জিম করবেট অমনিবাস

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন কলকাতা-৯

জিম করবেট অমনিবাস সংকলনটি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

❋

অলংকরণ ও প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

গ্রন্থনকারী
ডিলাক্স বাইন্ডিং ওয়ার্কস
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলকাতা-৯

দাম ৩৫·০০

ভূমিকা

এডোয়ার্ড জেম্‌স করবেট

(১৮৭৫—১৯৫৫)

এক

এডোয়ার্ড জেম্‌স করবেট বা জিম করবেট, ১৮৭৫ সালের ২৫শে জুলাই নৈনিতালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ক্রিস্টোফার গার্নি, মায়ের নাম মেরী জেন। ওঁদের প্রথম সন্তান টমাস; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান মেয়ে—তৃতীয় সন্তানের নাম মার্গারেট বা ম্যাগি; চতুর্থ জেম্‌স বা জিম; পঞ্চম আরেকটি ছেলে। দাদা টমের নাম "জাঙ্গল লোর" ও "মাই ইণ্ডিয়া"য় দেখা যাবে। ম্যাগির উল্লেখ সব বইয়েই আছে। সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের নাম "ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন" বইয়ের "রবিন" লেখায় আছে।

করবেটের বাবা নৈনিতালে পোস্টমাস্টার ছিলেন। করবেটের চার বছর বয়সে বাবা মারা যান। টম নৈনিতালের পোস্টাপিসে চাকরি পান। তিনিই পরিবারের অভিভাবক হন। ওঁদের বাড়ি নৈনিতালের আয়ারপাটায়, বাড়ির নাম "গার্নি হাউস"। করবেটের লেখা থেকে জানা যায় টম তাঁকে শিকারে প্রথম উৎসাহ দেন। নৈনিতালের স্কুলে করবেট বন্দুক চালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

নৈনিতাল ছিল করবেট পরিবারের গ্রীষ্মাবাস। করবেট লিখেছেন নৈনিতাল হ্রদের (তাল : হ্রদ) পাশের নৈনী দেবীর মন্দিরের চার মাইলের মধ্যে তিনি অন্যান্য প্রাণী সহ বাঘ, চিতা, ভাল্লুক ও সম্বর দেখেছেন এবং ওই একই জায়গায় একশো আটাশ জাতের পাখি চিনতে পেরেছেন। করবেট পরিবারের শীতাবাস নৈনিতাল থেকে পনের মাইল দূরে কালাধুঙ্গি নামক গ্রাম সমষ্টির অন্তর্গত ছোটি হলদোয়ানি নামক গ্রামে, তবে করবেট জায়গাটিকে বারবার কালাধুঙ্গি বলেই উল্লেখ করেছেন। করবেটের জীবনের প্রথম দিকটি যে জায়গায় ও পরিবেশে, যাদের মধ্যে কেটেছিল, সে পরিচয় পাবার জন্যে আগ্রহী পাঠক "আমার ভারত" ও "জাঙ্গল লোর" পড়ে দেখতে পারেন। ১৯৬০ সালে বালকৃষ্ণ শেষাদ্রি কালাধুঙ্গিতে করবেটের বাড়িটি দেখতে যান। তখন বাড়িটি জরাজীর্ণ, কামরার জানালাগুলি বন্ধ। দেওয়াল থেকে আস্তর খসে পড়ছে। শেষাদ্রিকে একজন গ্রামীণ বলেছিলেন, বাড়িটির নতুন মালিক শহরে থাকেন, বাড়িটি এক তত্ত্বাবধায়কের হেফাজতে আছে। বাড়ির হাতা গ্রামবাসীরাই পরিচ্ছন্ন রাখেন। ১৯৫৬ সালে ইণ্ডিয়ান বোর্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফের এক অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশ

সরকার কালাধুঙ্গির বাড়িটিকে মিউজিয়াম হিসাবে গ্রহণ করে করবেটের স্মৃতিরক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার বাড়িটি নেন ও করবেট মিউজিয়ামের কাজ শুরু করেন। বুনো শুয়োর, হরিণ ও ময়ূরের হাত থেকে গ্রামের ফসল বাঁচাবার জন্যে করবেট তাঁর সামান্য উপার্জন থেকে ছোটি হলদোয়ানি গ্রাম ঘিরে তিন মাইলব্যাপী যে পাঁচিল তুলেছিলেন, শেষাদ্রি সেটিও দেখেছিলেন।

ক্রিস্টোফার গার্নি'র নাগরিক সংজ্ঞা ছিল, তিনি ভারতে 'domiciled Englishman.' জিম করবেটের নাগরিকত্বও অনুরূপই ছিল। ওই সংজ্ঞার জন্যেই জিম করবেট, নৈনিতালের সবচেয়ে গর্বের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের সম্মানিত বোটহাউস ক্লাবের সদস্য হতে পারেন নি।

ক্রিস্টোফার গার্নি যখন মারা যান, তখন জিম করবেট নিতান্ত নাবালক। জিম করবেট স্থানীয় স্কুলের পাঠটুকুই সমাপ্ত করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সময় ও অর্থব্যয় সেদিন সকল শ্বেতাঙ্গেরও সাধ্যে কুলোত না। অত্যন্ত মেধাবী না হলে শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা উচ্চশিক্ষার কথা ভাবতেন না। মেধাবী ও উচ্চশ্রেণীর ছেলেরা যেতেন বাছাই করা সরকারী কাজে। এবং করবেট পরিবার খুবই সাধারণ চালচলতির গৃহস্থ ছিলেন। জিম করবেট স্ব-রচনায় নিজের বিষয়ে অত্যন্ত নীরব, সংকুচিত ও নম্র। যে লোক নিজের কথা কিছুই বলে যান নি, যাঁর কথা অন্যরাও বলেন নি, তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কম কথাই আমরা জানতে পারি। তবে মনে হয় না করবেট উচ্চশিক্ষার কথা আদৌ ভেবেছিলেন। ১৮৯৫ সালে কুড়ি বছর বয়সে করবেট বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে এক সময়-শর্তাধীন কাজে ঢুকে পড়েন। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর স্বভাব ও মানসিক চরিত্র স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। কি রকম স্বভাবের এক যুবক মান্কাপুরে কাজ করতে যান? তিনি লাজুক, স্বল্পভাষী, কঠোর পরিশ্রমী। স্বল্পভাষিতার অন্যতম কারণ হল, ছোটবেলা থেকেই দাদা টম ও চোরাশিকারী কুনওয়ার সিংয়ের নির্দেশে, নিজের কৌতূহলেও বটে, তিনি জঙ্গলে ঘুরেছেন। একটি গাদাবন্দুক ভরসা করে দশ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে একা রাতও কাটিয়েছেন। জঙ্গল ও জঙ্গলের বাসিন্দাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে, তাদের পরিচয় লাভেই তাঁর আনন্দ, সেই উদ্দেশ্যেই জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। আর, আরণ্যজীবনে প্রবেশাধিকারের প্রথম অলিখিত শর্তই হল একেবারে নির্বাক নিঃশব্দ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকতে জানা। জঙ্গলের, জঙ্গলের বাসিন্দাদের নিজস্ব ভাষা ও চালচলন আছে। গাছের পাতা পড়ার শব্দ, বাঘের শরীরের চাপে নুয়ে পড়া ঘাস সোজা হবার ভঙ্গি, বনের রাজার খবর জানতে বানর ও পাখির কিচিরমিচির ঠাহর করে শোনা, এ সব বুঝতে-দেখতে-জানতে হলে যত ধীর, নীরব ও ইস্পাত-নজর হতে হয়, করবেট তা হয়েছিলেন। তাই তিনি কোনো দিনই গল্পে, কথাকইয়ে মানুষ হতে

পারেন নি। খুবই লাজুক ছিলেন সেই বিশ বছরের যুবক। শুধু নিজের পরিবার, পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়জন, আর কালাধুঙ্গি গ্রামের মানুষদের নিয়ে তাঁর সমাজ। আবাল্য সঙ্গী ইবটসনও তাঁরই মত জঙ্গলে মানুষ, জঙ্গলের চালচলতিতে পাকাদখল, ভারতীয় সমাজে, বিশেষ গ্রামসমাজে করবেট খুব সহজ। বাইরে, খুব অন্তরঙ্গ মহলের বাইরে তেমন নন। আর সততা, সকর্ম, কর্তব্যপরায়ণতা তাঁর সহজাতও বটে, গ্রামসমাজ থেকেও আবাল্য তাই শিখেছেন। তাই সময় শর্তাধীন কাজ শেষ হলে যে টাকা বেঁচেছিল তা নিজে তো নেনই নি, ফেরত দেবেন কি বলে তাই ভেবে তাঁর চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তখনি যে জন্য তিনি জিম করবেট, কুমায়ুন-গাড়োয়ালের গ্রামসমাজের ঘরের মানুষ, তাদের 'শ্বেতাঙ্গ সাধু' সে স্বভাব তাঁর রক্তে বসে গিয়েছিল। তখনি তিনি এমন মানুষ, যে শুধু নিঃস্বার্থে ভালবাসতে, পরের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে দিতে জানে। যে সমালোচনা করতে বা তিক্ত হতে জানে না।. খুব সাধারণ অবস্থার দরিদ্র মানুষ হয়েও যে জীবনের অন্ধকার দিকটা স্বীকারও করে না, আমলও দেয় না। সত্যিকারের ধার্মিক মানুষ বলতে আমরা যদি সর্বজীবে দয়া, সকলকে ক্ষমা, সকলের প্রতি মমতা, এই সব গুণ সংবলিত মানুষের কথা ভাবি, তবে করবেট সেই বৃহত্তর, মানবিক অর্থে ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কুমায়ুনী গাড়োয়ালীরা তাঁকে প্রভুর জাতের প্রতিভূ ভাবতেন না, 'সাদা সাধু' বলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পূজারীদের মেয়েরা তাঁর এঁটো বাসন ধুয়ে দিতেন। করবেটের জীবনের এই সব সময়ের কথা 'মাই ইণ্ডিয়া' বইয়ে খুব বিস্তারিত লেখা আছে।

মানকাপুরের সময়-শর্তাধীন কাজটি খুবই পরিশ্রমের আবার করবেটের মনোমতও বটে। ট্রেনের বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাতে তখনো কয়লা ব্যাপক ব্যবহার হয় না। এঞ্জিনের বয়লারে কাঠও জ্বালানো হয়। মানকাপুরে তখন প্রচুর জঙ্গল। করবেটের কাজ ছিল জঙ্গলে গাছ কাটানো, একটি বিশেষ মাপে সে কাঠ টুকরো করে কাটিয়ে থাকবন্দী করে চালান দেওয়া। এই কাজ করার সময়েই তাঁর জঙ্গলের তাঁবুতে একটি হরিণ ছানা ও একটি অজগর আশ্রয় নেয়। একই তাঁবুতে খাদ্য-খাদক ও করবেট ঘুমোতেন। কোনো অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে নি। আরণ্যপ্রাণী যে মানুষের চেয়ে সহাবস্থানে বিশ্বাসী, এই প্রসঙ্গটিই তার প্রমাণ।

সময় ফুরোতে কাজ ফুরোল। এঞ্জিনের বাষ্পশক্তি যোগাতে থাকল খনিজ কয়লা। করবেট বাড়তি টাকা আপিসে জমা দিয়ে এলেন। কিছু বলতেই পারলেন না খোলসা করে, কথা আটকে গেল। তবে কর্মকর্তারা তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

দেখা যাচ্ছে তারপরও বছরখানেক করবেট ওই রেলওয়েতেই নানা জাতের কাজ করেছেন। এঞ্জিনের ফুটপ্লেটে দাঁড়িয়ে কত কয়লা পুড়ছে সে খবর নিয়ে

কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার কাজটি খুব পছন্দসই ছিল তাঁর, কেননা তখন এঞ্জিন চালাতে পেতেন। মালগাড়ির গার্ড, সহকারী গুদামরক্ষক, সহকারী স্টেশন-মাস্টার, নানারকম কাজই করেন এই সময়ে।

তারপরই মোকামাঘাটে তিনি ব্রডগেজ থেকে মিটার গেজে মাল চালান দেবার কন্ট্রাক্টের কাজ পেলেন। মনে রাখতে হবে তখন রেলদপ্তর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না। বহু ব্রিটিশ ফার্ম বিভিন্ন রেলপথের মালিক ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজে কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা হত। সে কাজে করবেট একেবারেই নতুন। কিন্তু শ্রমিক দল রংরুট করে তিনি অসীম যোগ্যতায় কাজ চালান। মোকামাঘাটের জীবনের বিশদ বিবরণী 'মাই ইণ্ডিয়া' বইয়ে আছে। এই কাজের সামান্য রোজগার থেকেই তিনি ছোটি-হল্‌দোয়ানি গ্রাম-ঘেরাও এক পাঁচিল তোলেন বহু বছর ধরে, একটু একটু করে। এই টাকা থেকেই তিনি গ্রামের সকল অধিবাসীদের দেয় খাজনার টাকা দিয়ে চলতেন। মোকামাঘাটে তার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয়। কুমায়ুন- গাড়োয়ালের মানুষ অরণ্য ও কৃষিনির্ভর। এরা রেলশ্রমিক, যদিচ দেশে সামান্য ক্ষেতগৃহস্থী অনেকেরই আছে। করবেট নিজের কথা কমই বলেছেন। তবু, মোকামাঘাটের চামারি, বুধুয়া ও বিদেশী লালাজীর কথা তিনি বলেছেন। চামারি জাতিতে অন্ত্যজ। কিন্তু করবেটের চেষ্টায় সে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠায় করেছিল এবং করবেটের সকল মানবসেবার কাজে ডান হাত ছিল। বুধুয়ার জীবন আজকের সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও আকর্ষণীয় বোধ হবে। কেননা সে ছিল মহাজনের শিকার, 'বেধবেগারী' প্রথার যন্ত্রে পিষ্ট অন্যতম এক দরিদ্র ভারতীয় গ্রামীণ। করবেট তাকে মহাজনের গ্রাস থেকে উদ্ধার করেন। আর লালাজীর প্রসঙ্গটি করবেটকে বোঝার পক্ষে সবচেয়ে ভাল চাবিকাঠি। লালাজী বিদেশী, অচেনা। তাঁকে করবেট কলেরার গ্রাস থেকে বাঁচান, বাড়িতে রাখেন, নিজের সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে তাঁকে পাঁচশো টাকা দেন। কোন বিশ্বাসে দেন? ভারতীয়রা কখনো ঠকায় না, এই বিশ্বাসে। সময়ে সে টাকা তিনি ঠিকই ফেরত পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে জিম করবেটকে এইভাবে চেনা যাচ্ছে, তিনি টাকা না পেলেও সমগ্র মানবজাতির ওপর বিশ্বাস হারাতেন না। মাথায় বেল পড়লেও কোন কোনো ন্যাড়া বেলতলাতেই যায় বারবার। জিম করবেট সেই জাতের মানুষ ছিলেন। এ রকম মানুষ ভারতের মাটিতেই হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। নিশ্চয়ই সকল ভারতীয় এ রকম নন। আর আজকাল মূল্যনিরূপণের যে মাপকাঠি তাতে জিম করবেট একান্তই বরবাদী বলে গণ্য হবেন। তবু এই রকম মানুষদের জন্যই 'মানুষ' শব্দটি যা-কিছু সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। এই মোকামাঘাটের কাজ করতে করতেই তিনি কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের মানুষখেকো বাঘ শিকার শুরু করেন।

এই তো কর্মজীবন। ব্যক্তিজীবন কি রকম ছিল? এখানেই জিম করবেট নামক আইডিয়াকে শক্ত হাতে চেপে ধরতে গেলে ভদ্রলোক পারার মত পিছলে বেরিয়ে যায়। যে জিম করবেট বাল্যের সুহৃদ ও অরণ্য পাঠের গুরু কুনওয়ার সিংকে আপিমের নেশাজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতাকে মারেন, মোকামাঘাটে মাল খালাস করেন। তাঁরা তিনজন জিম করবেট বলতে পারলে আমার কাজ সহজ হত। আধুনিক মানসের কাছেও তিনি বোধ্য হতেন। কিন্তু করবেট এমনই সৃষ্টিছাড়া মানুষ, যে জটিল ও বহুসত্তাধারী হতে তিনি জানতেনই না। অতএব তাঁর প্রত্যেকটি জীবনই অপর প্রত্যেক জীবনের পরিপূরক। মানুষটি একই রকম স্বল্পভাষী, সংযত, নম্র ও নিরীহ থাকেন, যখন তিনি মোকামাঘাটে মাল খালাস করেন। অথবা শত শত মাইল হেঁটে রুদ্রপ্রয়াগের চিতাকে একদিন একটি গুলিতে মারেন, কোনো নরখাদক বাঘ মারার পর বিশ্রাম না করে চল্লিশ, পঞ্চাশ বা সত্তর মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফেরেন নৈনিতালে, অথবা, যে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে, অরণ্য ও আরণ্যপ্রাণী বাঁচাবার জন্যে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেন, কিংবা বড়বোনের সঙ্গে গ্রামের বাংলোর বারান্দায় বসে গ্রামীণ মানুষদের ওষুধ-পথ্য-সুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। সব সময়েই ভাবখানা হচ্ছে, কোনো কৃতিত্বই তাঁর নয়, সব কৃতিত্বের দাবীই অন্যদের। তাঁর ভাগে তবু যে সম্মান, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জুটেছে সে জন্য তিনি অতিশয় লজ্জিত। প্রশংসা না পাবার জন্য করবেটের চেষ্টার অন্ত নেই। মোহনের মানুষখেকো বাঘ বহুজনকে মেরেছে, এবং বেঁচে থাকলে আরো মানুষ মারত, সেইজন্যেই তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মারার জন্য আত্মপক্ষে তিনি কিছু যুক্তি খুঁজে পান। অন্যথায় এবংবিধ কাপুরুষী কাজের জন্য তিনি খুবই লজ্জিত। অন্যান্য নরখাদক বাঘ ও চিতা মারার পর তিনি প্রায়ই যুক্তি দিয়ে বোঝান, দেখ, এই এই ব্যাপারগুলো যথাযথ ঘটেছিল বলেই জানোয়ারটা মারা পড়ল। তিনি যদি একা ঝোপের সামনে অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রুদ্রপ্রয়াগের চিতার জন্য অপেক্ষা করেন, সেটা কোনো সাহসের কাজ নয়। কিন্তু দূর থেকে ঘরের দরজা খুলে তাঁর কোনো অনুচর যদি হেঁকে তাঁকে ডাকে, তার সাহসের প্রশংসায় করবেট মুক্ত কণ্ঠ। সবচেয়ে মজার কথা হল, করবেট কোন কোন সময়ে যে জানোয়ারকে শিকার করলেন, তার দিক থেকে মানুষ মারার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। প্রায় প্রতিটি বাঘ বা চিতা মারার পর তিনি বলেন, চামড়া ছাড়াতে গিয়ে গুলির ঘায়ে পুরনো জখম অথবা মাংসে বেঁধা শজারুর কাঁটা দেখা গেল। এই জন্যেই ও মানুষ খেতে শুরু করে। রুদ্রপ্রয়াগের চিতার বেলা তিনি তাকে মারেন। কিন্তু অত্যন্ত মানবিকভাবে বলেন, সামনে শায়িত মৃত জানোয়ারটি দানো বা পিশাচ নয়। প্রকৃতির আইনও সে ভাঙে নি। তার একমাত্র দোষ, সে মানুষ খেয়েছিল, মানুষের আরোপিত

আইন ভেঙেছিল। করবেটের চরিত্রের মানবিকতা যে কত অখণ্ড, সম্পূর্ণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব যে কত সমগ্র ভাবে মানবিক, এতেই তা বোঝা যায়।

কিন্তু কি রকম ছিল তাঁর জীবন? ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ অবধি তিনি বারবার মানুষখেকো শ্বাপদ মারতে যান, সে সব বই পড়েই জানা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তিনি মোকামাঘাটে মালও খালাস করেন। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় কি করেন?

মজা হল, নাটকীয় কিছুই করেন না। নাটকীয়, ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবকারী কোনো ঘটনা ঘটে কি না আমরা জানতে পারব না। কেন না করবেট নাটক বা রোমাঞ্চ খুঁজে পান অন্যত্র। হিমালয়ের তুষারগলা নদীতে মহাশোল মাছ ধরতে গিয়ে জেন ইবটসন উলটে জলে পড়ে গেলে একটা হাসির ঘটনা ঘটে। বড় বাজ যখন পেঁচা ধরতে গিয়ে বিফল হয় তখন অত্যন্ত নাটকীয় উত্তেজনার সঞ্চার হয়। আর কোনো শিশিরভেজা হেমন্তের সকালে প্রিয় কুকুর রবিন কোনো চিতার হদিশ পেলে সে খুবই উত্তেজনার ব্যাপার। আমাদের কাছে তাঁর একেকটি নরখাদক শিকার চরম নাটকীয় উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের ব্যাপার, কিন্তু করবেটের কাছে তা অবশ্য কর্তব্য এক কাজ মাত্র, এবং কাজটি শেষ হলেই তিনি প্রচুর দুধ ও গুড়ে সিদ্ধ চা এবং প্রাণদায়ী সিগারেটের ধোঁয়া পান করতে পারেন। করবেট রোমাঞ্চ ও আনন্দ পান নীরবে জঙ্গলে হেঁটে, জঙ্গলের পুঁথির পাঠ বারবার গ্রহণ করে, আরণ্যপ্রাণীর স্বভাব ও আচার আচরণ লক্ষ করে। শিকারের চেয়ে অনেক আনন্দ পান তিনি চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে বাঘের ছবি তুলে।

এই তো করবেট। কি ঘটে তাঁর জীবনে? ১৯৩৮ সালে তিনি থাকের মানুষখেকো বাঘিনী মারেন। তাঁর শেষ নরখাদক শিকার, ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে আফ্রিকা যান। অন্য সময়ে কি করেন? কাজ যখন করতেন, তখনই বেশি বাঘ ও চিতা মারলেন। স্ব-স্বভাবে স্বল্প কথায় কোথাও কোথাও কোনো কোনো কথা বলেও ফেললেন। যেমন, পানারের চিতা মারার প্রসঙ্গে বললেন, 'আমাদের জীবনটা যত সুখেরই হ'ক না কেন, আসলে কোনো কোনা সময়কে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। ১৯১০ সাল আমার জীবনে তেমনি এক স্মরণীয় সময়। কেননা সে বছরই আমি মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো বাঘ এবং পানারের মানুষখেকো চিতাকে মারি। আমার কাছে, এবং মধ্যবর্তী সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, আমি ও আমার সহকর্মীরা যন্ত্রীয় সহায়তা ব্যতিরেকেই মোকামাঘাটে একেক দিনে পাঁচ হাজার পাঁচশো টন মাল খালাস করি।' এ ছাড়া তিনি কি করেন? কিছুই নয়। কাজের ফাঁকে সময় পেলে গ্রীষ্মে নৈনিতাল বা শীতে কালাধুঙ্গি চলে যান। আজীবন সঙ্গিনী বড়দিদি ম্যাগি এবং প্রিয় কুকুর রবিনের সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরেন; জঙ্গলের স্বাদ নেন ইন্দ্রিয়ে; পাখির কাকলি-ঝরনার ঝর্ঝর-পাতার মর্মর-হরিণ বা ঘুরাল বা বানরের ডাক—বাঘের গম্ভীর গর্জনের মিশ্র সঙ্গীত শোনেন; বন্দুক হাতে গ্রাম-

বাসীদের খেত পাহারা দেন ; মাছ ধরেন—তাঁর অতি প্রিয় নেশা ; খাওয়ার জন্যে হরিণ বা পাখি মারেন ; কালাধুঙ্গি ও অন্য গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য যা পারেন করেন ; নৈনিতাল পৌরসভার কাজকর্ম করেন। খুবই দুর্বোধ্য তিনি আমাদের কাছে, কেননা এত সামান্যেই তিনি অসীম আনন্দ পান।

আরো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন তিনি, যখন জানা যায়. ১৯১৫-১৬ সালেই, যথেষ্ট রোজগার করেছি বিবেচনায় তিনি মোকামাঘাটের কাজ ছেড়ে দেন। তখন তাঁর কত টাকা জমেছিল আমাদের জানতে ইচ্ছে করে বই কি। তখনকার হিসেবেও তা মোটা টাকা হতে পারে না। কেন না করবেটের দানদাক্ষিণ্যের কোনো অন্ত ছিল না। কিন্তু বেশি টাকার ব্যবহারও করবেট জানতেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি করবেট জমি কেনাবেচার কাজ করেছিলেন বলে যে সংবাদ জানা গেছে সে বিষয়ে সমগ্র তথ্য এখনো আমরা জানতে পাই নি। পরবর্তী সংস্করণে সে তথ্য বিষয়ে আরো জানানো যাবে বলে আশা করি।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কালাধুঙ্গি ও নৈনিতালে পছন্দমত শান্ত জীবন কাটাবেন বলেই তাঁর অবসর গ্রহণ, কিন্তু করবেট যুদ্ধের কাজে যাওয়া কর্তব্য মনে করলেন। জিম করবেট যে ব্রিটিশ সিংহের প্রতি অনুগত ছিলেন, তা নিয়ে মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্য শুনেছি। কিন্তু তাঁর আনুগত্য শ্বেতাঙ্গের স্বভাবোচিত নয়, নিরীহ গ্রামীণ-স্বভাবের ভারতীয়ের আনুগত্য। করবেট তাঁর রাজানুগত্যের জন্য বহু ভারতীয়ের মত স্বাধীনতাসংগ্রামী ভারতীয়দের বিরুদ্ধতা করে ধনী হন নি একথা যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই।

প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি কুমায়ুনী ফৌজ রংরুটে সাহায্য করেন ও একটি লেবার-ইউনিট নিয়ে ফ্রান্সে এবং ওয়াজিরিস্তানে যান। সেবারই তিনি লণ্ডনেও গিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন, জিমের কাণ্ড জান? ওআটারলু স্টেশনে নেমেছিল হাতে হারিকেন-লণ্ঠন ঝুলিয়ে। নেমেই বলেছিল, লণ্ডনের ডাকবাংলো কোথায় বলতে পারেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একবার তিনি টাঙ্গানাইকা যান বাড়ি তৈরি করতে বলে লিখেছেন বটে, কিন্তু শেষ জীবনে গিয়েছিলেন কেনিয়ায়। তাই মনে হয় সে বাড়ি তৈরি ওঁর হয়ে ওঠে নি। যুদ্ধবিরতির পর করবেট ভারতে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধের বোনাসলব্ধ টাকা কুমায়ুনী সৈন্যদের পুনর্বাসন-প্রকল্পে দান করেন। এরপর কালাধুঙ্গিতে ফিরে এসে তিনি সঞ্চয়লব্ধ টাকার অধিকাংশই গ্রামের লোকদের দেয় খাজনা দিয়ে ব্যয় করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ত্যাগের পরও এই বাবদে কালাধুঙ্গিতে তিনি টাকা পাঠাতেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি সমরবিভাগকে স্বেচ্ছায় সহায়তা করতে চান। তখনো করবেট কোনো বই লেখেন নি, সাধারণ্যে তাঁর কোনো পরিচিতিও নেই। তবে ওয়াকিবহাল মহল ও শিকারীরা তাঁর নাম জানতেন, জানতেন

করবেট মুখ্যাত এক অনন্য শিকারী। ভারতে অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে করবেটের ভূমিকার কথা সবাই জানতেন না। জঙ্গলে নিঃশব্দে চলাফেরার কায়দা, জঙ্গল চেনা, এতে তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা সরকারী মহল জানতেন। সেইজন্য, বর্মার জঙ্গলে যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত সৈন্যদের অরণ্যে চলাফেরা বিষয়ে প্রশিক্ষাদানের ভার করবেটকে দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষা দান কেন্দ্র ছিল মধ্য-ভারতের সামরিক ছাউনি মাউয়ে। সে সময়ে সেখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক প্রাক্তন সামরিক অফিসারের কাছে করবেট বিষয়ে এই স্মৃতিচারণটুকু শুনেছি।

জিম করবেটই যে প্রশিক্ষা দিচ্ছেন, একথা সবাই জানতেন না। করবেট অত্যন্ত আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। এই গ্রন্থের অনন্য, রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা শিকারপ্রসঙ্গে সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণীতেও তা বোঝা যাবে। সেনাবিভাগে এক ভারতীয় রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন। সবাই তাঁকে 'প্রিন্স' বলত। প্রিন্স রাজকীয় শিকারী। ভারতকে যাঁরা বাঘশূন্য করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর বংশের এবং তাঁর ব্যক্তিগত অবদান কিছু কম নয়। স্ব-কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য বিষয়ে প্রিন্সের যথেষ্ট গর্ব ছিল। বিকালে সকলে ক্লাব ঘরে মিলিত হতেন এবং খুশগল্প ও আড্ডা চলত।

একদিন, শিকারে অব্যর্থ হতে হলে কি দরকার, নিমেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, না তীক্ষ্ন দৃষ্টি, না অব্যর্থ নিশানা, না তিনটি অথবা দুটির যোগফল তা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। প্রিন্স বলেন, অব্যর্থ নিশানাই শেষ কথা নয়। বিতর্কে যখন তুফান উঠেছে তখন ছাউনির ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার বললেন, শোনা যাক এক্সপার্ট কি বলেন। কর্নেল করবেট, আপনি কি বলেন ?

অব্যর্থ নিশানা, রোদেপোড়া, শক্ত চেহারার বলিষ্ঠ এক প্রৌঢ় সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

প্রিন্স তা মানবেন কেন ? প্রৌঢ় বললেন, ওই দূরের গাছটি দেখ। একটি 'Y' আকারের সরু ডালের মাঝের খাঁজে একটি পাখি বসে আছে। ডালটি ভাঙবে না, পাখিটিকে মারতে হবে।

তখন বিকেলের আলো পড়ে আসছে। সব ধোঁয়াটে ধূসর। প্রিন্স বললেন, এ অসম্ভব। নজরই চলে না, পাখি মারব কি করে ?

প্রৌঢ় তাঁর গাড়োয়ালী অনুচরের কাছ থেকে রাইফেল নিলেন, তুললেন, গুলি ছুঁড়লেন, বললেন, কেন, এমনি করে ? সবাই ছুটে গেলেন। ডালটি অভগ্ন, পাখিটি মৃত। এ কাজ সম্ভব হল কি করে তাই যখন বলছেন সবাই, প্রৌঢ় বললেন, যখন রুদ্রপ্রয়াগের চিতা মারি……

তখন সকলের মাথায় ঢুকল ইনিই জিম করবেট। প্রিন্স তো ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে বাঁচেন না।

এরপরেই করবেটের কয়েকজন ভক্ত তাঁকে শিকার-স্মৃতি লিখতে পীড়াপীড়ি করেন। করবেট নিশ্চয় খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন। হ্যাঁ, প্রয়োজনে কয়েকটি নরখাদক শ্বাপদ মারতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ নরখাদক তো ১৯৩৮ সালেই মারা হয়ে গেছে। তাছাড়া সে শিকার বিষয়ে তাঁর গর্বও নেই কিছু। লিখে কি হবে? নিশ্চয় এইসব কথাই ভেবেছিলেন তিনি।

বহু বছর ধরে জিম করবেটে আগ্রহের ফলে নানা জায়গায় তাঁর বিষয়ে নানা কথা শুনেছি, কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, ও করবেটের নিজের লেখা নয়। যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা ইচ্ছে হলে এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে, ১৯২৬ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত করবেটের রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বিষয়ে সরকারের কাছে প্রদত্ত ইংরেজী বিবরণী পড়ে দেখতে পারেন। বিবরণীটির একটি আকর্ষণ হল, প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে ওটির কিছু কিছু তথ্যগত ও বর্ণনাগত পার্থক্য। তার চেয়েও বড় কথা হল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণীর ভাষা, স্টাইল, প্রকাশভঙ্গী এমনই, যে পড়ে নাম না দেখেও বলা যায় তা করবেটেরই লেখা। সে লেখা যখন লিখছেন, তার আঠার বছর বাদে তাঁর প্রথম বই বেরোয়। তাও অপরের জোরাজোরিতে লেখা। তাই, রিপোর্ট লেখার সময়ে করবেটের যে ভবিষ্যতে গ্রন্থকার হবার কোনো পরিকল্পনাই নেই, তা বলা চলে। সে পরিকল্পনা থাকলে করবেট ডায়েরি বা নোট রাখতেন। তাহলে যখন চিতার পেছনে ঘুরছেন, তখনকার বর্ণনা আর উক্ত প্রসঙ্গে লেখা বইয়ে সামান্য হলেও করবেট-গবেষকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক ছোট ছোট পার্থক্যগুলো ঘটত না। 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' বেরোয় ১৯৪৭ সালে। তখন করবেটের বয়স তিয়াত্তর। ডায়েরি বা নোট নয়, স্মৃতিনির্ভর বলেই কি লেখাতে এইসব পার্থক্য? যাইহ'ক, সেই বিবরণী পড়েও বোঝা যাবে করবেটের লেখার ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল।

যাঁরা তাঁকে বই লিখতে রাজী করান, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি। কৃতজ্ঞ থাকতে পারি করবেটের প্রকাশক অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের কাছেও। প্রথম বই 'ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' বেরোল ১৯৪৪ সালে। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এ পর্যন্ত বইটির বহু লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। প্রকাশকের পীড়াপীড়িতে 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' (১৯৪৭); 'মাই ইণ্ডিয়া' (১৯৫২); 'জাংগল লোর' (১৯৫৩) এবং 'দি টেম্পল্ টাইগার অ্যাণ্ড মোর ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' (১৯৫৪) প্রকাশিত হয়। শেষ বই "ট্রী টপ্স" মৃত্যুর পর বেরোয়। পাঠক জেনে আগ্রহী হবেন, করবেটের সকল বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের কর্মীদের জন্য এক ফাণ্ডে জমা হয়। প্রথম বইয়ের প্রথম সংস্করণের টাকা তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ভারতীয় সৈন্যদের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের চিকিৎসাকল্পে দান করেন। টাকার প্রয়োজন করবেট কোনোদিনই বোঝেন নি।

আজ করবেটের ভাষা ও স্টাইল ইংরেজীর জগতে স্বাধিকারে সম্মানের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু করবেটের কৃতিত্ব কোথায়? তাঁর চেয়েও বড় শিকারী নিশ্চয় আরো জন্মেছেন। অনেকেই বই লিখেছেন, অনেকে লিখবেনও। তবু সর্বকালে করবেটের লেখা সম্মান পাবে। তা শুধু তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য নয়। শিকার ব্যাপারটা এমনই, যে ভাগ্যচক্রে ঘটনার সমাপতনের ফলে সাফল্য তাতে একবার কি দুবার আসতে পারে। করবেট যে শিকারের কথা লিখে গেছেন, সেই নরখাদক শ্বাপদ শিকারে সাফল্য আনতে পারে মনের জোর, বুকের সাহস, অপরাজেয় উদ্যম ও শ্রম করার ক্ষমতা। অব্যর্থ নিশানা, অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও প্রখর শ্রবণক্ষমতা নিশ্চল নিশ্চুপে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকার ক্ষমতা, অনিয়মিত আহার ও নিদ্রায় অভ্যস্ত করা শরীর। এর প্রত্যেকটিই আবশ্যিক। এই সব কিছুর যোগাযোগ ঘটলে তবে সার্থক নরখাদক-শিকারী হওয়া চলে। যে শিকারী এরকম হবেন, তিনি শিকারকাহিনী লিখতে বসলে নিজের কৃতিত্বের কথা তাঁকে বলতেই হবে, তা অন্যায্যও হবে না। কেন না শিকার তো তিনি একাই করেছেন। তাঁর কথা আর কে বলবে?

কিন্তু শেষ অবধি লেখনী লেখে না, লেখে মানুষ। করবেটের বৈশিষ্ট্য হল, মানুষ হিসেবে তিনি নম্র, বিনয়ী, পরগুণগ্রাহী, আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরহংকার। প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি ভালবাসেন। অনর্থক রক্তপাতে বা হিংসায় তিনি বিশ্বাস করেন না। সেই মানুষই নরখাদক মেরেছেন, দুর্ধর্ষ দস্যু সুলতানাকে ধরার জন্য পুলিসবাহিনীর সঙ্গে গেছেন। কিন্তু সর্বদাই, সকল বিবরণীতে, অপরপক্ষের দিক থেকেও প্রসঙ্গটি বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে শিকার কাহিনী নিছক রোমাঞ্চকর একক ব্যক্তির গৌরব কাহিনী হয় নি। মানবিক গুণে তা আন্তরিক হয়েছে। খুব একটি হার্দ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন করবেট। পাঠককে একেবারে জড়িত করে ফেলতে পারেন সুলতানার জীবন কাহিনী কিংবা পিপলপানির বাঘের ব্যাপারে। সংযত, শোভন ও নির্মল কৌতুকের সুরের আবহ সৃজনে কখনো ভুল হয় না তাঁর। সেই সঙ্গেই, তাঁর আমিত্বকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেন না। হামবড়াই দূরে থাকুক, অহংএর যথাসাধ্য বিলুপ্তিই তাঁর কাম্য। যিনি লিখছেন, তাঁকেই ভালবাসতে থাকেন পাঠক। হাতগুনতি ছয়খানি বই পড়ার পর, শিকার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সঙ্গেও অনুরাগী পাঠক চিরতরে একাত্ম হয়ে থাকেন। এ রকমটি যখন ঘটে, তখন পাঠকের ভাল লাগে, নিশ্চিন্ত মনে হয়। কেননা এরকম লেখকের কাছে বারবার ফিরে যাওয়া যায়, জীবনের বিভিন্ন সময়ে, নিরাশ হতে হয় না একবারও। এখানেই করবেটের দারুণ জিত, বহু লেখকের ওপরে। পুনর্পঠন মূল্য না থাকলে কোনো বই সাহিত্যের দরবারে টেকে না। যাঁরা ইংরেজীতে করবেট

পড়েছেন তাঁরা আমার কথা বুঝবেন। করবেটের লেখক-সাফল্য অনেকের চেয়ে মূল্যবান এইজন্য, যে তিনি কোনো বিশাল-মহান-উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য করতে বসেন নি, শিকারের কথা লিখছেন, অথচ শিকার সাহিত্যকে তুলে দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সৃজনী সাহিত্যের আমদরবারে। রবার্ট লুই স্টীভেনসনের 'ট্রাভেল উইথ এ ডংকি' বা ডব্লু, এইচ ডেভিসের 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এ সুপার ট্র্যাম্প্' পড়লেও অনুরূপ বিমল আনন্দ পাই বটে, তবে তাঁরা দুজনেই সৃজনশীল সাহিত্যিক। স্টীভেন্সন তো বিশ্ববিখ্যাত, আর ডেভিসও প্রখ্যাত কবি। করবেটের ভাষা, স্টাইল, বর্ণনা যে কত সুন্দর, জাত লেখকের মত তিনি যথাস্থানে থামতেও জানেন, একথা করবেট অনুরাগী মাত্রেই জানেন। খুবই দুঃখ হয় তাঁর বই পড়তে পড়তে। মনে হয় চেনা জীবন ও জগৎ নিয়ে তিনি শিকার ছাড়াও এমনি স্মৃতিচারণাও যদি করতেন, আমরা লাভবান হতাম। দুঃখই হয়, আবার বলছি, কেননা করবেটের কুমায়ুনেও তো তাঁর 'মাই ইণ্ডিয়া'র চেহারা পালটে গেছে। তিনি লিখলে সেই জগৎ, সেই জীবন, সেই ভারতকে আমরা জানতে পেতাম। কোনো কোনো সময়ে রাগও হয়। চম্পাবতের মানুষ-খেকো বাঘ মারতে গিয়ে বাংলোতে কি অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা খোলসা করে লিখতে কি হয়েছিল? আর রাগ হয়, পাওয়ালগড়ের ব্যাচেলর আব পিপলপানির বাঘ, এদের না মারলেই কি চলছিল না? করবেট কখনো নরখাদক ছাড়া অন্য বাঘও মেরেছেন জানলে পরে যেন আমরা একটু লজ্জাই পাই। ঘরের মানুষ, প্রিয় মানুষের বিষয়ে যেমনটি মনে হয়, করবেটের বেলাও তাই।

১৯৪৪-এ প্রথম বই বেরোল। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হল। করবেট ভারত ছাড়া অন্য দেশ জানতেন না। করবেট থাকতেন নৈনিতালে তাঁর বড় বোন ম্যাগির সঙ্গে। ম্যাগি ও করবেট কেউই বিয়ে করেন নি। নৈনিতালের 'গার্নি হাউস' বাড়িটি, করবেটের মা মেরি জেন করবেট (মৃত্যু ৬।৫।১৯২৪) উইল করে ম্যাগিকে দিয়ে যান। 'গার্নি হাউস' এবং মায়ের পিয়ানো ম্যাগি পেয়েছিলেন। নৈনিতালের বাড়িতে করবেট চিরকাল থেকে যাবেন এই জানতেন। নৈনিতালে গ্রীষ্মকালে তিনি ও ম্যাগি থাকতেন। শহরে সবাই চেনা জানা। পনের বছর ধরে করবেট স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। শীতকালে কালাধুঙ্গি থেকে পনের মাইল হেঁটে তিনি বোর্ডের মিটিঙে আসতেন। নৈনিতালে ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের নির্মাণ স্থানটি তাঁরই পছন্দে বাছাই করা হয়েছিল। খুবই ভারতীয় ছিলেন তিনি। জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক বলেছেন করবেট জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন, নিজের কোষ্ঠিপত্র তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর জগৎ ও জীবনের সবরকম বিশ্বাসে যে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা তো তাঁর লেখাতেই বোঝা যায়। চামারির মৃত্যুকালে কাশীর

সাধুর আগমন (মাই ইণ্ডিয়া); সারদা নদীর তীরবর্তী পাহাড়ে অলৌকিক আলোর মিছিল (দি টেম্পল টাইগার অ্যাণ্ড মোর ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন); বালা সিংয়ের পেটে ত্রিশূলের দানো ঢুকে যাওয়া (ঐ), এই সব প্রসঙ্গ আমার উক্তিকে সমর্থন করবে। শহরে সকলেই বিশেষ ছোটরা তাঁকে ভালবাসত। করবেট তাদের আনন্দ দিতে গল্প বলতেন, পাখির ডাক নকল করতেন, জীবজন্তুর, বিশেষ বাঘের ডাক নকল করে শোনাতেন। তাঁর প্রকাশক সংস্থার বর্তমান ভারতে সর্বাধ্যক্ষ শ্রীরবি দয়ালের দেশ নৈনিতাল শহরে। ছোটবেলা সকলের কাছে 'ম্যান ইটার' ও 'জিম করবেট' শুনে শুনে তাঁর ধারণা হয়েছিল জিম করবেটই বুঝি মানুষ ধরে খান। স্কুলে যাবার সময়ে করবেটকে তিনি রোজই দেখেন, আর করবেটকে দূরে রেখে ঘুর পথে স্কুলে যান। করবেট একদিন তাঁকে ধরে ফেললেন। তখন সেই শিশুর মাথায় ব্যাপারটার পরিষ্কার হল।

এইভাবে যিনি বসবাস করছেন, (তাঁর পরিত্যক্ত আবাসগৃহের যে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি তাও এক প্রাচীন গৃহস্থালির) তিনি যে হঠাৎ তাঁর প্রিয় ভারত ছেড়ে আফ্রিকা চলে যাবেন, সেটি খুবই অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর। করবেট কেন ভারত ছেড়ে গেলেন ? তিনি যাকে 'স্বদেশ' বলছেন, সে দেশ তাঁর নয়, এ কথা কি করবেট সত্তর বছরে একবারও সন্দেহ করেছিলেন ? মনে তো হয় না। 'আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, আমাদের মেয়েরা, আমাদের পাহাড়ীরা, আমাদের রীতিনীতি,' লেখার ছত্রেছত্রে মানুষ-দেশ-প্রকৃতি বিষয়ে 'আমাদের' শব্দের ছড়াছড়ি। তাঁর ভারত ছেড়ে তিনি গেলেন কেন ? তাঁর নাগরিকত্ব 'ডমিসাইল্ড ইংলিশম্যান'-এর, সেই জন্য ? নাগরিকত্বের জন্য কোনো অসুবিধা হয়েছিল ? অত্যন্ত হালে এক সাংবাদিক লিখেছেন, হেইলি-ন্যাশনাল-পার্ক, উত্তর করবেট মৃত্যুতে যা করবেট-ন্যাশনাল-পার্ক নামে পরিচিত, করবেট তা স্থাপনে খুব উদ্যোগী ছিলেন এবং এই কারণেই উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে করবেটের মনান্তর হয়। সেইজন্যই করবেট দেশ ছেড়ে চলে যান। বিভিন্ন ব্যক্তিকে তিনি আফ্রিকা থেকে লিখেছেন, তাঁর প্রাণ পড়ে আছে ভারতে। তিনি দু-বছর বাদে ফিরবেন। এ বিষয়ে আরো তথ্য প্রকাশ না হওয়া অবধি বরং আমাদের এই দুঃখভার প্রশ্নটি নিরুত্তর থাকুক, যা জানা গেছে তাই বলা যাক আপাতত। দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর আট বছর আগে জিম করবেট বাহাত্তর বছর বয়সে, স্বাধীনতার বয়স তিন মাস হতেই 'গার্নি হাউস' বন্ধু শ্রীযুক্ত পি. কে. বর্মাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন ২১. ১১. ১৯৪৭ তারিখে এবং বড় বোন ম্যাগি সহ চলে যাচ্ছেন আফ্রিকার কেনিয়ায়। যাবার আগে বাড়ির বাগানে এক গাছ পুঁতে দিচ্ছেন। ঊনত্রিশ বছরে সে গাছ এখন বয়স্ক, পল্লবিত। যাবার আগে দুই অনুরক্ত অনুচরের সহায়তায় নৈনিতালের কোথাও, গভীরে গোপনে পুঁতে

রেখে যাচ্ছেন তাঁর তিনটি রাইফেল ও দুটি শটগান। নৈনিতালে, আজ যাঁরা করবেটকে নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের একজনের মত, ভারত ত্যাগের আগে করবেট শিকারজীবনে এইভাবে, আনুষ্ঠানিক পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেন। কথাটি আমরা গ্রহণ করি কি করে? শেষ নরখাদক ত ১৯৩৮-এ মারা হয়ে গেল। তারপর কখনো খাবার জন্য কিছু মেরেছেন কিনা তার রেকর্ড নেই। প্রমাণ আছে ছড়ানো ছেটানো, •চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে তিনি বাঘের ছবি তুলে বেড়িয়ে শিকারের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছেন। শিকারে যবনিকা কি আগেই টেনে দেন নি তবে?

'গার্নি হাউস' আজ শ্রীযুক্তা কলাবতী বর্মার দখলে। খুবই কৃতজ্ঞ আমরা বর্মা-পরিবারের কাছে। ঊনত্রিশ বছর ধরে তারা তাঁদের আবাসগৃহকে এমন ভাবে রেখেছেন, যেন তা জিম ও ম্যাগি করবেটেরই বাড়ি, তাঁরা সেখানে গৌণ। নৈনিতালের এক কোণে ওক (স্থানীয় নাম বান্ধ্) ও অন্যান্য গাছে ঢাকা এই পুরনো কেতার বাংলোবাড়ি। তিনটি ঘরে জিম করবেটের সব জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে আছে। তাঁর টিনের নৌকো, মাছ ধরার ছিপ। ধিকালায় নিহত এক হাতির দাঁত, দুটি বাঘের খুলি, করবেটের নন্দাদেবী সফরকালে ১৪,000 ফিট উঁচুতে নিহত একটি হিমালয়ান থর্‌এর চামড়ামোড়া জীবনানুগ মূর্তি। দর্শক ইচ্ছে হলে শ্রীযুক্তা বর্মার কাছ থেকে করবেটের মায়ের উইল ও এই বাড়ির বিক্রি দলিল দেখতে পারেন।

কালো পিয়ানোটি আজও শ্রীযুক্তা বর্মার যত্নে নিরেখ, ঝকঝকে। করবেটেরা চলে যাবার পর পিয়ানো সুরে বাঁধা হয় নি, বাজানোও হয় নি। ডাইনিং ঘরের কাচের বাসন-বাখা আলমারিটি করবেট মোকামাঘাট ৫০.৯ পাকা কাঠ এনে করিয়েছিলেন। শ্রীযুক্তা বর্মার মতে করবেট নিজের ডিজাইনে আসবাব করিয়ে নিতে ভালবাসতেন। ড্রয়িংরুমে আফ্রিকান আদিবাসী ড্রাম, দুটি কামান-গোলার খোল। ওদুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে করবেট নাকি বর্মা থেকে আনেন। তবে বর্মায় যুদ্ধার্থীদের প্রশিক্ষণই দেন নি তিনি শুধু? নিজেও গিয়েছিলেন? করবেট নিজের কথা বলে যায় নি কেন? ঘরে তাঁর ফোটো, ছবি। সংলগ্ন কামরায় তাঁর পুরনো কেতায় রোলটপ্ লেখার ডেস্ক্-টেবিল, তাঁর ইস্পাতের আলমারি। লাইব্রেরিতে তাঁর এবং পরিবারের বই। সাহিত্যের এনসাইক্লোপিডিয়া, স্টীভেনসনের "কিডন্যাপ্ড', ১৮৭০-এ মুদ্রিত এক ইংরেজ মেয়েদের গার্হস্থ্য ম্যাগাজিন, দুই খণ্ড 'ট্রেজারি অফ বটানি', নৈনিতালের ম্যাপ, ১৮৭২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ের। যেন হঠাৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দুই ভাইবোন সব কিছু, যা নিয়ে তাঁদের জীবন, সংসার, গৃহস্থালি। নাকি ভারতকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন মন থেকে? নৈনিতালে আজও যাঁরা করবেট বিষয়ে আগ্রহী, তাঁদের কারো কারো পিতাকে করবেট না কি নিয়মিত চিঠি লিখতেন, দু বছর

বাদে ফেরার সংকল্প জানাতেন। 'দু'বছর' কেন? করবেট কেন ভারত ছেড়ে যান, সে বিষয়ে সব কথা যেদিন জানা যাবে, সেদিন ছাড়া বহু প্রশ্নের উত্তর মিলবে না।

কেনিয়ার নিয়েরিতে ১৯৪৭-এ নবাগত সাদা শিকারীরা পাকা আস্তানা না পাওয়া অবধি 'আউটস্প্যান' হোটেলে থাকতেন। করবেটরাও সেখানেই প্রথমটা ওঠেন। বারান্দায় বসে ঋজু দেহ, ছিপছিপে বলিষ্ঠ মানুষটি লিখছেন, এ অনেকেই দেখেছেন। তাঁরা হয়তো ভাবেনও নি, স্বল্পভাষী মানুষটি যে-সব লেখা লিখছেন, বই হয়ে বেরোলে অচিরে তা বিশ্বপরিচিতি পাবে। প্রতি বিকেলে পাখিরা তাঁর গায়ে মাথায় বসত, হাত থেকে রুটি ও কেক খেত। যখন তিনি সাম্বুরু গেম পার্ক-এ অথবা বিখ্যাত অরণ্য-দর্শন আবাস, গাছের ওপরের বাংলো 'ট্রী টপ্স'-এ যেতেন, তখনো পাখিরা বিকেলে আসত প্রত্যাশায়। তাঁর নির্দেশে তাঁর ভাগের কেক ও স্যাণ্ডুইচ হোটেলের লোকরা পাখিদের দিত।

পরে করবেট একটি ছোট কটেজ কেনেন। বাংলোটি একদা লর্ড বডেন পাওয়েলের ছিল। বডেন পাওয়েল বিশ্ব-স্কাউট আন্দোলনের স্থাপয়িতা। এই বাড়ির সামনে করবেট একটি ছোট বাঁধানো জলাশয় তৈরি করে দেন পাখিদের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর যতদিন বেঁচেছিলেন, ম্যাগি পাখিদের নিয়মিত খেতে দিতেন।

এখানেই থেকে গেলেন করবেট ও ম্যাগি। মাঝে মাঝে করবেট সাম্বুরু গেম পার্ক দেখতে যেতেন। ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডের যুবরাণী এলিজাবেথ ও ডিউক অফ এডিনবরাকে নিয়ে তিনি ট্রী টপ্স'-এ একটি রাত কাটান। সে অভিজ্ঞতার কথা তাঁর শেষ বই 'ট্রী টপ্স'-এ লেখা আছে। কিন্তু এ রকম ঘটনা প্রত্যহ ঘটে নি। নিয়েরিতে প্রত্যহের জীবনে তিনি সাধারণের কাছে প্রায় অজানা ছিলেন। তখনো তিনি বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করেছেন, পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, লিখেছেন। জনৈকা ইংরেজ মহিলা রুথ ইডেন ১৯৫৯-এ এক ভারতীয় সাংবাদিককে বলেছিলেন করবেটরা তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর 'ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' বইয়ে করবেট লিখে দিয়েছিলেন, 'তোমাকে আমি বন্ধু বলে সম্ভাষণ করি, কেননা যাঁরা আমার বই পড়েন, সবাই আমার বন্ধু।' মৃত্যুর দু-দিন আগে এক তরুণ বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিটি দিন এমনভাবে বাঁচো, যেন এটি তোমার জীবনের শেষ দিন।' মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লিখেছিলেন, 'আমি, বা আমার দিদি ম্যাগি, কেউই বহু মানুষের ভিড়ে ভাল থাকি না।' ১৯৫৫ সালের ১৯শে এপ্রিল নিয়েরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন কুমায়ুনে বৈশাখ মাস। তুষারগলা ঝরনায় মাছের রুপোলী ঝলক, পাহাড়ের সানুদেশে পলাশে আগুন জ্বলছে, যাযাবর পাখিরা আবাসে ফিরবে

বলে ভাবছে, হিমালয়ের ওপরের আকাশ উজ্জ্বল নীল, আর কোনো কোনো পাহাড় এমন চোখে মায়া লাগায়, যে মনে হয় পা বাড়ালেই কাছে পেঁৗছে যাব, অথচ পাহাড় বহু দূরেই থাকে। সেণ্ট পিটার্স অ্যাংলিকল চার্চ সিমেট্রিতে এক নিরাভরণ সমাধিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ২৫. ১২. ৬৩-তে একই সমাধিতে ম্যাগিকেও সমাহিত করা হয়। শ্রীযুক্তা বর্মা বলেছেন, 'জিম ও ম্যাগি পরস্পরের জন্য বাঁচতেন।' সমাধির ওপর লেখা আছে "Until the daybreak and the shadows flee away."

দুই

মৃত্যুর পর জিম করবেট, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের অতি সামান্য মনোযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৯শে এপ্রিলের 'দি স্টেটসম্যান' কাগজে শ্রী বি.এম. কর্নেলিয়াস এক সংক্ষিপ্ত দেড়শো শব্দের বিবরণীতে করবেটের মৃত্যুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও বলেন, তাঁর মতে, চাঁদা তুলে নৈনিতালে এক প্রমাণ মাপের মূর্তি স্থাপনা করে করবেটকে শ্রদ্ধা জানানো হ'ক। আমি একটি মোটামুটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ (৪ ৬.১৯৫৫)। আজ তার পাতা উলটে দেখছি করবেটের অরণ্য ও আরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদানের ওপর খুব জোর দিয়েছিলাম। আসলে জিম করবেট আমার অতি প্রিয় লেখক, অরণ্য ও আরণ্য প্রাণীতে আমার চিরকালের আগ্রহ, এবং তখনি অধুনা দুষ্প্রাপ্য, করবেট ও জাফরি সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ' পত্রিকা পড়েছি।

যেহেতু করবেট উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন, সেহেতু তাঁর বিষয়ে উত্তরাঞ্চলে আগ্রহ বেশি থাকবে, এই স্বাভাবিক। দেরাদুন থেকে 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশ্যন সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া'র জার্নাল 'চিতল' এর সব কপি আমি পাই নি। যা যা পেয়েছি, তাতে করবেট প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে তাই বলি। 'চিতল' বেরোতে শুরু করে ১৯৫৮ সাল থেকে। প্রথম সংখ্যাতেই দেখছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে যা যা কাজ হয়েছে, তাতে 'চিতল' আগ্রহী। প্রথম সংখ্যার 'চিতল' বলছেন, প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় ১৯৩৫ সালে। সে বছর নয়া দিল্লিতে ভারত সরকার এক 'ওয়াইলড লাইফ কনভেনশন'-এর ব্যবস্থা করেন এবং সকল প্রদেশের প্রতিভূদের সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। সেই বছরেই সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমানের উত্তরপ্রদেশ) 'হেইলি ন্যাশনাল পার্ক' স্থাপিত হয়। 'চিতল'-এর সম্পাদক-মণ্ডলী এক আবেদনে জানান, "প্রিজারভেশ্যন অফ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশ্যন ইন্ দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস্"-এর পক্ষে অবৈতনিক সম্পাদকদ্বয় কর্নেল জিম করবেট ও হাসান আবিদ জাফ্রি সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড

লাইক' পত্রিকা (১৯৩৬-৩৮) বিষয়ে কেউ কোনো খবর দিতে পারলে সম্পাদকমণ্ডলী অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবেন।"

১৯৫৯ সালের এপ্রিল সংখ্যার 'চিতল'-এর খবরটি চিত্তাকর্ষক। তাতে লেখা হয়েছে, "পরলোকগত জিম করবেটের বোন মিস ম্যাগি করবেট 'ওয়াইল্‌ড লাইফ প্রিজারভেশ্যন সোসাইটি অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া'কে পাঁচশো টাকা দান করেছেন। বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সর্বোত্তম প্রচেষ্টার জন্য উত্তর ভারতের যে কোনো বালক/বালিকাকে 'করবেট পুরস্কার' নামে এক সাংবাৎসরিক পুরস্কার প্রদান-প্রকল্পে সোসাইটি এই টাকা খরচ করবেন।"

১৯৫৯ সালের অক্টোবরে 'চিতল' এক খবরে জানাচ্ছেন, "করবেট ন্যাশনাল পার্ক বিপন্ন। কেননা রামগঙ্গা নদীতে বাঁধ বেঁধে উক্ত পার্কের বৃহদংশকে এক হ্রদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা হচ্ছে।"

১৯৬০ সালের এপ্রিলে 'চিতল' বলছেন, "কিছুকাল আগে তদীয় বিখ্যাত ভাইয়ের স্মৃতিতে এক পুরস্কারের জন্য পরলোকগত জিম করবেটের বোন ম্যাগি করবেটের কাছে আবেদন জানানো হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সে আবেদনে সাড়া দেন এবং আমাদের পাঁচশো টাকা দেন। সোসাইটি তার সঙ্গে সমান অঙ্কের টাকা যোগ করেন এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ে করবেট স্মৃতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। এই পুরস্কারের বিষয়ে জানিতব্য সকল বিশদ সঙ্গের পরিপত্রে দেওয়া হল। আশা করা যায় পরিপত্রটি উত্তর ভারতের সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছবে এবং এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহ আকর্ষণে সমর্থ হবে।

পরিপত্র

উত্তর ভারতের সকল রাজ্যের শিক্ষাধিকর্তা সমীপে ॥

বিষয় : আরণ্যপ্রাণী বিষয়ে করবেট স্মৃতি পুরস্কার ॥

প্রিয় মহাশয়,

প্রখ্যাত শিকারী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রবক্তা পরলোকগত জিম করবেটের স্মৃতিরক্ষার এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ে ভারতে আগ্রহে উৎসাহদানের জন্য। করবেটের বোন মিস ম্যাগি করবেটের সহায়তায় 'দি ওয়াইল্‌ড লাইফ প্রিজারভেশ[illegible] ইণ্ডিয়া' এক সাংবাৎসরিক পুরস্কার দেওয়া স্থির করেছেন। উত্তর ভারতের যে কোনো বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর (নবম, দশম ও একাদশ) একক শিক্ষার্থীকে অথবা দলবদ্ধ শিক্ষার্থীদের, বন্যপ্রাণী সংবর্ধনে শ্রেষ্ঠ হাতে কলমী কাজের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই রূপায়ণীয় প্রকল্পে, অন্যান্য অনুরূপ বিষয়সহ নিচের একটি/দুটি বিষয় থাকতে পারে :—

(১) সম্পূর্ণ প্রজন-ঋতুর সময়কাল ধরে দুজোড়া পাখিকে পর্যবেক্ষণ।

(২) বন্যপ্রাণীর আলোকচিত্র গ্রহণ (অন্তত দুটি জাতের)।

(৩) দুটি বন্যপশু বা পাখির পদচিহ্নের মাপ গ্রহণ, তার রেকর্ড রাখা এবং প্ল্যাস্টারে সে চিহ্নের ছাঁচ নেওয়া।

(৪) নয় মাস থেকে বারোমাস কাল ধরে অন্তত দুটি প্রজাতির বন্য পাখি বা পশুর অভ্যাস-আচরণ পর্যবেক্ষণ।

(৫) পাখির জন্য বাসা তৈরি, ফলের গাছ লাগানো। পাখির স্নানাধার তৈরি, মাছের চাষ ও জীবজন্তুর পানের জন্য বাঁধ বেঁধে জল সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

পুরস্কারের জন্য পেশকৃত সকল প্রকল্পই হয় কোনো একক শিক্ষার্থী, অথবা সর্বাধিক পাঁচজন শিক্ষার্থীর এক মিলিত দলের কাজ হতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান ওই মর্মে অনুমোদন সূচক স্বাক্ষর করবেন।

৩১ ৮.১৯৬০-এর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে সকল নাম পৌঁছনো চাই। ১৯৬০ সালের অক্টোবরে পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে শিক্ষার্থীদের বা বিদ্যালয়গুলির, উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে আরো জানা প্রয়োজন। তাঁরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখতে পারেন।

বিদ্যালয় সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য উপরের বিশদ-তথ্যাবলী, আপনার অধীনস্থ জেলা-বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের অবগতিতে আনলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব। এই চিঠির দুশো কপি পাঠালাম। আপনার আধিক্ষেত্রিক বিদ্যালয়-গুলিতে এগুলি দয়া করে প্রচার করবেন। এ বিধির কপি আরো দরকার হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী সানন্দে তা পাঠাবেন।

বন্যপ্রাণী বিষয়ে আগ্রহ উদ্দীপনে এই প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

অবৈতনিক সম্পাদক ওয়াইলড লাইফ প্রিজারভেশ্যন সোসাইটি অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া।

১৯৬০ সালের এপ্রিল সংখ্যা 'চিতল'-এ মিঃ ব্র্যামলিকে লেখা জিম করবেটের চিঠির অংশ বিশেষ ছাপা হয়। ১৯৫৫ সালে ১০ই মে 'লণ্ডন টাইম্স'-এ চিঠিটি বেরিয়েছিল। অংশটি এইরকম, "কুড়ি বছর ধরে বন্যপ্রাণীর সপক্ষে আমি লড়েছি। যাঁরা সাহায্য করবেন, বিরোধিতা করবেন না বলে আশা করা যায়, বরাবর তেমন লোকরাই আমার প্রতিপক্ষতা করেছেন। রক্তপিপাসু পুরুষরা, বহু ক্ষেত্রে মেয়েরাও, সদাই কোনো-না-কোনো অছিলা নিয়ে হাজির থেকেছেন এটি কালে মানুষখেকো হবে, এটি হয় তো গৃহপালিত পশু খাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা আমাদের সময়ে যে সব অজুহাত দেখিয়েছি, আমাদের উত্তরাধিকারীরা এখন সেই সব অজুহাত দেখাচ্ছে। বাঘের বিষয়ে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, দু বছর আগে জেনারাল ওয়াভেল সেই এক প্রশ্ন

করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার মতে ভারতে ২000 বাঘ আছে। যখন তিনি জিগ্যেস করলেন, বাঘ 'কতদিন টিকবে বলে আমি মনে করি, আমি বলেছিলাম—অভয়ারণ্য এবং একটি বা দুটি ভারতীয় রাজ্য বাদ দিলে অন্যত্র দশ বছরের মধ্যে বাঘ লোপ পাবে।"

করবেটের চিঠিটি বাঘের ভবিষ্যৎ বিষয়ে এক আলোচনা-সভা সংশ্লেষে প্রকাশিত হয়। আলোচনার শুরুতে লেখা হয়েছিল, "ভারতে বাঘ অবলুপ্ত হতে চলেছে এমন আশঙ্কা আছে কি? মাঝে মাঝেই এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ইদানীং প্রশ্নটি বেশি উঠছে, যখন এদেশে বন্যপ্রাণী অবলুপ্তি বেড়ে চলেছে।"

১৯৫৫ সালের আগস্টে, ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অরণ্য পরিদর্শক প্রধান এম. ডি চতুর্বেদী করবেটের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করেন। তাঁর নিজের সংগৃহীত কিছু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতে বাঘ নিজেকে টিকিয়ে রাখছে। কিছুদিন আগে, বাঘ শিকারের জন্য ভারতে আবার এসে এক সামরিক অফিসার বলেন, এখনো প্রচুর বাঘ আছে। গভীর সন্দেহ করা হচ্ছে, আসল উত্তরটি এই দুয়ের মাঝামাঝি কোথাও লুকিয়ে আছে।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসের 'চিতল'এর সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখা যাক।

"ভারত ত্যাগের পর পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস শুরু করার পর পরলোকগত জিম করবেট কেনিয়ার নিয়েরিতে এক বন্যপ্রাণী সংরক্ষা সমিতি স্থাপন করেন এবং ১৯৪৯ সালে তিনি নিজেই তার অবৈতনিক সম্পাদক হন, এটি কুতূহলোদ্দীপক এবং লক্ষণীয়। সে সময়ে করবেট নিশ্চয় সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন! ত্রিশের দশকে জিম করবেট 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশ্যান সোসাইটি অফ দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস' স্থাপনে সহায়তা করেন এবং হাসান আবিদ জাফ্রির সঙ্গে উক্ত সংস্থার সহযোগী অবৈতনিক সম্পাদক থাকেন, 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ' পত্রিকা বহু বছর সম্পাদনা করেন, এ কথা পুনর্স্মরণ করা যেতে পারে। যুদ্ধ, পরবর্তী ঘটনাবলী এবং করবেটের আফ্রিকা যাত্রা, এই সব কিছুর যোগফল বন্যপ্রাণীর জন্য এই সব প্রচেষ্টার উপর যবনিকা ফেলে দেয়। জিম করবেটের দৃষ্টান্ত : বৃদ্ধ বয়সেও বন্যপ্রাণীর জন্য তাঁর কাজ প্রশংসাযোগ্য। যখন তাঁরা সক্ষম ছিলেন, তখন আরণ্যজগৎ থেকে বহু আনন্দ আহরণের পর বহু প্রাচীন শিকারী এমন নির্বেদে অবসর গ্রহণ করেন, যে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখেও সাহায্যার্থে তাঁরা একটি আঙুলও নাড়ান না। বস্তুত, যে সব প্রাচীন 'কোই হ্যায়'দের আমরা চিনি, তাঁদের অনেকেই ভারতের বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে যে কোনো প্রচেষ্টা বিষয়ে এতই উদাসীন ও নৈরাশ্যবাদী যে তাঁরা আমাদের সোসাইটিতে যোগ অবধি দেন না। শিকার করে, মাছ ধরে যে সব আনন্দময় সময় কাটিয়েছেন তা তাঁরা একেবারে ভুলে যান। উত্তরপুরুষের জন্য তাঁরা কোনো উত্তরাধিকারই রেখে যেতে চান না।"

৭, ৬, ১৯৬৫ তারিখের 'দি স্টেটসম্যান' কাগজে এই খবরটি বেরোয় : "ঢিকালা :—করবেট ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত কালাধুঙ্গিতে জিম করবেটের বাড়িটিকে উত্তরপ্রদেশ সরকার, এক মিউজিয়াম হিসাবে সংস্কার ও সংরক্ষা করতে চান। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান বোর্ড অফ ওয়াইলড লাইফের এক সভায় এই সংকল্প ঘোষণা করা হয়।"

'চিতল' পত্রিকার বক্তব্যগুলি আমি যথাযথ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলাম। লেখাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে করবেট অরণ্য ও আরণ্যপ্রাণী সংরক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। এখানে, করবেট কেন ভারত ও ভারতবাসীর স্মর্তব্য, সেই প্রসঙ্গটি আসছে। শুধু শিকারের কৃতিত্বের জন্য করবেটের সকল গৌরব হলে আমরা তাঁকে এমন করে মনে করতাম না এবং করবেটও আধুনিক ভারত-মানসে সংশ্লিষ্ট তাৎপর্য হারাতেন। সে বন, সে বনচারী নেই। করবেটের বইয়ে বর্ণিত প্রায় সকল অরণ্যাঞ্চল এখন বাঁধানো রাস্তা, জীপ-ট্রাক-বাস-মোটর-ট্যাক্সি, ট্রানজিস্টর ও জনতার দ্বারা আক্রান্ত এবং বিজিত। নরখাদক শ্বাপদ দূরে থাকুক, জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরলে বাঘের দেখা মেলাই দুর্লভ। আজ সেই দর্শক সংরক্ষিত বনে বা অভয়ারণ্যে বাঘ দেখেন, যাঁর 'টাইগার লাক' আছে।

এখানেই জানা যাচ্ছে করবেট কেন আমাদের স্মর্তব্য। কিছুই করার নেই আমাদের। করবেট আফ্রিকায় গিয়ে মরে যান আর যাই করুন, অবাধ্য জেদে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন কেন তাঁকেই শ্রদ্ধা জানাতে হবে। তাঁর উদ্ভট কৌতুকপ্রিয়তাও টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন না তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ. বলতে গেলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি কথা না বলে, একটি হরফ না লিখে তিনি সর্বশক্তি-সাধ্য-উপার্জন খরচ করে কানব মোষ তাড়িয়ে গেছেন। বহু জনের স্মৃতি-বহু চিঠি-বহু নথিপত্র থেকে তাঁর কাজ সম্পর্কে তথ্য বের করার ভার রেখে গেছেন আগ্রহীদের ওপর। এ কাজটি দুঃসাধ্য হবে, তাঁর তা মনেও হয় নি নিশ্চয়। পরকে বাঁচাতে যে পঁচাত্তর মাইল পাহাড় ঠেঙাতে পারে সে অন্যের ভবিষ্য অসুবিধার কথা ভাববে কেন? করবেটের নিজের বিষয়ে নিশ্ছিদ্র নীরবতার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। আশাকরি বোঝাতে পেরেছি, শিকারী করবেটকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, শিকারী করবেটের শতবার্ষিকী করে আমরা ঠিক করি নি। কেন না হন্তা করবেট নন, অরণ্য ও আরণ্যপ্রাণীর সংরক্ষয়িতা করবেট আমাদের স্মরণীয়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তিনি আমাদের কাছে আজ। কেন না ভারতের বন ও বন্যপশুপাখি আজ বন্যার মুখে বালুচরী পাখির বাসার চেয়েও বিপন্ন। কর্নেলিয়াস করবেটের মূর্তি করতে বলেছিলেন, আমরা ডাকটিকিট ছেপেছি, আরো আরো বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু করবেটকে তাতে প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানানো হয় নি। এ জাতীয় শ্রদ্ধা জানাতে আমরা জাতিগতভাবে সদাই ব্যস্ত। এতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুবিধা

অনেক। তা বুঝেছিলেন বলেই, জনশ্রুতি, গিরীশচন্দ্র বলেছিলেন, মূর্তি কোর না বাপ সকল, মাথায় কাক বসবে।

দেশ বলতে যাঁরা নীরব অরণ্য এবং মানব ভাষানভিজ্ঞ আরণ্য প্রাণীর কথাও ভাবেন, এগুলির প্রয়োজন বোঝেন, তাঁরা জিম করবেটকে শিকারী হিসাবে যত শ্রদ্ধা করেন, তার চেয়ে অনেক শ্রদ্ধা করেন আরণ্য প্রাণী ও অরণ্যানীর সংরক্ষয়িতা হিসাবে।

করবেটের বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন শিকার কাহিনী লিখলে কি হয়, করবেটের জঙ্গল ও জীবজন্তু বিষয়ে আশ্চর্য মমতা ছিল। জীবন বিষয়ে এই শ্রদ্ধা মমতা তাঁর স্বভাবে সহজাত, পরিবারে, গ্রাম সমাজে, সর্বত্র তিনি সকল জীবিত প্রাণীকে ভালবাসার শিক্ষাই পেয়েছিলেন। সহজাত প্রবণতার সঙ্গে প্রতিবেশের অনুকূল প্রতিক্রিয়া যুক্ত হয়েছিল। যে বাঘ মারার জন্য করবেটের এত নাম, সেই বাঘ বিষয়ে তাঁর প্রখ্যাত, ও বহুল উদ্ধৃত উক্তি স্মরণ করা যাক: "বাঘ হল দরাজ-কলিজা এক ভদ্রলোক, সীমাহীন তার সাহস। যেদিন বাঘকে বিলোপ করে দেওয়া হবে, আর যদি বাঘের সপক্ষে জনমত গড়ে না ওঠে বাঘ লোপ পাবেই—তাহলে ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রাণীর বিলোপে ভারত দরিদ্রতরই হবে।"

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন আজ পৃথিবী জুড়ে অনুভূত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আবহাওয়া ও ভূগোল নির্বিশেষে দেশের এক তৃতীয়াংশ বা শতকরা ৩৩ ভাগ জমি বনভূমি হওয়া প্রয়োজন। বন কথা কয় না, সভাসমিতি করে না, বিধান ও রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয় না, কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল করে, বৃষ্টিপাত সম্ভব করে, ভূ-ক্ষয় আটকায়, মাটির নিচে শিকড় চালিয়ে, শিকড়ে জল টেনে বন্যার প্রকোপকে বাধা দেয়, দেশকে কাঁচা মাল যোগায়, বহুজনের অন্নসংস্থান করে। ভারতে বনভূমি শতকরা বিশ থেকে তেইশ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে তা শতকরা তের ভাগ হবে। বন কেটে কৃষিভূমি হাসিল করা এবং জনবসত করানো চলছে তো চলছেই। বনের অবস্থা যখন এই, দেশের মানুষ যখন বনভূমির দরকারই বুঝতে নারাজ, তখন বন্যপ্রাণীর কথা কে ভাববে? আজ ভারতেও বন ও বন্যপ্রাণীর কথা ভাবা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গে এক অজানা জিম করবেটকে আমরা শ্রদ্ধা জানালে ঠিক হত। ভারতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জনমত গড়ে তোলার আন্দোলনে করবেটের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঘ মেরেছেন বলে নয়, বাঘকে বাঁচাবার জন্য নীরবে পাহাড়-পাহাড় বাধা ঠেলে চেষ্টা করেছেন দশকের পর দশক, তাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়।

অবশ্যই শিকারী করবেটকে গৌণ করা চলে না। কিন্তু তাঁর শিকার শিকার। জঙ্গল খোঁদিয়ে হাতির পিঠে, মাচানে বসে বা গাড়ি থেকে হত্যালীলা নয়। করবেটের সময়ে স্পোর্টের জন্যে শিকার তবু চলত, কেন না বন্যপ্রাণীর

সংখ্যা ছিল বেশি। আজও, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং চোখধাঁধানো আলো এবং জীপ এবং ভারি পকেটের সহায়তায় শিকারী তৈরি হন, তাঁরা নিজেদের হেমিংওয়ের ইমেজে বসিয়ে। অরণ্য বনাম মানুষ, এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিকার নিয়ে সাহিত্য লিখে পৌরুষ প্রতিমা মঞ্চে তোলেন। ট্রাজিডি এবং হাস্যকরতা হল, এখন একটি প্রাণী শিকার করাও অমানবিক, যদি না সে হন্তব্য বলে ঘোষিত হয় সরকারীভাবে। কেন না প্রাণী ও অরণ্য এখন ভারতে অন্ত যাচ্ছে। এ'রাই সংরক্ষণের বিপক্ষে কাজ করেন এবং দেশের বন্যপ্রাণী সম্পদ বিনাশে তৎপর থাকেন। এ'দের মত মানুষদের পূর্বসূরীরা নির্বাধ প্রাণীহত্যা করেছেন বলেই ভারতে প্রাণীজগৎ বিপন্ন হয়েছে। রাজারাজড়া, জমিদার, এ'দের শিকারের রেকর্ড হয়তো সাহসিকতার নয়, এক ধরনের অবিবেকী কাপুরুষতারই দলিল। করবেটের মত শিকারীর হাতে বাঘের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না, এ'দের হাতে হয়। অর্থ বলে এ'রা পুরুষের পর পুরুষ ধরে ট্রফি সংগ্রহ করে চলেন। জন্তু দেখলেই মারতে হবে, এ মানুষ-প্রজাতির রক্তলীন বর্বর অসহিষ্ণুতা। সকল শক্তিশালী বন্যপ্রাণী মনে করে নি মানুষ দেখলেই মারতে হবে। প্রাণীজগতে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা মানুষের চেয়ে বেশি। পশুরা যদি মানুষের মত রক্তপিপাসু হত, তাহলে শ্বাপদসংকুল ভারতে (গত শতকেও বাঘের সংখ্যা ভাবুন) জনসংখ্যা এমন পরমসুখে বৃদ্ধি পেত না। করবেট অন্যজাতের শিকারী। পৃথিবীতে কম প্রখ্যাত শিকারীই তাঁর সঙ্গে নামোচ্চারিত হতে পারেন।

করবেট, যখন নরখাদক মারছেন, তখন থেকেই, এমন কি রুদ্রপ্রয়াগের চিতাকে মারার আগে থেকেই সংরক্ষণের কাজে নেমেছিলেন। বাঘের ছবি তুলে যিনি অমর হয়ে আছেন, সেই এফ. ডব্লু. চ্যাম্পিঅনের ১৯৩৪ সালের এক লেখায় জানছি, সংরক্ষণের সপক্ষে জনমত গঠনে 'য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস ব্রাঞ্চ অফ দ্য প্রিজারভেশ্যন অফ দ্য ফনা অফ দ্য এম্পায়ার সোসাইটি'র স্থানীয় সচিব মেজর জিম করবেট বহু প্রচেষ্টা করছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে করবেট 'মেজর', 'কর্নেল' হন নি, এবং রুদ্রপ্রয়াগের চিতা মারার সময়ে সংবাদপত্রে তিনি 'মেজর' বলেই উল্লিখিত হয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে এই সোসাইটি বা সংস্থা ভারত-সরকারের প্রচেষ্টিত বা অনুমোদিত এক সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা।

এটি হল ১৯৩৪ সালের কথা। সংরক্ষণ কাজে 'বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র ভূমিকা মহামূল্যবান। ১৯২৭ সালে সোসাইটির জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী 'এম্পায়ার ফনা সোসাইটি'কে সহায়তা করতে এবং সংযুক্ত প্রদেশে উক্ত সোসাইটির সচিব মেজর করবেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

করবেট তাহলে বিশের দশক থেকেই এম্পায়ার সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। সংরক্ষণের কাজে সবচেয়ে দরকার বন্যপ্রাণীপ্ররক্ষার সপক্ষে জনমত গঠন করা। এ কথা তিনি বুঝেছিলেন অনেক আগেই। আর এও বুঝেছিলেন, কতিপয় শ্বেতাঙ্গ বা সরকারী আধিকারিক একথা বোঝা যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের বোঝা দরকার, আর সে দুরূহ কাজ কখনোই খোলাখুলিভাবে সরকারী ছাপমারা এক সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশের দশক ভারতের ইতিহাসে এক অস্থির, বিক্ষুব্ধ দশক। ১৯২০-২২ অসহযোগ আন্দোলন হয়, গান্ধীজী জেলে যান। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের পক্ষে দ্যোতক ঘটনা ঘটে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), এই দুটি। ১৯২৭-এ সাইমন কমিশন বর্জন করে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ আইন-অমান্য, খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব নেয়। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা বিশ থেকে তিরিশের দশকে পেঁাছে আরো জোরদার হয়। করবেট যে আন্দোলন করছিলেন, একেবারেই শিক্ষিতজনেরও এক দশমিকাংশের মধ্যে তার সম্ভাব্য পরিসরক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তবু, সাদা চামড়ার মানুষ তিনি, এম্‌পায়ার ফনা সোসাইটির টিকিট নিয়ে সেই সংকীর্ণ বৃত্তেও ঢোকা কঠিন হত। আর, বেসরকারী সংস্থা ছাড়া কোনো কাজই শেষ অবধি দাঁড়ায় না। সম্ভবত এই সব বুঝেশুনেই, করবেট তিরিশের দশকের শেষার্ধে আবিদ জাফ্রির সহযোগিতায় 'দ্য অ্যাসোসিয়েশ্যন ফর দ্য প্রিজার্ভেশ্যন অফ গেম ইন্‌ দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্‌সেস' গঠন করেন। এই সংস্থার নাম আমি দুরকম লিখেছি। 'ইন্‌' এবং 'অফ' জেনেশুনেই। যাঁরা যে-ভাবে লিখেছেন, তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে সে-ভাবে লিখেছি। কোনো সরকারী প্রকাশনায় সংস্থাটির নাম পাই নি, অতএব কোন নামটি আদিরূপে অবিকল, তা বলতে পারব না। এই সংস্থার মুখপত্র 'ইনডিয়ান ওয়াইল্‌ড লাইফ' ১৯৩৬—১৯৩৮, তিন বছর বেরোয়। এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ও সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় এক। এই হিসাব ধরলে এই বেসরকারী সংস্থা ১৯৩৬ এ স্থাপিত হয়। আমার ধারণা ১৯৩৫এ। তখন ম্যালকম হেইলি সংযুক্তপ্রদেশের গভর্নর। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনের সঙ্গে আমি 'বন' কথাটি আগাগোড়া ব্যবহার করলাম। কেননা বন সংরক্ষিত হলে তবেই বন্যপ্রাণী বাঁচে।

এই সংস্থা ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কি ভূমিকা পালন করেছিল, তা ১৯৫৩ সালে প্রাক্তন সামরিক, সংরক্ষণ আন্দোলনের সক্রিয় উৎসাহী আর ডব্লু, বার্টন সংকলিত "দ্য প্রিজারভেশ্যন অফ ওয়াইল্‌ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া" বইয়ে সংকলয়িতা লিখিত এক প্রবন্ধ থেকে তুলে দিচ্ছি। ১৯৪৮ সালে লিখিত তাঁরই পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধে বার্টন বলছেন: "ওয়াইল্‌ড লাইফ অ্যাণ্ড অর গেম অ্যাসোসিয়েশ্যান্‌স——যদি সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, তাহলে যেখানে

এ রকম সংস্থা আছে, সেখানে এগুলি সুফল দর্শায়। যেমন ধরা যাক 'দ্য অ্যাসোসিয়েশ্যন ফর দ্য প্রিজারভেশ্যন অফ গেম ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস। ১৯৩৫ সালের জানুআরিতে এই সংস্থার মাধ্যমেই দিল্লিতে সর্বভারতীয় বন্যপ্রাণী রক্ষা সম্মেলন হয়েছিল এবং কালাগড় ফরেস্ট ডিভিশনে হেইলি ন্যাশনাল পার্ক স্থাপিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, "একমাত্র জনমতের সহযোগিতাতেই ভারতীয় বন্যপ্রাণীকে বাঁচানো যেতে পারে। আইন প্রণয়ন, সে যত দক্ষ নিপুণই হোক না কেন, জনসাধারণের সর্বান্তর সমর্থন ব্যতীত এ কাজে সামান্যই সফল হতে পারে।"

কত সত্যি সে কথা! কোথায় সেই জনমত? কোথায় জনসাধারণের সমর্থন? আজ তেরো বছর বাদে বন্যপ্রাণীর অবস্থা কি?

বার্টন যে কথা ভেবেছেন, একই বইয়ের অন্যত্র আরেকজন সে কথা ভাবেন নি। তিনি সব কৃতিত্ব দিচ্ছেন হেইলিকে। কারণ দ্বিবিধ। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু হলেও করবেট সামান্য জন, হেটলি গভর্নর। তাছাড়া, করবেট কাজ করেই খুশি, নাম জাহিরে ব্যস্ত নন। কে বা জানছে কে গড়েছিল সংস্থা, হেইলিকে আগ্রহী করেছিল, সর্বভারতীয় সম্মেলন ঘটিয়েছিল? করবেট পরলোককে বহু জায়গায় 'Happy hunting grounds' বলেছেন। করবেট ও হেইলি দুজনেই সেই আনন্দময় মৃগয়াক্ষেত্রে গেছেন। কার কৃতিত্ব কে নিল, সে কচকাচিতে আর তাঁদের কিছু এসে যায় না আজ। যা হ'ক, সেই বইয়েই এম. এস. রণধাওয়া বলছেন: "ভারতে ন্যাশনাল পার্ক বিষয়ক তথ্যগুলির সংক্ষেপসার ডাঃ বৈনীপ্রসাদ এইভাবে করেছেন, "প্রদেশের আলোকিতচেতন গভর্নর সার ম্যালকম হেইলির মহান ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৪ সালে সংযুক্তপ্রদেশে এ বিষয়ে বড় রকম অগ্রগতি ঘটেছিল। তার ফলে ১৯৩৪ সালের ন্যাশনাল পার্ক অ্যাক্ট পাস হয়। ন্যাশনাল পার্কসমূহ স্থাপন; বন্যপ্রাণী অথবা বিজ্ঞানের পক্ষে আগ্রহোদ্দীপক অন্যান্য বিষয়ের সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ; এই অ্যাক্টটিতে এই সব কিছুর ব্যবস্থাই ছিল। ফলে বিখ্যাত পাটলি দুন এবং তার দক্ষিণে প্রায় ৯৯.০৭ বর্গমাইল ব্যাপী পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল নিয়ে গঠিত হেইলি পার্ককে ন্যাশনাল পার্ক অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। এই আইনে প্রাণী শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় "স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ অথবা পাখি।" ন্যাশনাল পার্কে কোনো প্রাণীকে মারা, জখম করা, উত্যক্ত করা অথবা কোনো পাখির ডিম বা বাসা নষ্ট করা এই আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়। যে সব শর্তাধীনে মানুষকে ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ বা বসবাস করতে দেওয়া হবে তা এই আইনে বলে দেওয়া হয় এবং বন-বিভাগের উপর সেগুলি বলবৎ করার অধিকার বর্তায়।

এম. এস. রণধাওয়ার লেখাটি ১৯৫৩ সালে বার্টন সংকলিত বইয়ে বেরোয়।

বোঝা যাচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে অরণ্য বিষয়ে যাঁদের ওয়াকিবহাল মনে করা হত, তাঁদের মন থেকেও জীবিতকালেই করবেটের 'সংরক্ষিয়িতা' ইমেজটি মুছে গিয়েছিল। গভর্নর হেইলি নিশ্চয় অরণ্যপ্রাণ ছিলেন, এবং তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতা খুবই সহায়ক হয়েছিল। তা বলে দিল্লির সম্মেলন আহবান, পাটলি দুনে হেইলি ন্যাশনাল পার্ক স্থাপন, এবং পিছনে করবেট ও জাফ্রি পরিচালিত সংস্থার অবদানের গুরুত্ব কমে না। রাধানাথ শিকদার এভারেস্টের উচ্চতা মাপেন। নামকরণ হয় সার জন এভারেস্টের নামে, এ ঘটনা সে আমলে ঘটতে পারে, সহৃদয় ও অনুকম্পায়ী গভর্নরের নামে ন্যাশনাল পার্কের নাম করণও হতে পারে, কেননা দুটিই দীর্ঘসময় আগে পরে ব্রিটিশ শাসনকালীন ঘটনা। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল রাধানাথের অবদান ভুলে যান না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহল প্রাক্-স্বাধীনতা সংরক্ষণ-প্রয়াসী সংস্থাগুলির প্রতি যেন বড় বেশী উদাসীন ও সেগুলিকে কোনো কৃতিত্ব দিতে নারাজ। কিন্তু করবেট ভারত ত্যাগের পর আলোচ্য সংস্থাটি বোধকরি উঠে যায়। কেননা এদিকে দেখছি ১৯৪৯ সালে ইন্সপেক্টর জেনেরাল অফ ফরেস্টস এম. ডি. চতুর্বেদী বলছেন, "বন্যপ্রাণী সংরক্ষা কল্পে অতীতে সংগঠিত সংস্থাগুলি বলতে গেলে কার্যকরী ছিলই না। 'দ্য অ্যাসোসিয়েশ্যন ফর দ্য প্রিজারভেশ্যন অফ গেম ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস বলতে গেলে এক লুপ্তপ্রায় সংস্থা। বহু বছর ধরে বনবিভাগ এই সংস্থাকে বছরে ১২০০ টাকার এক অঙ্ক দিয়ে আসছে সহায়তা-গ্রান্ট হিসাবে। এ বছর বহু স্মারকপত্র পাঠানো সত্ত্বেও আমি এর সম্পাদকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে উঠতে পারি নি। আর, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই গ্রান্ট নিতেও কেউ এগিয়ে আসছে না।"

বোঝা যাচ্ছে ১৯৪৭এ করবেট ভারতত্যাগের পর খুব তাড়াতাড়ি সংস্থাটি উঠে যায়।

এ পর্যন্ত লব্ধ নথিপ্রমাণ থেকে তাহলে এটুকুই আমরা জানতে পারছি, বিশের দশকে করবেট 'ফনা অফ দ্য এম্পায়ার সোসাইটি'র সদস্য ও স্থানীয় সচিব ছিলেন। তারপর, তিরিশের দশকে তিনিও হাসান আবিদ জাফ্রি 'দ্য অ্যাসোসিয়েশ্যন ফর দ্য প্রিজারভেশ্যন অফ গেম ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস' স্থাপন করেন এবং এই সংস্থার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ' প্রকাশ করতে থাকেন। বাঘের ছবি তুলে বিখ্যাত এফ. ডব্লু চ্যাম্পিঅনের বই 'উইথ এ ক্যামেরা ইন টাইগার-ল্যাণ্ড' এবং 'দ্য জাংগল ইন সানলাইট অ্যাণ্ড শ্যাডো' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২৭ ও ১৯৩৪ সালে। চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে করবেট ছবি তোলার সহায়তা করেন ও আগাগোড়াই সংরক্ষণ-সপক্ষে জনমত গঠনের কাজে তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সর্বভারতীয় বন্যপ্রাণী সম্মেলন আহবানে করবেট ও তাঁর সংস্থা এক সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই সম্মেলনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা

এর পরই ১৯৩৫-এর 'বন্যপ্রাণী আইন' প্রণীত হয়। হেইলি ন্যাশনাল পার্ক ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক এবং এটি স্থাপনে করবেটের ভূমিকা ছিল মুখ্য কর্মীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়ে করবেট যুদ্ধের কাজে চলে যাবার পর 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ,' আর বেরোয় নি।

মিঃ ব্র্যামলিকে করবেটের লেখা যে চিঠির অংশ অন্যত্র উদ্ধৃত করেছি সে চিঠি করবেট ১৯৪৬-এ লেখেন বলে বালকৃষ্ণ শেষাদ্রির 'দ্য টোয়াইলাইট অফ ইণ্ডিয়া'জ ওয়াইল্ড লাইফ বই থেকে জানা যাচ্ছে। সেই চিঠিতেই গত বিশ বছর যাবৎ তিনি বন্যপ্রাণী বাঁচাতে লড়ছেন এই উক্তি আছে এবং ফলে করবেটের সংরক্ষণী কার্যকলাপের প্রারম্ভকাল দাঁড়াচ্ছে ১৯২৬, ১৯৪৬-এও তিনি সমান উদ্বিগ্ন থাকছেন বন্যপ্রাণীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে, দেখাই যাচ্ছে। ১৯৪৭এর নভেম্বরে করবেট আফ্রিকা যাচ্ছেন। 'চিতল'-এ প্রকাশিত সংবাদ ও আমার পাওয়া অন্যান্য তথ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে আফ্রিকাতে গিয়েও তিনি সংরক্ষণী সংস্থা স্থাপন করেছেন, কাগজ বের করেছেন, সে কাগজে লিখেছেন। এ বই পুনর্মুদ্রিত হলে আমরা করবেটের আফ্রিকা বাসকালীন সংরক্ষণী কাজকর্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রত্যেকটি চেষ্টাই দেয়ালে মাথা কোটা কেননা একে করবেট স্ফিংকস্ বা মোনালিজার চেয়েও স্ব-রহস্য গোপনে রাখায় দক্ষ, দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সাল থেকে 'এ সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ' স্থাপন করে ভারত সরকার যখন সংরক্ষণের কাজ গুরুত্ব সহকারে শুরু করলেন, করবেটের সঙ্গে সে কাজের কোনো যোগাযোগও স্বাভাবিকভাবেই থাকে নি। তবে করবেট যে ভারতের সংরক্ষয়িতা ও বন্যপ্রাণী প্রেমীদের মধ্যে অন্যতম মুখ্য পুরুষ, তা বোধহয় বোঝাতে পেরেছি।

আজ সেই আলোতেই করবেটের নতুন, কালোপযোগী মূল্যায়ন প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন, কেননা আজ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি জাতীয় আবশ্যিকতা। এই একটি কথায় কেন আমি ফিরে ফিরে আসছি, কেন বলছি সংরক্ষয়িতা করবেটই মুখ্যত স্মরণীয় তাই বলি।

এ কথা বলতে গেলে ভারত বন ও বন্যপ্রাণীর কথা সংক্ষেপে না বলে উপায় নেই। বিশ বা দশ বছর আগের কথাও আমি বলব না। কেননা অরণ্য ও আরণ্য প্রাণীর অবস্থা দিন দিন মন্দ হচ্ছে। অবস্থা এমনই, যে দশ বছর আগের পরিসংখ্যায় দেখলেও মনে হবে এত প্রাণীও ছিল। আবার বাঘ, গণ্ডার, ইত্যাদি প্রাণীকে কঠোর প্ররক্ষায় বাঁচিয়ে সংরক্ষণ যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানে তাদের সংখ্যাও কিছু বেড়েছে।

আজ ভারতের পরিস্থিতি হল, প্রথমত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে যতখানি ভূ-সীমা জুড়ে বনাঞ্চল থাকা উচিত, সেই শতকরা তেত্রিশ ভাগে বন নেই। গড়পড়তায় হয়তো বিশ থেকে তেইশ ভাগ (শতকরা) জমিতে বন আছে। রাজ্য,

বিশেষে সে হিসাবও রেখে চলা যায় নি। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বনভূমি আছে সমগ্র ভূসীমার শতকরা তেরভাগ জুড়ে। মানুষের প্রয়োজনে বনভূমির সংকোচন ভারতে কি দ্রুতহারে ঘটেছে, তা বালকৃষ্ণ শেষাদ্রি কয়েক কথায় সুন্দর বলেছেন। তিনি বলছেন, "ভারতে যে দ্রুত হারে, নিঃশেষে, প্রকৃতিসৃষ্ট অরণ্য, বন্যপ্রাণীর আবাসভূমির বিনাশ ঘটেছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তা হয় নি। গত পঁচিশ বছরে অভয়ারণ্যের ভিতরে ও বাইরে ভারতের বন্যপ্রাণীর বিধ্বংসী ক্ষয় সাধনের জন্য বন-বিনাশ দায়ী। বিশিষ্ট ন্যাচুরালিষ্ট পিটার স্কট লিখেছেন, "আলুর খেত করার জন্য একটি মহান ক্যাথিড্রাল ভেঙে ফেলা যেমন অর্থহীন, তেমনি অর্থহীন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট করা।"

নানাবিধ জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এই বন-বিনাশের জন্য মুখ্যত দায়ী। সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি প্রকাশ ; জমিতে পুনর্বাসন প্রকল্প ; আবাদী হাসিল প্রকল্প ; আবাদী জমি হাসিল প্রকল্প ; কাঠ সংগ্রহ ; বনকেন্দ্রিক শিল্প ; সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য বৃক্ষরোপণ ; শৈল্পিক ও পরিবহণ ব্যবস্থা ; এগুলি দেশে জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে বনভূমি সংকুচিত ও বিনষ্ট হয়েছে, বন্যপ্রাণী লোপ পেয়েছে অসংখ্য। আফ্রিকার বন্যপ্রাণী লোপ পাচ্ছে বলে বিশ্ব-জনমত গড়ে উঠেছে। ভারতের অবস্থা আফ্রিকার মতই সংকটাপন্ন। কিন্তু ভারতের বন্যপ্রাণীর সপক্ষে আজও ফলপ্রসূ বিশ্ব-জনমত গড়ে ওঠে নি।

প্রকল্পের ফলে কি ভাবে বনভূমি বিনষ্ট হয় ? এক একটি বাঁধ প্রকল্প সুবিস্তীর্ণ ভূ-অঞ্চল জুড়ে এক জলাধারা সৃষ্ট হয়। ফলে বন বিনষ্ট হয়। প্রাণীজগৎ ধ্বংস হয়ে যায়। তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হতে সন্নিহিত বন ও বন্যপ্রাণী লোপ পেয়েছে। দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে মোয়ার নদীর কূলের অরণ্য বহুকাল যাবৎ বুনো হাতিব স্বভাব-আবাসস্থল। এই নদীতে বাঁধ বেঁধে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি, বনবিনাশ, নির্বিচার গুলি চালনার ফলে বুনো হাতির জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। পাটলি দুনে রামগঙ্গা নদীব বাঁকে অবস্থিত করবেট ন্যাশনাল পার্ক এই একপেশে প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। প্রথমে এর নাম ছিল হেইলি ন্যাশনাল পার্ক, তারপর এর নাম হয় রামগঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক, এবং ১৯৫৭ তে এর নাম হয় করবেট ন্যাশনাল পার্ক। ১২৫ বা ততোধিক বর্গমাইল বিস্তৃত, করবেটের স্ব-অঞ্চল এই ন্যাশনাল পার্কের নিসর্গ শোভা অতুলন। রামগঙ্গা নদীতে কালাগড় বাঁধ তৈরি হলে এর অধিকাংশ এলাকা জলে ডুবে যাবে ও বহু বন্যপ্রাণী লোপ পাবে। প্রায় প্রতিটি বাঁধ-প্রকল্পই অরণ্যজগতের প্রাণমূল্যে তৈরি বললে বেশি বলা হবে না। প্রকল্প নিশ্চয় প্রয়োজন। কিন্তু বন ও বন্যপ্রাণী কি নিষ্প্রয়োজন ; দেশের পক্ষে সবই যদি সমান প্রয়োজন হয়, তবে প্রকল্প রূপায়ণকালে ব্যাপারটি যেন মানুষ বনাম বন ও বন্যপ্রাণী। এ রকম রূপ নেয় কেন ? শেষাদ্রির বইটি আমি সকল আগ্রহী

পাঠককে পড়ে দেখতে বলি। কালাগড় বাঁধ তৈরির সঙ্গে যুক্ত কোনো সিদ্ধান্ত-নির্দেশকারী আধিকারিককে বনবিভাগের এক প্রবীণ অফিসার সেই রূপবতী বনভূমি দেখিয়েছিলেন। ট্রাজেডি হল, অন্য জায়গাতে বাঁধ তৈরি করা যেত এবং বনভূমি তাতে বিপন্ন হত না। কিন্তু সেই কর্তাব্যক্তি রায় দেন, আশ-পাশে, শিকারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বন নিয়ে ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে যোগ করে সমস্যাটির সমাধান করা হবে। এখন তাই করা হচ্ছে। যাঁরা প্রকল্প পরিকল্পনা করেন, রূপায়ণের সিদ্ধান্ত করেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যখন এ রকম, তখন বন ও বন্যপ্রাণী জাতীয় প্রকল্প সমূহে সম্যক মনোযোগ পাবে মনে করা ভুল। অরণ্য থেকে রাজধানী দিল্লি দূর হস্ত। বন্যপ্রাণী সপ্তাহে রেডিওতে বিমূর্ত বন ও কৃষিবিভাগের মূর্ত বাণীরূপ শোনা যায়, প্রাণী হত্যা করতে বারণ করা হয় আবেদনে, বন বিনাশের কথা বলা হয় না। বছরের বাহান্ন সপ্তাহ ধরেই বনবিনাশ চলে। অন্যান্য দপ্তর তাকে স্বাগত জানান, কেননা এ নাকি প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের জিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ঢালাও বনবিনাশ শুরু হয়। যুদ্ধের পর স্বাধীনতার সময় থেকে বন্দুক ও গুলি আরো সহজপ্রাপ্য হয়। ফলে অবাধ প্রাণীহত্যা চলতে থাকে। অরণ্যভূমে অবাধ গো-মহিষ ভেড়া ও ছাগল চারণের ফলে ভূমিক্ষয় বাড়তে থাকে। তাতে অরণ্যের উর্বরতা কমে। এতকাল গ্রামীণ মানুষ বা আদিবাসীরা মাংসের জন্য পশু মারত। শহুরে ব্যবসায়ীরা চোরাশিকারীদের কাজে লাগিয়ে বাঘ, হরিণের চামড়া ও গণ্ডারের শিং সংগ্রহ করত। স্বাধীনতার পর সরকারী ও বেসরকারী লোকজন জীপে চড়ে শিকার শুরু করেন। রাতে জীপ চালিয়ে গুলি ছুঁড়ে সকল প্রাণীকে মারতে মারতে চলার এক নতুন শিকার পদ্ধতি দেখা গেল। এই নতুন জাতের বন্দুকখুশ শিকারী কোন জীবজন্তু মারছেন, এটি শিকারের সময় কিনা, এখন জীবজন্তুর বাচ্চা হবার ও বাচ্চাকে বড় করার সময় কি না, কি মারছেন—মদ্দা না মাদী না শাবক, তা কিছুই বিচার করেন নি। জখম জন্তুকে অনুসরণ করে মারার সময় এঁদের থাকে নি। এদের এই শিকার রীতি এমন, যে ট্রফি বা মাংস সংগ্রহ তার উদ্দেশ্য নয়। এঁদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থাগ্রহণ বনবিভাগের সামান্য রেঞ্জার বা বিট অফিসার বা গেম ওয়ার্ডেনের সাধ্যাতীত। কেননা প্রায়ই এঁরা অনেক বেশি শক্তিধর মহলের পোষকতাপুষ্ট। বনবিভাগীয় আইনগুলিও দুর্বল। সেগুলি যথাযথ প্রযুক্ত হলেও দুষ্কৃতকারীর উপযুক্ত শাস্তি তাতে হয় না।

আইনের প্রযুক্তিও হয় না। ১৯৭২ সালের ১৯শে নভেম্বর বাঘ জাতীয় প্রাণী বলে ঘোষিত হয়। তার আগেই শেষাদ্রির বইয়ে দেখছি, ১৯৬৭-৬৮ সালের শীতে দিল্লিতে হাজারখানেক বাঘের চামড়া বিক্রি হয়। একেকটি চামড়া ন্যূনপক্ষে ৫,০০০ টাকায় বিক্রি হয়। বিদেশের বাজারে বাঘের চামড়ার কদর

খুব বেশি। খবরটি নাকি ১৯৬৮ সালের মে মাসের 'চিতল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। দিল্লিতেই সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়, দিল্লি রাজধানী, এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

অবশ্য রাজধানীতে নয়, রাজ্য রাজধানীতেও কর্তৃপক্ষের দপ্তরের নিচেই চলে বর্বরতার ব্যবসা। নিউমার্কেটে সেদিনও বাঘের ছানা দু হাজার টাকায় নিয়মিত বিক্রি হয়েছে। অতি দুষ্প্রাপ্য রেড বা লেসার পাণ্ডা, যার রপ্তানী একেবারে নিষিধ্য, তা এখানে বারবারই দেখা যায়। এই সেদিনও, নিউমার্কেটের দোকানে চামড়াঢাকা জীবনপ্রতিম স্টাফকরা বাঘ ও চিতার বড় থেকে শাবক, সব অবস্থার মূর্তি দেখা যেত। কোনোদিন মনেও হয় নি সে বিষয়ে কোনো নিষেধকারী আইন আছে। অথচ আইন হয়, আইন থাকে, ব্যবসা চলে, এরই নাম বুঝি সহাবস্থান।

ফলে ভারতে বন্যপ্রাণীর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইনে নিম্নোদ্ধৃত প্রাণীগুলি শিকার করা নিষিধ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে:

বিন্টুরং বা ভালুক-বিড়াল; কৃষ্ণসার; থামিন্; কারাকাল; চিতা (Cheetah); আমচিতা; ডুগং; মেছোবিড়াল; সোনা বিড়াল; সোনালি হনুমান: বন খরগোশ; উল্লুক; সিংহ; জংলী গাধা; নেকড়ে; হাংগাল; পাণ্ডা, লাল পাণ্ডা; কেশরী বানর; ছোট লজ্জাবতী বানর; লিংক্স্; গন্ধগোকুল; দোসাল্; মারখর; কস্তুরী মৃগ; নয়ান; হাঁড়িমুখো বিড়াল; বনরুই; বাসন বরাহ; ভারতীয় এক শৃঙ্গী গণ্ডার; নামালি বিড়াল; বড় লজ্জাবতী বানর; তুষার চিতা; চিত্রিত লিনসাং; বারসিঙ্গা; মিশ্‌মি টাকিন; তিব্বতী চিংকারা; তিব্বতী জংলী গাধা; বাঘ; উরিয়াল; বুনো মোষ, চিতা; নীলগিরি হনুমান; নীলগিরি থর; কুমির—মেছো কুমির-নোনা কুমির-ঘরিয়াল।

এ ছাড়াও এই তালিকায় আঠার রকম পাখির নাম আছে। এই আইনে উল্লিখিত প্রাণীগুলি শিকার করা নিষিদ্ধ যেমন বলা হয়েছে, তেমনি কোন কোন পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় এগুলি মারলে দণ্ডনীয় অপরাধ হবে না, তাও বলা হয়েছে। স্বার্থান্বেষী ইচ্ছা করলেই বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইনকে নিজের শিকারেচ্ছার সপক্ষে ব্যবহার করতে পারেন।

আজ শুধু বাঘ, সিংহ বা গণ্ডার নয়, বনরুই বা পিপীলিকাভুককেও সংরক্ষণের আওতায় এনে বাঁচাতে হচ্ছে। ভারতে বন্যপ্রাণীর অবস্থা এত বিপন্ন বলেই জিম করবেটকে, আমরা স্মরণ্য, শ্রদ্ধেয় মনে করছি। শিকারী জিম করবেট, লেখক জিম করবেট খুবই বড়। কিন্তু সংরক্ষয়িতা, অরণ্য ও আরণ্য প্রাণীর বন্ধু জিম করবেট আরো বড়। বন সৃজন করে, তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য

একটি জলাধার তৈরি করে, অরণ্যকে ভালবেসে তাঁর প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধা জানানো যায়। সব পূজো তো এক মন্ত্রে হয় না। সকলের বেলা ডাকটিকিট চূড়ান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি নাও হতে পারে। শুধু কালাগড় বাঁধপ্রকল্প সুবিবেচিত হলেও করবেটের স্মৃতির প্রতি সুবিচার করা হত।

আগেই বলেছি, জিম করবেট আমার প্রিয় মানুষ, বহুকাল ধরে তাঁর বইগুলি আমার বন্ধু। তাঁর শতবার্ষিকী স্মারক অমনিবাস সম্পাদনা করবার সময়েই আমি জানতাম আমি এ কাজের জন্য যোগ্যতম লোক নই। কিন্তু আমাকেই এ কাজ করতে হল।

কাজটি করতে গিয়ে বুঝেছি কি দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। করবেট নিজের কথা বলে যান নি কোথাও। যেমন নীরবে বাস করতেন ভারতে, তেমনি নীরবে চলে গেলেন আফ্রিকা। মৃত্যুর কতদিন পরে কাগজে খবর বেরোল। তাও ঠিক কেতামাফিক শোকসংবাদ নয়। তাই কিসে মৃত্যু হল, কাকে কাকে রেখে গেলেন, সবই অস্পষ্ট রয়ে গেল, শুধু জানা গেল ম্যাগি তার পরেও বেঁচেছিলেন।

যেমন বলি 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইলড্ লাইফ' পত্রিকার কথা। আমার স্পষ্ট মনে ছিল, ১৯৫০-৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে সে পত্রিকা তিনটি একজনের সহায়তায় পেয়ে পড়েছিলাম। বড়লাটের শিকারের খেয়াল বা খায়েস মেটাতে গিয়ে বরোদা রাজ্যের স্বর্ণ ঈগল কিভাবে লোপ পায়, সে বিষয়ক প্রবন্ধটি আমার আজও মনে পড়ে। অথচ যখন এই পত্রিকার কথা বলি, কলকাতা শহর বহু খুঁজে একটি মানুষকেও দেখলাম না যিনি এ পত্রিকার কথা জানেন। আমাদের বনবিভাগের গ্রন্থাগার বোধ হয় সম্প্রতি নিরুদ্দিষ্ট। মানুষ নয়, যে 'ভাই গ্রন্থাগার, ফিরে এস' বলে বিজ্ঞাপন দেব। জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বই ক্যাটালগে নেই। প্রায় সবাই বললেন, যাঃ, ও নামে কোনো পত্রিকা বেরোয় নি কখনো। কেন বললেন, তাও বুঝলাম। কেননা যেহেতু তাঁরা দেখেন নি, সেহেতু জিনিসটি নিরস্তিত্ব। তখন আমারও ধারণা হল স্মৃতি ছলনা করেছে। অবশেষে 'চিতল' আমায় বাঁচাল। তাতে উল্লেখ দেখার পর হীনমন্যতা কেটে গেল। না, আছে সে পত্রিকা। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে 'চিতল' কি করে ক্যাটালগ্ ছুট্ পত্রিকার এভারেস্ট থেকে পেলাম সদয় আধিকারিকের সহযোগিতায়, সে আরেক শিকার কাহিনী।

তবে বাঘ মারলাম এসপ্লানেডের জাতীয় গ্রন্থাগার : সংবাদপত্র বিভাগে গিয়ে। এ করবেটের কৃপা না হয়ে যায় না। ১৯২৬ সালের 'দ্য পাইওনিয়ার' সংবাদপত্রের পাতায় রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতার পিছনে ফিরতি অনামা শিকারীর রিপোর্টটি পড়ে দেখি এ করবেটের লেখা। কিন্তু বিশদ খুঁটিনাটিতে প্রকাশিত বইয়ের সঙ্গে তার রীতিমত কিস্তোগত পার্থক্য। দেখে অসম্ভব

উত্তেজিত হয়েছিলাম। এটি এমন চিত্তাকর্ষক ঘটনা! লেখাটিকে করবেটের অপ্রকাশিত লেখা বললেও চলে। পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্যে আমি সে রিপোর্টের যথাযথ ইংরেজী চেহারা ও বঙ্গানুবাদ, দুই-ই প্রথম খণ্ডে দিয়েছি। জানা গেল অধুনা বোম্বাইনিবাসী আর. ই. হকিন্স করবেটের বই ছাপার সময়ে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসে ছিলেন এবং করবেটকে জানতেন। তাঁকে চিঠি লিখলাম। তিনি লিখলেন,

৫৬ ভ্যালেণ্টিনা
৫ গামাড়িয়া রোড
বম্বে ৪০০০২৬,
২২. ১২ ৭৫

প্রিয় মহাশ্বেতা দেবী

১৯৭৮ সালে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস তাঁদের পঞ্চম শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে জিম করবেটের লেখার এক নির্বাচিত সংকলন বের করতে চান। আমাকে এই সংকলন তৈরি করতে ও ভূমিকা লিখতে বলা হয়েছে। আমি এই কাজের জন্য সম্মান-মূল্য পাব। অতএব এ বইয়ের কপিরাইট অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের থাকছে। যদি আপনার কাজে লাগবে বলে মনে হয়, তাহলে যথাসময়ে আপনি ও. য়ু. পি. 'র কাছে আমার বইয়ের বঙ্গানুবাদের জন্য অনুমতি চাইবেন।

নৈনিতালের লণ্ডন প্রেস জিম করবেটের হয়ে, যে তারিখ-অনুল্লেখিত ১০৪ পৃষ্ঠায় 'জাংগল স্টোরিজ' ছাপেন, তা হয়তো আপনি দেখেছেন। ৩১. ৮. ১৯৩২-এর 'রিভিউ অফ দ্য উইক' থেকে পুনর্মুদ্রিত একটি লেখা এতে আছে। নাম "Wild Life in the Village ; an appeal." করবেট যে সংরক্ষণের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, লেখাটি তার এক প্রদীপ্ত উদাহরণ। তিনি লিখেছেন, 'A country's fanna is a sacred trust, and I appeal to you not to betray this trust.' আমি জানি না এখানে কোন 'রিভিউ অফ দ্য উইক'-এর কথা বলা হয়েছে। তবে জাতীয় গ্রন্থাগার হয়তো সহায়তা করতে পারে এবং করবেট লিখিত অন্য রচনাও আপনি সেখানে পেতে পারেন।

করবেট যে সময়ে ভারত ছেড়ে যান. সেই সময় নাগাদই 'চিতল' বেরোতে শুরু করে। তাই করবেট 'চিতল'-এ লিখবেন সে সম্ভাবনা কম। 'হগ-হাণ্টার্স অ্যানুয়েল' ১৯৩০ বা ১৯৩১-এ 'দি পিপলপানি টাইগার'-এর একটি ভার্শান ছেপেছিলেন। ওই. কাগজ এবং 'ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ'-এ করবেট কোনো লেখা দিয়ে থাকতে পারেন, তবে আমি কিছু দেখি নি।

করবেটের একমাত্র অপ্রকাশিত লেখা যার কথা আমি জানি, যা আমার কাছে আছে তা হল, 'মাই ইণ্ডিয়া' থেকে বর্জিত একটি অধ্যায়। নৈনিতালের কাছে

বছর চোদ্দর একটি বন্য মেয়েকে ধরা নিয়ে লেখা। ১৫. ৭. ১৯১৪তে মেয়েটিকে ক্রস্‌থোয়েইট হাসপাতালে দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ বাদে মেয়েটি বেরিলি অ্যাসাইলামে মারা যায়। সমকালীন সংবাদপত্রগুলি হয়তো মেয়েটিকে 'নেকড়ে শিশু' বলে উল্লেখ করে থাকবে। কিন্তু অনুসন্ধান নিয়ে করবেটের মনে হয়েছিল মেয়েটি হয়তো একা থাকত, নইলে সম্ভবত ভালুক বা বুনো কুকুরের সঙ্গে থাকত।

এই ছোট্ট লেখাটি ১৯৭৮ সালের সংকলনে নেব কি না এখনো স্থির করি নি, তবে কপিরাইট আমার নয় এবং এটি অনুবাদ করতে হলে আপনাকে ও য়ু পি.'র অনুমতি নিতে হবে।

এরমধ্যে, 'দ্য পাইওনীয়র' অথবা অন্যত্র করবেট বিষয়ে আপনি যে উল্লেখ পেয়েছেন তা আমাকেও দেখতে দিলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

স্বাঃ আর. ই. হকিন্‌স।

সুখের বিষয় বোম্বাইয়ের অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের সৌজন্যে আমরা হকিন্‌স্ উল্লিখিত লেখাটি পেয়েছি এবং এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করতে পেরেছি। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত করবেটের অন্যান্য যে সব লেখার সন্ধান পেয়েছি, সেগুলি পরে প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। সুখের বিষয়, সংরক্ষয়িতা করবেট বিষয়ে আরো কেউ কেউ নৈনিতাল ও অন্যত্র কাজ করছেন। আশা করি তাঁদের কাজ থেকেও আমরা লাভবান হব। আমার অক্ষমতার কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবু, যদি জিম করবেটের জীবন, ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য ও কাজের বহিঃরেখাও যদি পরিস্ফুট করতে পেরে থাকি, তাহলেও মনে করব আমার শ্রম সার্থক। আরো সার্থক বোধ করব যদি এই অরণ্যনিবাস পড়ে কেউ জিম করবেট বিষয়ে আগ্রহী হন, ভারতের অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণী বিষয়ে কারো মমত্ব জাগ্রত হয়।

আমি জানতাম আমার ক্ষমতা কত কম। বহুজনের সহায়তা ব্যতীত একাজ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল গবেষণা, তথ্য উদ্ধার এবং করবেটকে পাবার চেষ্টায় প্রভূত সহায়তা পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান ও সংবাদপত্র শাখা থেকে। আগ্রহী বন্ধুবান্ধব সর্বদা সহায়তা করেছেন এবং বিশেষ বলতে হয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লী তিনটি অফিস অকুণ্ঠ সহযোগিতা না করলে এ বই কোনোদিন বেরোত না। এই প্রকাশ-সংস্থা শুধু করবেটের গ্রন্থ স্বত্বাধিকারী নন, জিম করবেট তাঁদের অতি প্রিয় মানুষ। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির সহযোগিতা করেছেন, ছবি এঁকে বইগুলি সুন্দর করেছেন খালেদ চৌধুরী।

করবেটের বইয়ের অনুবাদ প্রসঙ্গে একটি কথা। অনুবাদের প্রাথমিক শর্ত মূলানুগতা ও সুখপাঠ্যতা। এই কারণে প্রথম খণ্ডের বইগুলি আমরা

পুনর্মার্জন ও সংশোধন করি। এই খণ্ডে সন্নিবেশিত প্রতিটি বইই সম্পূর্ণ নতুন করে অনুবাদ করা হল। অনুবাদে সহায়তা করেছেন অনীশ ঘটক, নির্মল ঘোষ ও নন্দিতা মিত্র। এই খণ্ডে সংকলিত বইগুলির প্রথম বাংলা অনুবাদ গ্রন্থগুলির প্রকাশক হলেন মুকুন্দ পাবলিশার্স, সিগনেট প্রেস ও পত্রপুট। এই তিনটি সংস্থার শ্রীকানাই পাকড়াশী, শ্রীনীলিমা দেবী ও শ্রীবিজয় চক্রবর্তীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথম খণ্ডে ও জ্যাকেটে দুটি বইয়ের প্রকাশ-বছরে ভুল সাল লেখা হয়েছিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত এবং এই ভূমিকায় উল্লেখিত বৎসরাঙ্কগুলিই সঠিক।

এই খণ্ডে সন্নিবেশিত ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর নাম-নামান্তর সূচীটির এক বিশেষ মূল্য আছে। প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে করবেটের যোগ না থাকুক, যেহেতু করবেট ভারতের বন ও অরণ্য প্রাণী সংরক্ষণে, সাধারণ লোককে সে বিষয়ে জানাতে আগ্রহী ছিলেন, ভারতের বন্যপ্রাণী বিষয়ক এই নাম-সূচী সেই কারণেও করবেট নামাঙ্কিত সংকলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল।

সর্বশেষ ধন্যবাদ প্রকাশকের প্রাপ্য। তাদের যা বলা হয়েছে, তাই করেছেন তারা, এবং সে কাজটি সব সময়ে সোজা ছিল না। বইটি পাঠকের সমর্থন পেলে আমরা মনে করব সকল শ্রম সার্থক, এবং পরের সংস্করণে আমাদের ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পাব।

মহাশ্বেতা দেবী।

মন্দিরের বাঘ এবং
কুমায়ুনের আরো মানুষখেকো
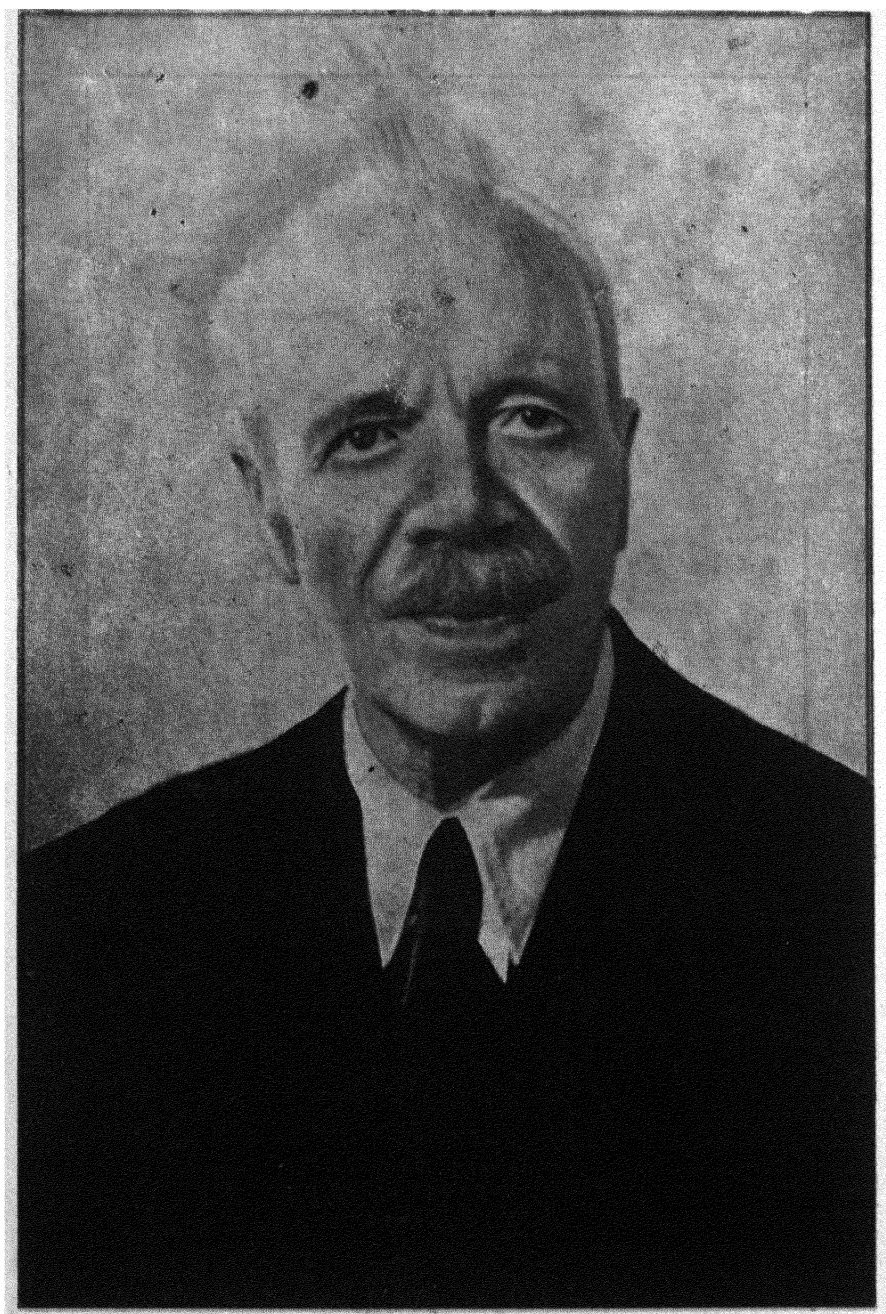
১

মন্দিরের বাঘ

১

হিমালয়ের উচ্চভূমিতে যাঁরা কখনো বসবাস করেন নি, তাঁদের পক্ষে এই বিরল জনবসতির বাসিন্দাদের ওপর কুসংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে অবগতি অসম্ভব। সুউচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলের সরল অশিক্ষিত মানুষের কুসংস্কার এবং নিম্নভূমির মার্জিত শিক্ষিত জনের বিশ্বাসের ভেদরেখা এতই সূক্ষ্ম যে একের প্রারম্ভ ও অন্যের সমাপ্তির চিহ্নিতকরণ কঠিন। এই কারণেই বর্তমানে আমি যে কাহিনীর অবতারণা করছি, তার চরিত্রদের সারল্য আপনাদের হাসি পেতে পারে, কিন্তু আমার বক্তব্য, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, আমার গল্পে উল্লেখিত কুসংস্কার এবং আপনাদের সংস্কারে বিশ্বাসের মধ্যেকার তফাতটি বুঝতে চেষ্টা করুন।

কাইজারের যুদ্ধের সামান্যকাল পরেই রবার্ট বেলেআর্স আর আমি কুমায়ুনের অভ্যন্তরে শিকার করতে যাই এবং সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় ত্রিশূলের পাদদেশে তাঁবু ফেলি; এসে জানলাম, এখানে প্রত্যেক বছর ত্রিশূলের দৈত্যের উদ্দেশে আট শত ছাগল উৎসর্গ করা হয়। আমাদের সঙ্গে আছে পনের জন কুশলী ও খুশিমনের পাহাড়ী যুবক, যাদের তুল্য খুব কম মানুষের সঙ্গই আমি শিকারকালে পেয়েছি। এদের মধ্যে একজনের নাম বালা সিং, জাতে গাড়োয়ালী; অনেক বছর ধরেই সে আমার সঙ্গে আছে আর বহু অভিযানেও

সঙ্গী হয়েছে। শিকারে যাবার সময়ে আমার সব চেয়ে ভারি মোটটা বেছে মাথায় তুলে নিয়ে, লম্বা পা ফেলে সকলের আগে এগিয়ে চলাতেই ছিল তার আনন্দ আর গর্ব। ঘুমুতে যাবার আগে তাঁবুর সামনের জ্বালানো আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসে একসঙ্গে গান গাওয়াই রীতি ; এবং প্রথম রাত্রে ত্রিশূলের পাদদেশে, হাততালি, হুল্লোড় আর টিনের কৌটো বাজিয়ে এই গানের আসর চলেছিল দীর্ঘক্ষণ।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে এখানেই তাঁবুর বাসস্থান অক্ষুণ্ণ রেখে চারপাশের অঞ্চলটায় আমরা 'বড়াল' ও 'থর'-এর অনুসন্ধান চালাব ; কিন্তু পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময়েই, আমার লোকেদের তাঁবু গোটাবার আয়োজন দেখে খানিক অবাকই হলাম। কারণ অনুসন্ধানে জানালাম যে জায়গাটা নাকি তাঁবু রাখার পক্ষে সুবিধাজনক নয় ; স্যাঁতসেঁতে ; পানীয় জল দূষিত ; এখানে জ্বালানি সংগ্রহ কষ্টসাধ্য এবং সর্বোপরি মাত্র দু'মাইল দূরেই একটা বাসযোগ্য সুন্দর সমভূমি বর্তমান।

মোট বইবার জন্যে আমার ছিল ছ'জন গাড়োয়ালী, কিন্তু দেখলাম মোট বাঁধা হয়েছে পাঁচটি আর অদূরে মাথার ওপর দিয়ে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে তাঁবুর জ্বালানো-আগুনের ধারে বসে আছে বালা সিং। প্রাতরাশের পর আমি তার কাছে গেলাম এবং লক্ষ করলাম, অন্য সকলে কাজ থামিয়ে গভীর মনোযোগে লক্ষ করছে আমি কি করি। বালা সিং আমাকে তার দিকে এগোতে দেখেও আমাকে সেলাম করল না ; এটা খুবই অস্বাভাবিক। আর আমার সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সে একটাই উত্তর দিল যে, সে অসুস্থ নয়। সেদিন নিঃশব্দে আমরা দু'মাইল পথ পেরোলাম ; সারাটা পথ পেছন পেছন বালা সিং এল, যেন কোনো ঘুমন্ত মানুষ অথবা সে ওষুধের ক্রিয়ায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

এখন অবশ্য এটা স্পষ্ট যে বালা সিং-এর যাই ঘটুক না কেন, বাকি চোদ্দ জনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ; স্বাভাবিক উচ্ছলতা হারিয়ে তারা যেন নিতান্ত কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে আর তাদের মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভীতির লক্ষণ। এই জন্যেই যখন রবার্ট এবং আমার থাকবার চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের তাঁবুটা খাটানো হচ্ছিল, তখনই আমি আমার পঁচিশ বছরের পুরনো গাড়োয়ালী চাকর মতি সিংকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বালা সিং-এর এমন অবস্থা বিষয়ে প্রশ্নাদি করি। নানাপ্রকার অস্পষ্ট ও ঘোরপ্যাঁচ উত্তরের মধ্যে থেকে মতি সিং-এর কাছ থেকে যে কাহিনী জানা গেল, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং দ্ব্যর্থহীন। 'গত রাত্রে যখন আমরা তাঁবুর সামনের আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে গান গাইছিলাম,' মতি সিং বলল, 'ত্রিশূলের দানো তখন বালা সিং-এর মুখের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেও তাকে গিলে ফেলে।' মতি সিং আরো বলে যে, তখন তারা চিৎকার করে, টিনের কৌটো বাজিয়ে সেই দানোটাকে বালা সিং-এর

শরীরের মধ্যে থেকে বের করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই পারে নি, এবং এখন এ-ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই।

একটু দূরেই বসে ছিল বালা সিং ; কম্বলটা এখনও তেমনি মাথা ঢেকে জড়ানো। তার সঙ্গে কথা বললে অন্যেরা শুনতে পাবে না এমন দূরত্বে সে বসে থাকায়, আমি তার কাছে গিয়ে সরাসরি গতরাত্রের ঘটনার বিশদ জানতে চাইলাম। বেশ কয়েক মিনিট ধরে বালা সিং বেদনার্ত দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর হতাশ গলায় বলল : 'এখন আর সে-কথায় কি লাভ সাহেব ; অবশ্য গত রাতের ঘটনা আপনাকে আমার জানানো কর্তব্য কিন্তু আপনি তা বিশ্বাস করবেন না।' 'সে কি', জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করেছি ?' 'না, না', সে বলে উঠল, 'কোনোদিন, আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন নি, কিন্তু এটা এমন একটা ঘটনা যা বোঝা আপনার পক্ষে অসম্ভব।' বললাম, 'আমি বুঝি বা না-বুঝি, তোমার মুখ থেকে সত্যি ঘটনাটা শুনতে চাই।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বালা সিং বলল : 'ঠিক আছে, সাহেব, যা ঘটেছিল বলছি। আপনি জানেন যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পাহাড়ী-গানে একজনই মূল গানটি গায় এবং অন্যেরা সমস্বরে তার দোহার টানে। গত রাতে আমি যখন এই রকম একটা মূল গান গাইছিলাম, তখনই ত্রিশূলের দানো আমার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আর অনেক বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে সড়াৎ করে আমার গলা বেয়ে পাকস্থলীতে চলে যায়। আগুনের উজ্জ্বল আলোয় অন্যেরা দানোর সঙ্গে আমার লড়াইটা দেখেছিল তাই তারা প্রাণপণে চিৎকার করে, টিন বাজিয়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু', সে কান্না ভেজা গলায় বলে চলে, 'দানোটাকে তাড়ানো গেল না।' 'এখন সেই দানোটা কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম। পেটের ওপর হাত রেখে গভীর আস্থায় বালা সিং জবাব দিল, 'এখানে সাহেব, এখানে। আমি পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি, ও আমার পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়াছে।'

রবার্ট সারাটা দিন আমাদের তাঁবুর পশ্চিমের মাঠে ঘুরে ঘুরে সম্ভাব্য শিকারক্ষেত্র দেখল তারপর অনেকগুলি 'থরে'র দেখা পাওয়ায় একটিকে গুলি করে মারে। নৈশভোজন শেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করলাম। বহু মাস ধরে আমরা এই শিকারের পরিকল্পনা করেছি আর প্রতীক্ষায় দিন গুনেছি। এই শিকারক্ষেত্রে পৌঁছতে রবার্টের লেগেছে সাত দিনের আর আমার লেগেছে দশ দিনের প্রাণান্তকর পথ হাঁটার শ্রম আর আমাদের পৌঁছবার সেই রাত্রেই বালা সিং গিলে বসল ত্রিশূলের দানোকে। এ-বিষয়ে আমাদের নিজস্ব মতামত যাই হ'ক না কেন, আসলে সমস্যা হল সঙ্গের প্রত্যেকেই তখন বিশ্বাস করে বসে আছে যে বালা সিং-এর পেটে দানোটা

বসবাস করছে এবং সে কারণেই সকলে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলছে। এ অবস্থায় একমাস ধরে শিকার চালিয়ে যাবার পরিকল্পনায় স্থির থাকা অসম্ভব এবং রবার্টের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে সেখানে একমত হল যে, সে এখানে একাকী শিকার করতে থাকবে আর আমি বালা সিংকে সঙ্গে নিয়ে নৈনিতালে ফিরে যাব। সুতরাং পরদিন সকালেই জিনিসপত্র গুছিয়ে, রবার্টের সঙ্গে একটু আগেই প্রাতরাশ সেরে নৈনিতালে ফেরার দশ দিনের হাঁটা পথ ধরলাম।

তিরিশ বছরের যৌবনের সার্থক প্রতিরূপ বালা সিং নৈনিতাল ছাড়বার সময়ে ছিল আনন্দোজ্জ্বল; আর আজ সে ফিরছে মূক, চোখে ভাষাহীন দৃষ্টি, আর সমস্ত দেহে জীবনের প্রতি অনাসক্তির লক্ষণ। আমার বোনেরা, তাদের মধ্যে একজন ছিল মেডিক্যাল মিশনারী, তার জন্যে যা কিছু করার সবই করল। নিকট এবং দূরের বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত কিন্তু সে নীরবে তার বাড়ির দরজায় বসে থাকত এবং কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে কোনো কথা বলত না। আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু নৈনিতালের সিভিল সার্জন কর্নেল কুক আমার অনুরোধে বালা সিংকে দেখতে এলেন। দীর্ঘ কষ্টকর পরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে শারীরিকভাবে বালা সিং সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তার এই মানসিক অবস্থার আপাত অবনতির কোনো কারণ নির্দেশ তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কয়েকদিন পরে আমার মাথায় একটা মতলব এল। সে-সময়ে নৈনিতালে একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ডাক্তার ছিলেন; ভাবলাম, যদি তাঁকে দিয়ে বালা সিংকে পরীক্ষা করাতে পারি এবং তারপর তাঁকে দানো বিষয়ে জানিয়ে দিয়ে, তাঁকে দিয়েই বালা সিংকে তার পেটে কোনো দানো নেই বলে আশ্বস্ত করতে পারি, তবে সে হয়ত সুস্থ হয়ে উঠবে; তার ওপর এই ডাক্তারবাবু যে কেবল হিন্দু ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও ছিলেন পাহাড়ী। অবশ্য আমি বৃথাই আশা করেছিলাম; আমার মতলবটা কোনো কাজেই লাগল না। কারণ ডাক্তার রোগীকে দেখামাত্রই সন্দিহান হয়ে উঠলেন এবং নানাবিধ চতুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি যখনই বালা সিং-এর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ত্রিশূলের দানো তার পাকস্থলীতে প্রবেশ করেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি কাছ থেকে দ্রুত পায়ে সরে এসে আমাকে বললেন, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন বটে, কিন্তু দুঃখিত, আমি এই লোকটির জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।'

বালা সিং-এর গ্রামের দুজন লোক ছিল নৈনিতালে। পরদিন আমি তাদের ডেকে পাঠালাম। তারা জানত যে বালা সিং-এর কি হয়েছে, কারণ তারা ইতিপূর্বে কয়েকবার তাকে দেখতে এসেছে; এবং আমার অনুরোধে তারা তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে রাজী হল। পয়সাকড়ি নিয়ে পরদিন সকালে

তিনজন লোক তাদের আটদিনের যাত্রাপথে পাড়ি দিল। তিন সপ্তাহ পরে দুজন ফিরে এসে আমাকে সমস্ত খবর জানাল।

পথে বালা সিং কোনো প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নি। কিন্তু যেদিন সে ঘরে ফেরে সেদিন রাতেই যখন তার স্বজন ও বন্ধুরা তার চারপাশে সমবেত হল তখনই অকস্মাৎ সে বলে ওঠে যে দানোটা ত্রিশূলে ফিরে যাবার জন্যে তার কাছ থেকে মুক্তি চাইছে আর তা দিতে হলে তার আপন মৃত্যুই একমাত্র উপায়। 'সুতরাং', আমার সংবাদদাতারা বক্তব্য শেষ করল, 'বালা সিং শুয়ে পড়ে এবং মারা যায় ; পরদিন সকালে আমরা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করি।'

আমি নিশ্চত যে কুসংস্কার হামের মতই একটা ব্যাধি, যার দ্বারা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সমগ্র সম্প্রদায়ই আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু অনাক্রান্তদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রতিরোধক্ষমতা। কার্যত এ-কারণেই হিমালয়ের উচ্চভূমির বাসিন্দা বালা সিং যে ভীষণ রকমের কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, আর কাছে থেকে আমি যে অনাক্রান্তই থেকে যাই, তাতে আমার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। যদিও কুসংস্কারগ্রস্ত নই বলেই আমি দাবি করি, তথাপি চম্পাবতের বাঘ শিকারের সময়ে বাংলোতে এবং জনশূন্য এক গ্রাম থেকে ভেসে আসা আর্তনাদে, আমার যে অভিজ্ঞতালাভ, তার ব্যাখ্যাদান আমার পক্ষে অসম্ভব। এবং অসম্ভব, কেন আমি সেই আশ্চর্য বাঘটি মারতে বারংবার ব্যর্থ হয়েছি, তার ব্যাখ্যা করা ; এখানে সেই কাহিনীই আমি বিবৃত করব।

২

'দেবীগিরি'র চূড়ায় নির্মিত রেস্ট হাউস থেকে যে প্রকৃতি-প্রেমিক নিসর্গ দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি কখনও দাবিধুরাকে ভুলতে পারেন না। তিনঘরের এই বাড়িটির বারান্দা থেকে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে পানার নদীর উপত্যকায়। আর এই উপত্যকার পরেই পাহাড়টা উঁচু হয়েছে ধাপে ধাপে, যতক্ষণ না ঢেকেছে চিরতুষারের আবরণে ; বিমান আবিষ্কারের পূর্বকাল পর্যন্ত এই অনতিক্রম্য ব্যবধানের পাঁচিল ভারতকে তার উত্তরাঞ্চলীয় ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কুমায়ুনের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নৈনিতাল থেকে পূর্ব সীমান্তের মহকুমা শহর লোহারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা দাবিধুরা অতিক্রম করে গেছে আর তারই একটা শাখা রাস্তা দাবিধুরা ও আলমোড়াকে সংযুক্ত করেছে। শেষোক্ত রাস্তার ধারে আমি যখন পানারের মানুষ খেকো বাঘ মারছিলাম,—অবশ্য এ গল্পে পরে আসছি—সেকালে জনৈক রোড ওভারসিঅর্ আলমোড়া যাবার পথে আমাকে জানান যে দাবিধুরাতে একটা চিতা একজন লোককে মেরেছে। সুতরাং আমি দাবিধুরাতে গিয়ে পৌঁছলাম।

দাবিধুরা যাবার পশ্চিম দিকের রাস্তাটা কুমায়ুনের দুর্গমতম পথ হিসাবে চিহ্নিত। যিনি এই পথের নকশা করেন, সম্ভবত তাঁর পরিকল্পনা ছিল সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথে চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা করা, এবং সেকারণেই যেন রাস্তাটা বাঁকবিহীনভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়াই উঠে গেছে আট হাজার ফুট। এপ্রিলের এক উত্তপ্ত বিকেলে এই রাস্তাটা অতিক্রম করে এসে যখন রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে গ্যালন গ্যালন চা পান আর নিসর্গশোভা উপভোগ করছিলাম, তখন দাবিধুরার এক পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দুবছর আগে আমি যখন চম্পাবতের মানুষখেকোকে শিকার করছিলাম, তখন এই অতিশীর্ণ বৃদ্ধের সঙ্গেও বন্ধুতা গড়ে ওঠে; দাবিধুরার বৃহৎ শিলাখণ্ডের ছায়ার মধ্যে যে ছোট মন্দিরটির অবস্থিতি, এ-বৃদ্ধ সেখানে পুরোহিতের কাজ করেন এবং উক্ত মন্দিরটির জন্যেই স্থানটির তীর্থস্থানের মর্যাদা; ভাবতে আশ্চর্য লাগে কি করে এখানে ওটি নির্মিত হল। কয়েক মিনিট আগে ওই মন্দিরের সামনে দিয়ে আসবার সময় আমি যথারীতি প্রণাম করেছিলাম আর প্রার্থনারত বৃদ্ধ পূজারীও আমাকে মাথা নেড়ে প্রণম্যের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পূজার্চনা সমাপ্ত করে পূজারী এক সময়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে চলে এলেন রেস্ট হাউসের বারান্দায়, তারপর আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লেন কিছুক্ষণ গল্প করবার জন্যে। সহৃদয় বৃদ্ধ মানুষটির হাতে ছিল অনন্ত সময় আর দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আমিও চাইছিলাম বিশ্রাম; অতএব সারাটা সন্ধ্যে আমরা কাটালাম গল্পে আর সিগারেট পুড়িয়ে।

এই পুরোহিতের কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে রোড ওভারসিয়রের কাছে দাবিধুরায় মানুষখেকোর হাতে লোকটি নিহত বলে যে সংবাদ পেয়েছিলাম, তা যথার্থ নয়। নিহত বলে কথিত উক্ত লোকটি একজন পশুপালক; আলমোড়া থেকে দাবিধুরার দক্ষিণে গ্রামে যাবার পথে গত রাত্রে সে উক্ত পুরোহিতেরই আতিথ্য গ্রহণ করে। রাত্রে খাওয়া সেরে সে পুরোহিতের কথা অগ্রাহ্য করেই মন্দিরের চাতালে ঘুমুতে যায়। প্রায় মধ্যরাত্রে, যখন পাথরের ছায়ায় ঢেকেছে মন্দির, তখনই মানুষখেকোটা গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে লোকটার পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরে তাকে চাতাল থেকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আর্তনাদ করে জেগে উঠে লোকটি কাছের অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা কাঠ তুলে নিয়ে চিতাটাকে মারতে থাকে। তার আর্তনাদে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসে পুরোহিত এবং অন্য লোকেরা আর সমবেত প্রচেষ্টায় চিতাটিকে তাড়াতে সমর্থ হয়। লোকটির ক্ষত গুরুতর হয় নি; মন্দিরের নিকটস্থ দোকানী 'বেনের' সামান্য চিকিৎসাতেই সে সুস্থ বোধ করে এবং আবার গ্রামের দিকে হাঁটার শক্তি পায়।

পুরোহিতের বক্তব্যে ভরসা রেখেই আমি দাবিধুরাতে থাকা স্থির করলাম। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা প্রত্যহ বেনের দোকানে এবং মন্দির দর্শনে আসত। এই লোকেরাই সর্বত্র জানিয়ে দেবে আমার আগমন সংবাদ এবং বর্তমান অবস্থিতি, যাতে করে এ-অঞ্চলে কোনো মানুষ বা পশুহত্যার খবর আমার কাছে যত শিগগীর সম্ভব পেঁাছে যায়।

সেদিন সন্ধেয় যখন বৃদ্ধ পুরোহিত যাবার জন্যে উঠলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ-এলাকায় কোনো শিকার পাওয়া সম্ভব কিনা, কারণ আমার লোকেরা অনেকদিন মাংস খেতে পায় নি, তাছাড়া এখানে দাবিধুরাতে তো সেটা কোনও সম্ভব নয়। 'হ্যাঁ', তাঁর জবাব এল, 'মন্দিরের বাঘটা আছে'। তাঁর বাঘ মারবার কোনো উৎসাহ আমার নেই, এই আশ্বাসবাণীর উত্তরে তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন, 'সাহেব, তোমার ও বাঘ মারতে চেষ্টা করায় আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি বা অন্য কেউ কখনই ও বাঘ মারতে পারবে না। আর এ-ভাবেই আমি পেলাম দাবিধুরা মন্দিরের বাঘের খবর, যা আমার শিকার জীবনের অভিজ্ঞতায় এক আশ্চর্যতম সংযোজন।

৩

দাবিধুরায় পেঁাছাবার পরদিন সকালেই আমি মানুষখেকোর সন্ধানে নিচে লোহারঘাট রোডে নেমে গেলাম; অথবা তার সম্পর্কে এখানে যদি কিছু সংবাদ মেলে, কারণ মন্দিরের লোকটিকে আক্রমণ করবার পর চিতাটি এ-পথেই গেছে বলেই জানা গিয়েছিল। একটু দেরিতে রেস্ট হাউসে দুপুরবেলার আহারের জন্যে ফিরে দেখতে পেলাম একজন লোক আমার চাকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। লোকটি বলল যে সে ম ন্দরের পুরোহিতের কাছে খবর পেয়েছে যে আমরা কিছু শিকারে আগ্রহী; এবং আমরা রাজী হলে সে আমাদের একটা জারাও-এর (সম্বরের পাহাড়ী নাম) সন্ধান দিতে পারে; এর শিংগুলি ওকগাছের বড় শাখার মত। পাহাড়ী সম্বরদের ক্বচিৎ সুন্দর শিং হয়; কিছুকাল আগে কুমায়ুনে সাতচল্লিশ ইঞ্চি শিংওয়ালা সম্বর গুলি করে মারা হয়; তার ওপর এই বিরাট প্রাণীটি থেকে কেবলমাত্র আমার লোকেদেরই মাংসের ব্যবস্থা হবে না, সেই সঙ্গে দাবিধুরার সমস্ত মানুষের মাংসের যোগান দেওয়া যাবে। লোকটিকে জানালাম যে দুপুরের খাওয়া সেরেই আমি তার সঙ্গে বেরুব।

কয়েকমাস আগে আমি সামান্য কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় যাই এবং এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে আমি বন্দুক বিক্রেতা ম্যান্টনের দোকানে ঢুকে পড়ি। দরজার ধারেই কাচের শো-কেসে একটা রাইফেল ছিল। আমি যখন এই অস্ত্রটা দেখছিলাম, তখন, আমার পুরনো বন্ধু, এই দোকানের ম্যানেজার এসে

উপস্থিত হলেন। তিনি জানালেন যে এই রাইফেলটি ওয়েস্টলী রিচার্ডস্-এর ২৭৫-এর নতুন মডেল; ভারতে পাহাড়ী অঞ্চলে শিকারের জন্য কোম্পানী এগুলি চালাতে আগ্রহী। রাইফেলটি অতীব পছন্দসই এবং ম্যানেজারের ওটিকে আমাকে গছাতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না, এবং যদি এটি আমার কাজের উপযোগী বোধ না হয় তবে তিনি এটা ফেরত নিতে রাজী ছিলেন। সুতরাং নতুন রাইফেলটি নিয়ে আমার গ্রামীণ বন্ধুর সঙ্গে বিরাট ওক ডালের মতো শিংওয়ালা জারাওটিকে মারবার জন্যে সেই সন্ধেবেলা বেরিয়ে পড়লাম।

উত্তরের তুলনায় দাবিধুরার পাহাড়ের খাড়াই অনেক কম; স্বভাবতই আমরা এই পথে ওকবন আর ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে প্রায় দু'মাইল হেঁটে এসে পেঁছলাম ঘাসের আস্তরণে ঢাকা স্থানে; এখান থেকে অদূরে উপত্যকায় দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্যাবলী স্পষ্ট। উপত্যকার বাঁদিকে ঘন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ একখন্ড খোলা জমি দেখিয়ে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে জানাল যে এখানে জারাও সকাল ও সন্ধ্যায় ঘাস খায়। তা ছাড়াও সে জানাল যে এই উপত্যকার দক্ষিণ দিকে একটা রাস্তা আছে এবং দাবিধুরা থেকে যাওয়া-আসার পথেই সে ওখানে জারাও দেখে। আমি যে রাইফেলটি সঙ্গে এনেছি তা পাঁচশো গজের নির্ভুল নিশানার উপযোগী, কিন্তু রাস্তা থেকে জারাও-এর বিচরণক্ষেত্রের দূরত্ব মাত্র তিনশো গজ; সুতরাং রাস্তা ধরে নেমে গিয়ে ওটাকে মারবার জন্যে অপেক্ষা করাই আমি স্থির করি।

আমরা যখন কথা বলছিলাম, দেখলাম আমাদের বাঁদিকের আকাশে কয়েকটি শকুন পাক খাচ্ছে। আমার সঙ্গীর দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করতেই ও জানাল যে ওদিকে পাহাড়ের ভাঁজে একটা ছোট গ্রাম আছে; সম্ভবত ওখানে কোনো গৃহপালিত পশু মারা যাওয়াতে শকুনগুলোর নজর পড়েছে। যা হ'ক সে বলল, আমরা শীগ্গিরই জানতে পারছি পাখিদের আকর্ষণের কারণ, কেননা ও-পথেই তো আমাদের ফিরতে হবে। একটা ঘাসে ছাওয়া ঘর, একটা গরু-ভেড়া রাখবার চালা, আর প্রায় তিন বিঘাখানেক সদ্য ফসল কাটা ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া খেত, এই হল 'গ্রাম'। কুঁড়েঘর আর চালা থেকে দশ ফুট চওড়া বৃষ্টির জলের নালা দিয়ে আলাদা করা একটা জমির ওপরে পড়ে থাকা একটা জানোয়ারের দেহ থেকে শকুন মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে। কুঁড়েঘরটার কাছে পেঁছতে, একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের নমস্কার জানিয়ে. আমরা কোথা থেকে আর কখন এসেছি জিজ্ঞেস করল। মানুষখেকো চিতা মারবার জন্যে আমি নৈনিতাল থেকে মাত্র গতকাল দাবিধুরায় এসে পেঁছেছি, এ-কথা তাকে জানাতে, সে দুঃখ করতে লাগলো কেন সে আগে জানতে পারল না আমার পৌঁছবার কথা। 'তাহলে ত আপনি' সে বলল, 'যে বাঘটা আমার গরুটাকে মেরেছে সেটাকেই মারতে পারতেন।' সে বলে চলে, এখন যে মাঠটায়

গরুর হাড় নিয়ে শকুনেরা কামড়াকামড়ি করছে, কালও সে মাঠে জমিতে সারের প্রয়োজনে চরতে ছেড়েছে পনেরটা গরুকে, তার একটাকে রাত্রে বাঘে মেরেছে। তার নিজের কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই আর কাছাকাছি এমনও কেউ নেই যাকে সে বাঘটা মারবার জন্যে অনুরোধ জানাতে পারে; তাই সে গিয়েছিল নিকটবর্তী গ্রামের একজনের কাছে. যার কাজই হল সেই এলাকায় চামড়া সংগ্রহ করা। সেই লোকটিই আমার আসবার দু-ঘন্টা আগে গরুটার চামড়া ছুলে ফেলেছে আর এখন চলেছে শকুনদের মহোৎসব। যখন লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সে কি জানত না যে সে এলাকায় বাঘ আছে আর তা জেনেশুনে কেন রাতে গরুগুলোকে চরতে পাঠাল; উত্তরে সে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো যে দাবিধুরা পাহাড়ে চিরকালই বাঘ আছে কিন্তু এর আগে কখনও কোনো গরু-ভেড়া মারা পড়ে নি।

কুঁড়েঘরটা পেরিয়ে এগোতেই লোকটা প্রশ্ন করে কোথায় যাব আমি আর উত্তরে যখন জানালাম যে আমি উপত্যকার অন্য প্রান্তে জারাও মারতে যাচ্ছি, তখনও সে বিনীত অনুরোধ জানাল যে এখনকার মত জারাও না মেরে আমি যেন বাঘ শিকারে মন দিই। 'আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার জমির পরিমাণ সামান্য, আর তেমন উর্বরাও নয়; এ অবস্থায় যদি বাঘ আমার গরুগুলোকে মারতে শুরু করে, তাহলে আমি কি করে বাঁচব; আমার সমগ্র পরিবার যে অনাহারে মরবে।'

আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন মাথায় এক ঘড়া জল নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে এল একটি নারী; তার পেছনে একটু পরে মাথায় এক বোঝা সবুজ ঘাসের ভার নিয়ে এল একটা মেয়ে আর একটা ছোট ছেলে মাথায় বয়ে আনল এক আঁটি শুকনো লকড়ি। প্রায় তিন বিঘার মতো স্বল্প-ফসলী জমি আর মাত্র কয়েক সের দুধ, তার ওপর পাহাড়ী গরুর দুধও হয় কম. দাবিধুরায় বেনের কাছে বিক্রি করে চলে চারজনের সাংসারিক দিনগুজরান। সুতরাং এ-লোকটি যে আমার বাঘ মারার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

শকুনগুলো মড়িটাকে শেষ করে ফেলেছে। অবশ্য এতে কিছুই এসে যায় না, কেননা আশেপাশে এমন কোনো ঝোপঝাড়ের আস্তানা নেই, যেখানে থাবা এলিয়ে বাঘটা শকুনগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে পারত; সুতরাং নিশ্চিত যে সে ফিরে আসবে কারণ গতরাত্রেও তার খাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি। জারাওএর চেয়ে বাঘ শিকারেই আমার পথপ্রদর্শকেরও আগ্রহ লক্ষিত হল বেশি; সুতরাং দুজনকেই বসে থাকতে বলে, বাঘটা কোনদিকে গেছে সেটা খুঁজতে বেরুলাম; কারণ মাঠের কাছাকাছি এমন কোনো গাছ ছিল না, যেখানে বসে আমি বাঘটার গতিবিধি লক্ষ করতে পারি; তার উপর আমার ইচ্ছা

যে ফেরার পথেই বাঘটার মুখোমুখি হব। পাহাড়ের এদিকে সেদিকে গৃহ-পালিত পশুদের যাতায়াতের পথ কিন্তু মাটিটা এতই শক্ত যে কোনো পায়ের ছাপ পড়ে না ; এ-কারণেই গ্রামটা বার দুয়েক ঘুরে দেখে নিয়ে বৃষ্টির জলের খালটা ধরে এগোলাম। এখানকার নরম ভেজা মাটিতেই আবিষ্কার করলাম একটা বড় পুরুষ-বাঘের থাবার ছাপ। এই থাবার চিহ্নতেই বোঝা গেল যে বাঘটা খাওয়া সেরে এ-পথেই ওপরের দিকে উঠে গেছে ; সুতরাং এটাই যুক্তিগ্রাহ্য যে সে এ-পথেই ফিরবে। কুঁড়েঘরটা খালটার যে পারে, সেই পারেই প্রায় তিরিশ গজ দূরত্বে, খালপাড়েই একটা খর্বাকায়, সর্বাঙ্গে বুনো গোলাপের লতায় ঢাকা একটা ওকগাছ। রাইফেলটা নিচে রেখে, খালটার ওপর ঝুঁকে পড়া ওকগাছটায় উঠে পড়লাম ; এবং লতা-ঝোপে আচ্ছন্ন মোটামুটি সুবিধাজনক বসবার জায়গাও মিলে গেল।

কুঁড়েঘরটায় ফিরে এসে অপেক্ষমান লোকদুটোকে বললাম যে আমি এখন রেস্টহাউসে ফিরে যাচ্ছি, উন্নতধরনের বারুদভরা কার্তুজের ব্যবহারোপ-যোগী আমার ভারি দোনলা ৫০০ এক্সপ্রেস রাইফেলটা নিয়ে আসতে। আমার পথপ্রদর্শক অবশ্য মনের খুশিতেই আমাকে সে কষ্টের হাত থেকে বাঁচাল ; সুতরাং তাকে বিষয়টা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে এসে গ্রামীণ মানুষটার সঙ্গে তার দোরগোড়ায় বসে পড়লাম ; আর শুনতে থাকলাম এক দরিদ্র অথচ শঙ্কাহীন মানুষের শুধুমাত্র মাথার ওপরে ঘাসের আচ্ছাদনটুকু টিকিয়ে রাখবার জন্যে প্রকৃতি ও বন্যজন্তুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী। জানতে চাইলাম কেন সে এই নির্জন জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস ও জীবিকার্জনের চেষ্টা করছে না ; উত্তরে সে অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, 'এটাই যে আমার বাড়ি।'

সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত, দেখলাম পাহাড় বেয়ে দুজন লোক নেমে আসছে কুঁড়েঘরের দিকেই। কারো হাতেই রাইফেল নেই, কিন্তু বালা সিং, গাড়োয়ালীদের মধ্যে যার মত শ্রেষ্ঠ মানুষ বিরল, এবং কয়েক বছর পরে যার বেদনাদায়ক মৃত্যুর ঘটনার কথা পূর্বেই আমি বলেছি, হাতে একটি লণ্ঠন ঝুলিয়ে আসছে। বালা সিং পৌঁছে জানালো যে সে আমার ভারি রাইফেলটা আনে নি, কারণ কার্তুজগুলো আমার সুটকেসেই তালাবন্ধ রয়েছে আর আমি চাবিটা পাঠাতেও ভুলেছি। ফলে, আমার নতুন রাইফেলটা দিয়েই বাঘটাকে মারতে হবে আর এটার পক্ষে এর চেয়ে ভাল বউনি আর কি!

গাছের ওপরে আসন নেবার আগে কুঁড়েঘরের মালিককে বললাম যে তোমার দুই বাচ্চা, আট বছরের মেয়ে আর ছ' বছরের ছেলেটাকে শান্ত করে রাখার ওপরেই আমার সার্থকতা নির্ভর করছে এবং তোমার স্ত্রী যেন আমার বাঘটাকে গুলি করা বা বাঘটা আর আসবে না এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সন্ধের রান্নাটা না চড়ায়। বালা সিংকে নির্দেশ রইল সে যেন

কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের চুপ করিয়ে রাখে, আমি শিস্ দিলে আলো জ্বালায় এবং আমার পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে।

পাহাড়ের ওপর থেকে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা মিলিয়ে যেতেই উপত্যকার শত সহস্র পাখিদের কলগুঞ্জন ক্ষীণতর হয়ে এল। গোধূলির অন্ধকার ঘন হয়ে এল, মাথার ওপরে পাহাড়ে হুতুম প্যাঁচার চিৎকার। চাঁদ ওঠবার আগে পর্যন্ত কিছুকালের জন্যে চতুর্দিক থাকবে প্রায়ান্ধকার। সময় আসন্ন আর কুঁড়েঘরের বাসিন্দারা মৃতের মত নিস্তব্ধ। আমার রাইফেলটাকে শক্ত করে ধরে, নিচের মাঠের দিকে স্থির চোখ রেখে বসে আছি ; বাঘটা তখন আমার গাছের নিচের পথটা এড়িয়ে সেই মড়িটার কাছে পৌঁছে গেছে আর সেটার অবস্থা দেখে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ। চাপা গর্জনে সে শকুনদের অভিশাপ দিতে থাকল, যদিও দু'ঘণ্টা আগেই তারা উড়ে গেছে, কেবলমাত্র জায়গাটাতে রেখে গেছে তাদের গায়ের সৌগন্ধ। সম্ভবত দু' তিন বা চার মিনিট ধরে সে নিজের মনেই গর্জাল আর তারপরেই নৈঃশব্দ্য। ক্রমশই আলো ফুটছে। আর কয়েক মিনিট পরেই আমার ভুবন আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিয়ে পাহাড়ের গায়ে চাঁদ উঠল। শকুনেরা চেঁছেমুছে খেয়ে যাওয়ায় এখন হাড়গুলো চাঁদের আলোয় শুভ্রতর দেখাচ্ছে কিন্তু কোথাও বাঘটার চিহ্নমাত্র নেই। উত্তেজনায় শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নিচু গলায় শিস্ দিলাম। বালা সিং সজাগই ছিল ; শুনতে পেলাম সে কুঁড়েঘরের মালিককে উনুন থেকে আগুন জ্বালিয়ে আনতে বলছে। ঘাসের কুঁড়ের দেওয়ালের ফাঁকে যে অল্প আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন লণ্ঠনটা জ্বালতেই তা স্পষ্টতর হল। আলোটা কুঁড়ের এধার থেকে ওধারে আনা হল, তারপর দরজা খুলে আলো হাতে মুখটাতে দাঁড়িয়ে আমার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। ওই একটি চাপা শিস্ দেওয়া ছাড়া গাছের ওপরে ওঠার পর আমি কোনো শব্দ বা গা-নড়াচড়া করি নি। এবং এখনই নিচে তাকিয়ে সুস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখলাম, আমার ঠিক নিচেই বাঘটা দাঁড়িয়ে তার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে বালা সিংকে দেখছে। আমার রাইফেলের মুখটা তখন বাঘের মাথাটা থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরত্বে ; কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, এই কার্তুজে হয়তো বাঘের লোমগুলো পুড়ে যাবে। আমার রাইফেলের হাতির দাঁতের মাছিটি বাঘের হৃৎপিণ্ডকে নির্দেশ করে আছে, জানি আমার বুলেট মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটাবে ; আমি শান্তভাবে ট্রিগার টিপলাম। চাপে ট্রিগার নেমে এল কিন্তু কিছুই হল না।

হা ঈশ্বর ! কি অসহ্য অসাবধানী আমি। স্পষ্ট মনে আছে গাছে আসন নেবার আগে আমি ম্যাগাজিন থেকে পাঁচটা গুলির একটা ক্লিপ ভরেছিলাম রাইফেলের চেম্বারে কিন্তু নিশ্চয়ই ম্যাগাজিন থেকে কার্তুজটা ঠিকমত চেম্বারে

বসেছে কিনা, তা দেখে নিতে ভুলেছি। রাইফেলটা যদি পুরনো আর বহু ব্যবহৃত হত, তবে এ-ভুলটা শুধরে নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু রাইফেলটা নতুন; এবং যে-মুহূর্তে বোল্টটা পেছনে টানবার জন্যে লিভারটা তুলেছি তখনই ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ আর এক লাফে বাঘটা খাল পেরিয়ে অদৃশ্য হল। বালা সিং-এর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে পেছনে তাকাতে দেখলাম সে কুঁড়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করেছে।

নৈঃশব্দ্যের এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই; আমাকে গাছ থেকে নামতে সাহায্য করার জন্যে বালা সিং আমারই ডাকে এগিয়ে এসেছে। ম্যাগাজিনটা খালি করার জন্যে রাইফেলের বোল্টটাকে আমি পেছনের দিকে টানলাম তখনই দেখলাম যে বোল্টের শেষের দিকে একটা কার্তুজ রয়েছে। তাহলে তো রাইফেলটায় গুলি ভরা ছিল আর সেফটি ক্যাচও খোলা ছিল। তবে কেন আমার ঘোড়া টেপা সত্ত্বেও রাইফেল থেকে গুলি বেরুল না? কারণটা জেনেছিলাম অনেক পরে। ম্যাণ্টনের ম্যানেজার রাইফেলটা দেখবার সময়েই আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে এর ঘোড়াটা দুবার টানতে হয়। তথাকথিত এ-ধরনের উন্নত প্রকারের রাইফেল ইতিপূর্বে ব্যবহার না করায় আমার জানা ছিল না যে ঘোড়াটা প্রথমে সামান্য টানলে ওটার ঢিলা ভাবটা কাটে এবং পরের টানে স্ট্রাইকারটা কার্তুজে লাগে। আমার ব্যর্থতার এহেন কারণটা বালা সিংকে ব্যাখ্যা করলে, সে নিজেকেই দোষারোপ করে বলে, 'আমি যদি আপনার ভারি রাইফেল আর সুটকেসটা আনতাম, তবে এরকমটি ঘটত না।' সে-সময়ে আমারও ওইরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু যতই দিন গিয়েছে মনে হয়েছে, আমার হাতে ভারি রাইফেলটা থাকলেও হয়তো সে সন্ধ্যায় আমি বাঘ-টাকে মারতে পারতাম না।

৪

মানুষখেকোটার সন্ধানে পরদিন সকালে আবার অনেকটা হাঁটলাম; এবং অবশেষে রেস্ট হাউসে ফিরে আসতেই জনৈক উত্তেজিত মানুষ আমাকে সেলাম জানিয়ে বললে যে বাঘটা সদ্য তার একটা গরুকে মেরেছে। বিগত সন্ধ্যায় আমি যে উপত্যকায় বসেছিলাম তারই অন্য ধারে লোকটি যখন গরু চরাচ্ছিল, তখনই বাঘটা এসে তার সেই লাল গরুটাকে মারে, কদিন আগে যেটার বাচ্চা হয়েছিল। 'আর এখন', লোকটা জানাল, 'বাছুরটা মরবে দুধের অভাবে; দুধেল গাই তো আর একটাও আমার নেই।'

গত সন্ধ্যায় বাঘটার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, কিন্তু ভাগ্য তাকে চিরকাল অনুগ্রহ দেখাবে না; আর এই গরু মারার অপরাধেই তাকে মরতে হবে, কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে একে গরুর সংখ্যা নগণ্য, তদুপরি একজন গরিব মানুষের দুধেল গাই

হত্যা আরো সাংঘাতিক। ফেলে আসা অন্য গরুগুলোর জন্যে লোকটার ভাবনা ছিল না, কারণ প্রাণভয়ে ইতিমধ্যেই তারা ছুটে পালিয়েছে গ্রামের দিকে ; সুতরাং আমার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করায় আগ্রহী ছিল। বেলা একটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম, লোকটা আমার পথপ্রদর্শক। আমি ওর পেছনে পেছনে চলেছি আর আমার পেছনে মাচান বাঁধবার সরঞ্জাম নিয়ে আমার দুজন লোক।

পাহাড়ের পাশের একটুকরো খোলা জমিতে দাঁড়িয়ে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে জায়গাটার অবস্থান বিষয়ে বুঝিয়ে দিল। পাহাড়ের ওপর থেকে সিকি মাইল নিচে একখণ্ড সবুজ জমিতে যখন তার গরুগুলো চরছিল, তখন উপত্যকার দিক থেকে বাঘটা বেরিয়ে এসে তার গরুটাকে মারে। বাকি গরুগুলো ভীত হয়ে পাহাড় পেরিয়ে ছুটে অন্য প্রান্তে তাদের গ্রামে পৌঁছেছে। আমাদের গ্রামে পৌঁছবার সহজ উপায় হল উপত্যকা পার হয়ে যাওয়া, কিন্তু যেহেতু বাঘটাকে আমি বিরক্ত করতে চাই নি, সেকারণেই আমরা উপত্যকার মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে গরুটাকে যেখানে মারা হয়েছে, সেখানে নেমে এলাম। যে শৈলশিরার ওপর দিয়ে শঙ্কিত গরুগুলো ছুটে পালিয়েছে আর যেখানে তারা চরছিল, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানটা ফাঁকা ফাঁকা বৃক্ষের জঙ্গল। দৌড়ে ছোটা পশুগুলোর পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে দো-আঁশ মাটির ওপরে আর এই ছাপ ধরে এগিয়ে অনায়াসে পৌঁছনো গেল, যেখানে এই দৌড়ের শুরু। এখানে জমে আছে চাপ চাপ রক্ত আর টেনে নিয়ে যাবার দাগের সূত্রপাত এখান থেকেই। পাহাড় অতিক্রম করে এই দাগটা চলে গিয়েছে দুশো গজ দূরের এক গভীর জঙ্গলাবৃত গিরিখাত পর্যন্ত ; এখানে একটি ছোট জলধারাও বর্তমান। এই খাতের পথ দিয়েই বাঘ তার শিকারকে ওপরে নিয়ে গেছে।

ফাঁকা মাঠের ওপরে সকাল দশটা নাগাদ গরুটাকে মারা হয়েছে আর তারপরই বাঘটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখবার জন্যে। অতএব সেইমত সে ওটাকে গিরিখাত দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে, লুকিয়ে রেখেছে তারই কোনো সংগোপনে, আর তারপর গেছে খাত ধরে নিচের উপত্যকার দিকে, থাবার ছাপে এর চিহ্ন স্পষ্ট। যে অঞ্চলে মানুষ এবং গৃহপালিত পশুরা চলাফেরা করে, সেখানে বাঘটার অবস্থান বিষয়ে ঠিক ঠিক বলতে যাওয়া বোকামি, কারণ সামান্য বিরক্ত বোধ করলেই সে স্থান ত্যাগ করবে। সুতরাং যদিও থাবার ছাপ খাত ধরে নিচে নেমে গেছে, তবুও তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সাবধানতায় আমি খাতের পথ ধরে এগোলাম।

শৈলশিরা থেকে দুশো গজ নিচে আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, বৃষ্টির জলের ধারাপাতে পাহাড়ের পাশে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে একটা বড় গর্ত।

এখান থেকেই গিরিখাতের শুরু। গর্তটার ওপরের দিকে, যেখান থেকে পনের ফুট খাড়াই নেমে গেছে, সেখানটা বহু আগে সৃষ্ট, আর এখন সেখানে দশ থেকে বারো ফুট লম্বা ওক আর মানদানী গাছ বেড়ে উঠেছে। এই কচি গাছের অরণ্য এবং পনের ফুট খাড়াইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত খোলা জায়গায় বাঘটা তার শিকার এনে রেখেছে। গরুর মালিক যখন অশ্রুসজল চোখে বলল যে, এই যে পশুটা সামনে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেটাকে সে কেবলমাত্র ছোট থেকে বড়ই করে নি, সে ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়, তখন আমি গভীর সমবেদনা বোধ করেছিলাম। পশুটার কোনো অংশ তখনো ছোঁয়া হয় নি, বাঘটা ওটাকে টেনে এনে রেখেছে পরে সময়মত খাবে বলে।

এখন একটা বসবার জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। কয়েকটা বড় ওক গাছ আছে খাতের ওপারে কিন্তু কোনোটা থেকেই মড়িটাকে দেখা যায় না আর ও-গাছে চড়াও কঠিন। মড়িটা থেকে তিরিশ গজ নিচে এবং খাতের বাঁ-দিকে একটা ছোট শক্ত হলি গাছ। তার ডালগুলো গুঁড়ি থেকে সমকোণে বেরিয়ে এসেছে, আর মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে বেশ একটা ডাল. সেখানে বসা যায় আর অন্য যে একটি ডাল সেটাতে পা রেখে আমি আমার পাকে বিশ্রাম দিতে পারি। কিন্তু মাটির অত কাছে বসতে চাওয়াতে আমার তিনজন সঙ্গীই প্রবলভাবে আপত্তি জানাল ; যাই হ'ক. বসার উপযুক্ত অন্য দ্বিতীয় গাছ খুঁজে পেলাম না, সুতরাং হলি গাছটাই সম্বল। লোকদের সরিয়ে দেবার আগেই বলে দিলাম যে গত সন্ধ্যায় আমি যে কুঁড়েতে ছিলাম, না ডাকা পর্যন্ত অথবা আমি যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ সেখানেই তাদের অপেক্ষা করতে। উপত্যকার আড়াআড়ি এর দূরত্ব হল প্রায় আধমাইল আর ওরা আমাকে বা মড়িটাকে দেখতে পাবে না ; অবশ্য হলি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কুঁড়েটা আমি ঠিকই দেখতে পাব।

বিকেল চারটেয় আমার লোকজনেরা চলে গেল আর আমি দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে হলি গাছের শাখায় বসে গেলাম ; কারণ পাহাড়টা পশ্চিমমুখো, আর সূর্যাস্তের আগে সম্ভবত বাঘটা আসবেই না। বাঁ দিকে হলি গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিখাতের পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিসীমায় ; সামনে প্রায় দশ ফুট গভীর ও কুড়ি ফুট চওড়া গিরিখাত আমার চোখে স্পষ্ট আর সামনের পাহাড়টায় কেবল পাথর আর পাথর, কোনো গাছ নেই। দক্ষিণে আমার প্রসারিত দৃষ্টিতে শৈলশিরা স্পষ্টতর কিন্তু মড়িটা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না, ঢাকা পড়ে আছে ঘন কচি গাছের অরণ্যে। আমার পেছনে রিংগালের ঘন বন গাছ পর্যন্ত ছড়িয়ে মড়িটাকে আমার চোখের আড়াল করেছে। জলধারা সৃষ্ট গর্তে মড়িটাকে রেখে বাঘটা খাত ধরে নেমে গেছে এবং এ অনুমানের যুক্তি আছে যে সে ফেরবার সময় ওই পথেই ফিরবে। এ-কারণেই খাতের দিকেই আমার মনোযোগ বিঁধে রেখেছিলাম, যাতে করে বাঘটার ওপর সরাসরি গুলি

চালাতে পারি। অত্যন্ত কাছে থেকেই যে আমি তাকে মারতে পারব, এ-বিষয়ে, আমি ছিলাম নিঃসন্দেহ আর অধিকতর নিশ্চিন্ত হবার জন্যে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে দ্বিতীয়বারও যাতে গুলি চালাতে পারি, তাই আমার রাইফেলের দুটো ঘোড়াই তৈরি রেখেছিলাম।

এখানে জঙ্গলে আছে সম্বর, কাকার ও লাঙ্গুর আর মনাল, পাহাড়ী নীল হাঁড়িচাঁছা, ছাতারে, দামা ও নীলকণ্ঠ ; যেহেতু এরা সকলেই বিড়াল পরিবারের একজনকে দেখলে আওয়াজ করে ডাকবে, সে কারণেই ভেবেছিলাম যে বাঘটা আসবার জানান আমি পেয়ে যাব। কিন্তু ভুলই ভেবেছিলাম ; কোনো রকম সতর্কতার সংকেতের আগেই অকস্মাৎ বাঘটার মড়িটার কাছে পৌঁছে যাবার পায়ের শব্দ পেলাম। খাত ধরে বাঘটা সম্ভবত জলপানের জন্যে নিচে নেমেছিল, তারপর রিংগালের অরণ্যানী ঘুরে, আমাকে না পার হয়েই সে পৌঁছেছে মড়িটার কাছে। এতে আমি কোনো অকারণ দুশ্চিন্তা বোধ করি নি, কারণ দিনের আলোয় বাঘেরা মড়ির কাছে কখনো সুস্থিরতা বোধ করে না ; এবং নিশ্চিন্ত ছিলাম যে হয় এখুনি অথবা সামান্যকাল পরে বাঘটাকে আমার সামনের খোলা মাঠে দেখা যাবেই। মাংসের বড় বড় টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাঘটা প্রায় মিনিট পনের ধরে খাচ্ছিল. এমন সময় দেখতে পেলাম একটা ভাল্লুক পাহাড়ের গা ধরে বাঁ থেকে ডান দিকে আসছে। এটা ছিল হিমালয়ের বেশ বড় জাতের কাল ভাল্লুক ; গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল সে, যেন এখান থেকে ওখানে যাবার জন্যে যত সময়ই লাগুক, তাতে তার কিছুই এসে যায় না। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে মুখ ফেরাল তারপর শুয়ে পড়ল। এক-দু' মিনিট পরে মাথাটা তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। দিনের আলোয় যেহেতু পাহাড়ে বাতাস নিচু থেকে উঁচু দিকে বয়ে চলে, সেহেতু ভাল্লুকটা মাংস এবং রক্তের গন্ধ পাচ্ছিল আর তার সঙ্গে মেশানো ছিল বাঘের গায়ের আঘ্রাণ। আমি ছিলাম মড়িটার সামান্য ডাইনে, সেকারণেই সে আমার গন্ধ পায় নি। এরপরেই সে উঠে দাঁড়াল এবং হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে বাঘটার দিকে এগুতে থাকল।

কোন ভাল্লুক এভাবে গুড়ি মেরে পাহাড় থেকে নেমে আসছে, এ-দৃশ্য আমার বিস্ময়কর। তাকে ওইভাবে যেতে হবে প্রায় দু'শো গজ আর যদিও বাঘ বা চিতার মত গুড়ি মেরে এগোবার মত শরীর তার নয়, তবু সে জায়গাটা পেরুল সাপের মত স্বচ্ছন্দে আর ছায়ার মত নিঃশব্দে। আর যতই সে কাছে এগুচ্ছিল, ততই যেন তার সাবধানতা স্পষ্ট হচ্ছিল। গর্তটার ওপরে যে পনের ফুট খাড়াই, তার ধারটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আর জায়গাটার কয়েক ফুট কাছাকাছির মধ্যে এসেই সে পেটে হেঁচড়ে এগুতে থাকল। গর্তের ওপর থেকে মাথা উঁচু করে ভাল্লুকটা একবার দেখে নিল যে বাঘটা তখন

পরমানন্দে ভোজনে ব্যস্ত তারপর নিচের দিকে দেখে নিয়ে মাথাটা আস্তে পিছিয়ে নিল। আমার উত্তেজনা তখন চূড়ান্তে পৌঁছে সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়েছে আর মুখ-গলা শুকিয়ে কাঠ।

হিমালয়ের ভাল্লুককে আমি দু'বার বাঘের মড়ি নিয়ে উধাও হতে দেখেছি। বাঘ অবশ্য কোনো বারেই সামনে ছিল না। আর দু'বার দেখেছি চিতাকে তাড়িয়ে ভাল্লুককে তার মড়ি কেড়ে নিয়ে চলে যেতে। কিন্তু এবারে বাঘ, এবং বিরাটকায় পুরুষ-বাঘ তার মড়ির সামনে এবং চিতার মত তাড়িয়ে দেবার জন্তুও সে নয়। মনে মনে ভাবছিলাম, জঙ্গলের রাজাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় মেতে ওঠার মত বোকামো নিশ্চয়ই ভাল্লুকটা করবে না। কিন্তু ভাল্লুকটা যেন সেটার বাসনাতেই ছিল আর বাঘটা যখন একটা হাড় চিবোতে ব্যস্ত, তখনই তার সে সুযোগ এল। জানি না, ভাল্লুকটা ঠিক এই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিল কি না ; যা হ'ক, বাঘটার এই হাড় চিবোবার ব্যস্ততার সুযোগে ভাল্লুকটা নিজেকে গর্তের কিনারে টেনে আনলে তারপর পা দুটো জড়ো করে এক ভয়ংকর চিৎকারের সঙ্গে নিজেকে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। মনে হয়, সে চিৎকার করেছিল বাঘটাকে হতচকিত করবার জন্যে, কিন্তু দেখে মনে হল তার সে চেষ্টায় ফল হয় নি ; কারণ ভাল্লুকের ভয়ংকর চিৎকারের উত্তরে তখন বাঘটার আরো ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল।

বন্যদের মধ্যে লড়াই হয় কদাচিৎ ; এবং আমার জ্ঞানত এই দ্বিতীয়বার আমি দুই ভিন্নজাতের পশুদের মধ্যে লড়াই দেখছি, যে-লড়াই শুধু লড়াইয়ের জন্যে, খাদ্য-খাদক সম্পর্কের সূত্রে নয়। এ-লড়াই আমি চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং এর কারণটা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু শব্দের প্রত্যেকটি অনুরণনে ঘটনাটি স্পষ্টতর। গর্তের ছোট সীমায় ঘটনাটি ঘটার ফলে এই শব্দ ছিল ভয়াবহ এবং আমার সৌভাগ্য যে, লড়াইটা চলছিল সরাসরি আর এমন দু'পক্ষের মধ্যে যারা নিজেদের প্রতিরক্ষায় সমর্থ এবং তৃতীয় পক্ষরূপে আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ি নি। উত্তেজনায় হৃদ্‌স্পন্দনের গতি দ্রুততর হওয়ায় রক্তের বেগও বেড়েছিল এবং মনে হচ্ছিল সময় যেন থেমে আছে। লড়াইটা চলে মিনিট তিনেক বা তার বেশিও হতে পারে। যা হ'ক, যখনই বাঘটা বুঝল যে প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট শায়েস্তা করা হয়েছে, তখনই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে এক লাফে আমার সামনের খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল আর তারই পেছনে পেছনে চিৎকার করতে করতে এল ভাল্লুকটা। রাইফেলটা এদিকে যে-মুহূর্তে বাঘের বাঁ-কাঁধে লক্ষ স্থির করেছি, তৎক্ষণাৎ সে বাঁ-দিক ঘুরে এক লাফে কুড়ি ফুট লম্বা খাতটা পার হয়ে আমার পায়ের নিচে এসে পড়ল। সে যখন শূন্যে তখনই আমি রাইফেলটা ঘুরিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলাম, এবং আমার উদ্দেশ্যমতই সেটা লেগেছিল তার পিঠে। গুলির প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল তার ক্রুদ্ধ গর্জনে

আর তারপরে সশব্দে গিয়ে পড়ল আমার পেছনের রিংগাল বনে। শোনা গেল তার কয়েকগজ এগিয়ে যাবার শব্দ এবং এর পরেই নীরবতা। ভাবলাম, গুলিটা তার হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ করেছে এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

পয়েন্ট পাঁচশো বোরের কর্ডাইট রাইফেল যে-কোনো জায়গায় ছুঁড়লেই আওয়াজটা হয় জোর, কিন্তু এখানে, এই খাতে সেটা শোনাল কামান গর্জনের মত। কিন্তু উন্মত্ত ভাল্লুকটার এ-শব্দে কিছুই হল না। বাঘটার পেছনে পেছনে এসেও সে বাঘের মতো লাফিয়ে খাত পার হবার চেষ্টা না করে পাড় বেয়ে নেমে এসে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল। এমন একটা জানোয়ার, যে বাঘকে তার মড়ি থেকে হটিয়ে দেবার সাহস রাখে, তাকে মারবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না কিন্তু ওই সগর্জন ভয়াবহতাকে কাছে আসতে দেওয়া পাগলামিরই নামান্তর; সুতরাং সে যখন আমার থেকে কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধানে, তখনই আমার রাইফেলের বাঁ-নলের বুলেটটা তার কপাল লক্ষ করে ছুঁড়লাম। উপুড় হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে সে পিছলে নেমে যেতে থাকল যতক্ষণ না তার কোমরটা অপর পাড়ে আটকাল।

এক মুহূর্ত আগে জঙ্গলে যেখানে ক্রুদ্ধ গর্জন আর ভারি রাইফেলের আওয়াজে উচ্চকিত ছিল, এখন সেখানে গভীর নৈঃশব্দ্য; আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলে, সিগারেট খাবার কথা মনে এল। দু-হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা রেখে সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্যে দু'হাত দু'পকেটে ঢোকালাম। আর সেইক্ষণেই আমার ডানদিকে কোন চলার শব্দ হল; মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম, দু-এক মিনিট আগে বাঘটা যে খোলা মাঠটা লাফিয়ে পার হয়ে এসেছিল, এখন সেখান দিয়েই ধীরপদে হাঁটছে আর তাকাচ্ছে তার মৃত শত্রুর দিকে; আমার দিকে নয়।

জানি, ঘটনাগুলো যেমনভাবে ঘটেছে, অবিকল তা বলে গেলে শিকারীরা আমাকে লক্ষ্যভেদে উৎকর্ষতার অভাব ও মারাত্মক অসাবধানীরূপে চিহ্নিত করবেন। লক্ষ্যভেদের উৎকর্ষতা বিষয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার স্বপক্ষে বলার কিছু নেই কিন্তু অসাবধানতার অপরাধ আমি স্বীকার করতে রাজী নই। যখন বাঘের পিঠ লক্ষ করে গুলি ছুঁড়েছিলাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তাকে মারাত্মক আঘাত করা হয়েছে, আর প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ গর্জনের পর উন্মাদের মত ছুটে যাওয়ায় এবং অকস্মাৎ সমস্ত শব্দ বন্ধ হওয়ায়, মৃত্যুটা বাঘটার তরফেই ঘটেছে, এমন ধরে নেওয়াই যুক্তিসংগত। আমার দ্বিতীয় গুলিতে ভাল্লুকটা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল, এ-রকম দেখে, আমি যখন গাছের ওপরে ছিলাম, তখনই রাইফেলটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রাখবার আগে দ্বিতীয়বার গুলি ভর্তি করবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

বাঘটাকে জীবন্ত ও আহত অবস্থায় দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে দু-এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করলাম আর তারপরেই দ্রুত ব্যবস্থা নিলাম। রাইফেলটা ছিল আণ্ডার লেভেল মডেলের; লিভারটা ট্রিগার-গার্ডের সঙ্গে দুটি লাগ দিয়ে জোড়া। ফলে চটপট গুলি ভরা শক্ত আর তার উপর বাকি গুলিগুলো ছিল আমার প্যাণ্টের পকেটে; দাঁড়ানো অবস্থায় সেখান থেকে গুলি বের করা সহজ কিন্তু একটা সরু ডালের ওপর বসে তা তত সহজ ছিল না। ভাল্লুকটা মৃত, সেটা বাঘের জানা ছিল কি না, অথবা অকস্মাৎ কোনো আক্রমণ এড়াবার জন্যে সে চোখ রেখেছিল কিনা, এ-সকলই আমার অজ্ঞাত। যা হ'ক সে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরপদে এগিয়ে পেঁছিল চল্লিশ গজ দূরের একটা জায়গায়, রাইফেল-তাকের দিক থেকে যাকে সবচেয়ে ভাল বর্ণনায় বলতে পারি, ইলেভ্‌ন ও-ক্লক (ঘড়ির কাঁটা এগারটার দিকে নির্দেশ করলে যেমন ঈষৎ বাঁয়ে হেলে থাকে, তেমনই); এবং যখন একটা বড় পাথরের চাঁঙড়ের ওপর দিয়ে সে চলছিল, তখন মাত্র একটা নলেই গুলি ভরে রাইফেলটা তুলে ধরে গুলি ছুঁড়লাম। গুলিতে সে পিছু হটে এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল অত্যন্ত বেকায়দাভাবে, তারপরেই হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে দাঁড়িয়ে শৈলশিখরের পাশ দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে লেজ তুলে ছুটে পালাল। নিকেলের আধারে ভরা নরম-মাথা বুলেটটির গোড়াটা ছিল ইস্পাতের; সেটা বাঘটার মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা পাথরে লেগে ফিরে এসে ওর মুখে লাগে আর তাতেই তার ভারসাম্য নষ্ট হয় কিন্তু কোনো ক্ষতি তাতে তার হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করে আমি হলি গাছটা থেকে নেমে ভাল্লুকটাকে দেখতে গেলাম; আমি প্রথমে এটাকে যত বড় ভেবেছিলাম, আসলে তার চেয়েও বড়। বাঘের সঙ্গে তার স্বেচ্ছাকৃত লড়াই যে সাংঘাতিকই হয়েছে তা বোঝা গেল তার গলার ও অন্যান্য জায়গায় মোটা লোমের আবরণ ভেদ করে বেয়ে পড়া রক্তধারায় আর মাথার খুলির অনেক জায়গাতেই নখের ঘায়ে হাড় পর্যন্ত ছেঁড়াখোঁড়া। ভাল্লুকের মত শক্ত জীবের পক্ষে এই ধরনের আঘাত সামলে নেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নাকের ওপর যে জখমটা হয়েছিল সেটাই ছিল তার পক্ষে চিন্তা এবং রাগের কারণ। সব মরদই নাকের ওপর আঘাত পেলে ক্ষুব্ধ হয়; আর ভাল্লুকটা কেবলমাত্র সেই নরম জায়গাটাতে আঘাত পায় নি, তার নাকটা প্রায় দুফালা হয়ে গেছে, জখমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপমানের বেদনা। সুতরাং হত্যার উদগ্র বাসনা চোখে নিয়ে বাঘটা পিছনে ধাওয়া করায় তার পক্ষে আমার ভারি রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার শব্দ না পাওয়াই স্বাভাবিক।

ভাল্লুকটার ছাল ছাড়িয়ে নেবার জন্যে আমার লোকজনদের ডেকে পাঠাবার মত যথেষ্ট সময় আমার হাতে ছিল না সুতরাং কুঁড়ে থেকে তাদের ডেকে নিয়ে রাত নামবার আগেই রেস্ট হাউসে ফিরলাম, কারণ মানুষখেকোটা এই অঞ্চলেই

আছে। আমার লোকেরা, গ্রামের জনাবার বা তার বেশি লোকজন সেই কুঁড়ে ঘরে জড়ো হয়েছিল; একাগ্রভাবে অপেক্ষা করছিল আমার আসা-পথ চেয়ে এবং যখন আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পেঁছিুলাম, তখন তারা বিস্ময়ে নির্বাক। সমবেত লোকগুলো আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে যেন আমি সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরছি; বালা সিং-এর মুখেই প্রথম কথা ফুটল, আর তার মুখ থেকে সব শুনে আমি কিছুমাত্র অবাক হই নি তা 'কেন' বলে। 'আমরা আপনাকে আগেই অনুরোধ করেছিলাম', বালা সিং বলল, 'মাটির অত কাছাকাছি না বসতে; যখন প্রথম আমরা আপনার চিৎকার শুনলাম এবং পরমুহূর্তে কানে এল বাঘের গর্জন, তখন স্বভাবতই ধবে নিয়েছিলাম যে বাঘটা আপনাকে গাছ থেকে টেনে নামিয়েছে এবং আপনি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বাঘের সঙ্গে লড়ছেন। তারপর যখন বাঘের গর্জন থেমে গেল আর আপনার নিরন্তর চিৎকার শোনা যেতে থাকল, তখন ভাবলাম বাঘটা আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরে আমরা আপনার রাইফেলের দুটো গুলির শব্দ পেলাম এবং পরে তৃতীয়টার; তখন তা আমাদের কাছে বিরাট রহস্যই মনে হল, কারণ একজনকে যখন বাঘ টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে কি করে রাইফেল চালাতে পারে তা কিছুতেই আমাদের মাথায় ঢোকে নি। আর যখন আমরা উপস্থিত লোকদের সঙ্গে আমাদের কর্তব্য স্থির করতে ব্যস্ত ছিলাম তখনই আপনি হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেন।' বাঘ মারবার সমস্ত আয়োজনের বিষয় জেনে যারা তার শব্দ সংকেত পাবার জন্যে কান পেতে অপেক্ষা করছে, তাদের পক্ষে সে-উৎকণ্ঠার মধ্যে ভাল্লুকের চিৎকারকে মানুষের চিৎকার ভেবে ভুল করা খুবই সম্ভব কারণ উভয়ের মিলও যথেষ্ট এবং বিশেষ করে দূর থেকে একটি থেকে ওটিকে তফাত করা অসম্ভবই।

আমি যখন লোকদের, তারা যা শুনেছে, সে সমস্ত ঘটনা ও ভাল্লুক মারার কথা বলছিলাম, ততক্ষণে বালা সিং আমার জন্যে এক কাপ চা তৈরি করে ফেলেছে। ভাল্লুকের চর্বি বাতের ওষুধ হিসেবে মহার্ঘ এবং তারা যখন জানল যে ওটা আমি চাই না আর তারা তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে, তখন তারা মহাখুশি। পরদিন সকালে আমি যখন ভাল্লুকের ছালটার জন্যে যাত্রা করলাম, তখন আমার সঙ্গে অনেক লোক; তারা কেবলমাত্র চর্বিতেই আগ্রহী নয়, সেই সঙ্গে যে জানোয়ারটা বাঘের সঙ্গে লড়েছে তাকেও দেখতে চায়। আমি কখনও ভাল্লুককে মেপে বা ওজন করে দেখি নি, তবে ওরকম চোখেও পড়েছে কদাচিৎ আর সেদিন সকালে যেটার ছাল ছাড়িয়েছিলাম, সেটার মত বড় এবং মোটা হিমালয়ের ভাল্লুক আমি কখনো দেখি নি। ভাল্লুকের চর্বি আর মূল্যবান অঙ্গগুলো ভাগ হয়ে যেতে, সকলেই আনন্দের সঙ্গে দাবিধুরায় ফিরে চলল এবং আমার কাছ থেকে চামড়াটা পেয়ে সবচেয়ে খুশি ও সকলের

ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠল বালা সিং ; পিঠে সেটাকে বেঁধে গর্বের গর্বিত পদক্ষেপে সেও পা মেলাল।

বাঘটা আর ফিরে আসে নি তার অর্ধসমাপ্ত ভুক্তাবশেষের কাছে ; সন্ধ্যার মধ্যেই শকুনের পাল গরু আর ভাল্লুকের হাড়গুলো পরিষ্কার করে ফেলেছিল।

৫

চর্বিভর্তি একটা ভাল্লুকের ছাল ছাড়ানো খুবই নোংরা কাজ ; তাই আমি গরম জলে স্নান সেরে কিছু প্রাতরাশের আকাঙ্ক্ষায়, যখন রেস্ট হাউসে ফিরছিলাম, তখনই একজন উত্তেজিত বনরক্ষকের সঙ্গে দেখা ; এর সদর দপ্তর দাবিধুরায়। গতরাতে তাকে দূরে টহলে যেতে হয়েছিল ; সেখান থেকে দাবিধুরায় ফিরে আজ সকালেই বেনের দোকানে সে শুনেছে আমার ভাল্লুক মারার কথা। তার বাবা কিছুদিন যাবৎ বাতে শয্যাশায়ী, সে কারণেই খানিকটা ভাল্লুকের চর্বির তার ভীষণ প্রয়োজন আর এ-জন্যেই যখন সে তার একটু ভাগ পাবার আশায় ছুটে আসছিল তখন একপাল ছুটন্ত গরুর মধ্যে গিয়ে পড়ে। এর পেছনে ছুটে আসছিল একটা ছেলে : সে জানাল যে তার একটা গরুকে বাঘে মেরেছে। বাঘ যখন আক্রমণ করে তখন গরুটা যেখানে চরছিল, সে জায়গাটা সম্পর্কে বনরক্ষকের মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সুতরাং বালা সিং ও অন্যান্যেরা দাবিধুরার দিকে এগিয়ে গেল আর আমি তার সঙ্গে মড়িটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে যাত্রা করলাম। দু'মাইল বা কিছু বেশি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমরা এলাম এক ছোট উপত্যকায়। বনরক্ষকটির ধারণা এই উপত্যকাতেই গরুটা মারা পড়েছে।

কিছুদিন আগে আলমোড়ার গুর্খা ডিপোতে কিছু অকেজো মালপত্র নিলামে বিক্রি হয় এবং আমার এই সঙ্গীটি সেখান থেকে তার পায়ের চেয়ে অনেক বড় এক জোড়া আর্মি বুট কিনেছে। ওই গুরুভার পরেই পা টানতে টানতে সে উপত্যকার মুখ পর্যন্ত আমার আগেই এসে পৌঁছেছে। এখানেই আমি তাকে জুতোটা খোলালাম আর তার পায়ের অবস্থা দেখে আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, যে-লোকটা সমস্ত জীবন খালি পায়ে চলেছে, সে কেবল মাত্র মিথ্যা অহমিকার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করেছে। 'আমি জুতোটা বড়ই কিনেছিলাম', সে বলে ফেলল, 'ভেবেছিলাম জুতোটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাবে।'

বিঘা পনের জায়গা জুড়ে এই নৌকাকৃতির ছোট উপত্যকাটি, মাঝে মাঝে বিরাট ওক গাছ, সব মিলিয়ে একটা চমৎকার পার্কের মত। আমি যেদিকটা দিয়ে নেমেছিলাম, সেদিকটা ধীরে ঢালু হয়ে নেমেছে এবং কোনো ঝোপঝাড় নেই, আর উল্টো দিকটা খাড়া উঠে গেছে ওপরের দিকে, এবং সেখানে রয়েছে কিছু কিছু ঝোপঝাড়। উপত্যকার মুখে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে সমস্ত জায়গাটা

আঁতিপাঁতি করে দেখে নিলাম এবং কোনোরকম সন্দেহজনক কিছুই না পেয়ে আমি ঢালু ঘাসে ঢাকা পথ ধরে নিচে নামতে থাকলাম আর আমার পেছনে এখন খালি পায়ে আসছে বনরক্ষকটি। উপত্যকার তলদেশের সমতল ভূমিতে নেমে দেখতে পেলাম অনেকখানি জায়গা থেকে শুকনো পাতা আর ডালপালা আঁচড়ে আঁচড়ে একজায়গায় এনে জড়ো করে একটা বড় ঢিবি করা হয়েছে। যদিও এখানে গরুটার শরীরের কোনো অংশই দেখা যাচ্ছিল না, তথাপি আমি জানতাম যে, ওই মরা পাতা ডালের স্তূপের নিচে বাঘ মড়িটাকে লুকিয়ে রেখেছে এবং আমি খুবই নির্বোধের মত ঘটনাটা আমার সঙ্গীকে জানতে দিলাম না; পরে সে আমায় জানিয়েছিল যে বাঘেদের এই মড়ি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি তার জানাশোনার বাইরে। যখন বাঘ এভাবে তার মড়ি লুকিয়ে রাখে তখন সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় যে সে তার কাছাকাছি কোথাও নেই; কিন্তু সর্বদা এরকম ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়। একারণেই এ-উপত্যকায় নামার আগে জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম; এখন আরো একবার দেখে নেবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

স্তূপীকৃত পাতা ও ডালপালার অদূরে পাহাড়টা উঠে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে আর চল্লিশ গজ ওপরে পাহাড়ের গায়ে গাছগাছড়ার ছোট ঝোপজঙ্গল। এটার দিকে তাকাতেই আমার চোখে পড়ল বাঘটা; একটুকরো চাতাল জমির ওপরে সে শুয়েছিল, পা দুটো আমার দিকে রেখে; এখন সে ঘুরে বসাতে পেছন দিকটা আমার সামনে। আমি তার মাথার একটা অংশ এবং ঘাড় থেকে পেছনের পা পর্যন্ত তিন ইঞ্চি চওড়া ডোরা দাগ দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথায় গুলি করবার প্রশ্নই ওঠে না আর গায়ে গুলি করলে একমাত্র ক্ষত করা ছাড়া কোনোই লাভ হবে না। আমার হাতে এখনো পুরো বিকেল আর সন্ধেটা রয়েছে আর বাঘটাকে এখন বা একটু পরে যখনই হ'ক উঠে দাঁড়াতেই হবে; সুতরাং বসে থেকে অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। এই সিদ্ধান্তে আসবার পরমহূর্তেই আমি আমার বাঁ-দিকে একটা চলাফেরার শব্দ পেলাম; মাথা ফিরিয়েই দেখলাম একটা ভাল্লুক তার দুটো ছোট বাচ্চাকে নিয়ে নিঃশব্দে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে মড়িটার দিকে। ভাল্লুকটা নিশ্চয়ই বাঘের গরু মারার ঘটনাটা জানতে পেরেছে আর সেকারণে যেমন আমিও দিয়ে থাকি, বাঘটাকে নিশ্চিন্ত হবার মত কিছু সময় দিয়ে, সে এখন এসেছে ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে; অন্যথায় বিশেষ কারণ ছাড়া ভরদুপুরে ভাল্লুকরা চলা-ফেরা করে না। যদি আমি মড়িটার কয়েক ফুটের মধ্যে না থেকে উপত্যকার মুখটায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, আমি নিশ্চিত যে, তাহলে এক অতি চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতাম; কারণ গন্ধের আশ্চর্য বোধে ভাল্লুকরা অনায়াসেই সন্ধান পেয়ে যেত মড়িটার আর সেটাকে টেনে বের করেও ফেলত। আর এরই ফলে বাঘটাও

জেগে উঠত এবং কল্পনা করাও যায় না যে, বিনা লড়াইয়ে সে মড়িটাকে ছেড়ে দিত ; সুতরাং লড়াইটা হত দেখার মত।

বনরক্ষক এতক্ষণ নিজের পায়ের তলার মাটির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল, এখন হঠাৎ ভাল্লুকটাকে দেখে সে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'দেখো সাহিব, ভালু, ভালু'। বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে নিমেষে সরে গেল ; কিন্তু তাকে প্রায় কুড়ি গজ খোলা মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হবে ; তাই আমার রাইফেলের নিশানার মধ্যে সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রিগার টিপলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বনরক্ষকটি আমি ভুল নিশানা করেছি এই ধারণা থেকে আমার হাত জড়িয়ে ধরে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিল আর তারই ফলে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা থেকে কয়েক গজ দূরে একটা গাছে গিয়ে বুলেটটা বিঁধল। রেগে গিয়ে কোথাও কোনো লাভ হয় না, বিশেষ করে জঙ্গলে। বনরক্ষক জানত না যে ওই উঁচু করা পাতার ঢিবিটার অর্থ কি, আর সে বাঘটাকেও দেখে নি, সুতরাং সে তখনও ধারণায় বদ্ধমূল ছিল যে ভয়াবহ ভাল্লুকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে আমার প্রাণরক্ষা করেছে ; অতএব বলার কিছুই নেই। আমার গুলিতে ভয় পেয়ে ভাল্লুকগুলো যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সঙ্গীটি আমাকে ধরা গলায় উৎসাহিত করছিল, 'মারো, মারো' বলে।

বনরক্ষকটি যখন অত্যন্ত মনমরা হয়ে দাবিধুরায় ফিরছিল, তখন তাকে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত করবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কোথাও 'ঘুরাল' মারতে পারা যায় কিনা, কারণ আমার লোকজনদের এখনো মাংস জোটে নি। এই ছোট্ট মানুষটি কেবল যে সে-সংবাদই রাখত তাই নয়, সেই সঙ্গে সে তার পায়ের ফোস্কাজনিত কষ্ট সহ্য করেও আমাকে নিয়ে যেতে রাজী হল। অতএব এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল, সঙ্গে দুজন লোক ; বনরক্ষকের কথামত থলে বয়ে আনবার জন্যে এদের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

রেস্ট হাউসের বারান্দা থেকেই পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে। বনরক্ষকের নেতৃত্বে এই পাহাড় বেয়ে কয়েকশো গজ নেমে যেতেই পাহাড়ের মুখোমুখি ফুট খানেক চওড়া 'ঘুরালে'র যাতায়াতের পথের ওপর পেঁছিলাম। এখন আমিই আগে আগে চলতে থাকলাম আর এভাবে প্রায় আধমাইল দক্ষিণে চলার পর এক শৈলশিরায় উঠে আড়াআড়িভাবে এক গভীর গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে একটা 'ঘুরাল'কে দেখলাম ; খাতের অন্যপাশে একটা খাড়াই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে আছে ; এই অভ্যেসটা ছাগল জাতীর প্রাণী যথা থর, আইবেক্স এবং মারকর সবারই আছে। গলার সাদা চক্করের মতো দাগ দেখেই মনে হল যে এটা পুরুষ 'ঘুরাল'। আমাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান দু'শো গজেরও কিছু বেশি। এখন আমি কেবলমাত্র আমার লোকজনদের জন্যে মাংস নেব তাই নয়, সেই সঙ্গে

আমার নতুন রাইফেলটার কার্যক্ষমতাও পরীক্ষিত হবে। সুতরাং শুয়ে পড়ে, দু'শো গজের নিশানা ঠিক করে, ঠিকমত নির্দিষ্ট লক্ষে গুলি ছুঁড়লাম। গুলি লেগে ঘুরাল'টা যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল ; সৌভাগ্য যে ঠিক নিচেকার কয়েকশো ফুট গভীর খাতে পড়ে নি। অন্য একটা 'ঘুরাল', যাকে এতক্ষণ দেখতে পাই নি, তখনি খাতের অন্য দিক থেকে একটা ছোট বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এল, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কয়েকবার দেখে নিয়ে পাহাড়ের গা ঘে'ষে চলে গেল।

বনরক্ষক এবং আমি সিগারেট ধরিয়ে সঙ্গের দুজনকে পাঠালাম থলিটায় শিকার ভরে আনতে। ভাল্লুকের চর্বির ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বনরক্ষককে 'ঘুরালে'র চামড়া ও কিছুটা মাংস দেওয়া হবে জেনে সে বেশ খুশি হল ; সে বলল যে, চামড়া দিয়ে সে তার বাবার জন্যে একটা আসন করে দেবে, কারণ বার্ধক্য আর বাতের জন্যে তাকে সারাদিন রোদে পড়ে থাকতে হয়।

৬

পরদিন ভোরে উপত্যকায় পে'ছে, আমার সন্দেহই সত্য তার প্রমাণ পেলাম ; বাঘটা আর তার মড়ির কাছে ফিরে আসবে না। কিন্তু আসবে ভাল্লুকরা। তিনটে ভাল্লুক মিলে কয়েকটা হাড় ছাড়া কিছুই ফেলে যায় নি ; আর সেই ভুক্তাবশেষের মধ্যেও একাকী রাজা শকুন সযত্নে খু'জছে আহার্য।

তখনো বেলা বাড়ে নি ; বাঘটা যে পথে আগের দিন গেছে, সেই পথে পাহাড়ে উঠে, শৈলশিরা ধরে এগিয়ে লোহারঘাট রোড বরাবর নেমে গেলাম, মানুষখেকো চিতাটা কোন পথে গেছে তার অনুসন্ধানে। দুপুরে রেস্ট হাউসে ফিরতেই বাঘের অন্য একটা শিকারের খবর পেলাম। আমার সংবাদদাতা একজন বুদ্ধিমান যুবক ; সে আলমোড়ায় একটা মামলায় হাজিরা দেবার জন্যে যাচ্ছিল এবং তার হাতে সময় না থাকায়, বাঘটাকে যেখানে গরু মারতে দেখেছিল, সেখানে আমার সঙ্গে যেতে পারল না, বারান্দার মেঝেতে কাঠকয়লা দিয়ে এ'কে জায়গাটা কোথায়, তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। সকালের আর দুপুরের খাওয়া একসঙ্গে সেরে আমি মড়িটাকে খু'জতে বেরিয়ে পড়লাম ; যুবকটির আঁকা স্কেচটা যদি ঠিক ঠিক হয়, তবে গতকাল আমি যেখানে বাঘটাকে গুলি করেছিলাম, এ-জায়গাটা তা থেকে মাইল পাঁচেকের মধ্যেই হবে। সেখানে পে'ছে দেখলাম যে বাঘটা মূল উপত্যকা বরাবর নদী ধরে এসে নদীর ধারে যে গরুগুলো চরছিল, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ; নরম মাটির অবস্থা দেখে বোঝা যায় বাঘটা যে গরুটা বাছাই করেছিল তাকে কাবু করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। একটা ছ'শো থেকে সাতশো পাউণ্ড ওজনের বিরাট ও শক্তিশালী জন্তুকে মারা খুবই কষ্টসাধ্য আর বাঘকে এই জাতীয় পরিশ্রমের পর দম নিতে

হয়। এবারে অবশ্য, বাঘটা, মারবার পরই গরুটাকে তুলে নিয়ে গেছে; রক্তের চিহ্ন না-থাকায় তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং নদী পার হয়ে ও পাহাড়ের নিচে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছে।

গতকাল বাঘটা যেখানে মেরেছিল, সেখানেই তার মড়িটাকে ঢেকে রেখেছিল; কিন্তু আজ দেখা গেল মড়িটাকে মারবার জায়গা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে নেওয়াই হল তার উদ্দেশ্য। গরুটাকে যে পথে টেনে নিয়ে গেছে তারই অনুসরণে আমি প্রায় দু'মাইল বা তারও বেশি ঘন বনের মধ্যে দিয়ে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠে গেলাম। পাহাড়ের মাথার প্রায় দু'শো গজ নিচে দুটো ওক গাছের চারার মধ্যে গরুটার পেছনের একটা পা দেখি আটকে আছে; পা-টা দুটো গাছের মধ্যে আটকানো অবস্থায় ফেলে রেখে বাকি অংশ প্রচণ্ড ঝটকায় ছিঁড়ে নিয়ে সে পাহাড়ের ওপর দিকে চলে গেছে। পাহাড়ের মাথাটায়, যেখানে বাঘটা তার মড়ি নিয়ে উঠে এসেছে, সেই সমতলে দু' বা তিন ফুট জায়গা জুড়ে বেড়ে উঠেছে ওকের বনানী। এই গাছগুলোর নিচে কোনো ঝোপঝাড় বা লুকোবার জায়গা নেই; বাঘটা কোনো রকম লুকোবার চেষ্টা না করেই এখানে মড়িটাকে ফেলে রেখে গেছে।

শুধুমাত্র আমার রাইফেলটা আর সামান্য কয়েকটা কার্তুজ সঙ্গে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে, হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার দাগ অনুসরণ করে এসেছি। তা সত্ত্বেও যখন আমি পাহাড়টার মাথায় পেঁছিলাম তখন আমার জামা ভিজে গেছে ঘামে আর গলা শুকনো। এ-কারণেই আমি অনুমান করতে পারি যে বাঘটার কি পরিমাণ তেষ্টা পেয়েছিল এবং তা মেটাতে আগ্রহ জেগেছিল। আমার নিজেরও তেষ্টা মেটাবার প্রয়োজন, তাই কাছাকাছি কোথাও জলের সন্ধানে বেরুলাম, জানতাম, সেখানে বাঘের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা আছে। যে খাতে আমি ভাল্লুক মেরেছিলাম, সেটা ডানদিকে আধ মাইল দূরত্বে আর সেখানে জলও আছে; কিন্তু বাঁ-দিকে কাছাকাছি আর একটা খাত আছে, সেখানেই প্রথম চেষ্টা করা স্থির করলাম।

আমি খাদটা ধরে আধমাইলেরও বেশি নেমে গিয়ে যে জায়গায় এলাম, সেখানে খাদটা সরু হয়ে দুধারে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। একটা প্রকান্ড শিলাখণ্ড ঘুরে যেতেই দেখি আমার সামনেই বিশ গজ দূরে বাঘটা শুয়ে আছে। এখানে একটা ছোট জলা বর্তমান এবং ওই জলা ও দক্ষিণদিকের পাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ বালির চড়ার ওপরে ছিল বাঘটা। খাদটা এখানে সরাসরি ডান দিকে বেঁকে গেছে, এবং বাঘটার একাংশ ছিল আমার দিকের বাঁকে আর অন্য অংশ ওধারে বেঁকে। জলাটার দিকে পেছন ফিরে সে বাঁ কাতে শুয়েছিল; আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তার লেজ ও পেছনের পায়ের অংশবিশেষ। আমার আর ঘুমন্ত জানোয়ারের মধ্যে, পড়ে আছে একগাদা শুকনো ডালপালা;

কিছুদিন আগে মোষকে খাওয়াবার জন্যে ওপরের গাছ থেকে এগুলো পাড়া হয়েছিল। কোনো শব্দ না করে এই বাধা অতিক্রম করে যাওয়া যেমন দুঃসাধ্য, নুড়ি পাথরের ছোট ছোট ধস না নামিয়ে দুধারের কোনো একটা খাড়াই ধরে যাওয়া তেমনি অসম্ভব। সুতরাং বাঘটা যতক্ষণ না আমাকে গুলি করতে সুযোগ দেয় ততক্ষণ বসে থাকাই ছিল একমাত্র পন্থা।

কঠিন পরিশ্রমের পর প্রাণভরে জল খেয়ে বাঘটা নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল আর আধঘণ্টার মধ্যে সে কিছুমাত্র নড়াচড়া করে নি। তারপর সে ডানদিকে ফিরে শুতেই তার পায়ের আরো খানিকটা অংশ নজরে আসে। এইভাবেই কয়েকমিনিট শুয়ে থেকে সে উঠে দাঁড়াল আর বাঁকটা থেকে সরে গেল। ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে আমি সে আবার দেখা দেবে বলে বসে রইলাম, কারণ তার মড়িটা রয়েছে আমারই পেছনে পাহাড়ের ওপরে। মিনিট কয়েক কেটে যেতেই শুনলাম প্রায় একশো গজ দূরে একটা কাকার পরিত্রাহি চিৎকারে পাহাড় কাঁপিয়ে চলে গেল আর তার কিছু পরেই একটা সম্বর উঠল ডেকে। বাঘটা চলে গিয়েছিল ; কিন্তু কেন জানি না ; কারণ একটা বাঘের যতটা দৈহিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, ততটা সে করেছে আর আমার গন্ধ যে পেয়েছিল, তাও নয়, কারণ বাঘের কোন ঘ্রাণশক্তি থাকে না। যা হ'ক, এটা নিয়ে এখন ভাবার কারণ নেই, কারণ বাঘটা যখন তার মড়িকে পাহাড়ের মাথায় টেনে তুলতে এত কষ্ট করেছে, তখন সে মড়ির কাছে ফিরবেই আর আমি তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে হাজির থাকব। বাঘটা যে জলা থেকে জল পান করেছিল তা বরফ-ঠাণ্ডা ; আর আমিও তৃষ্ণা মিটিয়ে, অনেকক্ষণ থামিয়ে রাখা ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলাম।

মড়িটার দক্ষিণে, দশ গজ পূবে একটা ওক গাছের ওপর আমি যখন আরামে বসলাম তখন সূর্য প্রায় অস্তাচলে। বাঘটা পশ্চিম দিক থেকে পাহাড়ে উঠে আসবে এবং বাঘ ও আমার মাঝখানে সরাসরি মড়িটাকে রাখা সুবিবেচনার পরিচয় নয় কারণ বাঘের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। গাছের ওপরে আমার বসবার জায়গাটা থেকে পরিষ্কারভাবে আমি উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং ওপারে পাহাড়টাও। আর যখন আগুনের গোলার মত অস্তগামী সূর্য পৃথিবীর কিনারায় বসে পৃথিবীকে রক্তরঙে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল ঠিক তখনই একটা সম্বর আমার নিচে উপত্যকার দিক থেকে ডেকে উঠল। বাঘটা এবার চলতে শুরু করেছিল ; মড়ির কাছে পৌঁছতে তার অনেকটা সময় লাগবে আর তখনো নির্ভুলভাবে গুলি করবার মত যথেষ্ট আলো থাকবে।

অগ্নিগোলক দিকচক্রবালের নিচে নেমে গেল ; পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল আভা ; গোধূলি ছেড়ে দিল অন্ধকারের জন্যে পথ ; আর নিস্তব্ধ হয়ে গেল জঙ্গলের সমস্ত কিছু। চাঁদ ছিল তৃতীয় কলায়, কিন্তু হিমালয়ে যেহেতু তারার

আলো সর্বাধিক উজ্জ্বল, সেহেতু অজস্র আলোয় মড়ির সাদা রঙও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। মড়ির মাথাটা ছিল আমার দিকে ; এখন যদি বাঘটা আসে আর পায়ের দিক থেকে খেতে আরম্ভ করে, আমি তাকে দেখতে পাব না ; কিন্তু আমি যদি সাদা গরুটার দিকে কাত হয়ে বন্দুক তুলে ট্রিগার টিপি, যেহেতু মড়িটা আমার দৃষ্টির অগোচর, সেকারণেই বাঘের গায়ে গুলি লাগবার সম্ভাবনা আধাআধি। কিন্তু এটা কোনো নরখাদক নয় যে, যে-কোনো অবস্থাতেই গুলি করা যায়। এই মন্দিরের বাঘটি কোনো মানুষকে জখম করে নি ; আর যদিও সে পরপর চারদিনে চারটে গরু মেরেছে, তবু জঙ্গলের আইনের রীতিবিরুদ্ধ কোনো অপরাধই সে করে নি। বাঘটাকে একেবারে খতম করে ফেললে, যাদের গরু নিহত হয়েছে তারা হয়তো উপকৃত হবে ; কিন্তু রাত্রে অনিশ্চিতভাবে গুলি চালালে তার আহত হবার সম্ভাবনাই থাকে শুধু। আহতকে ফেলে রেখে আসতে হয় আর সে যন্ত্রণা ভোগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যদি বে-তল্লাসী ছেড়ে আসা হয়, পরিণামে সে মানুষখেকো হয়, তাই কোনো পরিস্থিতিতেই এ কাজ ন্যায়সংগত হয় না।

পূবে আলো ফুটছিল, কেননা গাছের গুঁড়িগুলো অস্পষ্ট ছায়া ছড়াতে সুরু করছিল আর তারপর, উন্মুক্ত অরণ্য খণ্ডগুলিতে জ্যোৎস্নায় বান ডাকিয়ে চাঁদ উঠল। তখন, সেই সময়ে, বাঘ এল। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু জানছিলাম বাঘ এসেছে কেননা আঁচ করতে পারছিলাম, অনুভবে জানছিলাম তার উপস্থিতি। পাহাড়ের মাথার কিনারার ওপরে শুধু চোখ দুটি আর মাথার ওপরটা জাগিয়ে মড়ির ওপাশে দূরে গুঁড়ি মেরে বসে ও কি আমাকে লক্ষ করছে ? না, তা সম্ভব নয়। কেননা যখন থেকে স্ব-স্থানে আরাম করে গুছিয়ে বসেছি, তখন থেকেই আমি গাছের সঙ্গে এক হয়ে আছি আর জঙ্গলে বাঘরা যে গাছের কাছে যায়, কোনো কারণ না থাকলে তার প্রতিটি খুঁটিয়ে দেখে না। আর তবুও বাঘটা এখন এখানে, আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার স্পষ্ট দেখার মত যথেষ্ট আলো এখন ফুটেছে, এবং অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে আমার সামনের জমিটি খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর, পেছনে চেয়ে দেখব বলে যেমন ডানদিকে মাথা ফিরিয়েছি, দেখলাম বাঘ। মড়ির মুখোমুখি এক খণ্ড চাঁদের আলোয় বসে আছে ও দাবনায় ভর দিয়ে, মাথা ফিরিয়ে, আমার দিকে চেয়ে। আমি নিচে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখল যখন, ও কানদুটো ছড়াল। যখন আমি আর নড়াচড়া করলাম না, কানদুটো আগের মত খাড়া হয়ে গেল। আমি কল্পনা করতে পারলাম ওর স্বগতোক্তি 'বেশ, এখন তো আমাকে দেখে ফেলেছ। এখন কি করতে চাও সে বিষয়ে ?' অতি সামান্যই সাধ্য ছিল আমার কেননা একটি গুলি ছুঁড়তে হলেও আমাকে অর্ধচক্রাকার ঘুরে যেতে হয় এবং বাঘটিকে ঘাবড়ে না দিলে তা করা সম্ভব নয়, ও পনের ফুট তফাত পাল্লা থেকে আমার দিকে চেয়ে আছে। তবে আমার বাঁ কাঁধ থেকে

একটি গুলি মারবার একটি সম্ভাব্য সুযোগ মাত্র আছে এবং তাই করাই স্থির করলাম আমি। রাইফেলটা রাখা ছিল আমার হাঁটুতে, নলের মুখ ছিল বাঁ দিকে তাক-করা। যেমন ওটা তুলে ডানদিকে ঘোরাতে শুরু করেছি, বাঘটা মাথা নামিয়ে নিয়ে আবার কান দুটো ছড়াল। আমি যতক্ষণ নিশ্চল থাকলাম, ও ওই ভাবেই থেকে গেল কিন্তু যে মুহূর্তে আবার আমি রাইফেল ঘোরাতে শুরু করেছি, ও উঠে পড়ল, পেছনের ছায়ায় ঢুকে গেল।

বাস্ এই তো ঘটনা, বাঘটা আর একবার নিশ্চিতভাবে জিতে গেল। যতক্ষণ আমি গাছে বসে থাকব, সে আর আসবে না, কিন্তু যদি আমি চলে যাই সে হয়তো ফিরে মড়িটাকে সরিয়ে নিতে পারে; আর পুরো গরুটাকে যখন সে একরাতে শেষ করতে পারবে না, তখন পরের দিন হয়তো আর একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

এখন আমার সামনে প্রশ্ন হল রাতটা কোথায় কাটাই। ইতিমধ্যে এই দিনে আমি কুড়ি মাইলের মত রাস্তা হেঁটেছি; এখন আবার বনের মধ্যে দিয়ে কুড়ি মাইল হেঁটে রেস্ট হাউসে পেঁছবার চিন্তা আমাকে উৎসাহিত করল না। অন্য কোনো জায়গা হলে আমি মড়ি থেকে দু'-তিনশো গজ দূরে চলে গিয়ে নিশ্চিন্তে মাটিতে ঘুমোতে পারতাম; কিন্তু এই অঞ্চলটাতে রয়েছে একটা মানুষখেকো চিতা এবং মানুষখেকো চিতারা রাত্রেই শিকার করে। সন্ধেবেলায় গাছের ওপরে বসে থাকার সময়েই দূর থেকে ভেসে আসা গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ পেয়েছিলাম; হয় কোনো গ্রাম বা কোনো বাথান থেকে সে শব্দটা আসছিল। আমি শব্দটার সঠিক হদিশ রেখেছিলাম; এখন কোথা থেকে তা আসছিল তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। হিমালয়-অঞ্চলে গরুচুরির ব্যাপারটা অজানা, এবং কুমায়ুনের সর্বত্র গরুচরাবার মাঠের কাছেই জঙ্গলে থাকে সার্বজনীন বাথান। শ্রুত ঘণ্টাধ্বনির অনুসন্ধানে আমি এরকম একটা বাথনই পেয়ে গেলাম; একটা খোলা জায়গার চারপাশে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে শ'খানেক গরু রাখা। জঙ্গলের গভীরে এরকম একটা অরক্ষিত বাথান পাহাড়ী মানুষদের সততারই প্রমাণ দেয়। তাছাড়া এটিও প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমি আসার আগে পর্যন্ত দাবিধুরা এলাকায় গরু কখনো বাঘের হাতে উৎপীড়িত হয় নি।

রাত্রে জঙ্গলের সমস্ত পশুই সন্দেহপ্রবণ, আর যদি আমি রাত্রে এই বাথানের বাসিন্দাদের আশ্রয়ে রাত কাটাতে চাই, তবে তাদের সহজাত সন্দেহকে কাটাতে হবে। কালাধুঙ্গিতে আমাদের গাঁয়ের প্রজারা প্রায় ন'শ গরু-মোষ রাখত, আর খুব ছোটবেলা থেকে সেই গরু-মোষের কাছাকাছি থাকায়, তারা কি-ভাষা বোঝে আমি জানি। ধীরপদে হাঁটতে হাঁটতে এবং পশুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বাথানের দিকে এগোলাম, আর বেড়ার ধারে পৌঁছে সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে পড়লাম ধূমপানের জন্যে। আমি যে-জায়গাটায় বসেছিলাম,

তার কাছেই কতকগ্নলো গর্ন দাঁড়িয়ে ছিল ; তার মধ্যে থেকে একটা এগিয়ে এসে খ্নটোর ঘেরের বেড়ার মধ্যে দিয়ে মাথাটা বের করে আমার মাথার পেছনটা চাটতে আরম্ভ করল। আচরণটি বন্ধ্নজনোচিত, তবে তা ভিজিয়ে দিচ্ছেও বটে আর এখানে এই আট হাজার ফুট উচ্চতায় রাত্রিগ্নলি তুহিন। আমার সিগারেট শেষ করে রাইফেলের ভার নামালাম আর সেটা খড়ে ঢেকে বেড়া টপকালাম।

সাবধানে ঘ্নমোবার জায়গা-বাছাইকরা দরকার হয়েছিল, কেন না রাতে যদি কোনো বিপদ ঘটে আর জন্তুগ্নলো হ্নড়োহ্নড়ি করতে শ্নর্ন করে, সে অবস্থায় বাথানের মধ্যে মাটিতে শ্নয়ে থাকা বিপজ্জনক হবে। বাথানের চালার প্রায় মাঝামাঝি, যেটা দিয়ে প্রয়োজনে আমি উপরে উঠে যেতে পারি, এমন একটা খ্নটির কাছেই, দ্নটো ঘ্নমন্ত গর্নর মাঝখানে একট্ন খালি জায়গা ছিল। কাত হয়ে শ্নয়ে থাকা পশ্নগ্নলোকে ডিঙিয়ে এবং দাঁড়ানো গর্নগ্নলোর মাথা সরিয়ে পেরিয়ে এসে, পরস্পর পেছন দিকে ফিরে শ্নয়ে থাকা দ্নটোর মাঝখানে শ্নয়ে পড়লাম। সমস্ত রাত কোনো বিপদের আভাস ছিল না, স্নতরাং খ্নটি বেয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথাই ওঠে না ; গর্নগ্নলোর গরম শরীর রাত্রের ঠাণ্ডা আটকাল, আর স্বাস্থ্যবান দলটির স্নিগ্ধ মধ্নর গন্ধে আমি ঘ্নমোলাম প্নথিবীর অপার শান্তি নিয়ে ; বাঘ এবং মান্নষখেকো চিতাও তার বহির্ভূত নয়।

পরদিন সকালে তখন সবে স্নর্য উঠছে ; গলার স্বর শ্ননে জেগে উঠে দেখলাম তিনজন লোক, হাতে তাদের দ্নধ দ্নইবার বালতি, বেড়ার খ্নটির ফাঁক দিয়ে আমার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে। গতকাল প্রাতরাশের পর একমাত্র বাঘের জলায় জলপান করা ছাড়া অন্য কিছ্নই আমার গলা দিয়ে নামে নি ; গর্নগ্নলির মধ্যে ঘ্নমন্ত অবস্থায় আমাকে আবিষ্কার করার বিস্ময়টা কেটে যেতেই লোকগ্নলো আমাকে গরম দ্নধ খেতে দিল আর আমি তা সাদরে গ্রহণ করলাম। তাদের সঙ্গে তাদের গ্রামে গিয়ে খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, বাসস্থান ও পানীয়ের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে, স্নান ও আহারের জন্যে রেস্ট হাউসে ফিরে যাওয়ার আগে, মড়িটাকে বাঘটা কোথায় নিয়ে গেল দেখতে বের্নলাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, আমি যেখানে ফেলে গিয়েছিলাম, মড়িটা সেখানেই রয়েছে ; শকুন ও সোনালী মাথা ঈগলদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি সেটাকে ডালপালা দিয়ে ঢাকা দিয়ে, রেস্ট হাউসে ফিরে গেলাম।

মনে হয়, ভারতে ছাড়া প্নথিবীর অন্য কোথাও ভৃত্যেরা তাদের প্রভুদের খেয়ালীপনাকে এ-পরিমাণ সহ্য করে না। চব্বিশ ঘণ্টার পরে যখন রেস্ট হাউসে ফিরলাম, কোনো বিস্ময় বা কোনো প্রশ্ন উচ্চারিত হল না। স্নানের গরম জল তৈরি, পরিষ্কার জামাকাপড় বের করে রাখা ; আর খ্নব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি পরিজ, ডিমের স্ক্র্যাম্বেল্, গরম চাপাটি ও মধ্ন এবং এক

পেয়ালা চা নিয়ে প্রাতরাশে বসে পড়লাম ; মধুটি বৃদ্ধ পুরোহিতের উপহার। প্রাতরাশ শেষ করে আমি রেস্ট হাউসের সামনের ঘাসের ওপর বসে পড়লাম অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ এবং পরিকল্পনা করতে। নৈনিতালে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আর সেই একটিমাত্র উদ্দেশ্য হল পানারের মানুষখেকো চিতাটাকে মারতে চেষ্টা করা ; আর মন্দিরের চাতাল থেকে যে-রাত্রে সে রাখালটাকে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল, তারপর থেকে তার সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায় নি। পুরোহিত, বেনিয়া আর নিকট ও দূরের গ্রামের সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে কখনও কখনও দীর্ঘকাল মানুষখেকোটা যেন পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর তাদের ধারণায় এখন এসেছে সেই কাল কিন্তু কেউই বলতে পারে নি যে কতদিন এইকাল স্থায়ী হবে। যে-এলাকায় এই মানুষখেকোটা বিচরণ করত, সেটা বিস্তীর্ণ এবং সম্ভবত এখানে আরো দশ-কুড়িটা চিতা বর্তমান। সেই এলাকায় একটি বিশেষ চিতাকে, যে মানুষ মারা বন্ধ করেছে, কোথায় খুঁজতে হবে না জেনে, খুঁজে বার করে গুলি করার আশা অত্যন্ত কম।

মানুষখেকো প্রসঙ্গে আমার অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল ; দাবিধুরায় আমি আরো বেশি দিন থাকলে কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মন্দিরের বাঘের প্রশ্নটি থেকেই গেল। এই বাঘটিকে মারবার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব আমার আছে বলে আমি মনে করি না ; কিন্তু ভাবি এবং বেশ গভীরভাবেই ভেবেছিলাম যে আমার তাকে অনুসরণই, তাকে বেশি করে গরু মারতে উস্কানি দিয়েছিল, অন্যথায় সে এটা করত না। আমার দাবিধুরায় পদার্পণের দিনই কেন একটা পুরুষ বাঘ গরু মারতে আরম্ভ করেছিল তা বলা সম্ভব নয় আর আমি চলে গেলে সে থামবে কিনা তাও দেখা দরকার। যাই হ'ক, তাকে মারবার চেষ্টা আমি সর্বান্তঃকরণে করেছিলাম ; তার কৃত ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে, আমার আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী ক্ষতিপূরণও দিয়েছি ; আর সে আমাকে দিয়েছে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক এক জঙ্গলের অভিজ্ঞতা, যা আমার ইতিপূর্বে ছিল না। সুতরাং গত চারদিনে আমরা যে উত্তেজনাময় খেলা খেলেছি এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার পরাজয় ঘটেছে, তার জন্যে তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এই চারদিন আমার চূড়ান্ত পরিশ্রমে কেটেছে ; সুতরাং আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল সকাল সকালই নৈনিতাল ফেরার পথে রওনা হব। সবেমাত্র এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছি, এমন সময় শুনলাম পেছন থেকে এক কণ্ঠস্বর, 'সেলাম সাহেব, কাল বাঘটা আমার একটা গরু মেরেছে, এই খবরটা তোমাকে দিতে এলাম।' বাঘটা মারবার আর একটা সুযোগ, কিন্তু আমি সার্থক হই বা না হই, কাল সকালে আমার যাত্রার পরিকল্পনায় স্থিরই রইলাম।

৭

মানুষ আর ভাল্লুকের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে বাঘটা ঠাঁই বদল করেছে ; গতকাল সন্ধ্যায় আমি তার জন্যে যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে দাবিধূরা পর্বতের পূর্বদিকে এই শেষ হত্যাটি সংঘটিত হয়েছে। জমিটা এখানে অসমান, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, এলোমেলো ছড়ানো কয়েকটা গাছ ; চুকরদের (পাহাড়ী চড়াই পাখি) পক্ষে আদর্শ স্থান, কিন্তু বাঘের খোঁজ পাওয়া এখানে, আমার ধারণা, একেবারেই অকল্পনীয়।

পাহাড়ের মুখে আড়াআড়িভাবে রয়েছে একটা অগভীর নাবাল জমি। ঘন ঝোপঝাড়ের সারি আর জায়গায় জায়গায় ছোট ঘাসের টুকরো রয়েছে এই জমিটায়। এইগুলোর মধ্যে একটা ঝোপের কিনারে গরুটাকে মারা হয়েছে, তারপর ঝোপের দিকে কয়েক গজ টেনে নিয়ে গিয়ে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা আছে। বিপরীত দিকে অথবা মড়িটার মাঠের ধারের পাহাড়ের ঢালুতে একটা বড় ওক গাছ দাঁড়িয়ে। চারিদিকের একশো গজের মধ্যে ওই একটি মাত্র গাছ ; ঠিক করলাম এটাতেই বসব।

আমার লোকেরা যখন চায়ের জন্যে জল গরম করছিল, আমি তখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, যদি পথেই বাঘটাকে গুলি করার সুযোগ মেলে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এই নাবাল জমির কোথাও বাঘটা শুয়ে আছে কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রত্যেক ফুট খুঁজেও তার চিহ্নমাত্র পেলাম না।

যে গাছটা আমাকে বসবার জায়গা দেবে সেটা ছিল মাঠের দিকে ঝুঁকে পড়া। প্রায়ই ডাল কাটার জন্যে গাছের গুঁড়ির ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট ডালপালা হয়েছে, এতে করে যদিও গাছে ওঠা সহজ হল কিন্তু গাছের গুঁড়িটা অনেকখানি নজর আটকে দিল। কুড়ি ফুট ওপরে একটি মাত্র বড় ডাল মাঠের ওপরে এগিয়ে ছিল, গাছের ওপরে আমার একমাত্র বসবার আসন হিসাবে কিন্তু না সেটা আরামপ্রদ, না সেখানে ওঠা সহজ। বিকেল চারটের সময় পাহাড়ের আরো ওপরে একটা গ্রামে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমার লোকদের পাঠিয়ে দিলাম ; কারণ সূর্য ডুবে যাবার পর আর আমার বসার ইচ্ছে ছিল না।

আমি আগেই বলেছি, মড়িটা আমার থেকে দশ গজ দূরে খোলা জায়গায় পড়ে ছিল, আর তার পেছন দিকটা ছিল একটা ঘন ঝোপ থেকে প্রায় গজখানেক দূরে। একঘণ্টা ধরে তাক করে আমি অনড়ভাবে বসেছিলাম আর আমার ডানদিকের আসেলু ঝোপ থেকে কতকগুলো লাল ঝুঁটি বুলবুলি পাখিকে ফল খেতে দেখছিলাম ; দৃষ্টি ফিরিয়ে মড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলাম ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে বাঘের মাথাটা দেখা দিয়েছে। সে শুয়ে ছিল নিশ্চয়ই কারণ তার মাথাটা ছিল মাটিতে ছোঁয়ানো আর দৃষ্টি ছিল আমারই দিকে নিবদ্ধ। এখন তার একটা থাবা এগিয়ে এল, পরে অন্যটি, এবং এরপরই

অত্যন্ত ধীরে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বাঘটা নিজেকে মড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এখানে সে কয়েক মিনিট নিঃসাড়ে পড়ে রইল। তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মুখ দিয়ে সে মড়িরটার লেজের একটা টুকরো কামড়ে নিল এবং তা একপাশে রেখে খেতে শুরু করল। তিনদিন আগে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াইয়ের পর থেকে কিছু না খাওয়ায় সে ক্ষুধার্ত ছিল, এবং মানুষ যেমন করে আপেল খায় তেমন করে চামড়া বাদ না দিয়েই মড়িটার পেছনের দিক থেকে বড় বড় কামড়ে মাংস খেতে থাকল।

আমার রাইফেলটার মুখ বাঘের দিকে, ওটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রাখা। এখন ওটাকে কাঁধে তুলে নেওয়া আমার কাজ। এক মুহূর্তের জন্যে যখনই সে আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেবে, তখনই আমি তা করার সুযোগ পেতে পারি। কিন্তু বাঘটা, মনে হল তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন, কারণ আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে স্থিরভাবে কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সে প্রায় পনের কুড়ি পাউণ্ড মাংস পেটে পুরেছে, যখন বুলবুল পাখিরা আসেলু ঝোপ পরিত্যাগ করেছে আর দুটো কালোকণ্ঠী নীলকণ্ঠ এসে মিলেছে তাদের সঙ্গে এবং সকলে মিলে তার পেছনে কিচিরমিচির শুরু করেছে, আমি ভাবলাম, এই হল যথার্থ সময়। আমি যদি আস্তে আস্তে রাইফেলটা তুলি তাহলে সম্ভবত সে এটা লক্ষ করবে না ; সুতরাং পাখিরা যখন কিচিরমিচির চরমে তুলল, আমি কাজ শুরু করলাম। আমি নলটা সম্ভবত ইঞ্চি ছয়েকের মত তুলেছি অমনি বাঘটা যেন জোরাল স্প্রিং-এর টানে পিছিয়ে গেল। রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে কনুইটা হাঁটুর ওপরে রেখে আমি এখন, বাঘটা দ্বিতীয়বার মাথা বের করবে বলে অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং নিশ্চিত ভেবেছিলাম যে সে সেটা করবেই। কয়েক মিনিট কাটার পরেই আমি বাঘের শব্দ পেলাম। সে ঝোপটা ঘুরে আমার পেছন দিয়ে এসে আমার গাছটাকে আঁচড়াতে শুরু করল আর ওদিকের গুঁড়িতে ছোট ছোট ডালপালা ঘন হয়ে জন্মাবার ফলে তাকে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হল। আনন্দের প্রবল উল্লাসে বাঘটা বারংবার গাছটা আঁচড়ে চলেছে আপন শক্তিমত্তায় আর আমি তখন গাছের ডালে বসে নিঃশব্দে দুলে দুলে হাসতে থাকলাম।

আমি জানি যে কাক ও বাঁদরদের কৌতুকবোধ আছে, কিন্তু সেদিনের আগে পর্যন্ত জানতে পারি নি যে বাঘও উক্তবোধ সম্পন্ন। ওই বিশেষ বাঘটার যে বরাতজোর আর বেহায়াপনা দেখলাম, তা কোনো জানোয়ারের থাকে বলে জানতাম না। পাঁচ দিনে সে পাঁচটা গরু মেরেছে, যার মধ্যে চারটেই প্রকাশ্য দিবালোকে। এই পাঁচ দিনে আমি তাকে দেখেছিলাম আটবার আর চারটে সুযোগে আমি তার ওপর গুলি চালিয়েছিলাম। আর এখন, আমার দিকে আধঘণ্টা তাকিয়ে থেকে, আর সে-অবস্থায় খেয়ে নিয়ে গরগর শব্দ করে

আমাকে অবজ্ঞা দেখাবার জন্যেই আমি যে-গাছটায় বসে ছিলাম সেটা আঁচড়াচ্ছে।

বাঘটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত আমাকে বলেছিলেন : 'আপনি বাঘটাকে মারতে চেষ্টা করতে পারেন সাহেব আমার কিছু আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি বা অন্য যে কেউই হ'ক না কেউই মারতে সমর্থ হবেন না।' বাঘটা এখন, নিজেও, পুরোহিত যা বলেছিলেন তাকেই অনুমোদন করছে। যাই হ'ক আমাদের একজনও চোট খেল না, উত্তেজক এই খেলার শেষ চালটা চালল বাঘটা কিন্তু আমি ওকে শেষ হাসিটা হাসবার আমোদটা পেতে দিতে চাচ্ছি না। রাইফেলটাকে শুইয়ে রেখে হাতদুটো মুঠো করে আমি তার আঁচড়ানো না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম এবং তার পরে গলা ছেড়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলাম, আর তা প্রতিধ্বনিত হল পাহাড়ে পাহাড়ে, ফলে তাকে ছুটতে হল পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে; নিচের গ্রাম থেকে আমার লোকদের নিয়ে এল ছুটিয়ে। 'আমরা বাঘটাকে ল্যাজ উঁচু করে দৌড়ে যেতে দেখেছি' পেঁাছে লোকেরা বলল, 'আর দেখুন, সে গাছটার কি অবস্থা করেছে।'

পরদিন সকালে দাবিধুরায় আমার বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানালাম আর আশ্বস্ত করলাম যে যদি কখনও মানুষখেকো আবার ক্রিয়াকলাপ চালায় আমি ফিরে আসব।

মানুষখেকো বাঘ মারতে আমি পর পর কয়েকবার দাবিধুরায় গেছি, এবং কখনো শুনি নি মন্দিরের বাঘটাকে কেউ মারতে পেরেছে বলে। সুতরাং ধারণা যে, কালের পূর্ণতায় এই বৃদ্ধ যোদ্ধা একজন বুড়ো সৈনিকের মতই মুছে গেছে।

২

মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো

নৈনিতালের উত্তর, উত্তর-পূবের আঠার মাইল দূরে একটি পাহাড় আছে। তা আট হাজার ফুট উঁচু এবং পূবে-পশ্চিমে বার থেকে পনের মাইল লম্বা। পাহাড়টির পশ্চিম প্রান্ত উঠে গেছে খাড়া, আর এই প্রান্তের কাছেই আছে মুক্তেশ্বর ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। সেখানে ভারতের গৃহপালিত পশুদের রোগের সঙ্গে লড়বার জন্য জীবাণু ও টিকা তৈরি হয়। ল্যাবরেটরি ও কর্মী আবাস-গৃহগুলি পাহাড়ের উত্তর দিকে এবং এই জায়গাটির মুখোমুখি যে নিসর্গ দৃশ্য দেখা যায়, তা তুষারাবৃত হিমালয় গিরিমালার যে-কোনো জায়গা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই পর্বতমালা এবং ভারতের সমভূমির মধ্যবর্তী জায়গায় যত পাহাড় আছে, সবগুলিই পূব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এবং যে-কোনো পাহাড়ের বেশ উঁচু থেকে যতদূর চোখ চলে ততদূর শুধু উত্তরের তুষারপর্বতই নয়, পূব ও পশ্চিমের সব পাহাড় উপত্যকার অবাধ দৃশ্য চোখে পড়ে। যারা মুক্তেশ্বরে থেকেছে তারা দাবি করে এটি কুমায়ুনের সুন্দর-শ্রেষ্ঠ স্থান আর এ জায়গার জলহাওয়ার কোনো জুড়ি নেই।

মুক্তেশ্বরের সুখসুবিধের কথা মানুষ যে রকম উঁচুদরের বলে ভাবে, সেই রকমই মনে হয়েছিল এক বাঘিনীরও। সে ওই ক্ষুদ্র বসতির সংলগ্ন বিস্তৃত অরণ্যে বসবাস শুরু করে। যতদিন না এক শজারুর সঙ্গে সংঘর্ষের দুর্ভাগ্য হয়, ততদিন সে এখানে মহানন্দে সম্বর, কাকার ও বনবরা খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। এই সংঘর্ষে সে একটি চোখ হারায় আর এক থেকে ন ইঞ্চি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্রায় পঞ্চাশটি শজারু-কাঁটা ওর ওপর-পা এবং সামনের ডান পা-র থাবার নিচে

গে'থে যায়। হাড়ে বি'ধে যাবার পর এই কাঁটার অনেকগ্নলো ইংরিজী 'U' অক্ষরের ছাঁদে বে'কে যায়, কাঁটার দ্ব-ম্বখ কাছাকাছি চেপে বসে। সেখান থেকে সে দাঁত দিয়ে কাঁটা বের করার চেষ্টা করে। ফলে সেখানে প্বঁজ-ঘা হয়ে যায় এবং উপোসে ঘা চাটতে-চাটতে সে যে ঘন ঘাসঝোপে শ্বয়েছিল, একটি রমণী সেই বিশেষ ঘাসঝোপটিকে তার গৃহপালিত পশ্বর খাদ্যের জন্যে সেই ঘাস-ঝোপটিকে বেছে নেয়। প্রথমটা বাঘিনীটি ব্যাপারটিকে গ্বর্ত্ব দেয় না কিন্তু ও যেখানে শ্বয়ে আছে, মেয়েটি যখন একেবারে সেই পর্যন্ত ঘাস কেটে ফেলে, বাঘিনী একবার থাবা মারে, ফলে মেয়েটির খ্বলি ভেঙে যায়। মৃত্যু ঘটে তৎক্ষণাৎ, কেননা পরদিন যখন মেয়েটিকে পাওয়া যায় মেয়েটি এক হাতে কাস্তে চেপে ধরে ছিল, তখনি কাটবে বলে আরেক হাতে চেপে ধরে ছিল এক গোছা ঘাস, যখন চোটটা খায়। মেয়েটি যেখানে পড়ে যায় সেখানেই তাকে ফেলে রেখে বাঘিনী খ্বঁড়িয়ে চলে যায় এক মাইলেরও বেশি দ্বরে এবং একটি পতিত গাছের নিচে একটি ছোট গর্তে আশ্রয় নেয়। দ্ব-দিন বাদে এই পতিত গাছটি থেকে জ্বালানী কাঠের টুকরো কেটে নিতে একটি লোক আসে এবং বাঘিনীটি তাকেও মারে। বাঘিনী শ্বয়েছিল গাছটির অপর প্রান্তে। লোকটি গাছের ওপর পড়ে এবং যেহেতু সে তার শার্ট ও কোট খ্বলে ফেলেছিল আর ওকে মারার সময়ে যেহেতু বাঘিনী ওর পিঠে আঁচড়েছিল, লোকটি যখন গাছের গ্বঁড়ির ওপর পড়ে ঝ্বলছিল. ওর শরীর থেকে বেয়ে-নামা রক্তের দৃশ্য দেখে বাঘিনীর প্রথম মনে হয় সে তার ক্ষ্বন্নিবৃত্তি করতে পারে এটা এমন কিছ্ব। সে যাই হ'ক না কেন, লোকটিকে ফেলে চলে যাবার আগে ও পিঠ থেকে অল্প একটু খায়। একদিন বাদে রীতিমত মন ঠিক করে ও তৃতীয় মান্বষটি মারে। কোন উস্কানি ছাড়াই। এরপর থেকে ও পাকাপাকি মান্বষখেকো হয়ে দাঁড়ায়।

ও মান্বষ মারতে শ্বর্ব করার স্বল্প পরেই আমি বাঘিনীটির কথা শ্বনি। যেহেতু ম্বক্তেশ্বরে বেশ কিছ্ব শিকারী ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই বাঘিনীটিকে মারতে আগ্রহীও, বাঘিনীটি তাদেরই দোরগোড়ায় কার্যকলাপ চালাচ্ছিল, সেহেতু সে ব্যাপারে এক বাইরের মান্বষের মাথাগলানো ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় নি। তবে যখন বাঘিনীর নিহত মান্বষের সংখ্যা চব্বিশে পে'ছিল, যখন বসতিতে বসবাসকারী সকল মান্বষ ও প্রতিবেশী গ্রামগ্বলির মান্বষদের জীবন বিপন্ন হল, যখন ইনস্টিটুটের কাজে মন্দা পড়ল, ইনস্টিটুটের ভারপ্রাপ্ত ভেটেরিনারী আধিকারিক তখন আমার সাহায্য চাইবার জন্য সরকারকে অন্বরোধ জানালেন।

আমার যা মনে হয়েছিল, আমার কাজটি খ্বব সহজ হবে না। কেননা নরখাদক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমিত, এ ছাড়াও, যে বিস্তৃত অঞ্চল

জুড়ে বাঘিনী তার কার্যকলাপ চালাচ্ছিল সেটি আমার চেনাজানা নয় এবং কোথায় ওকে খুঁজব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

একটি ভৃত্য এবং এক বাণ্ডিল বিছানা ও একটি সুটকেস বহনকারী দুটি লোককে সঙ্গে নিয়ে আমি দুপুরে নৈনিতাল থেকে রওনা হলাম এবং দশ মাইল হেঁটে রামগড় ডাকবাংলোতে পেঁছিলাম, সেখানে রাতটা কাটালাম। ডাকবাংলোর খানসামা (রাঁধুনী, বোতল ধোয়া এবং হাজার কাজের কাজী) আমার এক বন্ধু এবং যখন শুনল মানুষখেকোটি মারবার প্রচেষ্টায় আমি মুক্তেশ্বরের পথে চলেছি, মুক্তেশ্বরে পেঁছিবার শেষ দু-মাইল বিষয়ে খুব সাবধান হতে হুঁশিয়ার করে দিল ও আমায়। কেননা, ও বলল, পথের ওই অংশটিতে বহু লোক ইদানীং নিহত হয়েছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে আমার পেছন-পেছন আসতে বলে আমার লোকজনকে রেখে এলাম। উন্নত ধরনের বারুদ ব্যবহার করতে হয় এমন একটি দোনলা ·500 এক্সপ্রেস রাইফেলে সশস্ত্র হলাম ও পরদিন খুব ভোরে রওনা হয়ে যখন ঠিক ভোরের আলো ফুটছে তখন এসে পেঁছিলাম নৈনিতাল—আলমোড়া রোড ও মুক্তেশ্বর রোডের সন্ধিস্থলে। এই জায়গাটি থেকে খুব সতর্ক হয়ে হাঁটতে থাকা উচিত কেননা আমি এখন মানুষখেকোর রাজ্যে। এঁকে বেঁকে মুচড়ে একটি অত্যন্ত খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার আগে কিছুদূর পথটি যায় সমভূমি ধরে। সে জমিতে ফোটে কমলা রঙা লিলি ফুল। সে ফুলের শক্ত গোল বিচি গাদা বন্দুকের গুলি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এই প্রথম আমি এ পাহাড়ে চড়ছি। পথের ওপর ঝুলন্ত বেলেপাথরের পাহাড়ী কার্নিসের গায়ে বাতাসে কুরে-কুরে যে গুহাগুলো সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে আমার ভারি মজা লেগেছিল। আমার মনে হয় ঝড়ের সময়ে গুহাগুলো অত্যন্ত অতি প্রাকৃত শব্দ ছড়ায়। কেন না গুহাগুলি বিভিন্ন মাপের। কতকগুলি অগভীর, দেখে মনে হয় অন্যগুলি বেলেপাথরের গহীনে ঢুকে গেছে ভেদ করে।

যেখানে রাস্তাটা পাহাড়ের পিঠে উঠেছে, সেখানে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। সেই খোলা জায়গাটার এক মাথায় একটি ডাকঘর ও একটি ছোট বাজার রয়েছে। এত ভোরে ডাকঘর খোলা নেই। তবে একটি দোকান খোলা ছিল এবং ডাকবাংলোর কেমন করে খোঁজ মিলবে, দোকানীটি দয়া করে আমাকে সে হদিশ দিল। ও বলল, পাহাড়ের উত্তর দিকের গায়ে আধমাইল দূরে বাংলোটি। মুক্তেশ্বরে ডাকবাংলো দুটি। একটি সরকারী কর্মচারিদের জন্যে সংরক্ষিত, অন্যটি সাধারণের জন্য। আমি তা জানতাম না। বোধ হয় আমার টুপির মাপ দেখে বন্ধু দোকানীটি আমাকে সরকারী কর্মচারি ভেবে ভুল করে ভুল বাংলোটি এবং সে বাংলোর ভারপ্রাপ্ত খানসামার কাছে পাঠাল। খানসামাটি আমাকে প্রাতরাশ দেওয়াতে আমি তা

খাওয়ার ফলে আমি লাল-ফিতে-ফৌজের বিরাগভাজন হয়েছিলাম। যাই হোক তবে সে ব্যাপারটা আমার অজ্ঞাতে হয়েছিল। পরে খেয়াল রেখেছিলাম আমার ভুলের জন্যে যেন খানসামাটি বিন্দুমাত্র না ভোগে।

আমি যখন তুষার শৃঙ্গমালার অপরূপ শোভার তারিফ করছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম প্রাতরাশের জন্যে, সেনাবিভাগের রাইফেল নিয়ে বারজন ইউরোপীয়ানের একটি দল আমার সামনে দিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে তাদের পেছু-পেছু গেলেন একজন সার্জেণ্ট ও নিশানা এবং পতাকা নিয়ে দুজন লোক। সার্জেণ্টটি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি আমায় জানালেন, সদ্য যে দলটি গেল, ওটি যাচ্ছে রাইফেল রেঞ্জে আর মানুষখেকোটার জন্যে দলটি অমন জোট বেঁধে-আছে। সার্জেণ্টের কাছে শুনলাম ইনস্টিট্যুটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গতকাল সরকারের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম পেয়েছেন। তাতে জানানো হয়েছে আমি মুক্তেশ্বরের পথে রওনা হয়েছি। সাজেণ্ট আশা প্রকাশ করলেন মানুষখেকোটিকে নিধনে আমি সফল হব। তিনি বললেন বসতিটিতে অবস্থা খুব সঙিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি দিবালোকেও কেউ একা ঘুরতে ফিরতে চায় না আর সন্ধ্যার পর সকলকে দোর বন্ধ করে থাকতে হয়। মানুষখেকোটিকে মারার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যে সব মড়ির সামনে বসে থাকা হয়েছে তার একটির কাছেও বাঘিনীটি একবারও ফিরে আসে নি।

অতি চমৎকার প্রাতরাশের পর, আমার লোকজন যখন পেীছবে, মানুষ-খেকোটির খবর পাবার চেষ্টা করতে বেরোচ্ছি আমি, আর কখন ফিরব তা জানি না এ কথা তাদের বলতে নির্দেশ দিলাম খানসামাকে। তারপর, রাইফেল তুলে নিয়ে, আমি নিরাপদে পৌঁছেছি তা মাকে জানাতে তাঁকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে আমি ডাকঘরে গেলাম।

ডাকঘর ও বাজারের সামনের সমতল জমি থেকে মুক্তেশ্বরের পাহাড়ের ডানদিকটি খাড়া ঢালে নেমে গেছে। ঘনগুল্মে আচ্ছাদিত শৈলশিরা ও খাতে সে দিকটি ক্ষতবিক্ষত। নিচের উপত্যকা ও তার ওপারের অরণ্যনিবিড় রামগড় পর্বতমালার দিকে চেয়ে আমি পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি, পোস্টমাস্টার ও বহু দোকানী এসে জুটলেন। পোস্টমাস্টার গতকালের সরকারী টেলিগ্রামটি দেখেছেন। এখনি আমি তাঁর হাতে যে টেলিগ্রাম ফর্ম দিয়েছি তাতে আমার সই দেখে তিনি ধরে নিয়েছেন টেলিগ্রামে উল্লেখিত ব্যক্তি আমিই। এবং তিনি ও তার বন্ধুরা তাঁদের সাহায্যেচ্ছা জানাতে এসেছেন আমাকে। এ প্রস্তাবে আমি খুবই খুশি হলাম কেননা মুক্তেশ্বরে যাঁরাই আসছেন, প্রত্যেককে দেখার তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সর্বাধিক সুযোগ এঁদেরই। যেহেতু দুই বা ততোধিক লোক একত্র জুটলে সুনিশ্চিত যে মানুষখেকোটিই

কথোপকথনের মুখ্য প্রসঙ্গ হয়, এ'রা খবর যোগাড় করতে পারেন, সে খবর আমার কাছে খুবই মূল্যবান। অন্যদেশের মানুষের কাছে শুঁড়িখানা বা ক্লাব যা, গ্রামীণ ভারতে গ্রামবাসীর কাছে ডাকঘর ও বেনের দোকানও তাই। যদি কোনো বিশেষ প্রসঙ্গের খবর নিতে হয়, তাহলে খবরের হদিস পেতে ডাকঘর ও বেনের দোকানই শ্রেষ্ঠ জায়গা।

আমাদের সামনে বাঁদিকে প্যাহাড়ের একটি ভাঁজে, আমাদের থেকে হাজার ফুট নিচে, আন্দাজ দু-মাইল দূরে একখণ্ড কর্ষিত জমি। আমাকে জানানো হল ওটি বদ্রী সিংয়ের আপেল-বাগিচা। আমার এক পুরনো দোস্তের ছেলে বদ্রী কয়েকমাস আগে নৈনিতালে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, আমাকে ওর গেস্টহাউসে রাখার এবং মানুষখেকোটি নিধনে ও যতভাবে পারে আমাকে সাহায্য করার প্রস্তাব জানিয়েছিল। সে প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি নি কেন, তা এর মধ্যে বলা হয়েছে। এখন যেহেতু সরকারের অনুরোধে আমি মুক্তেশ্বরে এসেছি, ঠিক করলাম, বদ্রীর সঙ্গে দেখা করব, ওর সাহায্য-প্রস্তাব গ্রহণ করব। বিশেষ, যখন এখনি সঙ্গীরা আমাকে জানিয়েছে, বদ্রীর আপেল বাগিচার নিচের উপত্যকায় শেষ মানুষটি মারা পড়েছে।

আমাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে, আরো তথ্যের জন্য ওদের ওপরই ভরসা রাখব এ কথা বলে আমি ধারি রোড ধরে রওনা হলাম। তখনো সকাল, বদ্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে পাহাড় ধরে পুবে এগিয়ে কয়েকটি গ্রামে যাবার সময় আছে। পথে কোনো মাইল স্টোন ছিল না, আর আমার ধারণামত আমি যখন ছ মাইল পথ হে'টেছি এবং দুটি গ্রামে গিয়েছি, ফিরতি পথে ঘুরলাম। ঘুরতি মুখে মাইল তিনেক এসেছি, একটি ছোট্ট মেয়ে একটা বলদকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে, তাকে আমি ধরে ফেললাম। মেয়েটির বয়স বছর আষ্টেক হবে, তার ইচ্ছে বলদটি মুক্তেশ্বরের দিকে যায়। আর বলদটি যেতে চায় উল্টোদিকে। আমি যখন ঘটনাস্থলে পেশছলাম তখন সেই পর্যায়ে পেশছনো গেছে যখন এ যা চায় অপরে তা করবে না। বলদটি শান্ত ও বৃদ্ধ এক প্রাণী। ওর গলায় বাঁধা দড়িটি ধরে মেয়েটি হাঁটতে থাকল সামনে আর আমি পেছনে রইলাম ওকে চলন্তি রাখার জন্যে, ও আর কোনো ঝামেলা করল না। অল্প পথ এগোবার পর আমি বললাম

'আমরা কালোয়াকে চুরি করছি না, করছি কি ?'

মেয়েটিকে কালো বলদটিকে ওই নামেই ডাকতে শুনেছিলাম।

'না—আ,' মেয়েটি সতেজ উত্তর দিল, ওর বড় বড় বাদামী চোখদুটি আমার পানে তুলে।

'ও কার বলদ ?' এর পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার বাবার', মেয়েটি বলল।

'আমরা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি ?

'আমার কাকার কাছে।'

'কাকা কালোয়াকে চান কেন ?'

'তাঁর খেতে লাঙল দিতে।'

'কিন্তু কালোয়া তো একা একা কাকার খেতে লাঙল দিতে পারবে না ?'

মেয়েটি বলল, 'নিশ্চয়ই পারবে না।' আমি বোকার মতই কথাটা বলেছি বটে, তবে সাহেব বলদ আর লাঙল চষা বিষয়ে কিছু জানবে এত কেউ আশা করতে পারে না ?

এর পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকার কি একটাই বলদ ?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, এখন কাকার একটাই বলদ, তবে দুটো ছিল।

'অন্যটি, এখন কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম, ভাবলাম বোধ হয় ধার শুধতে সেটি বেচে দেওয়া হয়েছে।

আমাকে বলা হল, 'গতকাল বাঘটা মেরে ফেলেছে সেটা।' এ খবরের মত খবর বটে। খবরটা হজম করতে থাকলাম। আমরা চলছি কথা-না-কয়ে। মেয়েটি থেকে থেকেই ফিরে চাইছে আমার দিকে, অবশেষে সাহস করে ও জিজ্ঞেস করল,

'আপনি বাঘটা মারতে এসেছেন ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বাঘটা মারবার চেষ্টা করতে এসেছি।'

'তবে মড়টার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন কেন ?'

'কেননা আমরা কালোয়াকে নিয়ে যাচ্ছি কাকার কাছে ?' মনে হল আমার জবাবে মেয়েটি সন্তুষ্ট হল, আমরা চলতে থাকলাম ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। অত্যন্ত দরকারী কিছু খবর পেলাম বটে কিন্তু আরো খবর চাই, আর একটু বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'তুমি জাননা বাঘটা মানুষখেকো ?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। ও কুন্তীর বাবাকে খেয়েছে আর বংশী সিংয়ের মাকে, আরো অনেক লোককে।'

'তবে তোমার বাবা কালোয়ার সঙ্গে তোমাকে পাঠাল কেন ? নিজে এল না কেন ?'

'তার যে ভাবারী বুখার (ম্যালেরিয়া) হয়েছে !'

'তোমার কোন ভাই নেই ?'

'না। একটি ভাই ছিল, সে অনেকদিন আগে মারা গেছে।'

'মা ?'

'হ্যাঁ মা আছে। রান্না করছে মা।'

'বোন ?'

'না, আমার কোনো বোন নেই।' অতএব, যে রাস্তায় চার ঘন্টায় আমি আর দ্বিতীয় মানুষ দেখি নি, যে পথ ধরে বড় দল-বেঁধে ছাড়া পুরুষরা হাটতে ভয় পায়, সেই পথ দিয়ে ওর বাবার বলদটি কাকাকে পেঁছিবার বিপজ্জনক দায়িত্ব এই ছোট্ট মেয়েটির ওপর পড়েছে।

আমরা একটি পথে পেঁছিছি, মেয়েটি পথটি ধরে এগোল, বলদটি ওর পেছনে, সবচেয়ে পেছনে আমি। অচিরে আমরা একটি খেতে এসে গেলাম, তার অপর প্রান্তে একটি ছোট বাড়ি। আমরা যেমন বাড়িটির কাছে পেঁছিলাম মেয়েটি ডাকল, ওর কাকাকে জানাল ও কালোয়াকে এনেছে।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠে জবাব এল, 'ঠিক আছে। ওটাকে খুঁটোয় বাঁধ্ পুত্লী, বাড়ি যা! আমি খেতে বসেছি।' অতএব আমরা কালোয়াকে খুঁটিতে বাঁধলাম আর ফিরে গেলাম রাস্তায়। আমাদের মধ্যে কালোয়ার সংযোগবন্ধন না থাকায় পুতলী এখন লজ্জা পাচ্ছে। যেহেতু ও আমার পাশে হাঁটবে না, ওর চালে চাল মিলিয়ে আমি এগিয়ে হাঁটতে থাকলাম। কিছুক্ষণ হাঁটলাম নিশ্চুপে তারপর আমি বললাম,

'কাকার বলদটাকে যে বাঘ মেরেছে আমি তাকে মারতে চাই, কিন্তু আমি জানি না মড়িটা কোথায়। আমাকে দেখিয়ে দেবে ?'

ও সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়! আমি আপনাকে দেখাব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি মড়িটা দেখেছ ?'

না, 'তবে সেটা কোথায় ছিল কাকা যখন বাবাকে বলছিল তখন আমি শুনেছি', সে বলল।'

'সেটা কি রাস্তার কাছে ?'

'আমি জানি না।'

'যখন মারা পড়ে তখন বলদটা কি একা ছিল ?'

'না। গাঁয়ের গরুবাছুরের সঙ্গে ছিল।'

'সকালে মারা পড়ে না সন্ধ্যায় ?'

সকালে গরুগুলির সঙ্গে যখন চরতে যাচ্ছিল তখনই মারা পড়েছে।

মেয়েটির সঙ্গে কথা কইছিলাম যখন, তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলাম চারদিকে, কেননা রাস্তাটা সরু আর বাঁদিকে তার ঘন জঙ্গল, ডানদিকে ঘন ঝোপঝাড়। আমরা মাইলখানেক এগোলাম, তারপর পেঁছিলাম বহু ব্যবহৃত একটা গরু-ছাগলের চলার পথে। পথটি বাঁয়ে জঙ্গলপানে চলে গেছে। এখানে মেয়েটি থামল, বলল, কাকা ওর বাবাকে বলেছিল এই পথটায় বলদটা মারা পড়েছে। মড়ি খুঁজে পেতে আমার যত খুঁটিনাটি জানা দরকার ছিল সব পেয়ে গেছি এখন। মেয়েটিকে নিরাপদে ওর ঘরে পেঁছে দিয়ে আমি গো-রাস্তায় ফিরে

এলাম। পথটা চলে গেছে একটা উপত্যকা পেরিয়ে এবং এই পথ ধরেই প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে একটি জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে গরুবলদগুলো প্রাণভয়ে ছুটকে পালিয়েছে। গো-রাস্তা ছেড়ে, রাস্তাটি থেকে পঞ্চাশ গজখানেক নিচে, ওরই সমান্তরাল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চললাম আমি এখন। সবে অল্প পথই গিয়েছি, দেখলাম ছেঁচড়ে টানার দাগ। দাগটি সিধে ঢুকে গেল উপত্যকাটিতে আর ওটিকে কয়েকশো গজ অনুসরণ করতেই আমি পেয়ে গেলাম বলদটিকে। তার শরীরের পেছন ভাগ থেকে সামান্য খানিকটা খাওয়া হয়েছে শুধু। একটি গভীর খাতের মুখ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে আন্দাজ বিশ ফুট উঁচু একটা পাড়ের পায়ের কাছে পড়েছিল ওটা। খাত ও মড়ির মাঝে একটি বাড়-থেমে যাওয়া গাছ, একটি বুনো গোলাপ গাছে সেটি চাপা পড়েছে। মড়ির কাছাকাছি বাঁধা জায়গা-সীমার মধ্যে এটিই একমাত্র গাছ, বাঘটিকে মারার কিছু আশা নিয়ে যার ওপর বসতে পারি আমি, কেন না আকাশে চাঁদ নেই। আর বাঘটা যদি অন্ধকারের পর আসে, নিশ্চিত জানছিলাম যা ও আসবেই, মড়ির যত কাছে থাকব, বাঘকে মারার সুযোগ পাব তত বেশি।

এখন বেলা দুটো। বদ্রীর সঙ্গে দেখা করার, ওর কাছে এক পেয়ালা চা চাইবার সময়টুকুই আছে আমার, আর চায়ের দরকার আমার খুব কেন না সকাল চারটেয় রামগড় ছেড়ে বেরোবার পর থেকে আমি প্রচুর হাঁটা হেঁটেছি। গো-রাস্তাটি যেখানে পথের সঙ্গে মেশে, বদ্রীর ফলবাগিচার পথ তার কাছাকাছি শুরু হয়ে ঘন গুল্মঝোপের ভেতর দিয়ে একটি খাড়াই পাহাড় ধরে এক মাইল নামে। আমি যখন পৌঁছলাম, বদ্রী ওর গেস্টহাউসের কাছে ছিল, একটি চোট-খাওয়া আপেল গাছের তদারকি করছিল। আমার আগমনের কারণ শুনে, ফলবাগিচার মুখোমুখি একটি ছোট টিলার ওপর অবস্থিত গেস্টহাউসে নিয়ে গেল ও আমাকে। বদ্রী ওর চাকরকে আমার জন্যে চা আর কিছু খাবার তৈরি করতে বলল, বারান্দায় বসে আমরা যখন তারই অপেক্ষা করছি, কেন মুক্তেশ্বরে এসেছি, তা, এবং ছোট মেয়েটি আমাকে যে মড়িটি খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে তার কথা—সবই আমি ওকে বললাম। বদ্রীকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, মুক্তেশ্বরে শিকারীদের কাছে এ মড়িটার খবর বলা হয় নি কেন, ও বলল, বাঘটি মারায় শিকারীদের বারবার ব্যর্থতার কারণে গ্রামের লোকরা ওদের ওপর ভরসা হারিয়েছে, আর এই জন্যেই হত্যার খবরগুলো শিকারীদের আর দেওয়া হয় না। মড়ির কাছে পাহারা-বসার জন্য যে লম্বাচওড়া তোড়জোড় চলে, তাকেই ব্যর্থতার কারণ বলে বদ্রী জানাল। এই তোড়জোড়ের মধ্যে আছে—ঝোপ ও ছোট ছোট গাছের সকল বাধা সরিয়ে মড়ির কাছের জমি সাফ করা; বড় বড় মাচান তৈরি; আর বহুজন মিলে মাচান দখল করা। কখনো মড়ির কাছে ফিরে-না-আসার যে খ্যাতি অর্জন

করেছে বাঘটি, এ তার যথেষ্ট কারণ। বদ্রী দৃঢ়বিশ্বাসে স্থির যে মুক্তেশ্বর জেলায় কেবল একটি বাঘই আছে; সেটির সামনের ডানপা সামান্য খোঁড়া; তবে কিসে সে খোঁড়া হয়েছে তা সে জানে না; এও জানে না জানোয়ারটি মদ্দা না মাদী।

একটি বড় এয়ারডেল টেরিয়ার কুকুর আমাদের সঙ্গে বারান্দায় বসেছিল। অচিরে কুকুরটি গরগর করতে শুরু করল, আর ও যেদিকপানে মুখ করে আছে, সেদিকে চেয়ে দেখি একটি বড় হনুমান জমিতে বসে একটি আপেলগাছের ডাল নুইয়ে ধরে কাঁচা ফল খাচ্ছে। বারান্দার রেলিঙে ঠেস দেওয়া ছিল একটি শটগান। সেটি তুলে নিয়ে বদ্রী তাতে ৪ নং ছররা পুরে গুলি করল। হনুমানটিকে কোনো চোট দিতে হলে ছররাগুলোর পক্ষে পাল্লাটা বড় বেশি লম্বা হয়ে গেল, যদি একটাও লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধত, তবুও তাই বলতে হত। তবে গুলি ছোঁড়ায় এই সুফল হল, হনুমানটি ছুটে পালাল পাহাড় ধরে ওপর পানে। কুকুরটি জোর তাড়া করল ওকে। কুকুরটার সর্বনাশ হবে বলে ভয় পেয়ে বদ্রীকে বললাম ওটাকে ডেকে ফেরাতে। কিন্তু ও বলল, ও ঠিক আছে। কুকুরটা এই বিশেষ হনুমানটাকে সদাই তাড়া করে। ও বলল, ওর চারা গাছগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ওটা। কুকুরটা হনুমানটাকে প্রায় ধরে ফেলছিল। কয়েক গজের মধ্যে ও পেঁছেছে যখন, হনুমানটা হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। কান টেনে ধরল কুকুরটার, ওর মাথার পাশ থেকে এক খাবলা মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নিল। খুব জোর জখম হয়েছিল। আমরা ক্ষতের শুশ্রূষা শেষ করেছি, সে সময়ে আমার চা আর এক থালা গরম পুরি তৈরি হয়ে গেল।

যে গাছটায় বসতে চাই তার কথা বদ্রীকে বলেছিলাম, আর আমি যখন মড়ির কাছে ফিরে যাচ্ছি, একটি ছোট মাচান তৈরির সাজসরঞ্জাম-বাহী দু-জন লোক সহ আমার সঙ্গে যাবে বলে বদ্রী জোরাজোরি করল। এক বছরেরও ওপর বদ্রী এবং লোক দুটি মানুষখেকোটির আতঙ্কের ছায়ায় বসবাস করছে, বাঘটির বিষয়ে ওদের ধারণার কমতি ছিল না কিছু। আর যখন ওরা দেখল আমি যেটি বেছেছি সেটি ছাড়া মড়ির কাছে এমন একটি গাছও নেই যার ওপর মাচা বাঁধা চলে, ওরা আমাকে সে-রাতে মাচায় না-বসার জন্যে তাগিদ দিল। এই ধারণায় যে, বাঘটি মড়িটাকে সরিয়ে নেবে আর পরের রাতে মাচায় বসার জন্যে আমাকে যোগ্যতর কোনো জায়গা জুটিয়ে দেবে। বাঘটি মানুষখেকো না হলে আমি তাই করতাম, কিন্তু যেহেতু বাঘটি মানুষখেকো, এ-কাজে খানিকটা ঝুঁকি থাকলেও আমি এ সুযোগ হারাতে রাজী ছিলাম না। সুযোগটির পুনরাবৃত্তি পরের রাতে না ঘটতেও পারে। এ জঙ্গলে ভাল্লুক আছে, এবং যদি একটা ভাল্লুকও মড়ির গন্ধ পায়, বাঘকে মারার সব আশাই নষ্ট হবে আমার। কেননা হিমালয়ের ভাল্লুকরা বাঘকে সমীহ করে না মোটে আর বাঘের মড়ি

অপহরণে ইতস্তত করে না। গাছটি যেহেতু গোলাপ ঝোপে চাপা, তাতে চড়া বেশ কষ্টসাধ্য এক কাজ। কাঁটা সত্ত্বেও যতদূর পারলাম ততদূর নিজের আরামে বসার ব্যবস্থা করে নেবার পর, আমাকে রাইফেলটি তুলে দিয়ে এবং পরদিন ভোরে আসবে বলে কথা দিয়ে বদ্রী ও তার লোকেরা চলে গেল।

খাত আমার পেছনে। আমি পাহাড়ের দিকে মুখ করে আছি। ওপর থেকে যে জন্তুই নামুক আমি পরিষ্কার দেখতে পাব। কিন্তু আমি যেমন ভাবছি, বাঘ যদি সে-মত নিচ থেকে আসে মড়ির কাছে না পৌঁছনো অব্দি ও আমায় দেখতে পাবে না। বলদটি সাদা। পনের ফুট দূরে আমার দিকে পা মেলে ডানকাতে পড়ে আছে ওটি। বিকেল চারটেয় আমি জায়গায় বসি আর একঘণ্টা বাদে আমার দুশো গজ নিচে খাতের দিক থেকে একটি কাকার ডাকতে শুরু করল। বাঘ এখন চলতে শুরু করেছে আর তা দেখে কাকার নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকছে। বহুক্ষণ ও ডাকল তারপর চলে যেতে শুরু করল। ডাকটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল যতক্ষণ না পাহাড়ের ঢালের ওপারে মিলিয়ে যায়। মড়ির দৃশ্যসীমার মধ্যে আসার পর বাঘটা গুঁড়ি মেরে বসেছে। এ হল তারই নিশানা। ঘড়ি রেখে বাঘটিকে গুলি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো বদ্রী আমাকে বলার পর এমনটি ঘটবে বলেই আমি ভেবেছিলাম। চোখ-কান খোলা রেখে ও মড়ির কাছে আসার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে মড়ির কাছে কোন মানুষ নেই, সে জন্যে কাছেই কোথাও গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে এ আমি জানতাম। একটি মিনিটের পর আরেকটি দীর্ঘ মিনিট এল আর গেল। সন্ধ্যা নামল। আমার সামনের পাহাড়ে এটাসেটা অস্পষ্ট হয়ে এল, মিলিয়ে গেল। মড়িটিকে তখনো ঝাপসা-সাদা দাগের মত দেখতে পাচ্ছি, খাতের মুখে একটা ডাল মট করে ভাঙল, সন্তর্পণ পদক্ষেপ আমার দিকে এগোল, থামল আমার ঠিক নিচে। এক বা দুই মিনিট নিশ্ছিদ্র নীরবতা তারপর গাছের পায়ের তলের শুকনো পাতার ওপর শুল বাঘটি।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি ঘন মেঘ জমে উঠেছিল, এখন মাথার ওপর এক কালো চন্দ্রাতপ তারাগুলি মুছে দিয়েছে। অবশেষে বাঘ যখন উঠে মড়ির কাছে গেল, তখন রাতকে কাজলকালো বললে সবচেয়ে ভাল বলা হয়। যত তীক্ষ্ণ নজরই চালাই না কেন, সাদা বলদটির কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, বাঘকে তো আরোই কম। মড়ির কাছে পৌঁছে বাঘটি মড়ির ওপর ফুঁ দিতে থাকল। হিমালয়ে, বিশেষ গরমকালে মড়ির টানে ভিমরুল আসে। দিনের আলো মিলিয়ে গেলে অধিকাংশ ভিমরুলই চলে যায়। যেগুলো ওড়ার পক্ষে বড় বেশি বুঁদ হয়ে থাকে সেগুলো থেকে যায়। সম্ভবত তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই, খেতে শুরু করার আগে বাঘ মাংসের ছিন্ন উন্মুক্ত অংশে সেঁটে থাকা ভিমরুল গুলোকে ফুঁ দিয়ে তাড়ায়। তাড়াহুড়ো করে গুলি করার কোনোই

দরকার নেই আমার। কেননা যদিও কাছেই আছে তবু কোনো নড়াচড়া বা আওয়াজ দ্বারা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ না-করা অব্দি বাঘটি আমায় দেখবে না। অন্ধকার রাতে তারার আলোয় আমি মোটামুটি ভালই দেখতে পাই কিন্তু সে রাতে একটি তারাও দৃশ্যমান নয়। ঘন মেঘে এক ঝলক বিদ্যুৎও চমকায় নি। খেতে শুরু করার আগে বাঘ মড়িটা সরায় নি তাই জানছিলাম মড়ির ডান ধারে আমার দিকে পাশ ফিরে আছে বাঘটা।

বাঘটিকে মারার যে সব প্রচেষ্টা হয়েছে তার কারণে আমার সন্দেহ ছিল অন্ধকার হবার আগে ও আসবে না। তারার আলোয় যেমনটি তাক করতে পারি তাই করা এবং তারপর যাতে মড়ির এক বা দু ফুট ডাইনে আমার বুলেট পৌঁছয় সেইমত রাইফেলের নল সরিয়ে তাক করা, এই ছিল আমার অভিপ্রেত। কিন্তু এখন যখন মেঘ আমার চোখ দুটি অকেজো করে দিয়েছে আমাকে নির্ভর করতে হবে কানের ওপর (তখন আমার শ্রবণশক্তি ছিল অটুট)। কনুই দুটো হাঁটুতে রেখে রাইফেল তুলে ধরে, বাঘটা যে আওয়াজ করছিল সেদিক পানে সযত্নে তাক করলাম। রাইফেলটি দৃঢ় অনড় ধরে রেখে আমার ডান কান ফেরালাম আওয়াজের দিকে। আবার সোজা হয়ে বসলাম। আমার তাক একটু উঁচু হয়ে গিয়েছিল তাই নলটি এক ইঞ্চিরও অত্যন্ত কম নামিয়ে ধরে আমি আবার মাথা ফেরালাম, কান পাতলাম। এরকমটি কয়েকবার করে যখন সন্তুষ্ট হলাম যে শব্দের দিকেই নিশানা করেছি আমি, নলটি ডানদিকে একটু সরিয়ে ট্রিগার টিপলাম। দুই লাফে বাঘটা সেই বিশ-ফুট উঁচু পাড়ে উঠে গেল। তার মাথায় ছোট একটু করে সমতল ভূমি তার ওপারে পাহাড় উঠে গেছে সিধে খাড়াইয়ে। সেই সমতল ভূমি অব্দি বাঘের শব্দ পেলাম শুকনো পাতার ওপর তারপর সব হয়ে গেল নৈঃশব্দ্য। হয় সেই সমতলে পৌঁছে বাঘটা মারা গেছে নয় ও বে-জখম, নৈঃশব্দ্যের ব্যাখ্যা এই দু-রকম হতে পারে। রাইফেল কাঁধে ধরে রেখে অত্যন্ত অভিনিবেশে তিন বা চার মিনিট শুনলাম। যেহেতু আর কোনো আওয়াজ হল না, রাইফেল নামালাম। আমার এই আচরণের জবাবে পাহাড়ের মাথা থেকে এল এক গম্ভীর গর্জন। তবে বাঘটা বে-জখম, এবং আমায় দেখেছে ও। গাছের ওপর আমার বসার জায়গাটি গোড়ায় দশ ফুট উঁচুতে ছিল, কিন্তু যে হেতু আমার বসার মত শক্ত কিছু জিনিস ছিল না, আমার ভারে গোলাপ ঝাড়টি দেবে যায়। এখন সম্ভবত জমি থেকে আট ফুটের বেশি উঁচুতে নই। আর আমার ঝুলন্ত ঠ্যাং দুটি তো আরোই নিচে। আর খানিকটা ওপরে, প্রায় বিশ ফুট দূরে একটি বাঘ গলার গভীরে গরগর করছে। ওই মানুষখেকো, একথা মনে করবার সম্পূর্ণ কারণ আছে আমার।

যখন বাঘ আমাকে দেখছে না তখনও, দিবালোকেও বাঘের নিকট সান্নিধ্য রক্ত চলাচলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যখন সে সাধারণ বাঘ নয়, মানুষখেকো;

সময় যখন অন্ধকার রাতের দশটা ; আপনি যখন জানছেন মানুষখেকোটি আপনাকে নজর করছে ; রক্তপ্রবাহের বিশৃঙ্খলা পরিণত হয় তুফানে। আমি এ কথা বলেই যাব বিনা উসকানিতে বাঘ স্ব-প্রয়োজনের বাইরে হত্যা করে না। যে বাঘটা আমার উদ্দেশ্যে গজরাচ্ছে তার দু-তিন দিন চলে যাবে এমন একটা মড়ি ওর আছে। ওর আমাকে মারবার দরকার নেই কোনো। তবুও আমার এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যে এবারটা এই বিশেষ বাঘটা হয়তো এ হিসেবের বাইরের জানোয়ার বলে প্রমাণিত হবে। তার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ার পরও বাঘ সময়ে-সময়ে মড়ির কাছে ফেরে কিন্তু আমি জানতাম এ তা করবে না। আমি এও জানতাম যে আমার অস্বস্তির অনুভূতি সত্ত্বেও যতক্ষণ না ভা সাম্য হারাই,—ধরার কিছুই ছিল না আমার—অথবা ঘুমিয়ে পড়ি এবং পড়ে যাই গাছ থেকে, আমি সম্পূর্ণই নিরাপদ। এখন আর ধূম্রপান থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবার কোনো কারণ নেই আমার। তাই সিগারেট কেস বের করলাম আর যেমন দেশলাই কাঠি জেবলেছি পাড়টির কিনারা থেকে বাঘটিকে সরে যেতে শুনলাম। অচিরে ও ফিরে এল, গজরাল আবার। আমি তিনটে সিগারেট খেলাম, বাঘ তখনো আমার সঙ্গে লেগে আছে, তখন বৃষ্টি এল। প্রথমে কয়েকটি বড়-বড় ফোঁটা, তারপর ঝমঝম ধারাপাত। সে-সকালে রামগড় থেকে বেরোই যখন, পাতলা পোশাক পরেছিলাম। কয়েক মিনিটেই চামড়া অব্দি ভিজে গেলাম, কেননা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ঠেকিয়ে গুঁড়ো করে দেয় এমন একটি পাতাও ছিল না আমার মাথার ওপরে। আমি জানতাম, যে মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হল, বাঘটা চলে যাবে দ্রুত কোনো গাছের নিচে অথবা পাহাড়ের আড়াল-জায়গার আশ্রয়ে। রাত এগারটায় বৃষ্টি নেমেছিল, ভোর চারটেয় থামল, আকাশ পরিষ্কার হল, আমার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে এখন বাতাস বইতে শুরু করল। এর আগে যদি শুধুই শীতার্ত ছিলাম, এখন বরফ জমা হয়ে গেছি। যখনি বাত কামড় দেয়, আমি সে রাত, এবং অনুরূপ অন্যান্য নিশীথের কথা স্মরণ করি আর কৃতজ্ঞ হই, বাতের প্রকোপটি সামান্য বলে।

বদ্রীও বন্ধু হিসেবে ভাল। সূর্য যখন উঠছে তখনি ও পৌঁছে গেল এক কেটলি গরম চা-বাহী একটি লোককে নিয়ে। রাইফেলের ভার থেকে আমায় মুক্তি দিয়ে, আমি যেমন গাছ থেকে পিছলে নেমে এলাম, ওরা দুজনে ধরল আমাকে কেননা আমার পা এত আড়ষ্ট, যে চলছিল না। আমি যেমন মাটিতে শুয়ে চা খেতে থাকলাম, ওরা আমার পা ডলাইমলাই করে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনল। যখন দাঁড়াতে সক্ষম হলাম, গেস্টহাউসে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালবার জন্যে বদ্রী ওর লোক পাঠিয়ে দিল। বুলেটের গতি নির্দেশ করবার জন্য এর আগে শ্রবণশক্তিকে কাজে লাগাই নি কখনো তাই দেখে খুশি হলাম মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য বাঘের মাথা ফসকে ফেলেছি। রাইফেল-উঁচনোটা ঠিকই হয়েছিল

তবে রাইফেলের নলটি যথেষ্ট বাঁয়ে ঘোরাই নি। ফল দাঁড়ায়, বাঘ বলদটির যেখান থেকে খাচ্ছিল, তার দু-ইঞ্চি দূরে আমার বুলেটটি বলদটিকে বেঁধে।

সেই চা আর পথ ধরে আধমাইল হাঁটা আমার শরীর থেকে সকল খিল-ধরা ভাব দূর করে দিল আর বদ্রীর ফলবাগিচার দিকের এক মাইল লম্বা পথটি যখন ধরেছি, ভিজে কাপড় আর খালি পেটের কারণেই আমার যা কিছু কষ্ট তখন। লাল মাটির ওপর দিয়ে গেছে সে পথ, বৃষ্টিতে সে মাটি বেজায় পিছল। এই মাটিতে তিনটি পদচিহ্ন: বদ্রী এবং ওর লোকটির পদচিহ্ন উঠতি পথে; লোকটির পদচিহ্ন ফিরতি পথে। ভিজে মাটিতে শুধু এই তিন জোড়া পদচিহ্ন পঞ্চাশ গজ; তারপর পথ যেখানে মোড় ঘুরছে, ডান পাড় থেকে একটি বাঘিনী ঝাঁপিয়ে নেমেছে এবং বদ্রীর লোকটির পেছু-পেছু গেছে ওই পথেই। লোকটির পদচিহ্ন আর বাঘিনীটির থাবার ছাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে, দুজনেই গেছে খুব জোরকদমে। তখন আমার বা বদ্রীর করবার কিছুই নেই কেন না লোকটি আমাদের বিশ মিনিট আগে রওনা হয়ে গেছে; এবং সে যদি বাগিচার নিরাপত্তায় পৌঁছতে না-পেরে থাকে, তবে এর অনেক আগেই আমরা ওকে যে সাহায্যই করতে পারতাম, তার নাগালের বাইরে চলে গেছে ও। অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হতে হতে, সে পিছল মাটিতে যন্দূর পারি তত তাড়াতাড়ি হাঁটলাম আমরা; আর সেখান থেকে বাগিচা এবং বাগিচায় কর্মরত একদল লোককে চোখে পড়ে, তেমন একটি পায়েচলা-পথে পৌঁছে ভারি নিশ্চিন্ত হলাম দেখে বাঘিনীটি সে পথে চলে গেছে, লোকটি গেছে বাগিচা পানে। পরে জিজ্ঞেস করতে লোকটি বলে ও জানতই না বাঘিনীটি ওর পেছু নিয়েছে।

গেস্টহাউসে গনগনে কাঠের আগুনের সুমুখে আমার জামাকাপড় শুকোতে শুকোতে যে জঙ্গলে বাঘিনীটি গেছে তার কথা জিজ্ঞেস করলাম বদ্রীকে। বদ্রী বলল, বাঘিনী যে-পথ ধরেছে সেটি নেমে গেছে এক গভীর, ঘন বনে নিবিড় গিরিখাতের মধ্যে। একমাইল বা তারও বেশি জায়গায় খাতটি একটি অত্যন্ত খাড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে এগিয়েছে, তারপর ডান দিক থেকে আরেকটি খাত এসে মিলেছে তার সঙ্গে। দুটি খাতের সঙ্গমে আছে একটি নদী, আর, বদ্রী বলল, এক টুকরো খোলা জমি আছে। সে জমিটি দুটি গিরিখাত থেকে বেরুবার পথের মুখোমুখি অবস্থিত। সে গিরিখাতে বাঘিনীটি ঢুকেছে বলে মনে করার সম্পূর্ণ কারণ আছে আমাদের। বদ্রীর মতে সেই খাতেই দিনটা ঘাপটি মেরে থাকবে বাঘিনী। জায়গাটি যেহেতু জঙ্গল-হাঁকাবার পক্ষে আদর্শ স্থান, আমরা ঠিক করলাম, যদি জঙ্গল-হাঁকাবার মত যথেষ্ট লোক যোগাড় করতে পারি তবে বাঘিনীটাকে মারবার জন্য এই উপায়টি পরখ করব। বদ্রীর প্রধান মালী গোবিন্দ সিংকে তলব করা হল, তাকে আমাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হল। গোবিন্দ সিং বলল, দুপুর অব্দি সময় দিলে ও জঙ্গল-হাঁকাবার জন্যে তিরিশ

জন লোক যোগাড়, এবং তার ওপরে ওর মনিবের হুকুম মত পাঁচ মণ মটরশুঁটি যোগাড় করতে পারে। আপেল-বাগিচার ওপর বদ্রীর আছে এক বিস্তীর্ণ তরকারি-বাগিচা আর সন্ধ্যায় ও টেলিগ্রাম পেয়েছে নৈনিতাল বাজারে মোটাদানার মটরশুঁটির দাম ঝপ করে পাউণ্ড প্রতি চার আনায় উঠেছে। এ চড়া দরের সুযোগ নিতে বদ্রী আগ্রহী আর ওর লোকরা মটরশুঁটি তুলছিল। সেই রাতেই মালবাহী টাট্টুঘোড়া সে মাল নিয়ে যাবে, পরদিন নৈনিতালে পেঁছিবে ভোরের বাজার ধরার জন্য।

রাইফেল পরিষ্কার করে আর বাগিচার চারপাশ ঘুরে বেড়িয়ে বদ্রীর সঙ্গে ওর দিনের খাওয়াতে যোগ দিলাম ; আমার সুবিধের জন্য খাওয়ার সময় একঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছিল, আর মধ্যাহ্নে গোবিন্দ ওর তিরিশ জনের দলকে হাজির করল। কারো মটর-তুলিয়েদের তদারকি করা দরকার তাই বদ্রী থেকে যাওয়া স্থির করল আর খেদান চালাবার জন্যে পাঠাল গোবিন্দ সিংকে। গোবিন্দ এবং সেই তিরিশ জন লোক স্থানীয় বাসিন্দা এবং মানুষখেকোটির হাতে কেমন বিপদ ঘটতে পারে তা জানে। বাঘিনীটির জন্যে সেই খাতে তল্লাসী করতে, যদি আমি গুলি ছুঁড়তে ব্যর্থ হই তবে নদীটির কাছে খোলা জায়গাটিতে স্ব-স্থানে বসতে, আমাকে একঘণ্টা সময় দিল বদ্রী। গোবিন্দ ওর লোকদের দু দলে ভাগ করবে ; একটি দলের দায়িত্বে নিজে থাকবে ; অন্যটির ভার দেবে একটি নির্ভরযোগ্য লোকের ওপর। সেই একঘণ্টা কাটলে বদ্রী একটি গুলি ছুঁড়বে আর দল দুটি তখন বেরিয়ে পড়বে ; খাতের দুদিকে দুটি দল যাবে ; পাথর গড়াবে, চেঁচাবে আর হাততালি দেবে। শুনতে এমনি সহজ সরলই বটে, তবে আমার সংশয় ছিল কেননা আমি বহু হাঁকাই বিগড়ে যেতে দেখেছি।

যে-পথ ধরে সেই সকালে নেমেছি সেই পথের চড়াইয়ে গিয়ে আমি বাঘিনী যে-পথে গেছে সেটি ধরলাম। তাতে এই শুধু দেখলাম অল্প দূর গিয়ে, সে পথটি একটি নিবিড় ও বহুবিস্তৃত গুল্মবনে হারিয়ে গেছে। বহুশত গজ পথ ভেদ করে গিয়ে আমি দেখলাম পাহাড়ের গা এক সার গভীর খাত ও শৈলশিরায় কাটা কাটা। যে গিরিখাতে হাঁকানো হবে তার ডান সীমানা বলে যে শৈলশিরাটিকে ঠাউরেছিলাম, তা ধরে উৎরাই নেমে আমি একটি উঁচু খাড়াইয়ের মুখে পেঁছিলাম। এর তলে আমার বাঁ দিকের গিরিখাতটি ডানদিক থেকে আসা আরেকটি খাতের সঙ্গে মিশেছে, আর দুটি খাতের সন্ধিতে একটি নদী। যখন নিচের দিকে চেয়ে দেখছি আর ভেবে অবাক হচ্ছি যে ফাঁকা জমিতে আমি দাঁড়াব সেটি গেল কোথায়, কাছেই শুনলাম মাছির ভনভনানি ; আর সে শব্দের অনুসরণে গিয়ে দেখলাম এক হপ্তা আগে নিহত একটি গরুর ভুক্তাবশেষ। প্রাণীটির গলার দাগ বুঝিয়ে দিল ওটি একটি বাঘের হাতে মারা পড়েছে। কাঁধের একাংশ, ঘাড় ও মাথা ছাড়া গরুটির সবটাই খেয়েছে বাঘটি। এ-কাজ

করার বিশেষ কোনো যুক্তি না-থাকলেও আমি গরুর শবটাকে কিনারা অব্দি টেনে নিয়ে খাড়া পাহাড়ের নিচে ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। শতখানেক গজ গড়িয়ে, ওটা থামল গিয়ে নদী থেকে অল্প দূরে একটা ছোট গহ্বরে। বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে, যে গহ্বরে গরুটির দেহাবশেষ গড়িয়ে ফেললাম তা থেকে আন্দাজ তিনশো গজ দূরে একটি শৈলশিরার ওপর একটা ফাঁকা জমির টুকরো পেয়ে গেলাম। এ জায়গাটি যেমনটি হবে বলে আমি ভেবেছিলাম, এটি তা থেকে একেবারেই অন্য রকম। পাহাড়ের যে পাশটা হাঁকানো হবে, দাঁড়িয়ে সেটার ওপর নজর রাখি এমন একটি জায়গাও নেই; আর আমি ওকে না-দেখতেই বাঘিনীটি যে কোনো জায়গা দিয়ে বেরোতে পারে। তবে তখন সে বিষয়ে কিছু করার পক্ষে খুবই দেরি হয়ে গেছে কেননা যে গুলি আমাকে জানাবে যে হাঁকাই শুরু হয়ে গেছে, বদ্রী সেটি ছুঁড়েছে। অচিরে মানুষদের চেঁচাতে শুনলাম দূরে। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হল হাঁকাই আমার দিকে আসছে, তারপর চেঁচামেচি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হতে থাকল, ক্রমে মিলিয়ে গেল। আবার এক ঘণ্টা বাদে হাঁকাই করছে যারা তাদের গলা শুনলাম। তারা পাহাড়ের উৎরাইয়ে আমার ডান দিকে নেমে আসছে আর তারা যখন আমার সঙ্গে সমোচ্চতায়, আমি ওদের চেঁচিয়ে বললাম হাঁকাই বন্ধ করে শৈলশিরায় আমার কাছে চলে আসতে। হাঁকাই যে বিফল হয়েছে সে কারো দোষ নয় কেননা জায়গাটি না জেনে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই একদল আনাড়ী লোক দিয়ে আমরা হাঁকাতে চেষ্টা করেছিলাম ঘন গুল্মবনের এক বিশাল এলাকা, শত-শত তৈরি লোকও এ কাজ পেরে-ওঠা কঠিনই মনে করত।

গুল্মবন ঠেলে পথ করে ঢুকতে হাঁকাইদারদের খুব কষ্টকর সময় কেটেছে; আর ওরা যখন দল বেঁধে বসে হাত-পা থেকে কাঁটা বের [illegible]ছিল আর আমার সিগারেট খাচ্ছিল; আমি আর গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিলাম মুখোমুখি; পরদিন সকালে মুক্তেশ্বরে আর আশপাশের গ্রামে যত লোক পাওয়া যায় সবাইকে নিয়ে একটি হাঁকাইএর বিষয়ে ওর প্রস্তাবটি আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে গোবিন্দ কথা-কওয়া থামাল। আমি দেখলাম আমার পেছনে অপ্রত্যাশিত কিছু ওর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে কেননা ওর চোখ সরু হয়ে গেল আর বিশ্বাস করতে পারছে না এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘটছে বলে, এই ভাবটি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও যেদিকে মুখ করে ছিল সেদিক পানে চাইলাম আমি, ঝট করে ঘুরে গিয়ে আর সেখানে, একটি বরবাদ-আবাদী খেত ধরে ধীরে আসছিল বাঘিনীটি। নদীটির ও প্রান্তে পাহাড়ের ওপর, চারশোখানেক গজ দূরে বাঘিনীটি, ও আসছে আমাদেরই দিকে।

জঙ্গলে যখন বাঘ আপনার কাছে এগোতে থাকে, যখন আপনি জনবসতি থেকে দূরে আছেন তখনো, যে-ছবি আপনি তুলতে চান অথবা যে গুলি ছুড়তে চান, তার সুযোগ নষ্ট করে দেবার মত যে সব ব্যাপার ঘটতে পারে সেগুলোর

চিন্তা আপনার মাথায় আসতে থাকে। একবার, জানোয়ার চলার পথের মুখোমুখি একটি পাহাড়ের গায়ে বসে ছিলাম আমি একটি বাঘের প্রতীক্ষায়। 'বরম কা থান' নামে এক অতি পবিত্র অরণ্য পীঠে গিয়েছে পথটি। 'বরম' এক অরণ্যদেবতা। তিনি মানুষদের রক্ষা করেন। এবং তিনি যে এলাকায় পাহারা দেন সেখানে জানোয়ার হত্যা করতে দেন না। যে জঙ্গলের গভীরে এই পীঠ আছে। সেটি জানোয়ারে বোঝাই; আশপাশের বহু মাইল জায়গার চোরা-শিকারীদের এবং ভারতের সর্বত্রের শিকারীদের প্রিয় মৃগয়া-ভূমি। তবু সে জঙ্গলের সঙ্গে এক জীবন কালের পরিচয়েও আমি একটি বারের জন্যেও জানি নি ওই পীঠস্থানের সমীপে একটি জানোয়ারও গুলি খেয়েছে বলে। তাই আমাদের গ্রামের মোষ মারছিল যে-বাঘটি, তাকে মারার জন্যে সেদিন আমি যখা বেরোই, বরমের থানের এক মাইল দূরের একটি জায়গা নির্বাচন করি আমি। বিকেল চারটেয় আমি একটি ঝোপের পেছনের জায়গায় বসে যাই আর যেদিক থেকে বাঘটিকে আশা করছি সেদিকে একটি সম্বর ডাকল এক ঘণ্টা বাদে। কিছুক্ষণ বাদে আমার অপেক্ষাকৃত কাছে একটি কাকার ডাকতে শুরু করল; যে পথের কাছে আমি বসেছিলাম, তাই ধরে বাঘ আসছে। জঙ্গলটি মোটামুটি খোলামেলা। তাতে আছে বেশির ভাগ তরুণ জাম গাছ, দুই থেকে তিন ফুট মোটা। যখন ও দুশো গজ দূরে তখন আমি বাঘটিকে দেখলাম—এক বিশাল মদ্দা বাঘ। ও আসছিল ধীর চালে আর আমাদের মধ্যের দূরত্ব কমিয়ে এনেছিল একশো গজে, তখন আমি পাতার খসখস শব্দ শুনলাম; আর মুখ তুলে দেখলাম একটি জাম-গাছ, তার ডালপালা আরেকটির সঙ্গে জড়ানো, কাত হতে শুরু করেছে। অতি মন্দ গতিতে গাছটি টলতে থাকলে যতক্ষণ না একই জাতের ও মাপের আরেকটি গাছকে ছোঁয়। কয়েক মুহূর্তে দ্বিতীয় গাছটি প্রথমটির ভার সইল, তারপর সেটিও টলে পড়তে শুরু করল। গাছদুটি যখন সোজা অবস্থা থেকে আন্দাজ তিরিশ ডিগ্রী কোণে পৌঁছেছে, ওরা একটি তৃতীয়, একটু ছোট গাছে বেধে গেল। এক কি দুই মুহূর্তের বিরতি, তারপর তিনটি গাছই হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল। আমার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে গাছগুলি দেখছিলাম যখন, বাঘটির ওপরও একটা চোখ রেখেছিলাম। পাতাগুলির প্রথম শব্দেই ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর গাছগুলি যখন মাটিতে ভেঙে পড়ল ও ঘুরে দাঁড়াল, এবং ঘাবড়াবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়েই যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে প্রস্থান করল। আমি যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম তাকে স্বাভাবিকতার বাইরে বলে ব্যাখ্যা করতে হবে এই কারণের জন্যে: গাছগুলি তরুণ ও সতেজ; ওদের শিকড় শিথিল করে দেবার মত কোনো বৃষ্টিপাত সম্প্রতি ঘটে নি; জঙ্গলে এক ঝলক বাতাসও বইছিল না; আর পীঠস্থানে যাবার পথের ওপরই পড়ল গাছগুলি যখন বাঘটি আর সত্তর গজ এলেই আমি যে গুলিটি মারব বলে অপেক্ষা করছি তা ছুঁড়তে পারি।

গুলি মারার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেড়ে যায়, যখন যে জনবসতির এলাকায় মানুষজন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা বাজারে যাওয়া-আসা করতে পারে ; অথবা আপেল-বাগিচা থেকে হনুমানদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে গুলি ছোঁড়া হতে পারে ; তেমন জায়গায় থাকে অভিপ্রেত শিকারটি। নদীতে পৌঁছতে বাঘিনীটির এখনো তিনশো গজ যেতে হবে, আর তার মধ্যে দুশো গজই হল ফাঁকা জমি, যার ওপর একটি গাছ বা ঝোপ নেই। সামান্য কান্নি মেরে বাঘিনী আমাদের দিকে আসছে, আমরা যে নড়াচড়াই করি তা দেখতে পাবে ও ; অতএব ওকে দেখে চলা ছাড়া কিছুই করতে পারি না আমি। আর কোনো বাঘিনী কোনোদিন এত আস্তে চলে নি। মুক্তেশ্বরের লোকজনের কাছে ও 'খোঁড়া বাঘ' নামে পরিচিত কিন্তু ওর খোঁড়াত্বের কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না আমি। ওকে যখন লক্ষ করছি, তখন মাথায় এই পরিকল্পনা দানা বাঁধতে লাগল যে ও আগাছার জঙ্গলে ঢোকা অব্দি সবুর করব, তারপর সামনে ছুটে যাব, আর ও নদীটা পেরোবার আগে অথবা পরে একটা গুলি মারতে চেষ্টা করব। ও যে জায়গাটা তাক করে যাচ্ছে সেটার এবং আমার মধ্যে যথেষ্ট আড়াল থাকলে ওকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি সামনে চলে যেতাম ; আর হয় ফাঁকা জমির ওপরই ওকে মারতে চেষ্টা করতাম, নয়তো তাতে বিফল হলে ওই নদীতে ওকে আটকাতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নড়াচড়া গোপনে সারবার মত যথেষ্ট আড়াল ছিল না ; তাই ফাঁকা জমি ও নদীর মধ্যবর্তী ঝোপে বাঘিনী না-ঢোকা অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতেই হল। আমি না-ফেরা অব্দি লোকজনকে নড়তে বা কোনো আওয়াজ না-করতে বলে, বাঘিনী যেই চোখের আড়ালে গেল অমনি আমি দৌড়ে রওনা হলাম। পাহাড়টি খুব খাড়াই, আর যেমন বাঁক ঘিরে ছুটছি, পৌছলাম একটি বন-গোলাপের ঝোপে, সেটি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে বহু গজ বিস্তৃত। ঝোপের মধ্য দিয়ে একটি নিচু সুড়ঙ্গ ছিল আর সেটি দিয়ে ছুটব বলে যেমন সামনে ঝুঁকেছি, আমার টুপি খুলে পড়ল আর সুড়ঙ্গের শেষে তড়বড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ফলে মাথায় যে কাঁটা ফুটল তার টানে আমি শূন্যে উঠে যাচ্ছিলাম প্রায়। এই বনগোলাপের কাঁটা বাঁকানো খুবই শক্ত আর যে-হেতু আমি থামতে পারলাম না সে-হেতু কিছু কাঁটা আমার মাথায় ভেঙে গিয়ে গেঁথে থাকল—যখন আমি বাড়ি যাই আমার দিদি ম্যাগি সেগুলো বের করতে কষ্ট পেয়েছিলেন খুব—অন্য কাঁটাগুলো চামড়া ছিঁড়ে দিল। মুখ বেয়ে সরু সরু ধারে রক্ত ঝরছে, আমি ছুটতেই থাকলাম যতক্ষণ না ওপরের পাহাড় থেকে আংশিক ভুক্ত মড়িটি যে গহ্বরে গড়িয়ে ফেলেছিলাম সেটির কাছে পৌঁছই। এ গর্তটি আন্দাজ চল্লিশ গজ লম্বা আর তিরিশ গজ চওড়া। যেখানে মড়িটি পড়েছিল সেই ওপর কিনার ; মড়ির ওপরকার পাহাড়

এবং আরো দূরের পাড়, সব ঘন গুল্ম বনে আকীর্ণ। গর্তটির নাবালের আধখানায় আর আমার দিকের পাড়টিতে ঝোপ নেই। গহ্বরটির কিনারে গিয়ে যেমন উঁকি মেরেছি, একটা হাড় ভাঙতে শুনলাম। আমার আগেই বাঘিনী গর্তে পৌঁছে গেছে আর পুরনো মড়িটা পেয়ে গত রাতে যে-আহার থেকে ও বঞ্চিত হয়েছে, সেটা পুরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

মড়িটিতে খুব কম মাংসই আছে। ওটি ছেড়ে বাঘিনী যদি ফাঁকা জায়গাটিতে বেরিয়ে আসে তবে আমি ওকে একটা গুলি মারতে পাই, কিন্তু ও যদি পাহাড় অথবা দূরের পাড়টির চড়াই ধরে উঠে যায়, আমি ওকে দেখতে পাব না। যে নিবিড় গুল্মঝোপ থেকে আমি বাঘিনীটার আওয়াজ পাচ্ছি, তা থেকে একটি সংকীর্ণ পথ আমার দিকের পাড়ে উঠে এসেছে এবং আমার বাঁয়ে এক গজের ভেতর দিয়ে গেছে, আর পথটির এক গজ ওপারে গেলে সিধে পড়তে হবে পঞ্চাশ ফুট নিচে নদীটিতে। ওর ওপরকার পাহাড়ে একটা পাথর ছুঁড়ে বাঘিনীটিকে গুল্মবন থেকে তাড়িয়ে খোলা জায়গাটায় বের করে আনার সম্ভাবনা বিবেচনা করছি, এমন সময়ে আমার পেছনে একটা শব্দ শুনলাম। পেছনে চেয়ে দেখি আমার টুপি হাতে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ। সে সময়ে ভারতে কোনো ইউরোপীয়ান টুপি ছাড়া চলাফেরা করত না; আর গোলাপ-ঝাড়ের পাশে আমার টুপিটা পড়ে থাকতে দেখে গোবিন্দ সেটি কুড়িয়ে নিয়ে আমার কাছে এনেছে। আমাদের কাছেই পাহাড়ে একটা গর্ত ছিল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমি গোবিন্দর বাহু ধরলাম, ওই গর্তে চেপে ঢোকালাম ওকে। মোড়ানো হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে, আমার টুপি জাপটে উবু হয়ে বসে ও সে গর্তে মাপে-মাপে এঁটে গেল; এবং খুবই হতভাগ্য কোনো বস্তুর মত দেখাচ্ছিল ওকে, কেন না ও কয়েক গজ দূরে বাঘিনীটার হাড়-চিবনো শুনতে পাচ্ছিল। আমি যেমন সিধে হয়ে পাড়ের কিনারে আগেকার জায়গায় ফিরে দাঁড়িয়েছি, বাঘিনী খাওয়া বন্ধ করল। হয় ও আমায় দেখেছে; নয়, যা বেশি সম্ভব, পুরনো মড়িটা ওর পছন্দ হয় নি। এক দীর্ঘ মিনিট কোনো নড়াচড়া বা শব্দ রইল না, তারপর আমি ওর দেখা পেলাম। ও উলটো পাড়টা বেয়ে উঠেছে, এখন ওর ওপর দিয়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে। ওখানে কয়েকটা ছ ইঞ্চি মোটা পপলার চারা গাছ, আর ওগুলোর ভেতর দিয়ে যখন বাঘিনী চলছিল, আমি ওর শরীরের বহিরেখা দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু। আমার বুলেট চারাগাছগুলো এড়াবে, বাঘিনীকে বিঁধবে এই ক্ষীণতম আশায় আমি রাইফেল উঁচোলাম আর দুম করে গুলি ছুঁড়লাম একটা। আমার গুলিতে বাঘিনী সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, পাড় ধরে নামল, গহ্বরটি পেরোল এবং যত দ্রুত পারে আমার দিকের পথে চলে এল। আমি তখন জানি না যে আমার বুলেট বিঁধেছে ওর মাথার কাছে এক চারাগাছে। জানি না ওর

এক চোখ কানা। তাই যা দেখে মনে হল এ এক অতি দৃঢ়সংকল্প আক্রমণ ; তা শুধু এক ভয় পাওয়া জন্তুর বিপদ থেকে পলায়নও হতে পারে কেন না সেই আবদ্ধ জায়গায়, কোন দিক থেকে আমার রাইফেলের আওয়াজ এল, তা ও বুঝতে নাও পারে। সে যাই হ'ক, আমি যাকে আহত ও অতি ক্রুদ্ধ এক বাঘিনী ভাবছি, সে আমার দিকেই আসছে সোজা ; তাই ও যতক্ষণে দু গজের দূরত্বে আসে ততক্ষণ সবুর করে আমি সামনে ঝুঁকলাম আর অশেষ সৌভাগ্যবশে রাইফেলের বাকি গুলিটি বেঁধাতে পারলাম যেখানে ওর ঘাড় ও কাঁধ মিশেছে সেই নাবালে। আমার বাঁ কাঁধ ওর থেকে ফস্‌কে যাবার জন্যে যেটুকু বাধা প্রয়োজন সেই ভারি ৫০০ বুলেট সেটুকু বাধাই দিতে পারল ওকে, আর ওর শারীর-বেগ ওকে ফেলে দিল পঞ্চাশ ফুট নিচে, তলার নদীতে, সেখানে ও পড়ল জোর ঝপাং শব্দে। এক পা এগিয়ে আমি কিনার থেকে চাইলাম আর দেখলাম শূন্যে পা তুলে বাঘিনীটা পড়ে আছে এক আবদ্ধ জলে ডুবে, আর সে জল লাল হয়ে উঠছে ওর রক্তে।

গোবিন্দ তখনো গর্তেই বসে আছে, ইশারা করতে ও আমার কাছে এল। বাঘিনীকে দেখে ও ফিরে শৈলশিরার ওপরের মানুষদের চেঁচিয়ে বলল, 'বাঘটা মরেছে। বাঘটা মরেছে।' শৈলশিরার ওপরে তিরিশটি লোক এখন চেঁচাতে শুরু করল আর ওদের হল্লা শুনে বদ্রী তার শটগান নিয়ে দশটা গুলি ছুঁড়ল। সে শব্দ মুক্তেশ্বর এব আশপাশের গ্রামে শোনা গেল এবং অচিরে চারদিক থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাল নদীটিতে। সাগ্রহ বহু হাত বাঘিনীটিকে জল থেকে টেনে তুলল, তাকে একটি চারাগাছে বাঁধল এবং বিজয়গর্বে নিয়ে গেল বদ্রীর বাগিচায়। সকলে দেখার জন্যে এখানে তাকে রাখা হল খড়ের বিছানায়, তখন এক পেয়ালা চায়ের জন্যে আমি গেলাম গেস্টহাউসে। এক ঘণ্টা বাদে হাত লন্ঠনের আলোয় আমি বাঘিনীটার চামড়া ছাড়ালাম ; চারদিক ঘিরে অনেক লোকের এক জমায়েত দাঁড়িয়ে, তার ভেতর মুক্তেশ্বরের বহু শিকারীও ছিল। তখনই আমি দেখলাম বাঘিনীর এক চোখ কানা আর ওপর-পায়ে এবং সামনের ডান পার থাবার তলে গেঁথে আছে এক থেকে ন ইঞ্চি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্রায় পঞ্চাশটি শজারুর কাঁটা। রাত দশটার মধ্যে আমাব কাজ শেষ হল ; আর সঙ্গে রাত কাটাবার জন্য বদ্রীর অতীব সদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আমি পাহাড় বাইলাম যারা মুক্তেশ্বর থেকে এসেছে তাদের সঙ্গে ; তাদের মধ্যে ছিল চামড়া-বাহী আমার দুটি লোক। ডাকঘরের সামনে ফাঁকা জায়গায় পোস্টমাস্টার ও তাঁর বন্ধুদের দেখার জন্যে চামড়াটি মেলে রাখা হল। মাঝরাতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের জন্যে আমি সাধারণের জন্যে সংরক্ষিত ডাকবাংলোয় গিয়ে শুলাম। চারঘণ্টা বাদে আবার চলতে শুরু করলাম আর বাহাত্তর ঘণ্টা অনুপস্থিতির পর দুপুরে নৈনিতালে ফিরলাম স্বগৃহে।

মানুষখেকো নিধন মানুষকে এক তৃপ্তির অনুভূতি দেয়। যে কাজ করা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল, সে কাজ করার তৃপ্তি। এক অতি সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার স্বস্থানে পরাজিত করবার তৃপ্তি। আর, একটি সাহসী ছোট্ট মেয়ের হাঁটবার জন্যে পৃথিবীর এক ফালি ছোট্ট জায়গাকে বিপদমুক্ত করে দেবার তৃপ্তি হল সবার চেয়ে বড়।

৩
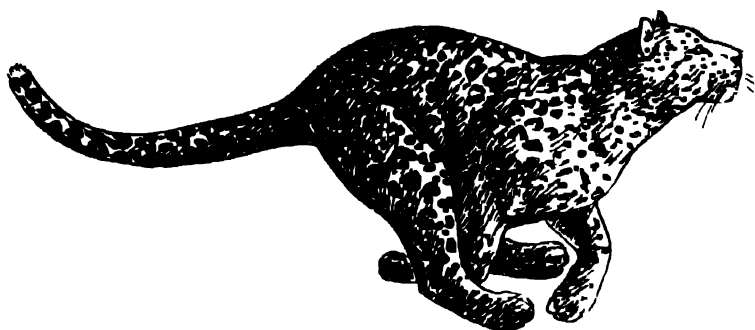
পানারের মানুষখেকো

১

১৯০৭ সালে যখন চম্পাবতের মানুষখেকোর শিকারে ফিরছিলাম, তখন শুনেছিলাম একটি মানুষখেকো চিতার কথা ; সেটি আলমোড়া জেলার পূর্ব-সীমানার গ্রামগুলির অধিবাসীদের ত্রাসিত করছিল। হাউস অফ কমন্‌সে এর বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং এই চিতাটি বহু নামে পরিচিত ছিল ; সে চারশো মানুষ মেরেছে বলে বলা হচ্ছিল। জানোয়ারটিকে আমি জানতাম পানারের মানুষখেকো নামে এবং অতএব, আমার গল্পের উদ্দেশ্যে আমি এই নামটিই ব্যবহার করব।

১৯০৫ সালের আগে সরকারী নথিপত্রে মানুষখেকো বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই এবং দেখে ধারণা হয়, চম্পাবতের বাঘ এবং পানারের চিতার আগমনের আগে কুমায়ুনে মানুষখেকোরা অজানিত ছিল। সেইজন্যে যখন এই দুটি জানোয়ার এসে দেখা দিল,—দুটিতে মিলে এরা আটশো ছত্রিশটি মানুষ মেরেছিল—সরকার এক সঙ্গিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল ; কেন না এদের বিরুদ্ধে কার্যকর করবার মত কোনো ব্যবস্থা সরকারের ছিল না, শিকারীদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন জানাবার ওপরেই ভরসা করতে হল। দুর্ভাগ্যবশত কুমায়ুনে সে সময়ে অতি অল্প শিকারীই ছিলেন যাঁদের এই নতুন জাতের শিকারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল এবং এ শিকারকে মনে করা হত কয়েক বছর বাদে এভারেস্ট বিজয়ে উইলসনের একক প্রচেষ্টার মতই অনিশ্চিত-বিপদপূর্ণ, তা সে ঠিক অথবা ভুল, যাই হ'ক। এভারেস্টের বিষয়ে উইলসন যেমন, মানুষখেকোদের বিষয়ে আমিও তেমনি সমান অজ্ঞই ছিলাম এবং আমি যে আমার প্রচেষ্টায় সফল হই,

যখন স্পষ্টই দেখা গেল তাঁর প্রচেষ্টায়, তিনি বিফল হলেন, এ একেবারে ভাগ্যের দয়ায়।

চম্পাবতের বাঘ মারার পর যখন নৈনিতালে স্ব-গৃহে ফিরে এলাম, পানারের চিতা শিকারের ভার নিতে আমাকে সরকার তরফে অনুরোধ জানানো হল। সে সময়ে জীবিকার্জনের জন্য আমি কঠিন শ্রম করছিলাম আর এ কাজের ভার নেবার সময় পেতে আমার অনেক হপ্তা কেটে গেল; তারপর, চিতাটি যেখানে কার্যকলাপ চালাচ্ছে, আলমোড়া জেলার সেই সীমান্ত অঞ্চলে রওনা হতে যেই প্রস্তুত হলাম; মুক্তেশ্বর, যেখানে একটি মানুষখেকো বাঘ এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে সেখানকার লোকদের সাহায্যার্থে যাবার জন্যে নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার বারথাউডের কাছ থেকে এক জরুরী তার পেলাম। বাঘটিকে শিকার করার পর, যার এক বিবরণী আমি দিয়েছি, আমি পানারের চিতার সন্ধানে গেলাম।

যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চিতাটি তার কার্যকলাপ চালাচ্ছিল, যেহেতু সেখানে আগে যাই নি, আমি গেলাম আলমোড়া হয়ে, আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার স্টিফের কাছ থেকে চিতাটির বিষয়ে যা পারি জেনে নিয়ে যেতে। ভদ্রতা করে ও আমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করল, ম্যাপ জুটিয়ে দিল, তারপর যখন বিদায়েচ্ছা জানাচ্ছে, সবরকম বিপদের সম্ভাবনা আমি বিবেচনা করে দেখেছি কি না, আমার উইল লিখে সে বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়েছি কি না, তখন এ কথা জিজ্ঞেস করে আমায় খানিকটা ঘাবড়ে দিল।

আমার ম্যাপগুলিতে দেখা গেল, আক্রান্ত অঞ্চলে পৌছবার দুটি পথ; একটি পিথোরাগড় রোডে অবস্থিত পানোয়ানালা দিয়ে; অপরটি দাবিধুরা রোডে অবস্থিত লাম্‌গারা দিয়ে। পরের পথটি বেছে নিলাম আমি আর একটি ভৃত্য ও আমার মালবাহী চারজন লোকসহ লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়লাম, সে উইলের উল্লেখ সত্ত্বেও—খোশমেজাজেই। আমার লোকজন ও আমি ইতিমধ্যেই খৈরনা থেকে চোদ্দ মাইল কষ্টসাধ্য পদযাত্রা করে এসেছি, কিন্তু তরুণ বয়স্ক এবং সুস্বাস্থ্যবান হওয়ার দরুন ক্ষান্ত দেবার আগে আমরা আরেক দীর্ঘ পথ হাঁটতে প্রস্তুত ছিলাম।

পূর্ণিমার চাঁদ যখন উঠছে আমরা পৌছলাম ছোট একটি জনবসতি থেকে দূরে এক নিরালা বাড়িতে; তার দেওয়ালের হিজিবিজি লেখা আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া কাগজের টুকরো থেকে আমরা ধরে নিলাম ওটি এক স্কুল হিসেবে ব্যবহার হয়। আমার সঙ্গে কোনো তাঁবু ছিল না, এবং যেহেতু বাড়িটির দরজা তালাবন্ধ, আমার লোকজন সহ উঠোনে রাত কাটানো স্থির করলাম; সম্পূর্ণ নিরাপদ এ ব্যবস্থা কেন না এখনো আমরা মানুষখেকোটির শিকার ক্ষেত্র থেকে বহু মাইল দূরে। এই উঠোনটি প্রায় কুড়ি ফুট সম-চতুষ্কোণ, সরকারী পথের

ওপর ঝুলছে এটি এবং তিনদিকে এটি দুই ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। চতুর্থ দিকে স্কুলবাড়িটি এর সীমানা।

স্কুলের পেছনের জঙ্গলে ছিল প্রচুর জ্বালানী কাঠ, ভৃত্য আমার রাতের খানা রাঁধবে বলে উঠোনের এক কোণে আমার লোকজন শীঘ্রই, গনগনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেস দিয়ে বসেছিলাম আমি; ধূমপান করছিলাম; পথের সবচেয়ে কাছের নিচু পাঁচিলের ওপর আমার ভৃত্য তখনি রেখেছে একটা পাঁঠার ঠ্যাং আর ঘুরে বসেছে আগুনটা ঠিকঠাক করতে; তখনি আমি দেখলাম পাঁঠার ঠ্যাংটির কাছের পাঁচিলটির ওপারে জেগে উঠল একটি চিতার মাথা। মুগ্ধ হয়ে নিস্পন্দে বসে আমি দেখতে থাকলাম,—কেন না চিতাটি আমার মুখোমুখি—আর ভৃত্যটি যখন কয়েক ফুট সরেছে সবে. চিতাটি মাংসটি কামড়ে ধরল আর রাস্তা লাফিয়ে ওপারের জঙ্গলে চলে গেল। মাংসটি রাখা হয়েছিল একটা বড় কাগজে, মাংসে সেঁটে গিয়েছিল সেটা, যখন আমার ভৃত্য কাগজের খসখস শুনল আর দেখল, ও ভেবেছিল কুকুর; মাংসটা নিয়ে পালাচ্ছে—ও চেঁচাতে চেঁচাতে সামনে ছুটে গেল; কিন্তু সামান্য এক কুকুরের নয়, এক চিতার পেছনে ছুটছে বুঝেই ও উলটো মুখে ঘুরল এবং আরো জোরে ছুটে এল আমার দিকে। দুপুরের রোদে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া অন্যান্য কারণেও প্রাচ্যের সকল শ্বেতাঙ্গই অল্প-বিস্তর খ্যাপা বলে খ্যাত; এবং আমার আশংকা, যখন আমায় হাসতে দেখল, আমার সুভৃত্যটি ভাবল আমার মত অধিকাংশের চেয়ে আমি একটু বেশি খ্যাপা, কেন না ও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল. 'চিতাটা নিয়ে গেল আপনারই খানা আর আপনি খান. এমন আমার আর কিছুই নেই।' যাহ'ক, সময়ে ও এমন খানা হাজির [illegible] যাতে ওকে তারিফ করতে হয় এবং এই খানার প্রতি আমি যা করলাম ক্ষুধার্ত চিতাটি তার উৎকৃষ্ট পাঁঠার ঠ্যাঙের প্রতি সেই সুবিচার করেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

পরদিন সকালে ভোর-ভোর রওনা হয়ে আমরা খাওয়ার জন্যে লামগারায় একটু থামলাম, এবং সন্ধের মধ্যে পৌঁছলাম মানুষখেকোটির সাম্রাজ্য সীমায় ডোল ডাকবাংলোয়। বাংলোতে আমার লোকজনদের রেখে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম মানুষখেকোটির খবর যোগাড়ের চেষ্টায়। যেতে যেতে, চিতার থাবার ছাপের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামে সংযোগকারী পায়ে চলা পথগুলি নিরীক্ষণ করতে করতে সন্ধ্যা পেরোলে আমি এক বসতি-বিচ্ছিন্ন খামারে পৌঁছলাম; তাতে আছে স্লেটপাথরের ছাত-দেওয়া, পাথরে তৈরি একটিমাত্র বাড়ি; কয়েক বিঘা আবাদী জমির মধ্যে সেটি অবস্থিত এবং আগাছার জঙ্গলে পরিবৃত। এই খামার-মুখো পায়ে চলা পথে আমি একটা বড় মদ্দা চিতার থাবার ছাপ দেখলাম।

বাড়ির কাছে যেমন এগিয়েছি, সংকীর্ণ ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এল একটি

লোক এবং সামান্য কয়টি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে এক জোয়ান, হয়তো বাইশ বছর বয়স, এবং সে অত্যন্ত বিপন্ন। জানা গেল, আগের দিন রাতে, বাড়ি বলতে যে একটিমাত্র ঘর তার মেঝেতে ও আর ওর বউ ঘুমোচ্ছিল; এপ্রিল মাস, বেজায় গরম, তাই দোর ছিল খোলা, তখন নরখাদকটি ঝুলবারান্দায় উঠে আসে এবং ওর স্ত্রীর গলা কামড়াতে পেরে মেয়েটিকে ঘর থেকে মাথার দিকে টেনে বের করতে থাকে। রুদ্ধ আর্তনাদে মেয়েটি একটা হাত ছুঁড়ে দেয় স্বামীর গায়ে আর কি ঘটছে তা নিমেষে বুঝে ফেলে তার স্বামী। সে তৎক্ষণাৎ এক হাতে মেয়েটির বাহু ধরে আর ঠেকা দেবার জন্যে আরেকটা হাত চেপে ধরে চৌকাঠের গায়ে, মেয়েটিকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেয় চিতার কাছ থেকে আর দরজা বন্ধ করে দেয়। বাকি রাতটা ধরে লোকটি এবং ওর স্ত্রী ঘরের এক কোণে সিঁটিয়ে থাকে ভয়ে, ওদিকে চিতাটা চেষ্টা করে দরজা ভেঙে ফেলতে। বায়ুপ্রবাহ বর্জিত গরম ঘরে মেয়েটির জখমগুলো সেপটিকে দাঁড়াতে থাকে এবং সকালের মধ্যে যন্ত্রণা ও ভয় ওকে অচৈতন্য করে ফেলে।

সারাদিন লোকটি ওর স্ত্রীর কাছে থাকল: তাকে রেখে যেতে পারল না এই ভয়ে যদি চিতাটি ফিরে এসে তাকে নিয়ে যায় এবং ও ওর নিকটতম প্রতিবেশীর কাছে, পৌঁছতে মধ্যবর্তী এক মাইল ব্যাপী আগাছার জঙ্গল পেরতে ভরসা পাচ্ছিল না। দিনের যবনিকা যখন নামছে, হতভাগ্য লোকটি আরেক আতঙ্ক-জনক রাতের সম্মুখীন হতে চলেছে, আমাকে বাড়ির দিকে আসতে দেখল ও; এবং ও যে আমার দিকে ছুটে এল, কাঁদতে কাঁদতে পড়ল আমার পায়ে, তাতে আর অবাক হলাম না আমি, যখন ওর কাহিনী শুনলাম।

এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম আমি। যে-অঞ্চলে এক নরখাদক কার্যকলাপ চালাচ্ছে সেখানকার লোকদের প্রাথমিক-চিকিৎসার সরঞ্জাম যোগান দেবার জন্য তখনো সরকারের সমীপস্থ হই নি আমি; তাই আলমোড়ার এদিকে কোনো ডাক্তারী বা অন্য সহায়তা পাবার উপায় নেই এবং আলমোড়া পঁচিশ মাইল দূরে। মেয়েটির জন্য সাহায্য আনতে হলে সে জন্য আমাকে নিজে যেতে হয় এবং তার মানে দাঁড়ায় লোকটিকে উন্মাদ হবার দণ্ড দেওয়া; কোনো মানুষের পক্ষে যতখানি সহ্য করা সম্ভব তা ও ইতিমধ্যেই সয়েছে; এবং চিতাটা ফিরে আসার ও ঢোকার প্রচেষ্টার সম্ভাবনা নিয়ে ও ঘরে আর একটি রাত থাকলে ওকে উন্মাদাগারে যেতে হত তা সুনিশ্চিত।

ছেলেটির স্ত্রী, একটি আঠার বছরের মেয়ে, চিত হয়ে শুয়েছিল, যখন চিতাটা ওর গলায় দাঁত বসায় এবং পুরুষটি যখন স্ত্রীর হাত চেপে ধরে পেছনে টানতে শুরু করে—তখন চিতাটা, আরো ভালভাবে ধরবার জন্যে একটা থাবার নখ ওর বুকে বিঁধিয়ে দেয়। শেষ ধস্তাধস্তির সময়ে চারটে

গভীর ক্ষত রেখে নখগুলো মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। ছোট ঘরটিতে শুধু একটি দরজা, জানলা নেই, এক ঝাঁক মাছি ভনভন করছে সেখানে। উত্তাপে মেয়েটির গলা ও বক্ষের সব জখমগুলোই সেপটিকে দাঁড়িয়েছে এবং ডাক্তারী-সহায়তা যোগাড় করা যাক বা না যাক, ওর বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম; তাই সাহায্যের চেষ্টায় যাওয়ার পরিবর্তে আমি লোকটির সঙ্গে রাতটা থাকা ঠিক করলাম। চিতা অথবা বাঘ গলা কামড়ে ধরার দুর্ভাগ্য যে মানুষ বা জানোয়ারের হয়েছে, তার যন্ত্রণা চোখে দেখার অথবা কানে শোনার দণ্ড যেন যাঁরা এ কাহিনী পড়ছেন তাঁদের কখনো না হয়, এ আমি আন্তরিক কামনা করি—বিশেষ, যখন সে-যন্ত্রণা কমাতে বা শেষ করতে একটি বুলেট ব্যতীত অন্য উপায় হাতে নেই।

ঝুলবারান্দাটি ঘিরে আছে সারা বাড়িটি; দু-মুখেই তার তক্তা আঁটা; সেটি প্রায় পনের ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া; একটি পাইন চারাগাছে খাঁজকাটা সিঁড়ি দিয়ে তাতে ওঠা যায়। এই সিঁড়িগুলির মুখে মুখে হচ্ছে বাড়ির একটি দরজা, আর ঝুলবারান্দার নিচে জ্বালানী কাঠ রাখার জন্য চার ফুট লম্বা ও চার ফুট চওড়া একটি উন্মুক্ত খুপরি।

ওর স্ত্রী এবং ওর সঙ্গে ঘরে থাকতেই আমাকে অনুরোধ জানাল লোকটি কিন্তু তা করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে; কেন না যদিও আমি পিটপিটে নই তবু ঘরের ভেতর গন্ধ একেবারে প্রচণ্ড তীব্র এবং আমার সহ্যসীমার বাইরে। তাই ঝুলবারান্দার নিচের খুপরির একপাশ থেকে ও আর আমি জ্বালানী কাঠ সরিয়ে একটু ছোট্ট জায়গা বের করলাম, সেখানে আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে পারি। এখন রাত ঘনিয়ে আসছে তাই কাছের একটি ঝরনা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে আমি বসে গেলাম নিজের কোণটিতে আর লোকটিকে বললাম স্ত্রীর কাছে যেতে, ঘরের দরজা খুলে রাখতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ও শুধোল, 'চিতাটা তো আপনাকে নির্ঘাত মারবে সাহেব, তখন আমি কি করব?' আমি জবাব দিলাম, 'দরজা বন্ধ করে দেবে আর সকাল হবার অপেক্ষা করবে।'

চাঁদ পূর্ণিমায় পৌঁছতে তখনো দু-রাত বাকি আর এখনো সংক্ষিপ্ত সময়কাল অন্ধকার থাকবে। এই অন্ধকারের সময়টুকু উদ্বিগ্ন করছিল আমাকে। লোকটি যেমন বলেছে, চিতাটা যদি সেইমত সকালের আলো ফোটা অব্দি দরজা আঁচড়ে থাকে, ওটা খুব দূরে যাবে না; এখনো ওটা ঝোপগুলোর ভেতর ওৎ পেতে থাকতে পারে আমার ওপর নজর রেখে। এক ঠায়ে রইলাম আমি আধঘন্টা, অন্ধকারায়িত রাতের ভেতর চোখ চালিয়ে চালিয়ে, পুবের পাহাড়গুলোর ওপর চাঁদ উঠুক এ প্রার্থনা জানাতে জানাতে, তখন একটা শেয়াল বিপদ সংকেতের ডাক ডাকল। প্রাণীটির ফুসফুসের সকল শক্তি দিয়ে

ডাকা এ ডাক শোনা যায় বহুদূর ঝোপে ; একে বর্ণনা করা যায় 'ফিয়াও' !' 'ফি'য়াও' বলে ; যে বিপদ শেয়ালটিকে শঙ্কিত করেছে তা যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকে ততক্ষণ ডাকটি বারবার হতে থাকে। উদ্দিষ্ট শিকারকে মৃগয়া করবার অথবা তার কাছে আসার সময়ে চিতা চলে খুব মন্দবেগে ; ধরে নিচ্ছি এটা মানুষখেকোটাই, আর এটা আমাদের মাঝখানের আধমাইলটুকু পেরোবার আগে বহু মিনিট কাটবে ; আর যদি এর মধ্যে চাঁদ ওপরে নাও ওঠে তবু গুলি ছোঁড়ার মত যথেষ্ট আলো চাঁদ দেবে, তাই আমি আরেকটু সহজভাবে নিজেকে আলগা করতেও নিশ্বাস নিতে পারলাম।

মিনিটগুলো চলল টেনে টেনে। শেয়ালটা ডাক থামাল। পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল চাঁদ আমার সামনের জমিতে অত্যুজ্জ্বল আলোয় বান ডাকিয়ে। কোথাও কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ে না আর আমার ওপরে নিশ্বাসের জন্য হতভাগ্য মেয়েটির যন্ত্রণার্ত ব্যাকুলতাই সারা পৃথিবীতে একটি শব্দ, যা শোনা যাচ্ছে। মিনিট গড়িয়ে দাঁড়াল ঘন্টায়। চাঁদ উঠে গেল অমরায় তারপর নামতে শুরু করল পশ্চিমে, যে জমির ওপর নজর রেখে আছি তাতে বাড়িটির ছায়া ফেলে। বিপদের আরেক সময়কাল, কেননা চিতাটা, যদি আমায় দেখে থাকে. তবে এই দীর্ঘায়মান ছায়াগুলি ওর নড়াচড়াকে গোপন করবে বলে ও অপেক্ষা করবে চিতার স্বভাব-ধৈর্যে। কিছুই ঘটল না। এবং আমি যে-সব রাত পাহারা জেগেছি তার দীর্ঘতম একটি সমাপ্ত হল। বার ঘণ্টা আগে আকাশের যেখানে চাঁদ উঠেছিল, সে জায়গাটি সূর্যালোকে দীপ্ত হল।

তার আগের রাত পাহারা জাগার পর লোকটি প্রগাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছিল. এবং আমি যখন আমার কোণটি ছেড়ে আমার ব্যথাকনকনে হাড়গুলোকে আরাম দিচ্ছি—যাঁরা কঠিন মাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিস্পন্দ বসে থেকেছেন. শুধু তাঁরাই জানবেন হাড় কেমন কনকন করতে পারে—লোকটি সিঁড়ি ধরে নেমে এল। সামান্য কয়েকটি বুনো র‍্যাস্‌প্‌বেরি ছাড়া আমি চব্বিশ ঘণ্টায় কিছুই খাই নি ; এবং আর বেশি সময় থাকলে কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাই আমি লোকটিকে বিদায় জানালাম আর মেয়েটির জন্যে সাহায্য তলব করতে ও আমার লোকজনের সঙ্গে ফিরে জুটতে আমি আট মাইল দূরে ডোল ডাকবাংলোয় রওনা হলাম। মাত্র কয়েক মাইল গিয়েছি, আমার লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে ওরা আমার জিনিসপত্র গুছিয়েছে, ডাকবাংলোয় আমার দেয় টাকা মিটিয়েছে, তারপর আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন যে রোড ওভারশিয়ারের কথা আমার মন্দিরের বাঘের গল্পে বলেছি, তিনি এলেন। একটি গাঁট্টাগোঁট্টা ভুটিয়া টাট্টুতে বসেছিলেন উনি, এবং উনি চলেছেন আলমোড়ার পথে—স্টিফের কাছে আমার একটি চিঠি পেঁছে দেবার ভার উনি সানন্দে নিলেন। আমার চিঠি

পেয়ে স্টিফ মেয়েটির জন্যে চিকিৎসা সহায়তা পাঠায় তবে যখন তা এসে পৌঁছল তখন মেয়েটির যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে।

এই রোড ওভারশিয়ারই আমাকে সেই মানুষ মারা পড়ার খবর দেয় যে জন্যে আমি দাবিধুরায় যাই ; আমার এ-তাবৎ যত শিকার অভিজ্ঞতা ঘটেছে তার মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজক একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেখানে। সে অভিজ্ঞতার পর আমি দাবিধুরা মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রশ্ন করি, আমি যে বাঘটিকে মারতে ব্যর্থ হলাম, নরখাদকটি সে বাঘের মতই কার্যকরী বরাভয় পেয়ে থাকে না কি তাঁর মন্দির থেকে, এবং তিনি উত্তর দেন, 'না না সাহেব। এই শয়তানটি বহুজনকে মেরেছে, তারা আমার মন্দিরে পুজো করত এবং আপনি যা করবেন বলে বলছেন, ওকে মারতে ফিরে আসবেন যখন, আমি সকালে সাঁঝে আপনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাব।'

২

আমাদের জীবন যত সুখে পরিপূর্ণ হয়ে থাকুক না কেন. কোনো কোনো সময় আছে, তার দিকে ফিরে চাই আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতায়। ১৯১০ বছরটি আমার কাছে তেমনি এক সময়, কেননা সে বছরই আমি মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো বাঘ ও পানারের মানুষখেকো চিতাকে মারি. এবং দুইয়ের মাঝামাঝি —আমার কাছে তা দারুণ এক ব্যাপার—আমার লোকজন ও আমি মোকামাঘাটে কোনো যন্ত্রীয় সহায়তা ব্যতীত একটি কাজের দিনে পাঁচ হাজার পাঁচশো টন মাল ওঠানো নামানো করে এক সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপন করি।

পানারের চিতাকে মারার জন্য আমার প্রথম প্রচেষ্টা ক.. হয়েছিল ১৯১০ সালের এপ্রিল ; আর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করার জন্য আমি সে বছরের সেপ্টেম্বরের আগে সময় দিতে পারি নি। এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে চিতাটির দ্বারা কতজন মানুষ নিহত হয় আমার কোনো ধারণাই নেই, কেননা সরকার কর্তৃক কোনো বুলেটিন প্রকাশিত হত না এবং হাউস অফ কমন্সে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির বাইরে—আমার যতদূর জানা আছে চিতাটির বিষয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে কোনো উল্লেখ করা হয় নি। রুদ্রপ্রয়াগের চিতার দ্বারা নিহত একশো পঁচিশ-জনের বিপক্ষে পানারের চিতাটিকে চারশো মানুষ মেরেছে বলে দায়ী করা হয় ; এবং প্রথমটি এত সামান্য প্রচারকার্য আকর্ষণ করে যখন পরেরটি ভারতের সর্বত্র প্রধান সংবাদের সম্মান পায় এ ঘটনাদি সম্পূর্ণ এই কারণে ; যে বহুল ব্যবহৃত পথ থেকে বহুদূরের এক দুর্গম অঞ্চলে পানারের চিতা কার্যকলাপ চালিয়েছিল, যখন রুদ্রপ্রয়াগের চিতা কার্যকলাপ চালাচ্ছিল এমন এক অঞ্চলে যেখানে প্রতি বছর যেত দেশের নগণ্যতম থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যন্ত ষাট হাজার তীর্থ যাত্রী এবং তাদের সকলকেই মানুষখেকোটির প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করতে হত।

এই তীর্থযাত্রীরা এবং সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন রুদ্রপ্রয়াগের চিতাকে এমন বিখ্যাত করে তুলেছিল, যদিও পানারের চিতাটির চেয়ে এটি মানুষের অনেক কম যন্ত্রণা ঘটিয়েছিল।

পানারের চিতাকে মারার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা কালে ১০ই সেপ্টেম্বর আমি নৈনিতাল থেকে যাত্রা করলাম একটি ভৃত্য ও আমার তাঁবুর সাজসরঞ্জাম ও রসদবাহী চারজন লোক সহ। ভোর চারটেয় যখন বাড়ি ছেড়ে বেরোই তখনি আকাশ ছিল মেঘাবিড় এবং আমরা সবে সামান্য কয় মাইল গিয়েছি, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ল আর ভিজে জুবজুবে হয়ে আটাশ মাইলের এক পদযাত্রা করে আমরা পৌঁছলাম আলমোড়া। আমার সে রাতটা স্টিফের সঙ্গে কাটাবার কথা কিন্তু পরার মত এক সুতো শুকনো পোশাকও ছিল না বলে আমি মাপ চাইলাম এবং রাতটা কাটালাম ডাকবাংলোয়। সেখানে আর কোনো যাত্রী ছিল না এবং ভারপ্রাপ্ত লোকটি অতীব দয়ায় আমাকে দুটি কামরা ছেড়ে দিল; দুটিতেই গনগনে কাঠের আগুন ছিল এবং সকালের মধ্যে যাত্রা করে চলার পক্ষে আমার মালপত্র যথেষ্ট শুকিয়ে গেল।

এপ্রিলে যে পথে গিয়েছি আলমোড়া থেকে সেই একই পথে যাওয়া এবং যে বাড়িতে মেয়েটি জখম থেকে মারা গিয়েছিল সেই বাড়ি থেকে চিতাটি শিকারাভিযান শুরু করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। নৈনিতালে আমাদের ছুটছাট কাজ করত পানোয়া নামে এক মিস্ত্রী, আমি যখন প্রাতরাশ খাচ্ছি সে এসে হাজির হল। পানোয়ার বাড়ি পানার উপত্যকায় এবং আমি মানুষখেকোটিকে শিকার চেষ্টায় চলেছি এ কথা আমার লোকজনের কাছে জেনে সে আমাদের দলে যোগদানের অনুমতি চাইল; কেননা সে বাড়ি যেতে চায় আর একা যাবার ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছে। পানোয়া তল্লাটটি চেনে, ওর পরামর্শে আমি পরিকল্পনা পালটালাম এবং দাবিধুরার পথ ধরে যে স্কুলে চিতা আমার রাতের খানা খেয়েছিল তা হয়ে না গিয়ে আমি পিথোরাগড়ের যাত্রী পথটি ধরলাম। রাতটা পানোয়ানালার ডাকবাংলোয় কাটিয়ে পরদিন সকালে খুব ভোর-ভোর রওনা হলাম এবং কয়েক মাইল এগোবার পর ডান দিক নির্দেশকারী এক পায়েচলা পথ ধরতে পিথোরাগড় রোড ছাড়লাম। আমরা এখন মানুষখেকোটির রাজ্যসীমায়, সেখানে কোনো পথ নেই, গ্রাম থেকে গ্রামে যাবার পায়েচলা পথই হল একমাত্র সংযোগব্যবস্থা।

অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর কেন না তল্লাটের বহু শত বর্গমাইল ব্যাপী গ্রামগুলি অত্যন্ত ছড়ানো ছেটানো এবং যেহেতু মানুষখেকোটির সঠিক ঠিকানা জানা নাই সেহেতু খোঁজখবর নিতে প্রতিটি গ্রামে যাওয়া প্রয়োজন হল। সালান্ বরগোত পট্টি (কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পট্টি গঠিত) দিয়ে গিয়ে চতুর্থ দিনের সন্ধ্যা শেষে পৌঁছলাম চাকাতিতে; সেখানে গ্রামমোড়লের কাছে জানলাম পানার নদীর দূর

পার্শ্ব অঞ্চলে সানৌলি নামে এক গ্রামে কয়েকদিন আগে একটি মানুষ মারা পড়েছে। সম্প্রতি প্রচুর বর্ষণের কারণে পানার নদীতে বান ডেকেছে এবং গ্রামমোড়ল আমাকে ওর গ্রামে রাত কাটাতে পরামর্শ দিল ; পানার নদীতে সেতু নেই তাই নদী পেরোবার একমাত্র নিরাপদ জায়গাটি দেখাবার জন্য পরদিন সকালে এক পথপ্রদর্শক সঙ্গে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল ও।

এক সারবন্ধ দোতলা বাড়ির এক প্রান্তে আমি আর গ্রামমোড়ল কথাবার্তা কইছিলাম আর যখন তার পরামর্শে আমি এ গ্রামে রাত কাটাব ঠিক করলাম, ও বলল, ওপরতলায় আমার এবং আমার লোকজনের জন্যে ও দুটি ঘর খালি করিয়ে দেবে। ওর সঙ্গে কথা কইবার সময়েই আমি লক্ষ করেছিলাম একতলার শেষ কামরাটিতে কোনো বাসিন্দা নেই ; তাই আমি তাকে বললাম আমি এই ঘরে থাকব এবং আমার লোকদের জন্যে ওপরতলায় একটি কামরা ও খালি করিয়ে দিলেই হবে। যে কামরায় থাকব ঠিক করলাম তাতে কোনো দরজা নেই কিন্তু তাতে এসে যায় নি কিছু, কেননা আমাকে বলা হয়েছিল শেষ মানুষটি মারা পড়েছে নদীর দূর পার্শ্ব অঞ্চলে এবং আমি জানতাম, নদীটিতে যখন বান ডেকেছে তখন মানুষখেকোটি তা পেরোবার কোনো চেষ্টাই করবে না।

ঘরটিতে কোনোরকম আসবাবই ছিল না এবং সেঘর থেকে সমস্ত খড় ও ন্যাকড়ার টুকরো ঝাঁট দিয়ে বের করল আমার লোকজন ; করতে করতে অভিযোগ করল শেষ বাসিন্দাটি নিশ্চয় বেজায় নোংরা এক লোক ; ওরা মাটির মেবেতে আমার শতরঞ্জি বিছাল ও আমার বিছানা পাতল। উঠোনে খোলা জায়গায় আগুন জেবলে ভৃত্য আমার খানা বানাল, আমি তা বিছানায় বসেই খেলাম ; আর যে বার ঘণ্টা সিধে হয়ে ছিলাম তাতে আমি যেহেতু প্রচুর হাঁটা হেঁটেছি, ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না আমার। পরদিন সকালে ঘরটি আলোয় ভাসিয়ে সূর্য সবে উঠছে, তখন ঘরে একটা ছোট্ট আওয়াজ শুনে আমি চোখ খুললাম এবং আমার বিছানার কাছে মেবেতে একটি লোককে বসে থাকতে দেখলাম। তার বয়স বছর পঞ্চাশেক, আর সে তখন কুষ্ঠ রোগের শেষ পর্যায়ে। আমি জেগেছি দেখে এই হতভাগ্য জীবন্মৃতটি বলল, ও আশা করছে ওর ঘরে আমি আরামেই রাত কাটিয়েছি। ও বলে চলল. এক সংলগ্ন গ্রামে দু-দিন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং ফিরে এসে ওর কামরায় আমাকে ঘুমোতে দেখে আমার বিছানার কাছে বসেছিল এবং আমার জাগবার অপেক্ষা করছিল।

প্রাচ্যের সকল ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক, সবচেয়ে ছোঁয়াচে এই কুষ্ঠ। কুমায়ুনের সর্বত্র অতি ব্যাপক, বিশেষ আলমোড়া জেলায় তা বিশেষ বিদ্যমান। ভাগ্যবাদী হওয়ার দরুন জনসাধারণ ব্যাধিটিকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে দেখে এবং না করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক, না করে সংক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো সাবধানতা অবলম্বন। তাই, স্পষ্টতই গ্রামমোড়লটি আমাকে সতর্ক করা

প্রয়োজন মনে করে নি, যে ঘরটি আমি থাকব বলে নির্বাচন করেছি তাতে বহু বছর ধরে এক কুষ্ঠরোগীর আবাস। সে সকালে পোশাক পরে নিতে দেরি হল না আমার, এবং আমাদের পথপ্রদর্শক প্রস্তুত হতেই আমরা গ্রাম ছাড়লাম।

কুমায়ুনে যেমন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, বরাবরই কুষ্ঠ বিষয়ে ভয় করেছি আমি, এবং সেই গরিব হতভাগ্যের ঘরে রাত কাটিয়ে আমার যেমন নোংরা বোধ হচ্ছিল, তেমনটি আর কখনো হয় নি। প্রথম নদীটিতে পেঁছেই ভৃত্য আমার প্রাতরাশ প্রস্তুত করবে বলে এবং আমার লোকজন খেয়ে নেবে বলে যাত্রা স্থগিত করলাম। লোকজনকে আমার শতরঞ্চি ধুতে ও আমার বিছানা রোদে মেলে দিতে বলে আমি কার্বলিক সাবানের একটি বার নিলাম, এবং বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ঘিরে নদীটিতে যেখানে ছোট্ট একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, চলে গেলাম সেখানে। ও ঘরে যে জামাকাপড় পরেছিলাম সেগুলি সব খুলে ফেলে ধুলাম জলাশয়ে এবং পাথরের চাঁইয়ে তা মেলে দিয়ে, নিজেকে আগে কখনো যেমন করে ঘষি নি তেমনি করে ঘষে বাকি সাবানটুকু খরচ করলাম। এই কড়া ধোলাইয়ের পর পোশাকগুলো খানিক কুঁচকোল, দু ঘণ্টা বাদে তাই পরে লোকজনদের কাছে ফিরে এলাম আমি ; আবার নিজেকে পরিষ্কার বোধ হল, আর প্রাতরাশের খিদেটা হল শিকারীজনোচিত।

আমাদের পথপ্রদর্শক প্রায় চারফুট ছ ইঞ্চি লম্বা একটি মানুষ, তার মস্ত মাথায় একরাশ লম্বা চুল, মস্ত পিপের মত শরীর, খাটো পা এবং কম কথার মানুষ ও। যখন জিজ্ঞেস করলাম খুব খাড়া চড়াই ভাঙতে হবে কি না, ও মুঠ খুলে হাতটি মেলে দিয়ে জবাব দিল, 'এই রকম সমানে যাব।' এ কথা বলেই ও আমাদের নিয়ে গেল এক অত্যন্ত খাড়াই পাহাড়ের উৎরাইয়ের গভীরে এক উপত্যকায়। আশা করেছিলাম এখানে ও মোড় ঘুরবে এবং যেখানে নদী ও উপত্যকার সঙ্গমস্থল, উপত্যকাটি হেঁটে সেখানে যাবে। কিন্তু না। একটি কথা না বলে, একবারও মাথা না ফিরিয়ে ও ফাঁকা জায়গাটি পেরোল এবং ও প্রান্তের পাহাড় ধরে সিধে উঠে গেল। অত্যন্ত খাড়াই এবং কাঁটা ঝোপে ঢাকার ওপর এ পাহাড়ে ছিল আলগা নুড়িপাথর, তাতে চলা খুব কষ্টকর হচ্ছিল আর সূর্য যেহেতু মাথার ওপর, রোদ বেজায় চড়া, আমরা ঘামে নেয়ে পাহাড়ের চুড়োয় পেঁছিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শকটির কিছুই হয় নি, ওর ঠ্যাং দুটো মনে হল পাহাড় চড়ার জন্যেই তৈরি।

পাহাড়ের চুড়ো থেকে চারধার সুবিস্তীর্ণ দেখা যাচ্ছিল, এবং যখন পথপ্রদর্শকটি জানাল, পানার নদীতে পেঁছবার আগে আমাদের এখনো সামনের জমির দুটি উঁচু পাহাড়ে চড়তে হবে ; পানোয়া, সেই মিস্ত্রী, ওর পরিবারের জন্যে উপহারাদির একটা পোঁটলা এবং ভারি গাঢ়রঙের কাপড়ে তৈরি একটা ওভারকোট বইছিল—সে কোটটি পথপ্রদর্শককে দিল এবং বলল, যেহেতু সে

আমাদের কুমায়ুনের সকল পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করছে, যেহেতু বাকি পথটা ওই ওভারকোটটি বইতে পারে। শরীরে জড়িয়ে রাখা একগাছা ছাগলের লোমের রশি খুলে নিয়ে পথপ্রদর্শকটি কোটটি ভাঁজ করে পিঠে বেঁধে নিল আঁট করে। ওপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে ওপরে আমরা চললাম, তারপর নিচে, দূরে, এক উপত্যকার গভীরে দেখলাম নদীটি। এ পর্যন্ত আমরা হেঁটেছি পথচিহ্নহীন মাটিতে, একটি গ্রামও চোখে পড়ে নি, কিন্তু এখন আমরা পেঁাছলাম এক সংকীর্ণ পথে, তা সিধে পেঁাছেছে নদীতে। নদীর যত কাছে এলাম আমরা, নদীর চেহারা তত কম পছন্দ হল আমার। যে পথটি জল অব্দি, এবং জলের ওপার দিয়ে গেছে, তার চেহারায় মালুম হল এখানে একটি পারঘাট ছিল, কিন্তু নদীতে এখন বান, আমার মনে হল পার হওয়া খুব বিপজ্জনক হবে। তবে পথপ্রদর্শকটি ভরসা দিল পার হওয়া সম্পূর্ণই নিরাপদ, তাই আমার জুতো মোজা খুলে আমি পানোয়ার হাতে হাত জড়িয়ে জলে নামলাম। নদীটি আন্দাজ চল্লিশ গজ চওড়া এবং তার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ দেখে আমার মনে হল খুব এবড়োখেবড়ো বুকের ওপর বইছে নদীটি। এ আমি ঠিকই ধরেছিলাম, এবং কয়েকবার পায়ের আঙুলে মোচড় খেয়ে, পা হড়কে ভেসে যাওয়া কোনোমতে বাঁচিয়ে আমরা কোনোরকমে দূরের পাড়ে উঠলাম।

পথপ্রদর্শকটি আমাদের পেছু পেছু নদীতে নেমেছিল। এবং পিছন ফিরে চেয়ে দেখি ছোটখাট মানুষটি বিপদে পড়েছে। যে জল আমাদের ক্ষেত্রে উরু অব্দি গভীর, সে ওর ক্ষেত্রে কোমর-জল, এবং মুখ্য নদীস্রোতে পেঁাছে স্রোতের বিরুদ্ধে পিঠ ঠেকিয়ে কাঁকড়ার মত বেঁকে না-হেঁটে অত্যন্ত বোকার মত ও স্রোতের মুখোমুখি দাঁড়াল; ফল হল ও পিছনে উলটে পড়ল এবং দ্রুতধা স্রোতে ভেসে গেল। আমার পা খালি, ধারাল পাথরের ওপর আমি অকেজো, কিন্তু পানোয়ার কাছে ধারাল পাথর কোনো বাধাই নয়; যে পোঁটলা বইছিল তা ফেলে দিল ও এবং এক লহমাও ইতস্তত না করে ও ছুটল নদীর পাড় ধরে; সেখানে আরো পঞ্চাশ গজ ভাটিতে এক ভয়াবহ নদীপ্রপাতের মুখে একটা বিশাল পাথরের চাই নদীর ওপর ঝুলে এগিয়ে আছে। দৌড়ে এই ভিজে ও পিছলে পাথরে উঠে পানোয়া উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং ডুবন্ত লোকটি যখন ভেসে বেরিয়ে যাচ্ছে, পানোয়া চেপে ধরল ওর লম্বা চুল এবং মরিয়া লড়াই করে ওকে সে-পাথরে টেনে ওঠাল। ওরা দুজন যখন আমার কাছে আবার এল—পথপ্রদর্শকটিকে ডোবা-ইঁদুরের মত দেখাচ্ছিল—নিজের জীবন অত্যন্ত বিপন্ন করে এই ছোট্ট মানুষটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি পানোয়াকে তার মহান দুঃসাহসিক কাজের জন্য প্রশংসা করলাম। কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে পানোয়া বলল, 'আরে, ওর জীবন নয়, ওর পিঠে আমার যে নতুন কোট বাঁধা ছিল তাই বাঁচাচ্ছিলাম আমি!' যাক, সে উদ্দেশ্য যাই হ'ক না

কেন, একটা ট্রাজিডী বাঁচানো গেছে, এবং আমার লোকজন হাতে-হাত বেঁধে নিরাপদে পার হবার পর আমি ঠিক করলাম আজ ক্ষান্ত দেওয়া যাক এবং নদীর পাড়ে রাতটা কাটানো যাক। নদীর উজানে পাঁচ মাইল দূরে পানোয়ার গ্রাম, ও এখন আমায় ছেড়ে চলে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল পথপ্রদর্শককে. সে দ্বিতীয়বার নদী পেরোতে ভয় পাচ্ছিল।

৩

যেখানে শেষ মানুষটি মারা পড়েছে, পরদিন সকালে আমরা সেই সানৌলি খুঁজতে বেরোলাম। সেদিন সন্ধ্যাশেষে আমরা পোঁছলাম এক বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত উপত্যকায়; আর যেহেতু কোনো জনপদ চোখে পড়ল না, রাতটা ফাঁকা জমিতে কাটাব স্থির করলাম। আমরা এখন মানুষখেকোর দেশের একেবারে মধ্যিখানে, এবং ঠাণ্ডা, ভিজে মাটিতে এক অত্যন্ত অস্বস্তির রাত কাটিয়ে দুপুর নাগাদ পোঁছলাম সানৌলিতে। এই ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দারা আমাদের দেখে অতি আহ্লাদিত হল এবং সানন্দে আমার লোকজনকে ছেড়ে দিল একটি ঘর এবং খড়ের চালের নিচে এক খোলা চাতালে আমায় থাকতে দিল।

গ্রামটি গড়ে উঠেছে একটি পাহাড়ের গায়ে; পাহাড়ের মুখোমুখি একটি উপত্যকা; উপত্যকাটিতে আলবাঁধা ধাপ-কাটা খেত; খেত থেকে সম্প্রতি এক ফলন ধান কাটা হয়েছে। উপত্যকার দূর প্রান্তে পাহাড়টি অতি ধীর ঢালে উঠেছে; এবং আবাদী জমি থেকে একশো গজ দূরে প্রায় ষাট বিঘা জুড়ে এক নিরেট খণ্ড গুল্মবন। এই গুল্মবন-খণ্ডের ওপরে শৈলপ্রান্তে একটি গ্রাম, আর ডাইনে পাহাড়ের ঢালে আরেকটি গ্রাম। ধাপ-কাটা খেতগুলি বাঁয়ে উপত্যকাটি বেঁধে ফেলেছে একটি ঘাস ঢাকা খাড়া পাগাড়। তাই, আসলে, গুল্মবন-খণ্ডটি তিন দিকে আবাদী জমিতে ঘেরা, চতুর্থ দিকে উন্মুক্ত ঘেসো জমি।

প্রাতরাশ যখন তৈরি হচ্ছে, গ্রামের লোকরা আমায় ঘিরে বসে কথা কইতে থাকল। মার্চের দ্বিতীয়ার্ধ এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধে এ অঞ্চলে চারটি মানুষ নরখাদকটির হাতে নিহত হয়েছে। পাহাড়ের গায়ের গ্রামে প্রথম মানুষটি মারা পড়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন মারা পড়ে শৈলপ্রান্তের গ্রামে, চতুর্থ জন সানৌলিতে। চারজন নিহতই মারা পড়ে রাতে, পাঁচশো গজ টেনে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় গুল্ম বনখণ্ডে, সেখানে চিতাটি তাদের খায় ধীরে সুস্থে; কেননা কোনো আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায়, মৃতদেহ উদ্ধারের কোনো প্রচেষ্টা চালাতে তিনটি গ্রামের বাসিন্দাই খুব ভয় পেয়েছিল। ছয়দিন আগে শেষ মানুষটি মারা পড়েছে এবং আমার তথ্যদাতারা দৃঢ়বিশ্বাসে স্থির যে চিতাটি তখনো ওই গুল্মবন-খণ্ডেই আছে।

সেদিন সকালের দিকে একটা গ্রাম দিয়ে আসি, আসার সময় আমি দুটি তরুণ মন্দা ছাগল কিনেছিলাম, এবং সন্ধ্যার দিকে আমি ওর মধ্যে যেটি ছোট সেটিকে নিয়ে, চিতাটি ওর আড়ালেই আছে গ্রামবাসীদের এ ধারণা পরখ করতে আগাছা জঙ্গলের পথের কিনারে সেটিকে বেঁধে দিলাম। ছাগলটির টোপ ফেলে আমি বসলাম না কেননা কাছাকাছি কোনো উপযোগী গাছ ছিল না; মেঘও জমছিল আর দেখে মনে হল রাতে বৃষ্টি হতে পারে। আমার ব্যবহারের জন্য যে চাতালটি দেওয়া হয় সেটির চারপাশই খোলা; তাই তার কাছে আমি এই আশায় দ্বিতীয় ছাগলটি বাঁধলাম। ভাবলাম যদি রাতে চিতাটি গ্রামে এসে দেখা দেয়, তবে ছিবড়ে মাংসের একটা মানুষের চেয়ে একটি কোমল মাংসের ছাগলই পছন্দ করবে বেশি। রাতে অনেকক্ষণ অব্দি দুটি ছাগলকে পরস্পর ডাকতে শুনলাম আমি। তাতে আমার আরো বিশ্বাস হল চিতাটি শ্রবণ-গোচর পাল্লার মধ্যে নেই। যাই হ'ক, ও কেন এ অঞ্চলে ফিরবে না তার কোনো যুক্তি নেই; তাই যা হলে সবচেয়ে ভাল তারই প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমোতে গেলাম আমি।

রাতে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল আর নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠল যখন, তখন প্রতিটি পাতা, ঘাসের প্রতিটি ডগা বৃষ্টি বিন্দুতে ঝলমল করছে এবং যে পাখিটির গান গাইবার গলা আছে, সে গান গেয়ে দিনটিকে আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমার চাতালের কাছের ছাগলটি তৃপ্তিতে একটি ঝোপে পাতা খুঁজছিল এবং মাঝে মধ্যে ডাকছিল, ওদিকে উপত্যকার ওধারের ছাগলটি মৌন। ভৃত্যকে আমার প্রাতরাশ গরম রাখতে বলে আমি উপত্যকা পার হলাম এবং যেখানে ছোট ছাগলটিকে বেঁধেছিলাম, সেই জায়গায় গেলাম। এখানে এসে দেখলাম, বৃষ্টি আসার কিছুক্ষণ আগে একটি চিতা ছাগলটিকে মেরেছে, রশি ছিঁড়েছে. এবং টেনে নিয়ে গেছে মড়ি। ছেঁচড়ে নেবার দাগ বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে কিন্তু তাতে এসে যায় না কিছু, কেননা একটি মাত্র জায়গায় চিতাটি তার মড়ি নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে আর তা হল ওই নিবিড় আগাছার জঙ্গলে।

মড়িসহ চিতা অথবা বাঘের পেছু পেছু যাওয়া হচ্ছে, আমি যত রকম চিত্তাকর্ষক ধরন জানি শিকারের, তার মধ্যে অন্যতম একটি; তবে অবস্থা সকল যখন অনুকূলে তখনি সাফল্যের কোন প্রত্যাশা মনে রেখে এতে রত হওয়া যায়। এখানে অবস্থাগুলি অনুকূল নয় কেননা নিঃশব্দে প্রবেশ করতে পারার পক্ষে আগাছার জঙ্গলটি অত্যন্ত নিবিড়। গ্রামে ফিরে এসে আমি প্রাতরাশ খেলাম, তারপর আশপাশের অঞ্চল বিষয়ে পরামর্শ করব বলে সব গ্রামবাসীদের একত্রে ডাকলাম। মড়িটি আমার দেখতে যাওয়া দরকার, কারণ চিতাটি শিকারে বসবার মতো যথেষ্ট হাড়গোড় রেখে গেছে কিনা তা দেখবার জন্য, এবং তা করতে গেলে চিতাটিকে বিরক্ত করা আমি এড়িয়ে যেতে পারব না। গ্রামবাসীদের

কাছ থেকে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা হল, আমার দ্বারা বিরক্ত হলে যেখানে চিতাটি চলে যেতে পারে কাছাকাছির মধ্যে তেমন কোনো গা-ঢাকা দেবার মত ভাল জায়গা আছে কি না। আমাকে বলা হল দু মাইলের এদিকে তেমন কোনো জায়গা নেই, এবং সেখানে পেঁছিতে হলে চিতাটিকে অনেকখানি আবাদী জমি পেরোতে হবে।

দুপুরে আমি ফিরে গেলাম সেই আগাছার জঙ্গলে এবং যেখানে ওটাকে মেরেছে, তা থেকে একশো গজ দূরে পেয়ে গেলাম ছাগলটির যা কিছু ফেলে গেছে চিতাটি—খুর, শিং এবং পাকস্থলীর কিয়দংশ। যেহেতু দিনের এ সময়ে এ আশ্রয় ছেড়ে চিতাটির দু মাইল দূরের জঙ্গলে চলে যাবার ভয় নেই, অনেক ঘণ্টা ধরে বুলবুল, ফিঙে, দামা এবং ঠোঁটবাঁকা-ছাতারেদের সহায়তায় আমি চিতাটির খোঁজ পাবার চেষ্টা করলাম; ওরা সবাই চিতাটির প্রতিটি নড়াচড়ার খোঁজ দিচ্ছিল আমাকে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনটি গ্রামের পুরুষদের জড়ো করি নি আমি; তাদের বাধ্য করি নি চিতাটিকে হাঁকিয়ে ফাঁকা জায়গায় বের করতে; যেখানে সেটাকে গুলি করতে পারতাম; এ কথা বলা দরকার যে যারা বন হাঁকাবে তাদের অত্যন্ত বিপন্ন না করে সে চেষ্টা করা যেত না। যেই চিতাটি দেখত তাকে তাড়িয়ে ফাঁকা জমিতে বের করা হচ্ছে, সে পিছিয়ে পালাতে যেত এবং যে কেউ তার পথে বাধা সৃষ্টি করত, তাকেই করত আক্রমণ।

চিতাটিকে গুলি করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর গ্রামে ফিরে ম্যালেরিয়ার বিশ্রী এক তাড়সে আমি কাত হলাম এবং পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা চাতালে পড়ে রইলাম অজ্ঞান ভাবে। পরদিন সন্ধ্যার মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল এবং আমি শিকারাভিযান চালাতে পারলাম। আগের রাতে নিজেদের উদ্যোগেই আমার লোকজন, প্রথম ছাগলটি যেখানে মারা পড়ে সেখানে বেঁধে দিয়েছিল দ্বিতীয় ছাগলটিকে; কিন্তু চিতাটি সেটাকে ছোঁয় নি। এ খুব ভাল হল কেননা চিতাটি এখন ক্ষুধার্ত এবং আশাভরে আমি তৃতীয় সন্ধ্যায় যাত্রা করলাম।

আগাছার জঙ্গলের কাছাকাছি জায়গায়, দু রাত আগে যেখানে ছাগলটি নিহত হয়, সেখান থেকে আন্দাজ একশো গজ দূরে একটি বুড়ো ওক গাছ। দুটি ধাপ-কাট খেতের মধ্যের একটি ছ-ফুট উঁচু পাড় থেকে গজিয়েছে গাছটি এবং এমন এক কোণ সৃষ্টি করে পাহাড়টি থেকে বাইরে হেলে আছে যে আমার পক্ষে রবারের সোলের জুতো পরে গুঁড়িটি বেয়ে হেঁটে ওঠা সম্ভব হল। গুঁড়িটির তলের দিকে এবং মাটি থেকে পনের ফুট উঁচুতে একটি ডাল নিচের খেতের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ডালটি এক ফুট আন্দাজ মোটা এবং ফাঁপা ও পচা বলে ওটার ওপর বসা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে, যেহেতু সে গাছে ওটিই একমাত্র ডাল, এবং যেহেতু বহুশত গজ বৃত্তের মধ্যে আর অন্য কোনো গাছ নেই তাই আমি ডালটিতে বসার ঝুঁকি নেওয়া স্থির করলাম।

আগাছার জঙ্গলে আমি যে থাবার ছাপ দেখি, এপ্রিলে যেখানে মেয়েটি নিহত হয় সেই খামার অভিমুখী পথের পাশে যে থাবার ছাপ দেখেছি, তার সঙ্গে এর মিল থাকাতে যে চিতার সঙ্গে আমি মোকাবিলা করছি সেই যে পানারের মানুষ-খেকো একথা বিশ্বাস করার সবরকম কারণ ছিল আমার। আমার লোকজনকে বেশ কিছু লতানে বনগোলাপের লম্বা কাঁটাসুদ্ধ ডগা কাটতে বললাম। গাছটির গায়ে ঠেস দিয়ে ডালে পা ছড়িয়ে বসার পর আমি ওদের দিয়ে কাঁটাডগা-গুলোর বাণ্ডিল বাঁধালাম, সেগুলো গাছের গুঁড়িতে রাখালাম এবং শক্ত দড়ি দিয়ে সেগুলো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আঁট করে বাঁধালাম। আমার স্থির বিশ্বাস এই ছোট ছোট কাজগুলি দক্ষভাবে সম্পন্ন করার ওপরই আমার জীবন নির্ভর করছে।

দশ থেকে বিশ ফুট অবধি লম্বা অনেকগুলো কাঁটা-ডগা গাছের দু'পাশে বেরিয়ে ছিল; এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য ধরার মত আমার কিছু ছিল না বলে আমি ডগাগুলো আমার দু'দিকে টেনে নিলাম এবং আমার বাহু ও শরীরের মাঝখানে শক্ত করে চেপে রাখলাম। পাঁচটার মধ্যে আমার প্রস্তুতি খতম হয়ে গেল। গলাটা বাঁচাবার জন্য সামনে কোটের কলার ভাল করে তুলে, ঘাড়ের পেছনটা বাঁচাবার জন্যে আমার নরম টুপিটা পেছনপানে টেনে নামিয়ে গাছের ডালটিতে আমি শক্ত করে চেপে বসে থাকলাম। আমার সামনে তিরিশ গজ দূরে খেতে পোঁতা এক খুঁটিতে ছাগলটি বাঁধা এবং আমার লোকজন খেতে বসে ধূমপান করছিল ও জোরে জোরে কথা বলছিল।

এ পর্যন্ত সে আগাছার জঙ্গলে সবই ছিল চুপচাপ কিন্তু এখন একটি অসি-ছাতারে কান ফাটানো ডাকে আশঙ্কা-সংকেত জানাল এবং এক অথবা দুই মিনিট বাদে তার অনুসরণে অনেকগুলো রসিক-দামা কিচমিচ করল। পার্বত্য অঞ্চলে সংবাদদাতাদের মধ্যে এই দুই প্রজাতির পাখি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং ওদের ডাক শুনে আমি ইশারায় আমার লোকজনদের গ্রামে ফিরতে বললাম। মনে হল, এ কাজটি করল তারা পরমানন্দে এবং জোরে জোরে কথা বলতে বলতে ওরা যেমন চলে যেতে থাকল, ছাগলটি শুরু করল ডাকতে। পরের আধ ঘণ্টা কিছুই ঘটল না এবং তারপর, গ্রামের উপরকার পাহাড়ে যেমন রোদ পড়ে আসছিল, আমার ওপরে গাছে যে দুটি ফিঙে বসেছিল তারা উড়ে গেল; আমার এবং আগাছার জঙ্গলের মাঝখানের ফাঁকা জমিতে কোন জানোয়ারকে ঠোকরাতে শুরু করল। ডাকার সময়ে ছাগলটি গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল এবং এখন সে মুখ ঘোরাল, আমার মুখোমুখি হল ও ডাকাডাকি থামাল। ফিঙেরা যাকে ঠোকরাচ্ছে, ছাগলটির আগ্রহ যাতে, সে জানোয়ারটির চলাফেরা আমি অনুসরণ করতে পারছিলাম ছাগলটিকে নজরে রেখে এবং একমাত্র চিতাই হতে পারে এই জানোয়ার।

চাঁদ ছিল তৃতীয় যামে এবং বহু ঘণ্টা ব্যাপী অন্ধকার থাকবে। আলোর অবস্থা যখন অনুকূলে থাকবে না তখন চিতাটির আসার কথা অনুমান করে নিয়ে আমি নিজেকে সশস্ত্র করেছিলাম গুলি বোঝাই একটি টুয়েল্‌ভ্‌-বোর্‌ দোনলা শটগানে ; কেননা আটটি গুলিতে চিতাটিকে বিঁধবার সম্ভাবনা, একটি মাত্র রাইফেল বুলেটে বিঁধবার সম্ভাবনার চেয়ে আমার বেশিই। আমি যে সময়ের কথা লিখছি, তখন রাত-শিকারের সহায়ক হিসেবে ভারতে বিজলী বাতি ও টর্চ ব্যবহার হত না এবং সঠিক নিশানার জন্য নির্ভর করার জন্য ছিল শুধু অস্ত্রটির নলে জড়িয়ে বাঁধা এক ফালি সাদা কাপড়।

আবার বহু মিনিট ধরে কিছুই হল না, তারপর, আমি যে কাঁটা-ডগাগুলো ধরে আছি তাতে একটা আল্‌তো টান পড়ল ; এবং পূর্ব চিন্তাবশে হেলানে গাছটিতে কাঁটা-ডগাগুলো বেঁধেছি বলে আমি ধন্যবাদ দিলাম নিজেকে, কেননা নিজেকে বাঁচাতে আমি পিছু ফিরতে পারব না এবং যত ভালই হ'ক, আমার কোট ও টুপির আমাকে বাঁচাবার ক্ষমতা সামান্যই। আমি এক মানুষ-খেকোর সঙ্গেই এবং এক অতি দৃঢ় সংকল্প মানুষখেকোর সঙ্গে মোকাবিলা করছি, এখন আর প্রশ্ন নেই তাতে। কাঁটার ওপর দিয়ে গাছে চড়তে পারবে না দেখে, প্রথম টান-মারার পর চিতাটি দাঁতে কামড়ে ধরেছে কাঁটা-ডগার গোড়াগুলো। সেগুলো ঝাঁকাচ্ছে সজোরে, আমাকে টেনে চেপে ধরছে শক্ত করে গাছের গুঁড়ির গায়ে। এখন দিবালোকের শেষটুকুও মিলিয়ে গেল আকাশ থেকে ; চিতাটি তার সব মানুষকে শিকার করে অন্ধকারে, ও এখন স্বরাজ্যে সম্রাট, আমি তা নই কেননা অন্ধকারে মানুষ হল সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে অসহায়। এবং নিজের কথাই বলি—তখন সাহস খুব কমে যায়। চারশো মানুষকে রাতে মারার ফলে চিতাটি আমার বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভয়—যখন গোড়া ধরে টান মারছে, গ্রাম থেকে মানুষদের উদ্বেগে শোনার মত যথেষ্ট জোরে ও গরগর করছে এই ঘটনাই তার প্রমাণ। লোকজনরা আমাকে পরে বলেছিল এ গরগরানি ওদের আতঙ্কিত করছিল, কিন্তু এখানে আমার ওপর হচ্ছিল বিপরীত প্রতিক্রিয়া কেননা তাতে আমাকে জানতে দিচ্ছিল চিতাটি কোথায় আছে এবং সে কি করছে। যখন সে চুপ করে থাকছিল তখনি আমি সব চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম, কেননা আমি জানি না এরপরে ও কি করবে। সবলে গোড়াগুলিতে টান মেরে ও বহুবার আমাকে প্রায় ফেলে দিল আসন থেকে এবং হঠাৎ ওগুলো টানা ছেড়ে দিচ্ছিল ; আর এখন যেহেতু অন্ধকার, শক্ত করে আঁকড়ে ধরার কিছু নেই আমারও নিশ্চিত মনে হল যদি লাফ মারে, আমাকে হুড়মুড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেবার জন্য ওর আমাকে ছোঁবার ওয়াস্তা শুধু।

নৈঃশব্দ্যের এমন এক স্নায়ু-ছিঁড়ে ফেলা বিরতির পর চিতাটি উঁচু পাড় থেকে লাফিয়ে নামল ও ছাগলটির দিকে তেড়ে গেল। শিকার করার মত যথেষ্ট

আলো থাকতে থাকতেই চিতাটি আসবে এই আশায়, চিতাটি ছাগলটির ওপর গিয়ে পড়ার আগেই ওকে মারার সময় পাবার জন্যে আমি ছাগলটিকে গাছটা থেকে ত্রিশ গজ দূরে বেঁধেছিলাম। কিন্তু এখন এই অন্ধকারে আমি ছাগলটির প্রাণ বাঁচাতে পারলাম না—সাদা হওয়ার দরুণ আমি ওটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম অস্পষ্ট একটা ধ্যাবড়া দাগের মত—তাই ওটা লাফাঝাঁপি বন্ধ করা অব্দি আমি অপেক্ষা করলাম এবং যেখানে চিতাটা থাকবে বলে ভাবলাম সেদিকে তাক করে ট্রিগার টিপলাম। আমার গুলির জবাব দিল এক ক্রুদ্ধ গর্জন এবং চিতাটি যেমন পেছনে পড়ে গেল ও আরেকটি উঁচু পাড়ের নিচে ওপারের খেতে মিলিয়ে গেল, আমি একটা সাদা ঝলক দেখলাম।

চিতাটির কাছ থেকে আরো আওয়াজের জন্য দশ বা পনের মিনিট আমি কান পেতে থাকলাম, এবং তখন আমার লোকজন চেঁচিয়ে ডাকল ও জিজ্ঞেস করল ওরা আমার কাছে আসবে কি না। ওরা যদি ডাঙা জমি ধরে আসে তাহলে ওদের আসা এখন সম্পূর্ণই নিরাপদ। তাই আমি ওদের পাইন কাঠের মশাল জ্বালাতে এবং আমার পরবর্তী নির্দেশ পালন করতে বললাম। জীবিত গাছ থেকে কেটে নেওয়া বার থেকে আঠার ইঞ্চি লম্বা রজন-নিষিক্ত পাইন কাঠের টুকরোর এই মশালগুলি উজ্জ্বল আলো দেয় এবং কুমায়ুনের সুদূরের গ্রামগুলিতে এই মশালগুলিই একমাত্র আলোকসজ্জা, যা ওরা জানে।

প্রচুর চেঁচামেচি, ছোটাছুটির পর আন্দাজ বিশ জন লোক প্রত্যেকে একটি মশাল নিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরোল এবং আমার নির্দেশ অনুসরণে ধাপ-কাটা খেতগুলি থেকে উঁচু জায়গা দিয়ে ঘুরে আমার গাছটির পেছন দিক থেকে এল। গাছের সঙ্গে কাঁটা বুনো গোলাপের ডগাগুলি-বাঁধা দড়িটির গিঁটগুলি চিতাটি টেনে এমন আঁট করে ফেলেছিল, যে সেগুলো কাটতে হল। কাঁটাগুলো সরিয়ে ফেলবার পর ওরা গাছে চড়ে আমাকে ধরে নামাল কেন না অসুবিধে করে বসার ফলে আমার পায়ে খিঁচ ধরেছিল।

যে খেতে নিহত ছাগলটি পড়েছিল, মশালের মিলিত আলো সেটি আলোকিত করে তুলল কিন্তু তার ওপারের ধাপ-কাটা খেতটিতে ছায়া। সিগারেট বিলি হবার পর আমি লোকদের বললাম যে আমি চিতাটিকে জখম করেছি তবে কত গুরুতর ভাবে তা জানি না; আমরা এখন গ্রামে ফিরব এবং আমি সকালে জখম জানোয়ারটির খোঁজ করব। এতে গভীর আশাভঙ্গ প্রকাশ পেল। 'আপনি যদি চিতাটিকে জখম করে থাকেন, ওটা নিশ্চয় এতক্ষণে মরে গেছে।' 'এখানে আমরা অনেকে আছি, আর আপনারও বন্দুক আছে একটা, তাই কোনো ভয় নেই।' 'অন্তত খেতটার কিনারা যতটা তন্দূর অব্দি যাই আমরা আর দেখি চিতাটা রক্তের নিশানা রেখে গেছে কি না।' চিতাটিকে এখনি খোঁজ করতে যাবার সপক্ষে ও বিপক্ষে সব যুক্তি ফুরিয়ে যাবার পর আমার সুবুদ্ধি যা বলে,

সে বিচারবোধের বিরুদ্ধেই আমি খেতটির কিনারা অব্দি যেতে রাজী হলাম ; সেখান থেকে আমরা নিচের ধাপ-কাটা খেতে চেয়ে দেখতে পারব।

ওদের অনুরোধ মেনে নেবার পর আমি লোকদের দিয়ে শপথ করালাম যে ওরা লাইন বেঁধে আমার পেছনে আসবে ; ওদের মশালগুলো উঁচিয়ে ধরবে ; যদি চিতাটা আক্রমণ করে আমাকে আঁধারে ফেলে রেখে পালাবে না। অতীব আগ্রহে ওরা কথা দিল এবং মশাল বদলে সেগুলি ভাল করে জ্বলবার পর আমরা রওনা হলাম ; আমি সামনে সামনে হাঁটতে থাকলাম, লোকজন পাঁচ গজ পেছনে আসতে লাগল।

ছাগলটির কাছে যেতে ত্রিশ গজ, খেতের কিনারে পেঁছিতে আরো বিশ গজ। খুব ধীরে, নীরবে আমরা সামনে এগোলাম। যখন ছাগলটির কাছে পেঁছিলাম, নিচের খেতটির দূর প্রান্তটি চোখে পড়ল, এখন আর রক্তের নিশানা খোঁজার সময় নেই। কিনারের যত কাছে এগোলাম, এই খেতটি আরো বেশি দেখা যেতে থাকল এবং যখন মশালের আলোর ওদিকে মাত্র এক সংকীর্ণ জমির ফালিতে শুধু ছায়া—চিতাটা ক্রমান্বয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে পাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠল এবং তার পুরোটাই দেখা গেল।

আক্রমণ করতে যাচ্ছে যে চিতা, তার ক্রুদ্ধ গর্জনে ভয়ংকর ভয়ধরানো কি যেন আছে, এবং যারা বাঘের সামনে নির্ভীক তেমন এক সার হাতিকে আমি দেখেছি আক্রমণোদ্যত চিতার সামনে ফিরে প্রাণভয়ে ইতস্তত পালাতে ; তাই যখন আমার সঙ্গীরা—সকলেই তারা নিরস্ত্র—একসঙ্গে পেছন ফিরে পালাল, আমি অবাক হলাম না। আমার সৌভাগ্যক্রমে পালিয়ে যাবার ব্যস্ততায় ওদের পরস্পরে ধাক্কা লাগে ও ওদের হাতে আল্গা করে ধরা কয়েকটি জ্বলন্ত পাইন কাঠের চ্যালা মাটিতে পড়ে যায়, দপদপ করতেই থাকে এবং চিতাটির বুকে কতকগুলো গুলি বেঁধাবার জন্য আমাকে যথেষ্ট আলো দেয়।

আমার গুলি শুনে ওরা ছুট থামাল এবং আমি একজনকে বলতে শুনলাম, 'আরে না! উনি আমাদের উপর রাগ করবেন না, কেননা উনি জানেন, এ-শয়তানটা আমাদের সাহস জল করে দিয়েছে।' হ্যাঁ, গাছের ওপর আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে মানুষখেকোর ভয় মানুষের সাহস কেড়ে নেয়। আর দৌড়নোর কথা, আমি যদি মশালধারীদের একজন হতাম, সেরা ছুটিয়েটির সঙ্গে ভাগতাম। তাই আমার রাগ করবার কিছুই ছিল না। ওদের অপ্রস্তুতি কাটাবার জন্যে আমি যখন চিতাটাকে খুটিয়ে দেখার ভান করছি, তখন অচিরে ওরা দুজন-তিনজন করে ফিরে এল। ওরা জড়ো হলে পরে আমি মুখ না তুলেই বললাম, 'চিতাটাকে গ্রামে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তোমরা একটা বাঁশের খুটি আর দড়ি এনেছিলে কি?' ওরা সাগ্রহে জবাব দিল, 'হ্যাঁ সেগুলো আমরা গাছের নিচে ছেড়ে এসেছি।' আমি বললাম, 'যাও,

সেগুলো আন গে। কেননা এক কাপ গরম চায়ের জন্যে আমি গ্রামে ফিরে যেতে চাই।' উত্তর থেকে বয়ে-আসা শীতল রাতের বাতাস ম্যালেরিয়ার আরেকটি তাড়স এনেছে এবং এখন সব উত্তেজনার অবসানে, পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল।

বহু বছরের মধ্যে আজ রাতে এই প্রথম সানৌলির লোকরা সন্ত্রাস মুক্ত হয়ে রাত্তিরে ঘুমোল, এবং নির্ভয়ে তারা ঘুমুতে থাকল।

৪

চুকার মানুষখেকো

১

লাঢিয়া উপত্যকার মানুষখেকো বাঘকে যে জায়গাটি নিজের নামটি ধার দিয়েছিল সে চুকা হল লাঢিয়া ও সারদা নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে সারদা নদীর ডান পাড়ে আন্দাজ দশ-লাঙলী একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটির উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে একটি পথ দুভাগে ভাগ হয়ে যাবার আগে সিকি মাইল গেছে জঙ্গল-জুলে সাফ হয়ে তৈরি একটি পথ ধরে; একটি পথ এক শৈলশিরায় সিধে উঠে গিয়ে থাক গ্রামে গেছে, অন্যটি তির্যক রেখায় পাহাড়গুলিতে উঠে ও সেগুলি পেরিয়ে গেছে চুকার লোকদের মালিকানাভুক্ত গ্রাম কোটাকিন্দারিতে।

১৯৩৬' সালের শীতকালে পরের পথটিতে একটি লোক দুটি বলদ নিয়ে যাচ্ছিল এবং যখন সে চুকার কাছে এসেছে, একটি বাঘ সহসা দেখা দিল জঙ্গল-জুলে সাফ হয়ে তৈরি পথটিতে। অতি প্রশংসনীয় সাহসে লোকটি বাঘটি ও বলদগুলির মধ্যে এসে দাঁড়াল, এবং লাঠি তুলে ও চেঁচিয়ে বাঘটিকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। তাদের অনুকূলে এই গণ্ডগোল সৃষ্টি হবার সুবিধা গ্রহণ করে বলদগুলি তৎক্ষণাৎ ছুটে গ্রামে পালাল, এবং শিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াতে বাঘটি এবার মনোযোগ দিল লোকটির ওপর। বাঘটির মারমুখো ভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে লোকটি দৌড়বে বলে ঘুরে দাঁড়াল এবং যখন সে ঘুরছে, বাঘটি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটির কাঁধে ছিল কাঠের ভারি লাঙল এবং চুকায় থাকার জন্য তার যে রসদ প্রয়োজন তার থলি ছিল ওর পিঠে। বাঘটি যখন লাঙল ও থলির ওপর নখ-দাঁতের ধার পরীক্ষা করছিল, লোকটি

ভারমুক্ত হয়ে গ্রামের দিকে দৌড় লাগাল ও ছুটতে ছুটতে সাহায্যের জন্য চেঁচাতে লাগল। চীৎকার শুনে ওর আত্মীয় ও বন্ধুরা ওর সাহায্যে এগিয়ে এল এবং আর নতুন কোনো ঘটনা ব্যতীতই ও গ্রামে পেঁছিল। বাঘের একটা থাবায় তার ডান হাতটা কাঁধের কাছ থেকে কব্জী পর্যন্ত চিরে গিয়ে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

কয়েক সপ্তাহ বাদে টনকপুরের হাট থেকে ফিরতি পথে দুটি লোক কোটাকিন্দারি যাবার খাড়াই পথে উঠছিল, তখন ওদের থেকে পঞ্চাশ গজ সামনে একটি বাঘ রাস্তাটি পার হয়। পথের কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে বাঘটিকে সময় দিতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে লোকগুলি ওদের পথে এগোল এবং চলতে চলতে চেঁচাতে থাকল। 'বাঘটি কিন্তু সরে যায় নি, এবং সামনের লোকটি ওকে ছাড়িয়ে এগোতেই ও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই লোকটি বইছিল এক বস্তা গুড়, বস্তার অর্ধেকটা ছিল মাথায় আর অর্ধেকটা ঝুলছিল পিঠে। বাঘটির দাঁত বসল বস্তাটায় এবং লোকগুলির কোনো ক্ষতি না করে ও বস্তাটি নিয়ে পাহাড়ের গা ধরে নেমে গেল। এ পর্যন্ত ও যা যা পেল, একটি লাঙল এবং এক বস্তা গুড়, সে বিষয়ে বাঘটির মনোভাব যে কি, তার রেকর্ড নেই কোনো ; তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে ও যে যে শিকার পেল তাতে সন্তুষ্ট হয় নি কেন না এখন থেকে ও সেই সব মানুষদের বেছে নিতে থাকল যারা লাঙল অথবা বস্তায় ভারাক্রান্ত নয়।

চুকা থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত থাক্-এ পার্বত্যগ্রাম অনুপাতে বেশ বৃহৎ জনসংখ্যা আছে। গুর্খাদের আবির্ভাবের আগে যে চাঁদ রাজারা কুমায়ুন শাসন করতেন, তাঁরা বর্তমান মালিকদের পূর্বপুরুষদের ভরণপোষণের জন্যে থাকের জমি দেন এবং পূর্ণগিরি মন্দিরসমূহের বংশানুক্রমিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন তাঁদের। সুফলা জমি ও মন্দিরগুলি থেকে রীতিমত রোজগার, থাকের জনসাধারণকে ভাল, শক্তসমর্থ বাড়ি তৈরিতে এবং গৃহপালিত পশুর বড় বড় পাল খরিদে সহায়তা করেছে।

১৯৩৭ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে এক দিন থাকের দুশো গজ পশ্চিমে সাতটি পুরুষ ও দুটি বালক গ্রামের পশুপাল চরাচ্ছিল। সকাল ১০ টায় দেখা গেল যে কিছু পশু ফাঁকা জায়গা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে ছটকে পড়তে শুরু করেছে এবং দুটি ছেলের একটিকে, বয়স তার চোদ্দ, তাদের ফিরিয়ে আনতে পাঠানো হল। পুরুষরা দিনের তাতের সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিল ; যে জঙ্গলে তখন সব পশুই ঢুকে পড়েছে, সে জঙ্গলটি ঘিরে আছে ফাঁকা জমি। জঙ্গলে একটি কাকারের ডাক শুনে পুরুষদের ঘুম ভাঙল এবং দ্বিতীয় ছেলেটি, তারও বয়স চোদ্দ, তাকে পাঠানো হল পশুগুলি তাড়িয়ে বের করে আনার জন্যে। সে জঙ্গলে ঢোকার অল্প পরেই পশুগুলি ত্রস্তে পালায় এবং ওরা যখন গ্রামের পথে একটি উন্মুক্ত খাত পেরোচ্ছে, একটি গরুর ওপর লাফিয়ে পড়ল একটি

বাঘ এবং সাতটি পুরুষের একেবারে সামনে সেটিকে মেরে ফেলল। পশুগুলির ডাক এবং লোকদের হইহল্লায় গ্রামের লোকজনের হুঁস হল এবং খাতটির মুখোমুখি উঁচু জমিতে শীঘ্রই এক ভিড় জমল। এই লোকজনের মধ্যে ছিল দ্বিতীয় ছেলেটির মা, এক বিধবা, আর পুরুষরা ওর ছেলেকে ডাকছে শুনে কি ঘটেছে তা জানতে ও ওদের দিকে ছুটে গেল। পশুগুলি তাড়িয়ে বের করতে ওর ছেলে জঙ্গলে ঢুকেছে, আর ফিরে আসে নি জেনে ও তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে প্রথম ছেলেটির বাবা-মা এসে হাজির হল ঘটনার জায়গায় এবং ওরা যখন জিজ্ঞেস করল ওদের ছেলে কোথায়, এক মাত্র তখনি সাতটি পুরুষের মনে পড়ল তাকে ওরা সকাল ১০ টার পর দেখে নি।

খাতের ধারে নিহত গরুটির কাছে যে বিশাল মানুষের জমায়েত হয়েছিল, তারা অনুসরণ করল এবং সেই উদ্‌ভ্রান্ত জননী জঙ্গলে গিয়ে যেখানে বাঘ ওর ছেলেকে মেরে ফেলে রেখে গেছে তা দেখল ; এবং প্রথম ছেলেটির বাবা-মা কাছের এক ঝোপের নিচে পেল তাদের নিহত, খানিক-খাওয়া ছেলেকে। এই ছেলেটির কাছেই ছিল একটি নিহত বাছুর। সে দিনের শোচনীয় ঘটনাবলীর যে বিবরণী পরে গ্রামবাসীরা আমাকে দেয়, আমার বিশ্বাস, যে জমিতে পশুগুলি চরছিল তার মুখোমুখি জঙ্গলে ওঁত পেতে ছিল বাঘটি ; এবং পুরুষদের অগোচরে বাছুরটি যখন জঙ্গলে ঢোকে, বাঘটি তাকে মারে এবং ওটাকে সে নিয়ে যেতে পারার আগেই প্রথম ছেলেটি হয় অসাবধানে নয় কৌতূহলের বশে বাছুরটির কাছে যায় এবং সেও নিহত হয়, ঝোপের নিচে তাকে টেনে নিয়ে খানিক খায়। এর পর স্পষ্টতই বাঘটি বিকেল ৪ টে আব্দি তার দুই মড়ি আগলে বসেছিল ; তখন ফাঁকা জায়গার কিনারের জলাশয়ে জল খেতে যাবার পথে একটি কাকার হয় মড়ি দেখে অথবা গন্ধ পেয়ে ডাকতে থাকে। এতে, পশুগুলি ছটকে জঙ্গলে গেছে বলে পুরুষদের হুঁশ হয় এবং দ্বিতীয় ছেলেটিকে পশুগুলি খেদিয়ে আনতে পাঠানো হয়, তার দুর্ভাগ্য, সে সিধে যায় সেই জায়গায় যেখানে বাঘটা তার মড়িগুলো আগলে বসে আছে।

দ্বিতীয় ছেলেটি মারা পড়ার সময়ে স্পষ্টতই পশুগুলি সাক্ষী ছিল, তারা তার উদ্ধারে সমবেত হয়—গরু ও মোষ, উভয়কেই আমি এ কাজ করতে দেখেছি —এবং ছেলেটির কাছ থেকে বাঘটিকে তাড়িয়ে দেবার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটে। মড়িগুলো থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়ে বাঘটি রেগে গিয়েছিল, এবং সম্ভবত সে সময়ে যে গুঁতোটা সে খায় সেজন্যেও, বাঘটি পলায়নকারী পশুদলের পিছু নেয় এবং প্রথম যেটিকে ধরতে পারে তারই ওপর মেটায় প্রতিহিংসা। পশুপালটি সিধে গ্রামে ছুটে না গেলে ও হয়তো ওকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের একটিকে মেরেই সন্তুষ্ট থাকত না। এমনি এক উদ্ধার প্রচেষ্টার বেলা আমি একবার এক ক্রুদ্ধ বাঘের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে পাঁচটি মোষের পুরো দলকে

প্রাণ হারাতে দেখেছিলাম। বাঘটি সে দলের একটিকে মেরেছিল এবং আর চারটি বীর-হৃদয় পশু তাকে আক্রমণ করে এবং তাদের শেষটি মারা না-পড়া অব্দি লড়াই চালায়। সে লড়াইয়ে বাঘটি স্পষ্টতই দারুণ জখম হয় কেন না যখন রণক্ষেত্র ছেড়ে যায় তখন সে রক্তের নিশানা রেখে গিয়েছিল।

একই দিনে সেই দুটি মানুষ ও দুটি পশু নিধন বাইরে থেকে যা অনাবশ্যক মনে হবে, তা প্রথম মড়ির বেলা বাঘটিকে বিরক্ত করার পরিণতি বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এতে নৈনিতাল ও আলমোড়া জেলায় বিরাট হইচই পড়ে যায় এবং বাঘটিকে মারবার জন্যে সব রকম চেষ্টা চালানো হয়। মড়ি সামনে রেখে মাচায় বহুবার বসেন জেলা-অধিকারিকরা, দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু ছররাগুলিতে যদিও দুবার বাঘটি আহত হয়—তবু সে মানুষ শিকার করে চলতেই থাকে এবং দুর্ভাগা থাক গ্রাম থেকে আরো একটি মানুষ-প্রাণ হারায়।

থাকের দুশো গজ ওপরে আছে একটি গমের খেত। এ খেতের ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল এবং দুটি ছেলে কয়েকটি পশু চরাচ্ছিল কাটা গমের খেতে। ছেলে দুটির বয়স দশ ও বার, তারা অনাথ, সহোদর। নিরাপত্তার কারণে তারা বসেছিল খেতের মধ্যিখানে। গ্রাম থেকে খেতের দূরতর প্রান্তটিতে একটি পাতলা ঝোপঝাড়ের বেড়া। সেখান থেকে পাহাড়টি সিধে খাড়াইয়ে উঠে গেছে হাজার ফুট এবং পাহাড়ের যে কোনো জায়গা থেকে ফাঁকায় বসে থাকা ছেলে দুটি চোখে পড়বার কথা। বিকেলের দিকে একটি গরু ছুট্‌কে চলে যায় ঝোপগুলির দিকে এবং ছেলে দুটি একসঙ্গে থেকে গরুটিকে তাড়িয়ে খেতে ফিরিয়ে আনবার জন্যে রওনা হল। বড় ছেলেটি সামনে ছিল এবং সে যেমন একটি ঝোপ পেরিয়েছে, বাঘটি অপেক্ষায় ও'ত পেতেই ছিল, ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও নিয়ে চলে যায়। ছোট ছেলেটি গ্রামে পালায় ও একদল পুরুষের কাছে ছুটে গিয়ে কে'দে তাদের পায়ে পড়ে। যখন ছেলেটি গুছিয়ে কথা বলতে সক্ষম হয়, ও তখন পুরুষদের বলে, একটা বড় লাল জানোয়ার ওর ভাইকে নিয়ে গেছে—বাঘ ও জীবনে এই প্রথম দেখল। দ্রুত একটি তল্লাসী-দল গঠিত হয় এবং অতি প্রশংসনীয় সাহসে মাইল খানেক ধরে গ্রামটির পূবে নিবিড় বনাচ্ছাদিত সুওয়ারগড় গিরিখাত অবধি রক্তের নিশানা অনুসরণ করা হয়। তখন রাত ঘনিয়ে আসছে, তাই দলটি থাকে ফিরে আসে। পরদিন, কাছাকাছি গ্রামগুলির পুরুষদের সহযোগিতায় দিনভোর তল্লাসী চালানো হয় কিন্তু ছেলেটি বলতে পাওয়া যায় শুধু তার লাল টুপি এবং ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা জামাকাপড়। এই হল চুকার মানুষখেকোর শেষ নিহত মানুষ।

যে বিপদের কারণে সাহসের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে, সে বিপদের অভিজ্ঞতা না হওয়া অব্দি সাহসের সমঝদারী করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। যে অঞ্চলে এক মানুষখেকো কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সেখানে যারা কখনো বাস করেনি, তারা

এ ভাবতে পারে, এক জননীর তার পুত্রকে খুঁজতে যাওয়া ; দুটি ছেলের পশু চরানো ; একদল লোকের একটি নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে যাওয়া ; এর মধ্যে সাহসের কিছু নেই। কিন্তু যে তেমন জায়গায় থেকেছে তার কাছে, যে নিবিড় অরণ্যভূমে এক ক্রুদ্ধ বাঘ আছে বলে জানে সেখানে এক মায়ের প্রবেশ ; দুটি ছোট ছেলের আত্মরক্ষার জন্য কাছ ঘেঁষে বসা ; এক মানুষখেকোর রেখে যাওয়া রক্তের নিশানা অনুসরণে একদল নিরস্ত্র লোকের যাত্রা ; এগুলি এমন উচ্চ মানের সাহসের কাজ, যা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

২

চুকার মানুষখেকো এখন লাদিয়া উপত্যকার সকলের জীবন বিপর্যস্ত করছিল, এবং নৈনিতাল, আলমোড়া ও গাড়োয়াল, ইবটসন এই তিনটি জেলার ডেপুটি-কমিশনার-ইনচার্জ নিযুক্ত হবার পর ওর ডিভিশনকে এই উপদ্রব মুক্ত করার জন্য আমরা হাতে হাত মেলালাম।

১৯৩৭ সালের এপ্রিলের এক দুরন্ত গরম দিনে বিকেলের গোড়ার দিকে ইবি, ওর স্ত্রী জীন এবং আমি বরমদেওয়ের উপর অবস্থিত বুম্-এ নামলাম মোটরবাস থেকে। অতি প্রত্যূষে আমরা নৈনিতাল থেকে রওনা হয়েছিলাম এবং হলদোয়ানি ও টনকপুর হয়ে মাথা থেকে পা অব্দি ধুলো ভরিয়ে, অদেখা, কোমল সব জায়গায় বহু ব্যথার চিহ্ন বয়ে বুম্-এ পেঁছিলাম দিনের তপ্ততম সময়ে। সারদা নদীর তীরের নরম বালিতে বসে এক কাপ চা পান আমাদের মেজাজ শরিফ করতে সহায়তা করল ; এবং নদী তীরের সোজা পথ ধরে আমরা পায়ে হেঁটে রওনা হলাম থুলিগড়ে, সেখানে আগেভাগে পাঠিয়ে দেওয়া আমাদের তাঁবুটি ফেলা হয়েছিল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর রওনা হয়ে আমরা গেলাম কালাধুঙ্গায়। সারদা গিরিখাতের পথে থুলিগড় ও কালাধুঙ্গার মধ্যবর্তী দূরত্ব আট মাইল এবং পূর্ণাগিরির পথে চোদ্দ মাইল। এই গিরিখাতটি চার মাইল লম্বা এবং এক সময়ে এটির বুক দিয়ে গিয়েছিল একটি ট্রামওয়ে লাইন (আসলে এটি রেলপথ কিন্তু কাঠ চালানীর রেলপথকে তখন ট্রামওয়ে লাইন বলাই নিয়ম ছিল) ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধন্যবাদ জানাবার স্মারক উপহার হিসেবে নেপাল দরবার ভারত সরকারকে যে দশলক্ষ কিউবিক ফুট শাল কাঠ উপহার দেন, তাই সংগ্রহের কারণে জে, ভি, কলিয়ার দুরারোহ পাহাড়ের-গা ডাইনামাইটে ফাটিয়ে লাইনটি বসান। ট্রামওয়ে লাইনটি বহুদিন আগে পাহাড়ের ধস ও বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এই চার মাইল উঠতে হলে ভাল রকম পাহাড়ে ওঠার জ্ঞান থাকা দরকার। সেখানে একটি ভুল পদক্ষেপ বা একবার ধরার জায়গা থেকে হাত পিছলে যাওয়া মানে ছিটকে শীতল নদীবক্ষে পড়া একেবারে সুনিশ্চিত। বিনা দুর্ঘটনায় আমরা

গিরিখাতটি পেরোলাম এবং উপরের মুখে, যেখানে কলিয়ারের ট্রাম-লাইন জঙ্গলে ঢুকেছিল সেখানে, যেখানে বাড়ির আয়তনের এক পাথর নদীর ভেতর ঢুকে এসেছে, সেখানে আটকে যাওয়া স্রোতে দুটি মাছ ধরলাম।

কালাধুঙ্গাতে আমাদের সঙ্গে দেখা করে মানুষখেকোটির সব চেয়ে টাটকা খবর জানাবার জন্যে আগেই পাটোয়ারীদের এবং ও অঞ্চলে কর্মনিরত বনরক্ষীদের খবর দেওয়া হয়েছিল। আমাদের আগমনের জন্যে অপেক্ষমান চারটি লোককে পেলাম আমরা বারলোয় এবং তারা যে খবর দিল তা বেশ উৎসাহজনক। গত কয়েক দিনে কোনো মানুষ মারা পড়ে নি, তিন দিন আগে থাক গ্রামে বাঘটি একটি বাছুর মেরেছে এবং গ্রামের কাছাকাছিই সে আছে বলে জানা গেছে।

কালাধুঙ্গা হল ধীরে উঁচু-হয়ে-যাওয়া লম্বা-কোণাটে এক উপদ্বীপ; মোটামুটি চার মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া; তিনদিকে সারদা নদীতে বেষ্টিত; চতুর্থদিকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এক শৈলশিরার প্রাচীর। তিন কামরা ও একটি চওড়া বারান্দা সংবলিত বাংলোটি পূবমুখো এবং উপদ্বীপটির উত্তর অথবা উচ্চতর সীমান্তে ওটি অবস্থিত। দূরের পর্বতমালার উপর দিয়ে যখন সূর্য ওঠে ও কুয়াশা মেলাতে থাকে তখন বারান্দা থেকে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেখা যায়, কল্পনায় মনকে আনন্দ দেবার মত যে সব দৃশ্যের কথা ভাবা সম্ভব, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক দৃশ্য। সিধে সামনে, সারদা নদীর ওপারে এক প্রশস্ত উন্মুক্ত উপত্যকা নেপালের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। তার দুদিকের পাহাড় নিবিড় অরণ্যে ঢাকা, এবং মরকত-সবুজ শরঘাস দু-তীরে নিয়ে নদীটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে উপত্যকা দিয়ে। যতদূর চোখ চলে, কোনো জনবসতি চোখে পড়ে না; এবং বাংলো থেকে বাঘ ও অন্যান্য প্রাণীদের যে ডাক শোনা যায়, তা থেকে অনুমানে মনে হয় উপত্যকাটিতে প্রচুর বন্যপ্রাণী আছে। এই উপত্যকা থেকেই কলিয়ার দশলক্ষ কিউবিক ফুট শালকাঠ সংগ্রহ করেছিলেন।

কালাধুঙ্গায় আমরা একদিন রইলাম এবং আমাদের লোকজন যখন তাঁবু ফেলতে ও ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে চুকা রওনা হয়ে গেল, আমরা মাছ ধরলাম; অথবা, সঠিক বলতে হলে, ইবটসনরা মাছ ধরল এবং আমি পাড়ে বসে দেখলাম; আগের রাতে আমি ম্যালেরিয়ায় পড়েছিলাম বিছানায়। ইবটসনরা মাছধরা সুতো ছুঁড়ে দিয়ে মাছ ধরতে ওস্তাদ; বাংলোর নিচের বিক্ষুব্ধ জলরাশি থেকে উপদ্বীপের কোণবিন্দু অবধি প্রায় পাঁচশো গজের জলবিস্তার ওরা এক-ইঞ্চি স্পুন দিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজে একটিও মাছের হদিশ পেল না। উপদ্বীপের কোণবিন্দুর উলটো মুখে নেপাল-উপত্যকা দিয়ে বয়ে আসা ছোট্ট নদীটি সারদা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এখানে সারদা নদী চওড়া ও অগভীর হয়ে যায় এবং একটি বড় জলাশয়ে প্রবেশ করার আগে দুশো গজ ধরে বয়ে যায়। এই প্রবাহের গোড়ার দিকের মুখে, নদীর বেশ মাঝখানে ইবি ওর প্রথম মাছটি গাঁথল—একটি

আট পাউন্ড ওজনের মাছ—ক্রমে তীরের কাছে খেলিয়ে এনে পাড়ে তোলার আগে ওই সরু সুতোয় ওটাকে যত্ন করে কায়দা করা দরকার হয়ে পড়েছিল।

সকল উৎসাহী মেছুড়েরা অন্য মেছুড়েদের, সকল আউটডোর স্পোর্টের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মাছ ধরায় রত হতে দেখে আনন্দ পায়। আমার কথা বলতে পারি, আমি নিজে মাছ ধরলেও যা, অন্য একজনকে মাছ ধরতে দেখলেও তেমনই আনন্দ পাব; বিশেষ যখন মাছ গেঁথেছে এবং পা রাখবার জায়গাটি হড়হড়ে, এবং নদী খরস্রোতা, সারদায় যা সর্বদাই হয়ে থাকে। ইবি ওর মাছটি মারবার অব্যবহিত পরেই জীন একটি মাছ গাঁথল; ও মাছ ধরছিল তীর থেকে ত্রিশ গজ ভেতরে, বিক্ষুব্ধ জলে। ওর রীলে ছিল মাত্র একশো গজ সুতো এবং মাছটি আবদ্ধ জলের দিকে ছুটবে, সুতোটা ছিঁড়ে দেবে, এই ভয়ে মাছটিকে খেলাতে খেলাতে ও পিছন পানে হাঁটতে চেষ্টা করল, করতে গিয়ে পা হড়কাল এবং একটি দীর্ঘায়িত মিনিট সময়কাল ধরে এক পায়ের আঙুল এবং ছিপের ডগাটুকুই ওর দেখা গেল। আপনি স্বভাবতই ধরে নিচ্ছেন যে সাম্প্রতিক ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ভুলে গিয়ে আমি ওর উদ্ধারে ছুটে গেলাম। ঘটনা হল, আমি তেমন কিছুই করলাম না। পাড়ে বসে বসে হাসলাম শুধু, কেননা জল-সমাধি থেকে ইবটসনদের একজনকেও উদ্ধারের চেষ্টা, একটি জলভোঁদড়কে জলে ডোবা থেকে বাঁচাবার চেষ্টার মতই নিরর্থক হত। দীর্ঘ এক প্রবল ধস্তাধস্তির পর জীন সোজা উঠে দাঁড়াল, পাড়ে পৌঁছে ওর মাছটিকে মারল, সেটির ওজন ছয় পাউন্ড। ও সেটি মারতে না মারতেই ইবি দূরে সুতো ছুঁড়তে গিয়ে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা থেকে পিছলে পড়ে গেল এবং ছিপ-টিপ সবসুদ্ধ জলের নিচে তলিয়ে গেল।

প্রবাহের তলের জলাশয়ের তল-সীমা থেকে নদীটি ডান দিকে মোড় নিয়েছে। নদীর এই বাঁকের যেদিকে নেপাল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মহাকায় শিমুল গাছ; একজোড়া উৎক্রোশ পাখি বহু বছর ধরে সেখানে বাসা বেঁধে আছে। পাখিদের পক্ষে এ গাছটি এক আদর্শ বাসা বাঁধার জায়গা; কেননা এটি শুধু নদীর বিস্তারিত দৃশ্যের মুখোমুখি আছে তাই নয়, এর গুঁড়ির সঙ্গে সমকোণে যে বড় বড় ডাল বেরিয়েছে, উৎক্রোশদের পিছিল শিকার রাখবার ও খাবার টেবিল বিশেষ সেগুলো। গত বছর বর্ষার বন্যা পাড় ধসিয়ে প্রাচীন গাছটি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং নদী থেকে একশো গজ দূরে জঙ্গলের কিনারায় দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘ শিশম্ গাছে উৎক্রোশরা বেঁধেছে নতুন বাসা।

প্রবাহটি স্পষ্টতই উৎক্রোশদের প্রিয় মাছ শিকারের জায়গা, এবং মাদীটি যখন বাসায় বসে ছিল মদ্দাটি ইবটসনদের মাথার উপর দিয়ে সামনে ও পিছনে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে এই বেফায়দা ব্যায়ামে ক্লান্ত হয়ে ও নদীর আরো আগে এগোল, সেখানে কয়েকটি খানিক ডুবে থাকা পাথর জলের উপর মাথা

জাগিয়ে এক ছোট প্রবাহ রচনা করেছে। এখান দিয়ে যে মাছ যাচ্ছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এক ডজন বার ঝুঁকি নিল উৎক্রোশটি, ডানা মুড়ে ভারি কোনো পদার্থের মত পড়ল নিচে এবং জল ছোঁয়ার আগে ডানা ছড়িয়ে, লেজ দিয়ে নিজেকে সামলে নিল, ডানা ঝাপটে উপরে উঠল আবার ঝাঁপ দেবে বলে। অবশেষে তার অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলল। ওর ঠিক নিচে জলের ওপর উঠে এসেছিল এক অসতর্ক মাছ এবং এক মুহূর্ত না থেমে ও সমান-উড়াল থেকে বাতাসে একশো ফুট বিদ্যুদ্‌গতিতে ঝাঁপ দিল এবং বিক্ষুব্ধ জলরাশির গভীরে ডুব দিল। ওর সূচের মত তীক্ষ্ম, ইস্পাতের মত কঠিন নখে শিকার পাকড়াল ঠিকই, কিন্তু ও যেমনটি ভেবেছিল তার চেয়ে শিকারটি স্পষ্টতই আরো ভারি। বার বার এলোপাথাড়ি ডানা ঝাপটে ও বাতাসে ভেসে উঠতে চেষ্টা করল, আবার নিচে নেমে জল ছুঁল বুকের পালকে। সেই সংকটের মুহূর্তে নদী খেপিয়ে এক ঝাপটা বাতাস উঠে ওর সহায়তায় বয়ে না এলে ওকে মাছটা ছেড়ে দিতে হত বলেই আমার বিশ্বাস। বাতাসটা ওকে ছুঁতেই ও নদীর ভাটির দিকে গেল, এক শেষ ও মরিয়া চেষ্টায় মাছটি তুলে ফেলল জল থেকে। ও যেদিকে চলেছে এখন, বাসা তার উলটো দিকে, কিন্তু এখন ফেরা অসম্ভব, তাই নামবার মত এক বিশাল পাথরের চাঁই পাড়ের ওপর দেখে নিয়ে সেদিকে সিধে উড়ে চলল।

আমি একাই উৎক্রোশটিকে লক্ষ করছিলাম এমন নয়, কেননা ও সে পাথরে নামতে না নামতেই, নদীর যে পাশে নেপাল, সেদিকে যে মেয়েটি কাপড় কাচছিল সে উত্তেজিত হয়ে চেঁচাল এবং তার মাথার ওপরকার উঁচু পাড়ে এসে দেখা দিল একটি ছেলে। যেখানে মেয়েটি কাপড় কাচছে, চড়া উৎরাইয়ে সেখানে নেমে এসে ছেলেটি যা শুনবার, শুনে নিল এবং বড় বড় আলগা পাথর ছড়ানো পাড় ধরে এমন জোরে ছুটল যে প্রতি পদে ওর ঘাড় আর হাত-পা এই ভাঙে তো সেই ভাঙে উৎক্রোশটি তার শিকার নিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করল না এবং ছেলেটি সে পাথরে পেঁছতেই ও বাতাসে উঠে পড়ল, পাক দিতে থাকল তার মাথার কাছে ; ছেলেটা তখন মাছটা তুলে ধরেছে মেয়েটিকে দেখবার জন্যে—দেখে মনে হল মাছটার ওজন হবে চার পাউণ্ড।

তারপর কিছুক্ষণ আমি উৎক্রোশটিকে আর দেখি নি ; আবার যখন তাকে দেখলাম—তখন আমরা লাঞ্চ শেষ করেছি। ছেলেটি যে মাছটা ওকে নিতে দিল না, সেটি ও যেখানে ধরে, সেই জলপ্রবাহের ওপরে চক্কর দিয়ে উড়ছিল ও। সদাই একই উচ্চতায় থেকে সামনে ও পেছনে উড়তে থাকল ও, তারপর ঝুঁকি নিল, পড়ল পঞ্চাশ ফুট, আবার ঝুঁকি নিল, পড়ল সিধে জলের মধ্যে। এবার ও যে মাছটি ধরল সেটি আগের চেয়ে হাল্‌কা, একটি কালবাউশ, আন্দাজ দু পাউণ্ড ওজনের। অনায়াসে পাখিটি তুলে ফেলল জল থেকে এবং বায়ুচাপ যাতে কম লাগে তাই সেটিকে টর্পেডোর মত সিধে করে ধরে উড়ে চলল ওর বাসার দিকে।

ওর কপাল সেদিন মন্দ, কেননা যতটা পথ যেতে হবে তার সবে অর্ধেকটা গেছে ও, এমন সময়ে আকারে ও ওজনে ওর দ্বিগুণ একটি মাছ-মারাল্ উড়ে এল পেছন থেকে, দ্রুত ধরে ফেলল ওকে। উৎক্রোশটি ওকে আসতে দেখল এবং যেতে যেতে ডানদিকে একটুখানি হেলে উড়ে চলল জঙ্গলের দিকে, গাছের ডালপালার মধ্যে ওর পশ্চাদ্ধাবনকারীকে এড়াবে বলে। এ কলাকৌশলের উদ্দেশ্য বুঝে মাছ-মারাল্‌টি এক সক্রোধ চীৎকার দিল এবং ওড়ার বেগ বাড়িয়ে দিল। নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছিতে আর মোটে বিশগজ বাকি কিন্তু এ বড় দারুণ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়, এবং একেবারে যথা সময়ে উৎক্রোশটি কালাবাউশটি ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল বাতাসে। মাছটা এক গজও পড়েনি, তার আগেই মাছ-মারাল্‌টি সেটি ধরে নিল এবং অপূর্ব লীলাময় ছন্দে ঘুরে গিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, নদীর সেই উজানের দিকে চলে গেল। যেমনটি ভেবেছিল, লুঠের মাল নিয়ে পালানো ওর পক্ষে তত সোজা হল না কেন না ফিরতি পথে ও অল্প দূরই গেছে, তখন, উৎক্রোশটির উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচত যে কাক জোড়া তারা ওকে তাক করে ছুটল, বাধ্য হল জঙ্গলে ছুটতে, তা কাকদের এড়াবার জন্যেও বটে। জঙ্গলের কিনারে যেতে কাক দুটো পিছু ফিরল এবং মাছ-মারাল্‌টি সবে সকলের চোখের আড়াল হয়েছে, তখনি শূন্য থেকে এসে পড়ল দুটি খয়েরি ঈগল, মাছ-মারাল্‌টি যে-পথে গেছে ঠিক সেই পথে ছুটে চলল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। আমার খুবই দুঃখ যে আমি এ পেছু-নেওয়ার শেষটা দেখি নি; আমি যতক্ষণ দেখি কোনো পাখিটাই জঙ্গল ছেড়ে ওপরে উঠে গিয়ে ওড়ে নি, তাই সন্দেহ হয় মাছ-মারাল্‌টি হয় তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময়কাল ধরে রেখেছিল মাছটিকে। মাত্র একবার আমি এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক এক পেছু নেওয়া দেখেছি। সেবার আমি ঘাসের ভিতর দিয়ে আঠারটি হাতির এক সার নিয়ে যাচ্ছিলাম কৃষ্ণ তিতির শিকারে, দশজনের ছিল বন্দুক আর পাঁচজন দর্শক বসেছিলেন হাতির পিঠে; তখন দেখেছিলাম এক চড়ুইবাজের হাত থেকে, একবারও মাটি না ছুঁয়ে একটি পিণ্ডা পাখিকে পালাতে; প্রথমটি ওটাকে আমাদের হাতির লাইনের ঠিক সুমুখে মারে—প্রথমে মরা পাখিটা কেড়ে নেয় এক লালশির বাজ; তারপর এক মধুবাজ, অবশেষে একটি বাজ ছোট্ট পাখিটাকে আস্ত গিলে ফেলে। ফেব্রুআরির সেই সকালে আমার সঙ্গে যে বন্দুকধারী ও দর্শকরা ছিলেন, তাঁদের কেউ এ অধ্যায়টি পড়লে ঘটনাটি মনে করতে পারবেন, এটি ঘটেছিল রুদ্রপুর ময়দানে।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আরামে পাঁচ মাইল হেঁটে আমরা চলে গেলাম কালাধুঙ্গা থেকে চুকা। দিনটি ছিল মাছশিকারীদের স্মৃতিতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার মত এক ঝলমলে দিন। রোদটি মিঠে কড়া; উত্তরদিক থেকে বইছে শীতল বাতাস; একপাল মাছের পোনা চলেছে স্রোত উজিয়ে;

নদীতে বড় বড় মাছ বোঝাই, শুধু ধরার অপেক্ষা। হালকা ছিপে মাছ ধরতে গিয়ে আমরা অনেক রোমাঞ্চকর লড়াই করেছিলাম, সবগুলো আমরা জিতি নি। তবে সারা দিনে আমরা যা মাছ ধরেছিলাম তা আমাদের ক্যাম্পের ত্রিশজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট।

৩

মানুষখেকোটির বিরুদ্ধে অভিযানে আমাদের সহায়তা করতে, এবং আরো মানুষের প্রাণ বিনাশ বন্ধ করার চেষ্টায়, বাঘের টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আগেই টনকপুর থেকে ছয়টি তরুণ মন্দা মোষ পাঠানো হয়েছিল আমাদের। আমরা চুকায় পেঁছিবার পর আমাদের বলা হল যে মোষগুলিকে তিন রাত ধরে বেঁধে রাখা হচ্ছে বাইরে, এবং যদিও কয়েকটির কাছে এক বাঘের থাবার ছাপ দেখা গেছে, কিন্তু একটিও মারা পড়ে নি। পরের চারদিন ধরে আমরা ভোর বেলা মোষগুলি দেখতে গেলাম; দিনে চেষ্টা করলাম বাঘটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে; মোষগুলি বাইরে বাঁধছিল যে লোকরা, তাদের সঙ্গে গেলাম সন্ধ্যায়। পঞ্চম দিনে আমরা দেখলাম, থাক্-এ, যে জঙ্গলে দুটি ছেলে প্রাণ হারিয়েছিল, তার কিনারায় যে মোষটিকে আমরা বেঁধেছিলাম, সেটি এক বাঘের হাতে মারা পড়েছে ও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম, তেমনটি মড়িটিকে ঘন বনে নিয়ে না-গিয়ে বাঘটি ওটাকে নিয়ে গেছে একটি ফাঁকা জমি পেরিয়ে একটা পাথুরে গোল টিলার ওপর। সে হয়তো এটা করেছে মাচানের কাছ দিয়ে যাবার পথটা এড়াবার জন্যে। এই মাচান থেকে আগে দুবার তাকে গুলি করা হয়েছে, সম্ভবত সে তাতে আহতও হয়েছে। সামান্য পথ মোষটিকে টেনে নেবার পর, ওর শিং দুটো, দুটো পাথরের মাঝে আট.. যায়; এবং তা ছাড়াতে না পেরে মড়ির পেছন দিক থেকে সামান্য কয় পাউন্ড মাংস খেয়ে বাঘটা ওটাকে ফেলে রেখে গেছে। কোন পথে বাঘটা গেছে তা ঘুরে দেখতে গিয়ে, মড়ি এবং জঙ্গলের মাঝামাঝি এক মহিষ-ডোবায় আমরা ওর থাবার ছাপ পেলাম। থাবার ছাপ দেখে বুঝলাম একটি বড় মন্দা বাঘ হল মোষটির হত্যাকারী।

জেলা কর্তৃপক্ষরা মনে করেছিলেন, জানি না কোন বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছিলেন কিনা- মানুষখেকোটি এক বাঘিনী। গ্রামবাসীদের মহিষ-ডোবার ছাপগুলো দেখাবার পর ওরা আমাদের বলল, ওরা বিভিন্ন বাঘের থাবার ছাপে পার্থক্য করতে পারে না এবং ওরা জানে না মানুষখেকোটি মন্দা না মাদী, তবে ওরা জানে তার একটি দাঁত ভাঙা। ওদের গ্রামের কাছে মানুষে-পশুতে যতটি মারা পড়েছে, সব ক্ষেত্রে ওরা দেখেছে বাঘটির একটি দাঁত চামড়া আলতো ছুঁয়ে গেছে, চামড়া ভেদ করে নি। এ থেকে ওরা সিদ্ধান্ত করেছে বাঘটির একটি কুকুর-দাঁত ভাঙা।

মড়িটি থেকে বিশগজ দূরে একটি জামগাছ। পাথর দুটির মাঝখান থেকে মড়িটি টেনে বের করবার পর ; গাছের যে একমাত্র ডালে বসা সম্ভব তা থেকে মড়িটিকে দেখার পথে যে কয়টি সরু ডাল ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল, সেগুলো ভেঙে ফেলার জন্যে একটি লোককে গাছে চড়ালাম আমরা। গোল পাথরটির ওপর এই নিঃসঙ্গ গাছটি, আশপাশের জঙ্গল থেকে পুরোই চোখে পড়ে এবং যদিও লোকটি পরম সতর্কে গাছে চড়ে ডালগুলি ভাঙে, তবুও আমার ধারণা যে বাঘ ওকে দেখেছিল।

তখন সকাল ১১টা, তাই দুপুরের আহারের জন্যে আমাদের লোকজনদের গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে আমি এবং ইবি, রোদ থেকে আড়াল পাবার মত একটি ঝোপ বেছে নিলাম এবং দিনের তাতের সময়টা কথা কয়ে কাটালাম আর ঝিমোলাম। আড়াইটের সময়ে, আমরা যখন পিকনিক-লাঞ্চ খাচ্ছি, যেখানে মোষটি নিহত হয়, জঙ্গলের সেই কিনারে কিছু কালিজ পাখি বিচলিতভাবে কিচিরমিচির জুড়ল এবং তাদের ডাক শুনে আমাদের লোকজন গ্রাম থেকে ফিরে এল। বাঘের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইবি এবং ওর সাহসী সঙ্গী শ্যাম সিং যখন জঙ্গলের সেই জায়গাটিতে গেল, যেখানে কালিজগুলো ডাকছিল, তখন আমি নিশ্চুপে জাম গাছে উঠে পড়লাম। আমাকে গুছিয়ে বসার জন্যে কয়েক মিনিট সময় দিয়ে ইবি ও শ্যাম সিং জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এবং চুকায় আমাদের ক্যাম্পে ফিরে গেল, আমার দুজন লোক রয়ে গেল থাক্-এ।

ইবি চলে যাবার অব্যবহিত পরেই কালিজগুলি আবার ডাকতে শুরু করে এবং একটু বাদে ডাকতে থাকে একটি কাকার। বাঘটা নিশ্চয় এখন চলছে, কিন্তু সূর্য না ডুবলে, গ্রামটি রাতের মত নিশ্চুপ না হলে ওই ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে ওর মড়ির কাছে আসার আশা ক্ষীণ। প্রায় পনের মিনিট ধরে বা তারও বেশীক্ষণ ডাকল কাকারটি তারপর থেমে গেল একদম, আর তখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, বাঘের কথা বলতে গেলে, অজস্র পাখির স্বভাব-কাকলি ব্যতিরেকে জঙ্গল ছিল নীরব।

সারদা নদীর সুদূরবর্তী পার্শ্বে নেপাল গিরিমালা থেকে অস্তমান সূর্যের রক্তাভা মিলিয়ে গেল ; গ্রামের কোলাহল থেমে এল ; তখন মহিষ-ডোবার দিকে একটি কাকার ডাকল ; মড়ি ছেড়ে যাবার সময়ে যে-পথে গিয়েছিল, সেই পথেই ফিরছে বাঘ।

আমার সামনে একটা সুবিধেমত ডালের ওপর আমার রাইফেলটি রাখা ছিল, বাঘটা যখন আসবে তখন একটা মাত্র কাজ আমায় করতে হবে, তা হচ্ছে ঝুঁকে পড়ে রাইফেলের বাঁটটা চেপে ধরা। মিনিটের পর মিনিট কাটল, আমার বয়সের সঙ্গে যুক্ত হল একশো মিনিট, তখন পাহাড়ের ঢালে

দুশো গজ উঁচুতে একটি কাকার ডাকল এবং একটি গুলি ছুঁড়বার মত সুযোগ যা দশের মধ্যে একবার মিলবে ভেবেছিলাম, তা কমে গিয়ে হাজারে একবারে দাঁড়াল। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে বাঘটি আমার লোকটিকে গাছের ডাল ভাঙতে দেখেছে; সূর্যাস্ত এবং এই শেষ কাকারটি ডাকার মাঝামাঝি সময়ে সে গাছটি ঠাহর করে দেখে গেছে এবং আমি যে গাছের ওপর আছি, সে দেখে চলে গেছে। তখন থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদে কাকার ও সম্বর ডাকতে থাকল, প্রতি ডাক আগেরটির চেয়ে কিছু দূরে। মাঝরাতে এই হুঁশিয়ারি ডাকগুলি থেমে গেল নিঃশেষে; অরণ্যে নামল সেই শান্তি ও বিশ্রামের নৈশ সময়, যখন বৈরিতা থেমে যায় এবং আরণ্যপ্রাণী ঘুমোতে পারে শান্তিতে। অন্য যাঁরা ভারতের অরণ্যে রাত কাটিয়েছেন তাঁরাও এই বিশ্রাম-প্রহর লক্ষ্য করে থাকবেন; বৎসরের ঋতু এবং চন্দ্রের কলা অনুযায়ী এতে সামান্য তারতম্য হয় এবং প্রকৃতির-নিয়মে এর সময় হল মধ্য রাত থেকে ভোর চারটে। এই ঘণ্টাগুলির মধ্যকালে ঘাতকরা নিদ্রা যায় এবং যারা তাদের ভয়ে ফেরে তারা থাকে শান্তিতে। মধ্যরাত থেকে ভোর চারটে অবধি ঘুমনো হয়তো মাংসাশী প্রাণীর স্বভাবধর্ম; তবে প্রকৃতি এই কয় ঘণ্টাকে পৃথক করে রেখেছেন যাতে যাঁরা প্রাণভয়ে ফেরে, তারা স্বস্তি পায় ও শান্তিতে থাকে, এরকমটা ভাবতেই আমি বেশি ভালবাসি।

দিনের বয়স তখন কয়মিনিট মাত্র হয়েছে, গাঁটে গাঁটে খিল ধরিয়ে আমি গাছ থেকে নেমে এলাম এবং যে থার্মোসফ্লাস্কটি ইবি অতীব বিবেচনায় এক ঝোপের নিচে পুঁতে রেখেছিল সেটি খুঁড়ে তুলে এক পেয়ালা চা খেতে থাকলাম, তার খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। অচিরে আমার দুই লোক পৌঁছে গেল এবং আমরা যখন ওটিকে শকুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ডালপালা দিয়ে মড়িটি ঢাকছি তখন আধ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের ওপর বাঘটি তিনবার ডাকল। ক্যাম্প-ফিরতি আমি যখন থাক দিয়ে চলেছি, গ্রামের বুড়োরা আমার সঙ্গে দেখা করল এবং রাতের বিফলতার জন্যে আমাকে ভেঙে পড়তে বারণ করল; কেননা, ওরা বলল, ওরা গণনা করিয়েছে, প্রার্থনা জানিয়েছে, যদি আজ বাঘটা না মরে পরদিন, নয় তো তার পরদিন নির্ঘাত মরবে।

গরম জলে স্নান এবং ভরপেট আহার আমাকে তাজা করে তুলল এবং বেলা একটার সময়ে আমি আবার থাক্‌এ যেতে খাড়াই পাহাড়ে চললাম এবং সেখানে পৌঁছে জানলাম, গ্রামের ওপরে একটি পাহাড়ে একটি সম্বর বহুবার ডেকেছে। একটি জ্যান্ত মোষের টোপ ফেলে বসব বলে সেই উদ্দেশ্যে ক্যাম্প থেকে রওনা হয়েছিলাম এবং আমি যখন বাঘটির জন্য এক জায়গায় অপেক্ষা করছি, ও যেন তখন অন্য জায়গায় না যায়, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করবার জন্যে গত রাতে যে মড়ি নিয়ে বসেছিলাম তার কাছে অনেক খবরের কাগজ পেতে দিয়েছিলাম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি বহু-ব্যবহৃত গো-পথ আছে, গ্রামবাসীরা বলল সেখানেই সম্বরটি ডেকেছে। এই পথের পাশের একটি গাছে আমি একটি দড়ির আসন ঝুলিয়ে দিলাম এবং গো-পথের উপর একটি শেকড়ে বাঁধলাম মোষটিকে। বেলা তিনটেয় আমি গাছে চড়লাম এবং এক ঘণ্টা বাদে উপত্যকার সুদূর পার্শ্বাঞ্চলে, হাজার গজ দূরে প্রথমে একটি কাকার ও পরে একটি বাঘ ডাকল। মোষটিকে প্রচুর তাজা ঘাসের খোরাক দেওয়া হয়েছিল এবং ওর গলায় আমি যে ঘণ্টা বেঁধে দিই, সারারাত ও সেটি বাজাতে থাকল কিন্তু তা বাঘকে টেনে আনতে পারল না। সকালে আমার লোকজন আমার জন্যে এল এবং ওরা আমাকে বলল, যে গভীর গিরিখাতে ছেলেটির লাল টুপি ও ছেঁড়া জামাকাপড় পাওয়া যায়, যার নিচের কিনারে গ্রামবাসীদের অনুরোধে আমরা একটি মোষ বেঁধে দিই, রাতে সেখানে কাকার ও সম্বর ডেকেছে।

যখন চুকাতে ফিরলাম, দেখলাম ভোরের আগে ইবি ক্যাম্প থেকে চলে গেছে। আগের সন্ধ্যায় দেরি করে খবর এসেছে যে, লাটিয়া উপত্যকায়, আধ মাইল দূরে একটি বাঘ একটি বলদ মেরেছে। বাঘের দর্শনমাত্র না পেয়ে ও মড়ি নিয়ে সারা রাত বসে থাকে এবং পরের সন্ধ্যার শেষের দিকে ফিরে আসে ক্যাম্পে।

৪

জ্যান্ত মোষটি নিয়ে আমি গাছে রাত কাটাবার পর জীন ও আমি প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম, তখন আমাদের বাকি পাঁচটি মোষ বাইরে বাঁধতে নিযুক্ত লোকগুলি খবর পেশ করতে এল, আগের রাতে আমার লোকজন যে গিরিখাতে সম্বর ও কাকারকে ডাকতে শুনেছিল, তার নিচের কিনারে বেঁধে রাখা মোষটি নিখোঁজ। আমাদের যখন এই খবর দেওয়া হচ্ছে, তখন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ম্যাকডোনাল্ড এলেন; তিনি সেদিন কালাধুঙ্গা থেকে চুকায় ক্যাম্প সরাচ্ছেন; বললেন যেখানে আমাদের মোষগুলির একটি বেঁধে রাখা হয়েছে বলে তিনি ধরে নিয়েছেন, তেমন একটি গিরিখাতের নিচের কিনারে তিনি একটি বাঘের থাবার ছাপ দেখেছেন। ম্যাক বললে, এর আগে একবার যখন থাক্-এ এসেছিল, ও মানুষখেকোটিকে গুলি করতে চেষ্টা করেছিল আর থাক্-এ ও যে থাবার ছাপ দেখেছিল, এ-ছাপগুলো ঠিক তারই মতন।

ব্রেকফাস্টের পর জীন ও ম্যাক গেল নদীতে মাছ ধরতে আর নিখোঁজ মোষটির কি হয়েছে দেখতে চেষ্টা করব বলে আমি গেলাম শ্যাম সিং-এর সঙ্গে। ছেঁড়া দড়ি এবং বাঘটির থাবার ছাপ ব্যতীত মোষটি যে নিহত হয়েছে তার কোনো চিহ্ন নেই দেখার মত। যাই হ'ক, চারপাশে চেয়ে আমি দেখতে পেলাম যেখানে মোষের একটি শিং মাটিতে ঘষেছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে এক

সুস্পষ্ট রক্তের নিশানা। মোষটিকে মারার পর বাঘটি দিশা হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, না ওর খোঁজ-নিশানা লুকোতে চেষ্টা করছিল আমি জানি না, কেননা বহু মাইল পথ মড়িটিকে অতি দুর্গম জায়গা দিয়ে নিয়ে যাবার পর, ও সেটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে সেই একই গিরিখাতে। যেখান থেকে যেতে শুরু করেছিল তার দুশো গজ দূরে। এই বিন্দুতে পেঁছে গিরিখাতটি সংকীর্ণ হয়ে প্রায় দশ ফুট চওড়া এক বোতলের গলার আকারে পর্যবসিত হয়েছে। বাঘটি হয়তো ওই সরু গলা-আকারের জায়গাটির সুদূর পার্শ্বাঞ্চলে মড়ি নিয়ে বসে আছে ; এবং যেহেতু এর জন্যে পুরো রাত বসে থাকা আমার উদ্দেশ্য, বসার আগে যারা মাছ ধরছিল তাদের কাছে চলে গিয়ে ওদের লাঞ্চে ভাগ বসানো স্থির করলাম।

পেটের খিদে মিটিয়ে, শ্যাম সিং এবং মাছ ধরার দল থেকে ধার নেওয়া তিনটি লোক সহ আমি ফিরে এলাম ; কেননা যদি মড়িটি খুঁজে পাই এবং ওটার সামনে বসি, ক্যাম্পে একা ফিরে যাওয়া শ্যাম সিং-এর পক্ষে নিরাপদ হবে না। চারটি লোককে পেছনে ফেলে যথেষ্ট এগিয়ে হেঁটে আমি দ্বিতীয়বার সেই বোতলের-গলা সদৃশ স্থানে পেঁছলাম, আর যেই পেঁছেছি, বাঘটি গরগর করতে শুরু করল। এখানে গিরিখাতটি খাড়াই এবং আলগা পাথরে বোঝাই এবং বাঘটি গর্জাচ্ছে ঝোপের আড়াল থেকে—আমার সমুখে প্রায় সিধেসিধি বিশ গজ দূরে থেকে। যে বাঘকে দেখা যাচ্ছে না খুব কাছ থেকে তার গরগরানি হল জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়-জাগানো আওয়াজ এবং তা অনাধিকার প্রবেশকারীদেব প্রতি আব কাছে না এগোবার অতি সুস্পষ্ট নির্দেশ। ওই আবদ্ধ জায়গায়, বাঘটি যখন সব দেখতে পাচ্ছে, আর এগনো হত মূর্খতা। তাই লোকজনকে ফিরে যেতে ইশারা করে এবং তা করার জন্য তাদের ক মিনিট সময় দিয়ে আমি অতি ধীরে পেছনপানে হাঁটতে শুরু করলাম—কোনো জানোয়ারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে যখন কেউ আগ্রহী নন, তার কাছ থেকে সরে যাবার একমাত্র নিরাপদ পন্থা এটি। যেই সেই ফাঁড়ার জায়গাটি পেরিয়েছি অমনি আমি ফিরে দাঁড়ালাম এবং শিস দিয়ে লোকজনকে আসতে বলে গিরিখাতের ভাটিতে আরো একশো গজ এগিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হলাম। কোথায় বাঘ আছে আমি এখন তা সঠিক জানি, বেশ বিশ্বাস হল তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমি সক্ষম তাই লোকজনের কাছে ফিরে গিয়ে আমি ওদের বললাম আমাকে রেখে ফিরে গিয়ে মাছ ধরিয়েদের দলে ভিড়তে। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তারা এ-কাজ করতে খুব ভয় পেল। আমি যেমন, তারাও তেমনি বিশ্বাস করছিল, যে বাঘের গরগরানি এইমাত্র শুনেছে সেইই মানুষখেকো, এবং তারা আমার রাইফেলের ভরসা পেতে চেয়েছিল। আমি নিজে ওদের নিয়ে গেলে আমার দু'ঘণ্টা নষ্ট হয় এবং যেহেতু আমরা ছিলাম এক শাল বনে আর চড়ার মত একটি গাছও দৃষ্টিসীমায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়েই ওদেরকে আমার সঙ্গেই রাখতে হল।

খাড়াই বাঁ পাড় বেয়ে উঠে আমরা গিরিখাতটি থেকে সোজা দুশো গজ দূরে চলে গেলাম। এখানে আমরা বাঁয়ে ঘুরলাম এবং দুশো গজ এসেছি বোঝার পর আমরা আবার বাঁয়ে ঘুরলাম এবং যেখানে বাঘটিকে গরগর করতে শুনেছি তা থেকে একশো গজ ওপরে গিরিখাতেই ফিরে এলাম। অবস্থা ঘুরে গেছে এখন, অবস্থিতির সুবিধা এখন আমাদের হাতে। আমি জানতাম বাঘটা গিরিখাত ধরে নিচে নামবে না কেননা মাত্র ক মিনিট আগে ওদিকপানে ও লোকজন দেখেছে এবং ও গিরিখাত ধরে ওপরেও উঠবে না কেননা তা করতে হলে আমাদের পেরিয়ে যেতে হয়। আমাদের দিকে পাড়টি ত্রিশ ফুট উঁচু এবং তলাটা ঝোপঝাড়শূন্য ফাঁকা; তাই আমরা কৌশল করে বাঘটাকে যে ব্যূহে আটকিয়েছি তা থেকে ওকে বেরোতে হলে ওর একমাত্র পথ হল উলটোদিকের পাহাড়ের গা দিয়ে ওঠা। দশ মিনিট কাল আমরা গিরিখাতের কিনারে বসে থাকলাম, সামনের প্রতি ফুট জমি খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর, ক পা পিছিয়ে আমরা বাঁয়ে ত্রিশ গজ গেলাম এবং আবার বসলাম কিনারে আর যখন বসলাম, আমার পাশে যে লোকটি বসে ছিল সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'শের' এবং গিরিখাতের ওপারে দেখাল। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, আর বাঘটার কতটুকু ও দেখতে পাচ্ছে লোকটিকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল কান নড়তে দেখেছে, কয়েকটি শুকনো পাতার কাছে। পঞ্চাশ গজ দূর পাল্লায় বাঘের কান কিছু সুস্পষ্ট বস্তু নয় এবং যেহেতু শুকনো পাতায় মাটি ঢেকে আছে, ওর বর্ণনায় বাঘকে হদিস করায় আমাকে কিছু সহায়তা করল না। আমার পেছনের লোকজনের নিশ্বাসে পরিষ্কার টের পাওয়া গেল উত্তেজনা চড়া পর্দায় উঠে যাচ্ছে। ভাল করে দেখতে পাবার কারণে অচিরে একজন উঠে দাঁড়াল; আমাদের দিকে মুখ করে বাঘ ছিল গুঁড়ি মেরে; সে উঠে পড়ল এবং পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল আর একটি ঝোপের পেছন থেকে ওর মাথা বেরিয়ে আসতেই আমি গুলি করলাম। পরে দেখেছিলাম আমার বুলেটটি ওর ঘাড়ের লোম ভেদ করে ছুটে গিয়ে একটি পাথরে লাগে। পাথরটি টুকরো হয়ে ফিরে এসেছিল; ফলে ও লাফিয়ে ছিটকে বাতাসে উঠে যায় এবং মাঠিতে পড়ার সময়ে ও বেধে যায় একটি বড় লতাগাছে; তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ওকে বেগ পেতে হয়। যখন ওকে মাটিতে ঝটাপটি করতে দেখলাম, আমরা ভাবলাম ও চিরতরে কুপোকাৎ হল, কিন্তু যখন পায়ে ভর করে উঠে ও ছুটে পালাল, শ্যাম সিং মত প্রকাশ করল ও বেগর-জখম, আমিও ওর মতকে সমর্থন করলাম। লোকেদের ফেলে রেখে আমি গিরিখাতটি পেরোলাম এবং মাটি খুঁজে বুলেটটি যে লম্বা লোমগুলো উড়িয়েছে তা পেলাম; পেলাম টুকরো হওয়া পাথর এবং ছেঁড়া ও কামড়ে টুকরো করা লতাটি; কিন্তু কোনো রক্ত পেলাম না।

কোনো জানোয়ারকে বিঁধলে সবসময়ে তখনি রক্ত বয় না এবং বুলেটটি যে

ভাবে লেগেছে বলে আমি ভাবছি তা ভুল হয়ে থাকতে পারে ; তাই মড়িটা খুঁজে বের করা দরকার কেননা সেটিই আগামীকাল বলে দেবে বাঘটি জখম হয়েছে কি হয় নি। এতে আমাদের কিছু হয়রানি হল এবং দুবার জমিটি খোঁজার আগে আমরা মড়িটি পাই নি ; অবশেষে মড়িটি পেলাম চার ফুট গভীর এক জলাশয়ে, ধরে নেওয়া যায় ভিমরুল এবং নীল মাছির হাত থেকে বাঁচাতে ও ওখানে মড়িটিকে রেখেছিল। যাদের আমি ধার নিয়েছিলাম সে তিনজনকে মাছ ধরা-দলের কাছে ফেরত পাঠিয়ে—এখন তা করা নিরাপদ—জঙ্গলের শব্দ-টব্দ শোনার জন্যে আমি আর শ্যাম সিং মড়ির কাছে এক ঘণ্টা লুকিয়ে থাকলাম ; তারপর, কিছুই না শুনতে পেয়ে ক্যাম্পে ফিরলাম। পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমি ও ম্যাক ফিরে এলাম গিরিখাতে এবং দেখলাম, জলাশয় থেকে মড়িটি সরিয়েছে বাঘ ; অল্প দূর বয়ে নিয়ে গেছে সেটাকে ; এবং মাথা ও খুর বাদে সবই খেয়ে ফেলেছে। খাওয়ার সময়ে যে জমিতে শুয়েছিল তাতে রক্ত নেই, এবং এতেই প্রমাণ হল, যে বাঘটি জখম হয় নি এবং ও ভয় কাটিয়ে উঠেছে।

যখন আমরা তাঁবুতে ফিরলাম, আমাদের খবর দেওয়া হল, লাটিয়া নদীর সুদূর পার্শ্বাঞ্চলে এক প্রশস্ত উন্মুক্ত গিরিখাতে একটি গরু নিহত হয়েছে এবং যারা সেটি খুঁজে পেয়েছে তারা সেটি ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। লাটিয়ার আট মাইল উজানের গ্রামটি থেকে ইবি তখনো ফেরে নি এবং লাঞ্চের পর ম্যাক ও আমি গরুটি দেখতে গেলাম। মধ্যাহ্নে ওটিকে ঢাকা হয় আর একটু পরেই বাঘটি ফিরে আসে ও ছেঁচড়ে নেবার কোনো নিশানা না রেখেই ওদিকে বয়ে নিয়ে যায়। এখানে জঙ্গল সৃষ্ট হয়েছে বড় বড় শাল গাছে, নিচের জমিতে কোনো ঘাস লতা নেই এবং শুকনো পাতার এক সুবিশাল স্তূপের নিচে যেখানে বাঘ মড়ি লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পেতে আমাদের এক ঘণ্টা লেগে গেল। সেখানে ছায়াতে তাপমাত্রা প্রায় একশো দশ ডিগ্রী—একটি কাছের গাছে ম্যাক অসীম শৌর্যে একটি মাচা তৈরি করে দিল আমাকে, আমি ধূমপান ও ওর জলের বোতল খালি করতে থাকলাম এবং আমাকে গাছে উঠতে দেখে ও ক্যাম্পে ফিরে গেল। এক ঘণ্টা বাদে গিরিখাতে সুদূর পার্শ্বের খাড়াই পাহাড় দিয়ে গড়ানো একটি ছোট্ট পাথর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং অচিরে দৃশ্যপথে এল একটি বাঘিনী, তার অনুসরণে দুটি ছোট বাচ্চা। এ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে এই প্রথমবার ওদের জীবনে বাচ্চা দুটিকে এক মড়ির কাছে আনা হয়েছে। এ কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত বিপদের গুরুত্ব ; যে প্রবল সাবধানতা নিয়ে চলা উচিত ; তা বাচ্চাদের বোঝানোর জন্যে মা যে প্রবল চেষ্টা করছিল তা দেখা খুবই চিত্তাকর্ষক। বাচ্চাগুলোর আচরণ মার মতই মনোগ্রাহী। পায়ে পায়ে ওরা ওর ছাপ ধরে এগোল ; কখনো এ-ওকে কিংবা মাকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল না ;

মা যে বাধা এড়িয়ে চলছে তা যত তুচ্ছই হ'ক, ওরাও তা এড়াল এবং কয়েক গজ বাদে বাদে মা যখন কান পাততে থামল, ওরাও সম্পূর্ণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জমিতে বড় বড় শাল পাতার গালচে ; তা শোলার মত শুকনো ; তার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চলা অসম্ভব, তবু প্রতিটি থাবা ফেলা হল খুব আলতো করে, তেমনি আলতো করেই তা তোলা হল, যত কম সম্ভব আওয়াজ করা হল।

গিরিখাতটি পেরিয়ে, বাচ্চাদুটির ঘনিষ্ঠ অনুসরণে আমার দিকে এল বাঘিনীটি. আমার গাছের পেছন পেরিয়ে মড়ির মুখোমুখি, তা থেকে ত্রিশ গজ দূরে এক সমতল ভূ-খণ্ডে গুড়ি মেরে বসল। স্পষ্টতই ওর গুড়ি মেরে বসার উদ্দেশ্য হল যেদিক পানে ওর নাক উঁচিয়ে আছে সেদিকে ছানাদের এগিয়ে যাবার এক ইশারা, এবং এখন তারা তাই করতে থাকল। এখানে যে আহার আছে, কি উপায়ে মা সে সংবাদ শাবকদের জানাল তা আমি জানি না, তবে সে যে ওদের এ খবর পৌছে দিয়েছিল তাতে কোনো প্রশ্ন নেই। মা গুড়ি মেরে বসার পর তাকে পেরিয়ে গেল ওরা। মার পেছনে পেছনে আসার সময় মা ওদের যে রকম সাবধানে চলতে বাধ্য করেছিল, ঠিক তেমনি সাবধানে এগোল। ছানারা যখন রওনা হল তখন ওদের মধ্যে এই ভাবভঙ্গী ফুটে উঠল যে ওরা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে চলেছে। আমি বারবার বলেছি বাঘদের কোনো ঘ্রাণ বোধ নেই এবং বাচ্চারা সে বলার সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ যোগাচ্ছিল আমাকে। যদিও সে সকালে মড়িটির খবর আমাদের পৌছনো হয়, আসলে গরুটি নিহত হয়েছিল আগের দিন, এবং ওটাকে শুকনো পাতার পাঁজার নিচে লুকিয়ে রাখার আগে বাঘিনীটি ওর বেশির ভাগ খেয়ে ফেলেছিল। আমি যেমন বলেছি, আবহাওয়া ছিল অতি গরম এবং ওই দুর্গন্ধই ক্রমে ম্যাক ও আমাকে মড়ি খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আর এখানে এখন, দুটি ক্ষুধার্ত শাবক, মড়িটির এক গজের ভেতর দিয়ে ওপর থেকে নিচে, সামনে থেকে পেছনে, এক ডজন বার ওটাকে বারবার পার হয়ে চলে যাচ্ছে তবু ওটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। নীল মাছিগুলো মড়িটা কোথায় আছে প্রকাশ করে দিল এবং অনেকক্ষণ বাদে ওটা খুঁজে পেতে ওদের সহায়তা করল। ওটাকে পাতার তলা থেকে টেনে বের করে বাচ্চারা একসঙ্গে খানা খেতে বসল। আমি যেমন, বাঘিনীও শাবকদের তেমনি একাগ্রে লক্ষ করছিল এবং একবার মাত্র ও ওদের বকেছিল, যখন ওরা মড়ির খোঁজ করতে বড় দূরে চলে গিয়েছিল। যেই মড়িটি মিলল, সেই মা চিত হয়ে ঠ্যাং শূন্যে তুলে ঘুমোতে গেল।

শাবকদের যখন খেতে দেখছিলাম, কয়েক বছর আগে ত্রিশূলের পাদদেশে যে একটি দৃশ্য দেখেছিলাম তা আমার মনে পড়ল। সকল হিমালয়ী ছাগ প্রজাতির মধ্যে সব চেয়ে অটল পা ফেলে থর্। সেই থর-এর আশায় এক শৈলশিরায় শুয়ে ফিল্ড-গ্লাস দিয়ে আমার উলটো দিকের এক পর্বত চূড়া আঁতিপাঁতি করে

দেখছিলাম আমি। চূড়াটির চড়াই দিকে আধাপথে এক কার্নিসে একটি থর্ ও তার ছানা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চটপট থরটি উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, এবং তৎক্ষণাৎ ছানাটি ওকে গুঁতিয়ে দুধ খেতে শুরু করল। আন্দাজ এক মিনিট বাদে মা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, কার্নিস ধরে কয়েক পা গেল, এবং ওর বার থেকে পনের ফুট নিচে আরেকটি আরো সরু কার্নিসে লাফিয়ে নামল। যেই ওকে একা ছেড়ে আসা হল, অমনি ছানাটি সামনে ও পেছনে দৌড়দৌড়ি লাগিয়ে দিল। মাঝে মাঝে নিচে মার দিকে উঁকি মারবে বলে দৌড় থামায়, কিন্তু নিচে লাফ মেরে মার কাছে যাবার সাহস আর সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। কেননা সেই সামান্য ক ইঞ্চি সরু কার্নিসের নিচে পড়ে যায় যদি পড়তে হবে একেবারে হাজার ফুট। মা তার ছানাকে সাহস দিচ্ছিল কি না শোনার পক্ষে আমি বড়ই দূরে ছিলাম, কিন্তু যে ভাবে মায়ের মাথা ঘোরানো ছিল, আমার বিশ্বাস, তা দিচ্ছিল ও। ছানাটি এখন ক্রমেই বেশি বিচলিত হয়ে পড়ছিল এবং সে কোনো মূর্খতা করে বসে যদি, সম্ভবত সেই ভয়ে মা যেখানে গেল, তা চোখে দেখাল পাহাড়ের খাড়া গায়ে সামান্য এক ফাটলের মত; তা বেয়ে উঠে মা শাবকের সঙ্গে পুনর্মিলিত হল। এ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই মা শুয়ে পড়ল, বোঝাই গেল ছানাটিকে দুধখাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্যেই। অল্প ক্ষণ বাদে ও আবার উঠে দাঁড়াল, ছানাকে এক মিনিট দুধ খেতে দিল, কিনারে দাঁড়াল সন্তর্পণে, লাফিয়ে নামল নিচে; তখন ওর ওপরে ছানাটি আবার সামনে পেছনে দৌড়দৌড়ি লাগিয়ে দিল। পরবর্তী আধ ঘন্টার মধ্যে সাত বার এই আচরণটি করা হল; অবশেষে নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ছানাটি লাফ দিল, মার পাশে নিরাপদে অবতরণ করল, আশমিটিয়ে দুধ খেতে পেল, এই ভাবে হল পুরস্কারপ্রাপ্তি ওর। ও যে পথ দেখাচ্ছে তা অনুসরণ করা নিরাপদ, থরটির শাবককে সে শিক্ষাদানের সমাপ্তি হল সে দিনের মত। সহজাতপ্রবৃত্তি নিশ্চয়ই সহায়তা করে; কিন্তু বন্যজগতে সকল প্রাণীর শাবকদের বড় হয়ে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে মায়ের এই অসীম ধৈর্য এবং সন্তানের বিনাপ্রশ্নে বাধ্যতা। আমার দুঃখ হয়, যখন সুযোগ ছিল, আমি যে সব বিভিন্ন প্রজাপতির প্রাণীদের তাদের শাবকদের প্রশিক্ষণ দিতে দেখেছি তার সিনেমাটোগ্রাফ রেকর্ড করার সাধ্য আমার ছিল না তখন; কেননা জঙ্গলে তার চেয়ে চিত্তাকর্ষী দেখবার আর কিছু নেই।

শাবকদের খাওয়া হয়ে গেলে ওরা ওদের মার কাছে ফিরে গেল এবং মা ওদের গড়িয়ে গড়িয়ে, খাবার সময়ে ওরা যে রক্ত লাগিয়েছিল গায়ে, তা চেটে চেটে ওদের সাফ করতে লেগে গেল। ওর মনোমত ভাবে এ কাজটি সমাপন হলে ও রওনা হল লাঢিয়াতে এক অগভীর পারঘাটার দিকে এবং ছানারা চলল ওর পেছনে, কেননা মড়িটিতেও আর অবশেষ নেই কিছু এবং নদীর এপারে ওর ছানাদের আড়াল রাখার মত নেই কিছু।

আমি জানতাম না, এবং জানলেও এসে যেত না কিছু যে, সেদিন যে বাঘিনীটিকে অমন সাগ্রহে নিরীক্ষণ করেছিলাম, সে পরে গুলিজনিত জখমের কারণে মানুষখেকোতে পর্যবসিত হবে এবং লাঢিয়া উপত্যকা ও আশপাশের গ্রামগুলিতে যারা সব বাস ও কাজকর্ম করে, সকলের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠবে।

থাক্-এ যে মড়িটি নিয়ে আমি প্রথম রাত বসেছিলাম, শকুনরা খেয়ে শেষ করে দিক বলে সেটি খুলে বের করে দেওয়া হয় এবং আরেকটি মোষ বাঁধা হয় উপত্যকার মুখে, গ্রামের পশ্চিমে পুরনো মড়ির আন্দাজ দুশো গজ দূরে। চতুর্থ দিনে থাক্-এর গ্রামমোড়ল আমাদের খবর পাঠাল যে এই মোষটি একটি বাঘের হাতে মারা পড়েছে, এবং বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে।

আমাদের তোড়জোড় হয়ে গেল তড়িঘড়ি এবং বেদম গরমে চড়াই ভেঙে আমি ও ইবি দুপুর নাগাদ হত্যার জায়গায় পৌঁছলাম। মোষটিকে মারবার ও একটি বেজায় শক্ত রশি ছেঁড়ার পর বাঘটি মড়িটি তুলে নিয়েছে ও সিধে নেমে গেছে উপত্যকায়। আমাদের লাঞ্চ বইতে যে দুজন লোককে এনেছিলাম তাদের আমাদের খুব কাছাকাছি পেছনে থাকতে বলে আমরা ছেঁচড়ানোর দাগ অনুসরণে রওনা দিলাম। শীঘ্রই বোঝা গেল বাঘটি আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো জায়গায় গেছে, কেননা সে আমাদের নিবিড় জমিন্-ঝোপ, খাড়া পাড়ের উৎরাই, বিছুটি ও র‍্যাস্‌পবেরি ফলের ঝোপ; পড়ে থাকা গাছের ওপর ও তলা দিয়ে; সুবিশাল শিলা-স্তূপের ওপর দিয়ে দু মাইল হাঁটাল। অবশেষে দেখা গেল খোলা ছাতার মত দেখতে একটি বক্‌স গাছের তলার এক ছোট নাবালে ও মড়িটি সুরক্ষিত করে আগ্‌লে রেখেছে। মোষটি মারা পড়েছে আগের রাতে এবং একবারটিও না খেয়ে বাঘটি ওটা ফেলে রেখে গেছে এ ঘটনাটি মনে অশান্তি জাগাবার মত। যাই হ'ক মড়িটি এ জায়গায় আনতে ও যে কষ্ট স্বীকার করেছে তাতে এ কষ্টের অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল এবং সব যদি ঠিকঠাক চলে তবে এ আশা করার সম্পূর্ণ কারণ আছে যে ও ওর মড়ির কাছে ফিরবেই; কেননা মোষটির ঘাড়ের দাঁতের দাগ থেকে আমরা বুঝেছিলাম এ শুধু এক সামান্য বাঘ নয়, আমরা যাকে খুঁজছি সেই নরখাদক।

থাক্-এ গরম গরম হেঁটে ওঠা এবং তারপর দুর্গম সব জায়গা দিয়ে নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়ের গা দিয়ে উৎরাই নামা, এর ফলে আমরা ঘেমে নেয়ে উঠেছিলাম; আর আমরা যতক্ষণ সে নাবালে বিশ্রাম করতে করতে লাঞ্চ এবং প্রচুর চা খেলাম, আমি চারদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে থাকলাম। যার ওপর বসব, দরকার হলে রাতও কাটাব, তেমন একটি সুবিধামত গাছের খোঁজ করতে থাকলাম। জঙ্গলে কোনো একটি বিশাল গাছ এক সময়ে জীর্ণ হয়ে যায়। তারই এক পচধরা অংশে ফিকাস্ গাছটি জন্মায়। যে গাছটি ওকে জন্ম দিল তার চারপাশ দিয়ে ঝুরি নামিয়ে জাল বুনে দিয়ে নতুন গাছটি তাকে মেরে

ফেলল। এখন ঝুরিগুলো ঠাস বুনোট হয়ে পরগাছা গাছটির গুঁড়ি তৈরি করছে। ঝুরিগুলো নামতে নামতে থেমে গেছে। সেখানে মাটি আর ঝুরি-গুলোর মধ্যে দশ ফুট ফাঁক আর সেই ফাঁকের মধ্যে পচধরা প্রথম গাছটি পড়ে আছে। সেখানে আরামে বসার জায়গা হবে বলে মনে হল আর সেখানেই বসব বলে ঠিক করলাম।

লাঞ্চ এবং একটি সিগারেট খাওয়া হতে ইবি আমাদের দুটি লোককে ষাট গজ ডাইনে নিয়ে গেল এবং বাঘ যদি কাছে ওঁত পেতে থেকে থাকে, আমাদের দেখে থাকে, তাহলে তার মনোযোগ অন্যপথে নেবার জন্যে—ডাল ঝাঁকিয়ে তারা মাচা তৈরি করছে ভান্ করবার জন্যে লোক দুটিকে তুলে দিল গাছে—আমি ওদিকে যত নিঃশব্দে সম্ভব, উঠে পড়লাম ফিকাস্ গাছে। যে আসন বেছেছি আমি তা ঝুলে নেমেছে সমুখপানে ; পচা কাঠ ও মরা পাতায় তাতে গদী বিছানো ; যদি সেগুলো ঝেড়ে ফেলে দিই তবে সে শব্দ ও নড়াচড়া বাঘ ধরে ফেলতে পারে এই ভয়ে সেগুলো যেমনটি ছিল তেমন রেখে দিলাম আর বসলাম সেগুলোর ওপরে।—কায়মনে আশা করলাম আমার তলের ফাঁপা গুঁড়িতে যেন কোনো সাপ না থাকে, মরা পাতার ভেতর না থাকে কোনো বিছে। পিছনে বা সামনে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে আমার পা ঝুরির একটি ফাঁকে রেখে এ অবস্থায় যতটা সম্ভব ততটা গুছিয়ে বসলাম আরামে এবং যখন আমি বসে পড়লাম, ইবি লোকগুলিকে গাছ থেকে ডেকে নামাল এবং হেঁকে কথা কইতে কইতে চলে গেল।

বসব বলে যে গাছটি নির্বাচন করেছি সেটি বাইরের দিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর এক কোণ সৃষ্টি করেছে তা আগেই বলেছি ; এবং আমার দশ ফুট নিচে এক খণ্ড সমতল জমি, প্রায় দশ ফুট চওড়া ও বিশ ফুট লম্বা। এই সমতল ভূ-খণ্ড থেকে পাহাড়টি খাড়াই নেমে গেছে ক্রমে এবং লম্বা ঘাস ও নিবিড় আগাছার জঙ্গলে তা আচ্ছাদিত ; তার ওপারে আমি একটি নদীকে বইতে শুনছিলাম। বাঘের ঘাপটি মেরে থাকার এক আদর্শ জায়গা।

ইবি ও লোক দুটি চলে যাবার পর আন্দাজ পনের মিনিট কেটেছে তখন উপত্যকার সুদূর পার্শ্বে জঙ্গলের প্রাণীদের বাঘের উপস্থিতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্যে একটি লাল বাঁদর ডাকতে শুরু করল। ছেঁচড়ানির দাগের অনুসরণে আমরা যখন পাহাড়ের উৎরাই নামছিলাম তখন-এ বাঁদরটি ডাকে নি এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে আমাদের আগমনে বাঘটি সরে যায় নি। এখন, বাঘরা যা করে থাকে, ওর মড়ির কাছাকাছি ও যে সব শব্দ শুনেছে তার তদন্ত করতে আসছে। বাঁদররা অসামান্য ভাল দৃষ্টিশক্তির আশীর্বাদধন্য এবং যেটি ডাকছে সেটি যদিও সিকি মাইল দূরে আছে ; এ খুবই সম্ভব যে বাঘকে দেখে ও ডাকছে সে বাঘ আমার কাছেই আছে। আমি বসে আছি

পাহাড়ের মুখোমুখি, মড়িটি আমার সম্মুখে বাঁ দিকে। বাঁদরটি সবে মাত্র আটবার ডেকেছে, তখন আমার পেছনের পাহাড়ের খাড়াই ঢালে একটি শুকনো কাঠ ভাঙতে শুনলাম। ডাইনে মাথা ঘুরিয়ে, ঝুরির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলাম এপাশে ঝুরির জাল আমার মাথার একটু উঁচু অব্দি ছড়ানো; দেখলাম প্রায় চল্লিশ গজ দূরে থেকে বাঘটি দাঁড়িয়ে আমার গাছের দিকে চেয়ে আছে। বেশ কয় মিনিট ধরে ও একবার আমার দিকে, আরেকবার যে গাছে লোকদুটি চড়েছিল সেদিকে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অবশেষে আমার দিকপানে আসা স্থির করে ও পাহাড়ের খাড়াই ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। হাত ব্যবহার না করে, প্রচুর শব্দ না করে, কোনো মানুষের পক্ষে ওই খাড়াই দুর্গম পথ পেরনো সম্ভব হত না, কিন্তু বাঘটি সে কাজ নিঃশব্দে সারল। সমতল জমিটির যত কাছে এল ও ততই সতর্ক হয়ে উঠল ও এবং পেটটা মাটির তত কাছে ঘেঁষিয়ে রাখল। যখন পাড়ের মাথার কাছে পৌঁছে গেছে তখন অতি ধীরে ও মাথা তুলল। যে গাছে লোকগুলি চড়েছিল সে দিকে বহুক্ষণ চেয়ে দেখে নিল এবং ওতে মানুষ নেই জেনে লাফিয়ে চলে এল সমতল জমিতে এবং আমার তলে এসে আমার নজরের আড়ালে চলে গেল। আমি আশা করছিলাম ও আমার বাঁ ধারে আবার দেখা দেবে এবং মড়ির দিকে যাবে এবং তা করবে বলে আমি যখন অপেক্ষা করছি, শুনলাম গাছের তলের শুকনো পাতাগুলো দলেমচে যাচ্ছে। বাঘটা শুকনো পাতার ওপর শুচ্ছে।

পরের সিকি ঘন্টা আমি একেবারে অসাড় বসে রইলাম এবং বাঘের দিক থেকে আমার দিকে আর কোনো শব্দ এল না বলে আমি ডাইনে মাথা ঘোরালাম ও ঝুরির এক ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাঘটির মাথা দেখলাম। আমার চোখ টিপে এক ফোঁটা চোখের জল বের করতে যদি পারতাম এবং ওই ফাঁক দিয়ে তা ফেলতে পারতাম, তবে আমার বিশ্বাস, তা সিধে ওর নাকের ওপরে পড়ত। ওর চিবুক মাটিতে, চোখ বোজা। অচিরে চোখ খুলল ও, মাছি তাড়াতে চোখ পিটপিট করল, আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। আগেকার অবস্থায় ফিরে এসে আমি এখন বাঁয়ে মাথা ঘোরালাম। এদিকে কোনো ঝুরি নেই, যার গায়ে ভর দিয়ে নিজেকে সামলাই। এমন কোনো ডালও নেই, আর বেসামাল হয়ে পড়ে না গিয়ে যতদূর পারি, ততদূর ঘাড় ঘুরিয়ে নিচে চাইলাম। দেখলাম বাঘটির লেজের প্রায় সবটা এবং পিছনের একটি পায়ের এক অংশ দেখতে পাচ্ছি।

পরিস্থিতিটি বিবেচনাসাপেক্ষ। গাছের যে গুঁড়িতে আমি পিঠ ঠেস দিয়েছি তা মোটামুটি তিন ফুট মোটা এবং আড়াল দিচ্ছে চমৎকার। অতএব বাঘ আমাকে দেখে ফেলবার সম্ভাবনা নেই। বিরক্ত না করলে ও মড়ির কাছে যাবে তা সুনিশ্চিত, তবে প্রশ্ন হচ্ছে যাবে কখন? বিকেলটি বেজায় তপ্ত, কিন্তু ও যে

শোয়ার জায়গা বেছে নিয়েছে তা আমার গাছের ঘন ছায়ায়। এবং আরো কি, উপত্যকা থেকে বইছে শীতল বাতাস। এই সন্তোষজনক অবস্থায় ও ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমোতে পারে এবং দিবালোক সাঙ্গ না হওয়া অবধি মড়ির কাছে না যেতেও পারে, আমার একটি গুলি ছোঁড়ার সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারে। তাহলে বাঘের খেয়ালখুশির জন্যে সবুর করার ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে না ; কেননা যে সব কারণ দর্শিয়েছি তা ব্যতীতও আমাদেব হাতের সময় শেষ হয়ে এসেছে প্রায় ; এবং বাঘকে মারার এই হয়তো শেষ সুযোগ পাচ্ছি আমি, আর সে সুযোগের ওপর বহু মানুষের জীবন নির্ভর করতে পারে। গুলি ছোঁড়ার জন্যে অপেক্ষা করা সুপরামর্শের কাজ নয়, তাহলে রইল একটি সম্ভাবনা— বাঘ যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা। আমার ডান-দিকে ঝুরির জালে অনেক ফাঁক, তা দিয়ে আমি রাইফেলের নল ঢোকাতে পারি ; কিন্তু তা করলে পরে মাছিদুটো বাঘটার মাথা বরাবর তাক করার পক্ষে নলের মাথা যথেষ্ট নামানো যাবে না। দাঁড়িয়ে ঝুরি বেয়ে ওপরে উঠে ঝুরির মাথা থেকে গুলি ছোঁড়া কঠিন হত না। কিন্তু খানিকটা আওয়াজ না করে তা করা সম্ভব নয় ; কেননা আমার শরীরের চাপটা সরে গেলে যে শুকনো পাতার ওপর আমি বসে আছি তা মচমচ শব্দ করবে এবং আমার দশ ফুটের মধ্যে আছে জঙ্গলে যে কারো চেয়ে তীক্ষ্ণ শ্রুতিসম্পন্ন একটি জানোয়ার। বাঘের মাথার দিকে গুলি মারা সম্ভবপর নয়। রইল লেজের দিকটি।

যখন রাইফেলে ছিল দুটি হাত এবং আমি ঘাড় ঘুরিয়েছিলাম বাঁয়ে, বাঘের লেজের প্রায় সবটুকু এবং একটি পিছনের পায়ের একাংশ দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। রাইফেল থেকে ডান হাত সরিয়ে নিয়ে ঝুরিটি আঁকড়ে ধরে দেখলাম বাঘটির এক-তৃতীয়াংশ দেখতে পাব এতটা বাইরে ঝুঁকতে পারছি। হাত সরাবার পরেও যদি ওইভাবে থেকে যেতে পারি তবে ওকে পঙ্গু করে দেওয়া সম্ভব। একটি প্রাণীকে পঙ্গু করে ফেলা—বিশেষ, এক ঘুমন্ত জানোয়ারকে—শুধু এই কারণে, যে সে মাঝেসাঝে মুখ বদলাতে পছন্দ করে—সে একেবারে ঘৃণ্য। তবে বিষয়টি যখন এক নরখাদক, তখন ভাবপ্রবণতার ঠাঁই এ নয়। আরো মানব. প্রাণহানি বন্ধের জন্যে আমি এ বাঘটিকে মারতে চেষ্টা করছি বেশ কিছু দিন যাবৎ, এবং এখন যখন তার এক সুযোগ পেয়েছি, তখন ওকে মারার আগে ওর পিঠ ভেঙে দিতে হবে সেজন্যে এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ন্যায়সংগত হয় না। তাই পন্থাটি যতই অপ্রীতিকর হ'ক না কেন, মারতে আমাকে হবেই, এবং তা যত তাড়াতাড়ি সারা যায় ততই ভাল. কেননা মড়িটি এখানে আনতে গিয়ে বাঘটি এক দু-মাইল ব্যাপী রক্তের নিশানা রেখে এসেছে এবং এক ক্ষুধার্ত ভাল্লুক সে নিশানা খুঁজে পেলে পরে যে কোনো মুহূর্তে আমার হাত থেকে সিদ্ধান্তের ভার ছিনিয়ে নিতে পারে। শরীর সম্পূর্ণ অনড় কঠিন রেখে আমি ক্রমে ঝুরি থেকে

হাত সরালাম, দ্বহাত রাখলাম রাইফেলে এবং একটি গ্বলি ছ্বঁড়লাম পিছনে, আমার নিচে, আরেকবার তেমন গ্বলি ছোঁড়বার কোনো বাসনা নেই আমার। ৪৫০/৪০০ হাই ভেলোসিটি রাইফেলের ঘোড়া যখন টিপি, বাঘটা ছিল আকাশ-পানে তাক করে এবং আমি মাছিগ্বলির নিচ দিয়ে দেখছিলাম। ওপর দিয়ে নয়। পিছ্ব ধাক্কায় আমার আঙ্বলগ্বলো ও কবজি জখম হল বটে তবে আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, তা হল না, ভাঙল না, এবং বাঘটি যেমন তার শরীরের উপরাংশ উলটে দিয়ে চিত অবস্থায় পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকল, আসনে ঘ্বরে গিয়ে বসে আমি দ্বিতীয় নলটি দিয়ে ওর ব্বকে গ্বলি ছ্বঁড়লাম। আমার প্রথম গ্বলিতে বাঘটা যদি গর্জাত ও খেপে যেত, নিজেকে কম খ্বনী খ্বনী মনে হত আমার ; কিন্তু ও যে রকম দরাজ কলিজা জানোয়ার, ম্বখটি খ্বলল না ও, এবং একটি শব্দও না করে আমার দ্বিতীয় গ্বলিতে মরল।

চারদিন আগে যে মোষ মারা পড়ে, এবং কোনো অযাচিত কারণে শকুনরা যাকে খায় নি, সেটাকে সামনে রেখে সেই জাম গাছে বসার উদ্দেশ্যে ইবি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল, বাঘটি যদি আমাকে ফিকাস্ গাছে উঠতে দেখে থাকে, যে মড়ি রেখে আমি বসেছি সেটা ফেলে চলে যেতে পারে ও, ফিরে যেতে পারে থাক্-এ, ওর প্বরনো মড়ির কাছে এবং ইবিকে একটি গ্বলি ছোঁড়ার স্বযোগ দিতে পারে। আমার দ্বটি গ্বলি গ্বনে, ওর সাহায্য আমার দরকার কি না তা দেখতে দ্রুত ফিরে এল ও, এবং ফিকাস্ গাছ থেকে আধ মাইল দ্বরে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আমার। দ্বজনে ফিরে এলাম হত্যাস্থলে, বাঘটি নিরীক্ষণ করব বলে। চমৎকার বিশাল এক মন্দা বাঘ, যৌবনের শিখরে, চমৎকার শারীরাবস্থা এবং মাপ নেবার কিছ্ব আমাদের থাকলে পরে ওর মাপ হত নাকের ডগা থেকে লেজের শেষ অব্দি কাঠির মাপে ন ফুট, ছ ইঞ্চি এবং গায়ের মাপে ন ফুট, দশ ইঞ্চি। তলার চোয়ালের ডান দিকে শব-দন্তটি ভাঙা ছিল ওর। পরে ওর শরীরের বিভিন্নাংশে গ্রথিত বহ্ব ছররাগ্বলি পেয়েছিলাম আমি।

আমাদের চারজনের ক্যাম্পে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ও বেজায় ভারি, তাই ঘাস, ডালপালা, শ্বকনো কাঠের ওপর চাপানো বড় বড় পাথর, এইসব দিয়ে ওকে ঢেকে রেখে এলাম যেখানে পড়েছিল সেখানেই—ভাল্ল্বকের হাত থেকে বাঁচাবার কারণে। সে রাতে কথা ছড়িয়ে পড়ল যে মান্বষখেকো বাঘটি নিহত হয়েছে এবং পরদিন সকালে যখন ওর চামড়া ছাড়াতে সেই ফিকাস্ গাছের গোড়ায় ওকে বয়ে আনলাম, একশোজনেরও বেশি প্বর্ব্ষ ও বালক ভিড় জমাল ওকে দেখতে। বালকদের মধ্যে ছিল চ্বকার মান্বষখেকোর শেষ নিহত মান্বষের দশ বছরের ভাইটি।

৫

তল্লাদেশের মানুষখেকো বাঘ

১

সারা হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে বিন্দুখেড়ার মত এমন একটা সুন্দর ক্যাম্প করার জায়গা খুঁজে মেলা ভার। বিশেষ করে যখন পলাশের আগুন রঙে সারা গ্রামটা রাঙা হয়ে থাকে। আপনি মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিন। মাথার ওপর লাল পলাশের চাঁদোয়া, নিচে ছোট্ট ছোট্ট সাদা তাঁবু আর এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য রামধনুকের রঙ পাখায় মাখা বেনে, সাতসয়ালী, সোনা বউ, টিয়া, সোনালী কাঠ ঠোকরা, চুড়ো ফিঙে। তাদের লাফালাফিতে অজস্র পলাশ ফুল ঝরে ঝরে তাঁবুর বাইরের জমিটা একটা আগুন রঙা গালচের মত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাকান। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাদ-দেশের ওপরে একের পর এক মাথা তুলে উঠেছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী, মিশেছে চিরতুষারাবৃত চূড়ায়। এই ছবিটা মনে মনে আঁচ করে নিলেই বিন্দুখেড়ায় ১৯২৯ সালের এক ফেব্রুআরির সকালে আমাদের ক্যাম্পটি সম্বন্ধে আপনার মোটামুটি একটা ধারণা হবে।

বিন্দুখেড়া, প্রায় বার মাইল লম্বা আর দশ মাইল চওড়া এক বিস্তীর্ণ ঘেসো জমির পশ্চিমপ্রান্তে এই ক্যাম্পের জায়গাটির নাম। স্যার হেনরি র‍্যামসে যখন কুমায়ুনের রাজা ছিলেন তখন এই সমতলভূমি নিবিড়-চাষবাসের আওতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু আমার গল্প যখন শুরু তখন এখানে তিনটে মাত্র ছোট ছোট গ্রাম আর সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্ষীণস্রোতা পার্বত্য নদীটির

দুইধার দিয়ে সামান্য কয়েক একর জমির চাষবাস। আমরা পৌঁছনোর কয়েক সপ্তাহ আগেই সেই সমতল ভূমির ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল তবে জায়গায় জায়গায় যেখানে জমি ভিজে, সে জায়গাগুলি বিভিন্ন আকারের দ্বীপের মত দাঁড়িয়েছিল সবুজ ঘাস বুকে নিয়ে। এই রকম একটা ঘাসের দ্বীপের মধ্যেই আমরা আমাদের শিকার খুঁজে পাব আশা করেছিলাম। যার জন্যে আমাদের এই এক সপ্তাহের জন্যে বিন্দুখেড়ায় আসা। এই জায়গাটিতে আমার প্রায় বছর দশেক শিকারের অভিজ্ঞতা তাই জমির প্রতিটি ফুট জায়গা আমার চেনা। স্বভাবতই শিকার খুঁজে বার করার ভারও ছিল আমারই ওপর।

তরাই অঞ্চলে যতরকম শিকারের কথা আমি জানি তার মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের হচ্ছে পোষা, শেখানো হাতির পিঠে বসে বন্দুক চালানো। দিন যতই দীর্ঘ হ'ক না এতে প্রতিটি মুহূর্তে ভরে ওঠে আনন্দে আর উত্তেজনায়। কারণ এভাবে শিকার করলে রকমারি শিকার পাওয়া যায়। একটা ভাল দিনে আমি সুন্দরি, কাদাখোঁচা পাখি থেকে আরম্ভ করে চিতা, বার শিঙা হরিণ পর্যন্ত প্রায় আঠার রকমের বিভিন্ন শিকার পেয়েছিলাম। আর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে এভাবে শিকার করলে বহু বিচিত্র ধরনের পাখি চোখে পড়ে। ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে গেলে পাখির জগতের এই বৈচিত্র্যের সম্ভার সাধারণত চোখের আড়ালেই থেকে যায়।

ফেব্রুআরির সকালে যেদিন আমরা প্রথম শিকারে বেরোলাম সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিল নয়টি বন্দুক আর পাঁচজন ছিলেন দর্শকের ভূমিকায়। সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে আমরা হাতির পিঠে চড়ে বসলাম। দু'ধারে দু'জন করে বন্দুকধারীর মধ্যে একটি করে হাতি। এইভাবে লাইন সাজানো হল। আমি ছিলাম লাইনের ঠিক মাঝখানটিতে আমার দু'দিকেই চারজন করে বন্দুকধারী চারটি হাতি। দক্ষিণদিকে মুখ করে আমরা রওনা দিলাম। আমাদের লাইনের প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে একজন বন্দুক নিয়ে চলল। আমাদের বন্দুকের সীমানার বাইরে দিয়ে কোনো পাখির ঝাঁক যদি ডানদিকের জঙ্গলের দিকে মোড় নেয় তাহলে ও গুলি করবে। হাতির লাইনে যদি কখনও রকমারি শিকারে বেরোন সব সময়ে লাইনের পাশে জায়গা নেবেন। তবে বন্দুক আর রাইফেল এ দুটো চালানোতেই আপনাকে সমান দক্ষ হতে হবে। কারণ হাতির লাইনে ধরা পড়লে শিকার সব সময় একপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর যে জানোয়ার অন্য শিকারীদের গুলি থেকে বেঁচে পালাবার চেষ্টা করে তাকে তাক করে মারার মত কঠিন কাজ বড় একটা নেই।

ভারতবর্ষের জঙ্গলগুলি, ঝকঝকে সুন্দর ভোরে ফুলফলের নানারকম মিষ্টি গন্ধে যেন মেতে থাকে। সেই গন্ধ বেশিক্ষণ নাকে গেলে একটা শ্যাম্পেনের মত আমেজ আসে। শুধু মানুষের নয়, পাখিদেরও সেই গন্ধে নেশা হয়।

আর শিকারী আর শিকার দু'জনেই নেশার ঘোরে লক্ষ্যবিন্দুতে স্থির থাকতে না পারলে পাখি মারা কিরকম কঠিন কাজ হয়ে ওঠে ভেবে দেখুন।

তাই অতি উৎসাহী শিকারীর বন্দুকের সঙ্গে উড়ন্ত বুনো পাখির যোগ প্রায়শই ঘটে না। এরকম ঝকঝকে সুন্দর শিকারের দিনে সকাল আর সন্ধ্যের কয়েকটা মিনিট বড় ক্লান্তিকর। তাক করে করে চোখ টনটন করে, সারা শরীরে ব্যথা ধরে যায়। সেদিন সকালে পাখি অনেক ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকারীদের হাত ঠিক হয়ে এল। আমরা মারলাম পাঁচটা ময়ূর, তিনটে লাল বুনো মুরগি, দশটা কালো তিতির, চারটে গৌর তিতির, দুটো ঝোপের গুন্দরি আর তিনটে খরগোশ। একটা ভাল সম্বর হরিণেরও দেখা পেয়েছিলাম কিন্তু বন্দুক ঠিক মত তাক করার আগেই হরিণটা দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিল।

যেখানে জঙ্গলের একটা দিক অনেকটা জিভের মত সমতলভূমিতে এগিয়ে এসেছে কয়েকশো গজ, সেখানে শিকারের দলটিকে দাঁড় করালাম। এখানে সবসময়ে অসংখ্য ময়ূর ও বুনো মুরগি পাওয়া যায় বলে জঙ্গলটি বিখ্যাত। কিন্তু বহু নালা খাল খন্দ জঙ্গলের রাস্তাটিকে দুর্গম করে রেখেছে যার ফলে আমাদের লাইনটি সোজাসুজি এগোতে পারবে না। আমাদের লাইনের পেছনে একজন বন্দুক নিয়ে ছিলেন যাঁর এ ধরনের শিকারের অভিজ্ঞতা জীবনে প্রথম। তাই হাতির দলকে আঁকাবাঁকা পথে না নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। কয়েক বছর আগে এই জঙ্গলেই আমি এসেছিলাম উইণ্ডহ্যামের সঙ্গে একটা বাঘের সন্ধানে। তখনই আমি জীবনে প্রথম দেখি একটি রঙিন বাদুড়। এই সুন্দর বাদুড়গুলো যখন এক গাছের ছায়া থেকে আরেক গাছের ছায়ায় দৌড়দৌড়ি করে তখন মনে হয় যেন রঙচঙে প্রজাপতি। এগুলি সাধারণত দেখা যায় গভীর শরবনের মধ্যে।

শিকারের দলটিকে দাঁড় করিয়ে আমি হাতির দলকে পুবমুখো করে এক লাইনে রওনা করে দিলাম। জমির ওপর থেকে শেষ হাতিটি পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি লাইনটিকে আবার দাঁড় করালাম মুখ ঘুরিয়ে দিলাম উত্তরদিকে। এবার আমাদের সোজাসুজি সামনে নগাধিরাজ হিমালয়। আকাশ থেকে একখণ্ড শুভ্র মেঘ নেমে এসেছে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি। এত ঘন, যেন মনে হয় পরীরা ওর ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে পারে।

যখন সতেরটি হাতি একসঙ্গে এক লাইনে চলে তখন পায়ের নিচের জমির ওপর নির্ভর করে তাদের গতিবেগ পরস্পরের মধ্যের ব্যবধান। যেখানে ঘাস খুব গভীর সেখানে লাইনটির দৈর্ঘ্য আমি একশো গজের মধ্যে কমিয়ে এনেছিলাম। যেখানে ঘাস কম সেখানে দৈর্ঘ্য ছিল দুশো গজের মতন। উত্তর-দিকে প্রায় মাইলখানেক এগনোর পথে আমরা আরো গোটা তিরিশেক পাখি

আর একটা চিতা পেয়েছিলাম। হঠাৎ লাইনের সামনে লাফ দিয়ে উঠল একটা ভুঁই প্যাঁচা। এই প্যাঁচাগুলো সাধারণত থাকে বনরুই, শজারুর পরিত্যক্ত গর্তে। অনেকগুলো বন্দুক উঁচিয়ে ধরা হয়েছিল বটে কিন্তু পাখিটা কি মালুম হওয়ার পর বন্দুকগুলো নামিয়ে নেওয়া হয়। এগুলোর আকার তিতিরের প্রায় দ্বিগুণ, ডানাটা সাদা আর পাগুলো সাধারণ প্যাঁচার থেকেও লম্বা। যখন এরকমভাবে শিকারী হাতির বেড়জালে পড়ে যায় তখন এই প্যাঁচাগুলি মাটিতে নামার আগে প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ খুব নিচে দিয়েও উড়ে যায়। আমার মনে হয় ওরা এটা ইচ্ছে করেই করে যাতে হাতির পাল ওদের গর্তগুলো পেরিয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার হাতির দল এগিয়ে এলেই ওরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে ফিরে যায় ওদের গর্তের দিকে। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম আমি বড় একটা দেখি নি। কিন্তু আজকের প্যাঁচাটার ধরণ ধারণ একটু অন্যরকম মনে হল। পঞ্চাশ ষাট গজ সোজা উড়ে গিয়ে প্যাঁচাটা মাটিতে নামল না হঠাৎ ঘুরে ঘুরে আরো ওপরে উঠতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে উড়ে এল একটা বাজ। প্যাঁচাটা গর্তে ফিরতে না পেরে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বাজটার থেকেও উঁচুতে থাকার চেষ্টা করছিল। ওপরে ওঠার জন্যে প্রাণপণে ডানা ঝাপটাচ্ছিল সেটা। বাজটাও বিশাল ডানার বিস্তারে হাওয়া কেটে ঘুরে ঘুরে উঠছিল তার শিকারের ওপরে। সবাইয়ের এমন কি মাহুতদেরও দৃষ্টি তখন ওই দিকে—তাই লাইনটি আমি সেখানেই দাঁড় করিয়ে দিলাম।

উচ্চতা পরিমাপের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাটি না থাকলে উচ্চতা বোঝা কঠিন। তবে আমার মনে হয় দুটো পাখিই তখন প্রায় হাজার ফুট মতন উঁচুতে। প্যাঁচাটা তখন চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সাদা মেঘটার কোণা ছুঁই ছুঁই করছে। আমার মনে হল মেঘের পরীরা যেন নাচ থামিয়ে রুদ্ধশ্বাসে হাত বাড়িয়ে আছে প্যাঁচাটিকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্যে। একবার মেঘের আড়ালে ডুব মারতে পারলেই প্যাঁচাটি নিশ্চিন্ত। বাজটাও বুঝতে পেরেছিল প্যাঁচার মতলব। সেও ডানা ঝাপটিয়ে, চক্রটিকে ক্রমেই ছোট করে এনে তীব্র গতিতে উঠছিল ওপর দিকে। আমরা সবাই তখন দম বন্ধ করে একই কথা ভাবছি প্যাঁচাটা কি মেঘের আড়ালে পালাতে পারবে না ভয়ে দিশেহারা হয়ে গোঁত্তা মেরে নিচে নেমে গর্ততে লুকোবার চেষ্টা করবে? ভাল করে দেখার জন্যে তখন অনেকেরই পকেট থেকে দূরবীন বেরিয়ে এসেছে, চারিদিক ভরে উঠেছে হিন্দী ইংরিজী এই দুই ভাষাতেই উত্তেজিত স্বগতোক্তিতে।

না! আর বোধহয় পারল না।

নিশ্চয়ই পারবে! আলবাৎ পারবে!

আর একটুখানি গেলেই হয়ে যায়।

কিন্তু দেখ, দেখ। বাজটা কত কাছে এগিয়ে এসেছে!

হঠাৎ দেখা গেল আকাশে দুটো পাখির জায়গায় শুধু একটা মাত্র পাখি ঘুরপাক খাচ্ছে। আর একটা পাখি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। বাহবা! বাহবা! শাবাশ! শাবাশ! প্যাঁচাটা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে বেঁচে গেছে! সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল, কেউবা আকাশের দিকে সাদা টুপি নেড়ে অভিনন্দন জানাল প্যাঁচাটিকে। বাজটা কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে শোঁ করে ডানায় ভর দিয়ে নেমে এল তারপর বসল গিয়ে যে শিমুল গাছ থেকে প্যাঁচাটিকে তাড়া করেছিল তারই একটি ডালে।

মানুষের, কোন ঘটনায় যে কি প্রতিক্রিয়া হয় বলা বড় কঠিন। সেদিন সকাল থেকে আমরা চুয়ান্নটি পাখি আর চারটি জানোয়ার মেরেছিলাম—অনেকগুলি আমাদের তাক ফস্কে পালিয়েও গিয়েছে। তা নিয়ে বড় একটা হইচই হয় নি। আর এখন দর্শক, শিকারী, মাহুত সবাই যেন বাজের কবল থেকে প্যাঁচাটা বেঁচে যাওয়ায় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে, আনন্দিত হয়ে উঠেছে।

সমতলভূমির উত্তর প্রান্তে এসে আমি আবার হাতির দলটিকে দক্ষিণ মুখে ফেরালাম। যে পার্বত্য নদীটির জলে তিনটি গ্রামের চাষের জমি সেচ হয় তারই ডানদিকের পাড় দিয়ে এগোতে থাকলাম আমরা। এখানকার জমি ভিজে স্যাঁতসেঁতে আর ঘাসও খুব ঘন। আমরা সবাই রাইফেল তুলে তৈরি হলাম। এ জায়গাটায় অনেক হরিণ আর বারশিঙা পাওয়া যায়। তাছাড়া একটা চিতাও এখানে পাব আমরা আশা করছিলাম।

আমরা নদীর পাড় দিয়ে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে গেলাম। পথে আমরা মারলাম পাঁচটা ময়ূর, চারটে কাঠ ময়ূর, তিনটে কাদাখোঁচা আর একটা বেশ ভাল শিংঅলা বরা হরিণ। এগিয়ে চলেছি ধীরে ধীরে। হঠাৎ আমার কানের কাছে যেন বাজ ফাটল। আমার বাঁ কানের ভেতরের চামড়া যেন জ্বলে গেল, ভেতরের পর্দা গেল ফেটে। আমারই হাতির হাওদার পেছনে একজন দর্শক খুব জোরাল একটা রাইফেল হাতে করে বসেছিলেন। তাঁর হাত থেকে আচমকা রাইফেল ছুটে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। এরপরে সারাটা দিন আমার কাটল অবর্ণনীয় কষ্টে। কোনোরকমে বিনিদ্র একটা রাত কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে কালাধুঙ্গির পথে পা বাড়ালাম। কালাধুঙ্গিতে আমার বাড়ি। দূরত্ব আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল। আমি যখন রওনা হলাম ক্যাম্পে তখনও কেউ জেগে ওঠে নি।

কালাধুঙ্গিতে নতুন পাস করা তরুণ ডাক্তারটিও পরীক্ষা করে বললেন আমার কানের পর্দাই ফেটেছে। মাসখানেক পর আমরা নৈনিতালে আমাদের

গ্রীষ্মকালীন বাড়িতে গেলাম। সেখানেও র‍্যাম্‌সে হাসপাতালে নৈনিতালের সিভিল সার্জেন কর্নেল বারবার একই কথা বললেন। এরপরে বেশ কিছুদিন চলে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে আমার মাথার মধ্যে একটা ফোড়া হচ্ছে। আমার এই অসুস্থতায় আমি তো কণ্ট পাচ্ছিলামই, আমার দুই বোনের অশান্তি যেন ছিল আরও বেশি। হাসপাতালের চিকিৎসায় যখন কোনো ফলই পেলাম না তখন আমার বোনেদের ও ডক্টর বারবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি চলে যাওয়া স্থির করলাম।

আমি কিন্তু কারো সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যে এ দুর্ঘটনার কথা বলি নি। এটা বললাম তার কারণ এরপরে যে তল্লাদেশ মানুষখেকো বাঘের গল্প আপনাদের শোনাব তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার যোগ খুব গভীর।

২

১৯২৯ সালে বিল বেনেস ও হ্যাম ভিভিয়ান ছিলেন যথাক্রমে আলমোড়া ও নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার। দুজনকেই দারুণ ভোগাচ্ছিল দুটো মানুষখেকো বাঘ। প্রথমজনকে তল্লাদেশের মানুষখেকো বাঘ আর দ্বিতীয়-জনকে চৌগড় মানুষখেকো বাঘ।

আমি ভিভিয়ানকে কথা দিয়েছিলাম তার বাঘটিই প্রথমে মারার চেষ্টা করব। কিন্তু সে শীতে বাঘটা বিশেষ উপদ্রব করে নি। তাই ভিভিয়ানের অনুমতি নিয়ে আমি বেনেসের অঞ্চলের বাঘটাই আগে মারার সংকল্প করলাম। আমার এই সংকল্পের পেছনে আর একটা ধারণাও কাজ করছিল। আমি ভেবেছিলাম বাঘের খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলে দুর্ঘটনাজনিত মানসিক অবসাদ আমি অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পারব আর শারীরিক অক্ষমতাও আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। যাই হ'ক শেষ পর্যন্ত চলে গেলাম তল্লাদেশে।

আমার এই গল্পটি তল্লাদেশের বাঘকে নিয়ে, এবং আমি "জাঙ্গল লোর" বইটি না লেখা পর্যন্ত এ গল্প কাউকে বলি নি। কারণ "জাঙ্গল লোর" বইটি না পড়ে নিলে আমি ছোটবেলায় এবং পরেও কিভাবে জঙ্গলে হাঁটতে শিখেছি, রাইফেল চালাতে শিখেছি তা না জানলে পর, যাঁরা সে সময়ে কুমায়ুনে ছিলেন না তাঁদের কাছে গল্পটি অবিশ্বাস্য মনে হবে।

অচিরেই আমার যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হল এবং ৪ঠা এপ্রিল আমি নৈনিতাল থেকে রওনা হলাম। সঙ্গে নিলাম ছ জন গাড়োয়ালী। তাদের মধ্যে ছিল মাধো সিং, রাম সিং, এলাহাই নামে এক রাঁধুনী আর এক ব্রাহ্মণ, নাম গঙ্গারাম। গঙ্গারামের আমার সঙ্গে যাওয়ার উৎসাহ ছিল খুব। ওর কাজ ছিল টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটা। চোদ্দ মাইল হেঁটে কাঠগুদামে নেমে আমরা ট্রেনে উঠলাম সন্ধেবেলা। বেরিলি, পিলিভিট হয়ে টনকপুরে গিয়ে

পেঁছিলাম পরদিন দুপুর বেলায়। এখানে বেনেস তার পেশকারকে পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছেই শুনলাম যে তার আগের দিনই তল্লাদেশের মানুষখেকো একটি ছোট ছেলেকে মেরেছে। সে আরো জানাল যে বেনেসের নির্দেশ অনুযায়ী, আমার শিকারের টোপ হিসেবে দুটি বাচ্চা মোষ চম্পাবত দিয়ে তল্লাদেশে পাঠানো হয়েছে। আমার লোকজনেরা রান্নাবান্না করে তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিল। আমি খেয়ে নিলাম ডাকবাংলোয়। সেই রাতেই আমরা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম চব্বিশ মাইল দূরে কালাধুঙ্গার (কালাধুঙ্গি কিন্তু আলাদা) পথে।

রাস্তার প্রথম বার মাইল—বরমদেও হয়ে পবিত্র পূর্ণাগিরি পাহাড়ের নিচ পর্যন্ত অধিকাংশই গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ওই পাহাড়ের নিচেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে কালধুঙ্গায় যাওয়ার দুটো পায়ে চলা পথের মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়। একটি যেটি একটু দীর্ঘ সেই পথটি বাঁ দিক দিয়ে খাড়া উঠে গিয়ে পূর্ণাগিরি মন্দিরে পেঁছেছে, সেখান থেকে উৎরাইয়ের রাস্তা নেমে গিয়েছে কালাধুঙ্গা গ্রামে। আরেকটি পথ গিয়েছে কোলিয়ারের দশ লক্ষ ঘন ফুট শালকাঠ কাটার সময় তৈরি ট্রামওয়ে লাইনের সমান্তরাল হয়ে (আসলে এটি রেলপথ। তখন কাঠ-চালানের জন্য তৈরি রেলপথকে ট্রামওয়ে লাইনই বলা হত।—সম্পাদিকা)। সারদা নদীর খাদ ধরে চার মাইল লম্বা কোলিয়ারের ট্রামওয়ে লাইনটি বহুদিন হল জলে ভেসে গেছে। কিন্তু যেখানে পাহাড়ের পাথুরে অংশের ওপর দিয়ে পাথর কেটে লাইন বসানো হয়েছিল, সেখানে তার কিছু অংশ এখনও রয়েছে। আমার সঙ্গে ভারি বোঝা নিয়ে যে গাড়োয়ালীরা চলছিল তাদের পক্ষে এই রাস্তাটা পার হওয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। তার ওপরে নদীর খাদ ধরে আমরা আধাআধি পথ আসতে না আসতেই রাতের অন্ধকার নেমে এল। রাতে তাঁবু ফেলার মত একটা জায়গা খুঁজে বার করা খুব সহজ হল না। কয়েকটা জায়গা মিলল বটে তবে ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে বিপদ ঘটবার আশঙ্কা আছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত একটা চাতালের মত পাথর পাওয়া গেল। মাথার ওপর ছাদের মত আরেকটি পাথর থাকার জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ মনে হল। এখানেই আমরা রাত কাটানো স্থির করলাম। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। আমার লোকজন নদীর ভেসে আসা কাঠকুটো কুড়িয়ে রান্নাবান্না সেরে নিচ্ছিল। আমি জামাকাপড় ছেড়ে ক্যাম্প খাটে গা এলিয়ে দিলাম। আমার ক্যাম্পিং-এর সাজসরঞ্জাম বলতে এই ক্যাম্প খাটটি ছাড়া ছিল একটা হাতমুখ ধোওয়ার পাত্র আর একটা চল্লিশ পাউন্ডের তাঁবু।

সারা দিনটা খুব গরম ছিল আর টনকপুরে ট্রেন থেকে নেমে আমরা এ

পর্যন্ত প্রায় ষোল মাইল হেঁটেছি। আমার সারা শরীর জুড়ে একটা ক্লান্তির আমেজ—বেশ আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল নদীর ওপারে তিনটে আলো। নেপাল অঞ্চলে প্রত্যেক বছরই বনে আগুন লাগানো হয় এই এপ্রিল মাস নাগাদ। এই আলোগুলো দেখে আমার মনে হল নদীর খাদের হাওয়ায় ধিকিধিকি জ্বলা কোনো মরা গাছের কাঠ হয়তো জ্বলে উঠেছে। আমি শুয়ে আলোগুলো দেখতে দেখতেই আর একটু ওপরে আরো দুটো আলো জ্বলে উঠল। একটু পরেই নতুন দুটি আলোর বাঁ দিকেরটি ঢালু জমির পাড় দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এসে প্রথম তিনটি আলোর মাঝেরটির সঙ্গে মিশে গেল। এবার আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে ওগুলো আলোই, কোনো আগুন নয়। আলোগুলো সব একই আকারের, ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে দু ফুট মত। আলোগুলো জ্বলছিলও স্থির, অচঞ্চল শিখায়, কোনো ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। তারপরেই আরো কিছু আলো দেখা গেল—কিছু বাঁ দিকে, কিছু পাহাড়ের আরো ওপরে। তখন আমার মনে হল কোনো বড় জমিদার হয়তো শিকার করতে বেরিয়ে দামী কিছু হারিয়ে ফেলেছেন আর লোকজনকে লণ্ঠন হাতে পাঠিয়েছেন তারই সন্ধানে। একথা আমার হঠাৎ কেন মনে হল জানি না কিন্তু ওই বরফগলা নদীর ওপারেও নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে।

আমার লোকজন তখন আমারই মত আলোগুলো সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। নিচে নিস্তরঙ্গ নদী, চারিদিকে জঙ্গলের সীমাহীন স্তব্ধতা। আলোগুলোর দূরত্ব আমাদের আস্তানা থেকে প্রায় দেড়শো গজ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারা কোনো গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কি না। তারা উত্তর দিল কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ওপারের পাহাড়ে কি হচ্ছে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা এখন বৃথা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমরাও ছিলাম ক্লান্ত। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাম্পের সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রে শুধু একটা ঘুরাল আমাদের ওপরের পাহাড় থেকে বিপদ সংকেত জানিয়েছিল তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা চিতার ডাক শুনেছিলাম।

এখনও আমাদের পার হতে হবে অনেকখানি পথ আর চড়াইয়ের রাস্তাটাও বেশ দুর্গম। আমি আমার লোকজনদের জানিয়েই রেখেছিলাম যে আমাদের ভোর থাকতেই রওনা হতে হবে। পুবে প্রথম ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এক কাপ গরম চা আমার হাতে এসে গেল। আমাদের ক্যাম্প ভাঙা মানে তো টুকটাক কিছু বাসনপত্র আর আমার ক্যাম্প খাটটি গুছিয়ে নেওয়া। তাই সময় বিশেষ লাগল না। নদীর খাদের মধ্যে দিয়ে একটা ছাগল চলার পথ দিয়ে আমার রাঁধুনী আর গাড়োয়ালীরা লাইন করে নামছিল। কোলিয়ারের আমলে এই গর্তটার ওপরে একটা লোহার সাঁকো ছিল। আমি

কাল রাতে যে পাহাড়টায় আলো দেখেছিলাম, সেইদিকে তাকালাম। সূর্য উঠতে তখন আর বিশেষ দেরি নেই—দূরের জিনিসও এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমি নদীর পাড় থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত তারপর পাহাড়ের চূড়া থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি জমি তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলাম—প্রথমে শুধু চোখে, পরে দূরবীন দিয়ে কিন্তু কোনো জন-মানবের চিহ্ন আমার চোখে পড়ল না। আমার প্রথম ধারণাও যে অমূলক তার প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ধিকিধিকি জ্বলা কোনো আগুন আমার চোখে পড়ল না। আর এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায় যে এ-অঞ্চলের গাছপালা অন্তত গত এক বছরের মধ্যে পোড়ানো হয় নি। পাহাড়টা আগাগোড়াই শক্ত পাথর। গাছপালা নেই বললেই চলে। পাথরের মধ্যে শেকড় চালানোর মত ফাটল যেখানে আছে সেসব জায়গায় কিছু ঝোপঝাড়, কিছু অপুষ্ট গাছ গজিয়েছে। যেখানে আলো দেখা গিয়েছিল সেটা একটা পাথরের দেয়ালের মত সোজা খাড়াই। মানুষকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে না নামিয়ে দিলে কোনো মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

ন'দিন বাদে, পাহাড়ীদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি একরাতের জন্যে কালাধুঙ্গায় তাঁবু ফেলেছিলাম। যাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালবাসেন বা মাছ ধরার নেশা আছে তাঁদের কাছে কালাধুঙ্গা কুমায়ুন অঞ্চলের একটি স্বর্গ-বিশেষ। নেপাল ভারতকে যে কাঠ দিয়েছিল তা কেটে আনবার সময়ে কোলিয়ার এখানে একটা বাংলো বানিয়েছিলেন। সেই বাংলো থেকে গড়ানো জমি থাকে থাকে নেমে গেছে সারদা নদী পর্যন্ত। এই থাকগুলির ওপর কোনো এক সময়ে শস্য ফলানো হত। এখন এইগুলি ভরে আছে ঘন সবুজ ঘাসে। এখানে সকালে সন্ধ্যায় ঘাস খেতে আসে সম্বর আর চিতল হরিণ। বাংলোর পেছন দিকে ঢেউ খেলানো নিবিড় বন। সেখানে আছে চিতা আর বাঘ—আরো আছে ময়ূর, বনমোরগ আর কালিজ পাখির ঝাঁক। বাংলোর নিচেই সারদা নদীর জল থেকে তৈরি হয়েছে বড় বড় পুকুর আর মাছের ভেড়ি। সারা অঞ্চলে মাছ ধরার এমন জায়গাটি মেলা ভার। আপনি বড় হুইল ছিপেই ধরুন বা বোলতার টোপ দিয়ে হালকা ছিপেই ধরুন।

পরদিন খুব ভোরে আমরা কালাধুঙ্গা থেকে রওনা হলাম। গঙ্গারাম পাহাড়ী রাস্তায় চলে গেল পূর্ণগিরির দিকে। আমরা সারদা নদির গভীর উপত্যকা দিয়ে সোজা পথ ধরলাম। গঙ্গারামকে দশ মাইল ঘুরপথে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল পবিত্র পূর্ণগিরি মন্দিরের বিগ্রহের সামনে আমাদের জন্যে পুজো দেওয়া। যাওয়ার আগে তাকে বলে দিয়েছিলাম সে যেন বিগ্রহের পুজারীদের কাছ থেকে আমরা তল্লাদেশে আসার পথে যে অদ্ভুত আলো দেখেছিলাম তার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে। পরদিন সন্ধেবেলা যখন সে টনকপুরে আমাদের

সঙ্গে যোগ দিল তখন তার কাছেই শুনলাম সেই কাহিনী। এর কিছুটা সে নিজে লক্ষ করেছে আর বাকিটাও শুনেছে মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে।

পূর্ণাগিরি মন্দিরে ভগবতীর পুজো হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী প্রতি বছর এখানে আসে। এখানে আসার দুটি মাত্র পথ আছে। একটা আসে বরমদেও থেকে, আরেকটা কালাধুঙ্গা থেকে। এই দুটো পথই চূড়ার কিছু নিচে পাহাড়ের উত্তর পারে এসে মিশেছে। এইখানেই পূর্ণাগিরির দুটি মন্দিরের মধ্যে একটি—যেটি সম্বন্ধে কম লোকই আগ্রহী। বিখ্যাত পূর্ণাগিরির মন্দিরটি আরো ওপরে, বাঁদিকে। এই পবিত্র মন্দিরটিতে আসার রাস্তা একটিই—সেটা হল খাড়া এক পাথুরে পাহাড়ের মধ্যের এক ফাটল দিয়ে। শিশু, বৃদ্ধ বা যাদের মনের জোর কম তারা এই মন্দিরে যায় পাহাড়ীদের পিঠে একরকম ঝুড়িতে। ওপরের মন্দিরে পৌঁছতে পারে একমাত্র তারাই যাদের ওপর ভগবতী প্রসন্না। অন্যেরা অন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের পুজো দিতে হয় নিচের মন্দিরে।

ওপরের মন্দিরে পুজো আরম্ভ হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—চলে দুপুর পর্যন্ত। এর পরে নিচের মন্দির পার হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। ওপরের পবিত্র মন্দিরের কাছেই একটা প্রায় একশো ফুট উঁচু পাথরের চাঁই আছে। এই পাথরটির ওপরে ওঠা দেবী নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বহুকাল আগে এক অহংকারী সাধু নিজেকে দেবীর সমান প্রতিপন্ন করার জন্যে ওই পাথরটার ওপর উঠেছিলেন। দেবী সাধুর স্পর্ধায় কুপিত হয়ে পাথরটির ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁকে বরফগলা নদীর ওপারের পাহাড়টির ওপর। এই সাধুই পূর্ণাগিরি থেকে চিরকালের মত নির্বাসিত হয়ে, দুহাজার ফুট নিচে আলো জ্বালিয়ে দেবী ভগবতীর পুজো করেন। এই পুজোর আলো কোনো কোনো বিশেষ সময়ে দেখা যায় (আমরা দেখেছিলাম ৫ই এপ্রিল) আর এ আলো দেখতে পায় একমাত্র তারাই যারা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করেছে। দেবী আমাকে ও আমার লোকজনদের কৃপা করেছেন কারণ আমরা যাচ্ছিলাম পাহাড়ীদের উপকার করতে, যারা দেবীর আশ্রিত।

এই পুরো কাহিনীটাই গঙ্গারাম আমাকে শুনিয়েছিল যখন আমরা টনকপুরে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সপ্তাহ কয়েক পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন পূর্ণাগিরির রাওয়াল (প্রধান পুরোহিত)। পূর্ণাগিরির আলো সম্পর্কে আমি একটি স্থানীয় কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তিনি প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করতে এবং আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন, কারণ আমিই একমাত্র ইউরোপীয়ান যার ওই আলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার প্রবন্ধে সেই আলো সম্বন্ধে আমি নিজের যুক্তি দিয়ে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যেমন এখানেও দিয়েছি। সেই প্রবন্ধে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে

পাঠকেরা যদি আমার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন এবং নিজেদের যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে বার করতে চান তাহলে এই বিষয়গুলি মনে রাখলে ভাল করবেন :

এই আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে ওঠে নি।

সব আলো একই আকারের (প্রায় দু ফুট ব্যাস বিশিষ্ট)।

বাতাসেও আলোগুলো ছিল স্থির।

আলোগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নড়াচড়া করে বেড়াতে পারে।

প্রধান পুরোহিত জোরের সঙ্গে বললেন আলোর ব্যাপারটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য সে বিষয়ে কোনো বিরোধ থাকতেই পারে না। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হলাম কারণ আলোগুলি আমি নিজের চোখে দেখেছি। এ বিশ্বাসও আমার ছিল যে আলোগুলির কারণ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি তার বাইরে কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

পরের বছর আমি এবং স্যার ম্যালকম (এখন লর্ড) হেইলি, যিনি তখন ইউ পি'র গভর্ন'র ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সারদা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। স্যার ম্যালকম আমার প্রবন্ধটি দেখেছিলেন। আমরা যখন সারদা নদীর সেই খাতের দিকে এগোচ্ছিলাম তিনি আমায় বললেন কোথায় আলো দেখতে পেয়েছি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিতে। আমাদের সঙ্গে চারজন ধীমা (জেলে) ছিল। তারাই সারনি (চামড়া ফোলানো নৌকো) করে আমাদের এক মাছ ধরার জায়গা থেকে আর এক মাছ ধরার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। কুমায়ুন ও নেপাল পাহাড়ের ওপরের দিকে পাইনের জঙ্গল কেটে নদী দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে বরমদেও ঘাটে পেঁছনোর কাজে এক ঠিকাদার যে কুড়ি জন লোককে কাজে লাগিয়েছিল, এই ধীমারা তাদেরই দলের। এই কাজটা খুবই সময়সাপেক্ষ, কঠিন ও অত্যন্ত বিপজ্জনক ; এ কাজে যেমন সাহস চাই, তেমনিই চাই এই বিপজ্জনক ভয়ংকর নদী ও তার খালখন্দ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান।

কোলিয়ার পাথর কাটিয়ে যে ধাপটা বের করেছিল এবং তল্লাদেশে যাওয়ার পথে আমি ও আমার লোকেরা যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম তার নিচেই ছিল এক সরু বালির চড়া। এখানে আমার নির্দেশে ধীমারা পাড়ে সারনি ভেড়াল। আমরা নামলাম। আমি যখন যে জায়গায় আলোগুলো দেখা গিয়েছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম তখন স্যার ম্যালকম বললেন ধীমারা হয়তো এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে। তিনি ধীমাদের দিকে ফিরে চাইলেন। কোন ভারতীয়ের কাছ থেকে খবর বার করতে গেলে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হয় তা তিনি ভাল মতনই জানেন। আর ওদের ভাষাও উনি অনর্গল বলতে পারেন। তিনি ওদের কাছ থেকে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করলেন। ওদের বাড়ি হল কাংড়া উপত্যকায়।

ওদের চাষবাস কিছু আছে কিন্তু চাষের রোজগারে সংসার চলে না। তাই ওরা কাজ করে ঠাকুর দান সিং বিস্ত্ এর জন্যে। ওদের কাজ হল বড় বড় কাঠ সারদা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। বরমদেও পর্যন্ত নদীর প্রতিটি খালখন্দ ওদের নখদর্পণে কারণ এই নদীপথে ওরা অগুন্তিবার যাতায়াত করেছে। এই খাতটি ওরা খুব ভাল করেই জানে কারণ এর জমা জলে কাঠগুলি আটকিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে মহা ঝামেলার সৃষ্টি করে। তারা নদীর এই অংশটিতে কখনো আলো বা অন্য অস্বাভাবিক কিছু দেখে নি।

উনি যখন ধীমাদের কাছ থেকে চলে আসছিলেন তখন তাঁকে আমি আরেকটি মাত্র প্রশ্ন করতে বললাম। এই যে বছরের পর বছর নদীপথে আসা-যাওয়া করছে, ওই খাতটির মুখে কখনও কি তারা রাত কাটিয়েছে? তারা সমস্বরে বেশ জোরের সঙ্গেই উত্তর দিল না, কখনও না। আরও প্রশ্ন করতে তারা জানাল যে তারা নিজেরা যে শুধু রাত কাটায় নি তাই না কেউ এখানে কখনো রাত কাটিয়েছে বলে তারা শোনেও নি। কারণ এ জায়গাটায় নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।

এখান থেকে দু হাজার ফুট ওপরে একটা সরু ফাটল দীর্ঘকাল ধরে তীর্থ-যাত্রীদের পায়ের ঘষায় ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে। লম্বা ফাটলটা প্রায় পঞ্চাশ গজ নেমে এসেছে কিন্তু সেখানে হাত দিয়ে ধরার মত কোনো অবলম্বন নেই। তীর্থযাত্রীদের জীবন রক্ষার জন্যে মন্দিরের পুরুতরা যতই সচেষ্ট থাকুন কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে বহু দুর্ঘটনা ঘটত। শেষ পর্যন্ত বছর কয়েক আগে মহীশূরের মহারাজা এই পাহাড় বরাবর নিচের মন্দির থেকে ওপরের মন্দির পর্যন্ত একটা তার ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু টাকা বরাদ্দ করেছেন।

কাজেই পাহাড়ের নিচে কোনো আত্মা থাকলেও আমি আশ্চর্য হব না—তবে আমার মনে হয় এ আত্মারা মানুষের অনিষ্ট করে না।

৩

এবার গল্পে ফিরে আসা যাক।

গঙ্গারাম কুমায়ুনের যে কোনো লোকের মতই খুব ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করতে পারে। সে আমার সঙ্গে থেকে গেল আমার ক্যামেরা বইবার জন্যে। আমরা যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম সেখান থেকে মাইল দুয়েক যাওয়ার পর আমরা সেই রাঁধুনী ও ছ'জন গাড়োয়ালীকে পেলাম। এর পর ছ' ঘণ্টা ধরে আমরা ক্রমাগত হেঁটে চললাম—কখনও সারদা নদীর কিনারে কিনারে, কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। যেতে যেতে আমরা কালাধুঙ্গা পার হলাম, চুকা পার হলাম—তারপরে পেঁছিলাম সেই পাহাড়টির পাদদেশে যার ওপারেই হল আমাদের গন্তব্যস্থল। যেখানে তল্লাদেশের মানুষখেকোর দৌরাত্ম্য চলেছে।

পাহাড়টির চার হাজার ফুট চড়াইয়ে ওঠার আগে আমরা সেখানে ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করে আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম।

তারপর শুরু হল আমাদের চড়াইভাঙা। এত খাড়া আর ক্লান্তিকর চড়াই আমাদের অভিজ্ঞতায় বড় একটা পড়ে নি। এপ্রিলের জ্বলন্ত রোদ সর্বাঙ্গ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, কোথাও একটা গাছও নেই যে ছায়ায় দু দণ্ড জিরোব। এবড়ো-খেবড়ো পায়ে চলার সরু পথটা সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। এক আধটা বাঁক থাকলেও হয়তো ওঠার কিছুটা সুবিধে হত। থেমে থেমে, বহু কষ্টে আমরা সন্ধে নাগাদ একটা কুঁড়েঘরের কাছাকাছি এসে থামলাম। ঘরটি পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রায় হাজার ফুট নিচে। ঢুকাতেই আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল এই কুঁড়েঘরটি এড়িয়ে যেতে কারণ, পাহাড়ের দক্ষিণদিকে এইটাই একমাত্র জনবসতি হওয়ার দরুন মানুষখেকোটি এখানে নিয়মিত হানা দিয়ে থাকে। এখন মানুষখেকো হ'ক আর যাই হ'ক, আমাদের আর এগোবার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তাই পথের কয়েক শো গজ দূরে এই কুঁড়েঘরটির দিকেই এগিয়ে গেলাম আমরা। এই কুঁড়েঘরে বাস করে দুটি পরিবার। তারা এত মানুষজন আসায় খুব খুশি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়ার পর আমার লোকজন আশ্রয় পেল খিল দেওয়া ঘরের মধ্যে। আমি কুঁড়েঘরটির পাশেই একটা গাছের নিচে ক্যাম্প খাটটা পেতে শুয়ে পড়লাম। আমার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা ঝরনা। এই ঝরনার জলেই পরিবার দুটির রান্না খাওয়া চলে। সে রাতে আমার সঙ্গী ছিল আমার রাইফেলটি আর একটা টিমটিমে লণ্ঠন।

সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা মনে মনে ভাবার চেষ্টা করলাম। প্রত্যেক গ্রাম-প্রধানকে বিল বেনেস জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি না যাওয়া পর্যন্ত মানুষ বা অন্য কোনো জন্তু বাঘের হাতে মারা পড়লে তা যেন সরিয়ে না নেওয়া হয়। টনকপুরে পেশকার যে ছেলেটির কথা আমায় বলেছিল সে মারা পড়েছিল চার তারিখে আর আজ হল ছ তারিখের রাত। টনকপুরে গাড়ি ছাড়ার পর আমরা একটা মিনিটও নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে পেঁছিনোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমি জানতাম আমরা পেঁছিনোর আগেই বাঘটা তার শিকারের সবটাই খেয়ে ফেলবে—তবে তাকে যদি ঘাঁটানো না হয় তাহলে হয়তো ধারে কাছেই সে আরো দু এক দিন থাকবে। সেদিন সকালে ক্যাম্প ছাড়ার আগে আমি ভেবেছিলাম যে সময় মত গন্তব্যস্থলে পেঁছে সেই বাচ্চা মোষগুলোর একটিকে বেঁধে হয়তো টোপ করতে পারব। কিন্তু সারদা নদী থেকে এই দুর্গম চড়াইয়ের রাস্তাটাই আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। এরকম অবস্থায় একটা দিন হাত থেকে ফসকে যাওয়া খুবই আপসোসের ব্যাপার। কিন্তু কি আর করা যাবে। আমি একমাত্র আশা করতে পারি যে বাঘটা তার

শিকার থেকে খুব একটা দূরে সরে যায় নি। আমার একটা বড় রকম অসুবিধে হল আমি কুমায়ুনের এই অঞ্চলটা ভাল চিনি না। বাঘটা এই অঞ্চলে প্রায় আটবছর ধরে দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে। মানুষ মেরেছে শ দেড়েক। সেই জন্যে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে বাঘটার অবাধ গতিবিধি। আমার নাগালে এসেও বাঘটা যদি একবার হারিয়ে যায় তাহলে আবার তার হদিস মিলতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে। যাই হ'ক, বাঘটা কি করেছে আর কি করবে এ নিয়ে অকারণে কল্পনার জাল বুনে কোনো লাভ নেই কাজেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমাদের বেরনোর কথা ছিল খুব ভোরে। রাত থাকতেই আমার বিছানার পাশে নিভে যাওয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে গঙ্গারাম আমায় তুলে দিল। সকালের খাবার যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমি ঝরনার জলে স্নান সেরে নিলাম। তখন নেপাল পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্য উঠছে। তারপরে আমার ·২৭৫ রিগবি মসার রাইফেলটা তেলটেল দিয়ে পরিষ্কার করে, পাঁচ রাউণ্ড গুলি ভরে নিয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হলাম, মানুষখেকোর ভয়ে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়। কাজেই সেই কুঁড়েঘরের বাসিন্দা লোক দুটি বাঘটির শেষ শিকার সম্বন্ধে কিছু শোনেও নি। আমাদের কোনদিকে, কতদূর যেতে হবে সে সম্বন্ধেও তারা কিছুই বলতে পারল না। এরপরে কখন কোথায় খাওয়া-দাওয়া জুটবে তার কোনো ঠিক নেই। তাই আমি আমার লোকজনদের বলে দিলাম ভাল করে খেয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে। তাদের আরও বলে দিলাম তারা যেন পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে হাঁটে আর বিশ্রামের প্রয়োজন হলে সব সময় যেন খোলা জায়গায় বসে।

আগের দিন যে পথে চড়াই ভেঙেছি সেই পথে এসে, চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে আমি একটু দাঁড়ালাম। নিচে সারদা নদীর উপত্যকা ছায়ায় ঢাকা—নদীটা পাহাড়ের নিচ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে টনকপুরে। নদীর বাঁকগুলি হাল্‌কা কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা। টনকপুরের পর নদীটি ঝকঝকে রুপোলী ফিতের মত সোজা গিয়ে মিশেছে দিগন্তে। চুকা তখনও ছায়া আর কুয়াশার আড়ালে ঢাকা। কিন্তু যে পথটা এঁকে বেঁকে থাক পর্যন্ত উঠে গিয়েছে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দশ বছর পরে থাকের মানুষখেকো বাঘ মারার সময় এই পথটির সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় হয়। একশো বছর আগে কুমায়ুনের চাঁদ রাজারা পূর্ণগিরির পুরোহিতদের এই থাক গ্রামটি দান করেছিলেন। সেই গ্রামটি এবং পূর্ণগিরির চূড়া তখন সকালের সোনাগলা-সূর্যের আলোয় স্নান করছে।

সেই দিনটির পরে আজ প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু কিছুই ঘটেছে। কিন্তু যা মানুষের মনে দাগ কেটে রেখে যায়, সময়

তা নষ্ট করতে পারে না। আমার স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছে তল্লাদেশ মানুষখেকো মারার ওই পাঁচটি দিন। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও ওই দিনকটির স্মৃতি আমার মনে আজকের দিনটির মতই স্পষ্ট উজ্জ্বল।

পাহাড়ের ওপরে দেখি যে আমি যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথটি বেশ ভাল একটা জঙ্গলের রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। প্রায় ছ ফুট চওড়া রাস্তাটি চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। এখানে আমি একটা সমস্যায় পড়লাম। আশেপাশে কোনো গ্রাম নেই অথচ কোনদিকে যে যেতে হবে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে আমি প্রথমে পূব দিকের রাস্তাটি ধরাই ঠিক করলাম। কারণ এটা ভুল রাস্তা হলেও আমি গিয়ে পৌছব বড়জোর সারদা নদী পর্যন্ত।

আমাকে যদি বলা হয় পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে বেড়াবার সময় ও জায়গা খুঁজে নাও তাহলে আমি নির্দ্বিধায় কোনো এক এপ্রিলের সকালে হিমালয় পাহাড়ে উত্তরমুখী কোনো বনাকীর্ণ পথই বেছে নেব। এপ্রিলে সারা প্রকৃতি সাজেন নয়নাভিরাম সাজে। পত্রমোচী গাছ ভরে ওঠে নতুন পাতায়—হাল্কা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ কত রঙের বাহার তার। ভায়োলেট, বাটারকাপ, রডোডেনড্রন, প্রাইমুলাস, লার্কসপার, অর্কিড, কত রকমারি ফুল। আর কত অজস্র রকমের পাখি দামা, ছাতারে, সাতসয়ালী, গাংরা, আরও সব নানান জাতের পাখি যারা শীতের সময় নিচে নেমে গিয়েছিল তারা সব আবার ফিরে এসেছে—তাদের শিসে, গানে, কিচিমিচিতে নিস্তব্ধ বনভূমি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। যে বনে কোনো বিপদ নেই, যেখানে পাখির কলকাকলিতে মুখর বনভূমি নানাধরনের ফুল, নতুন পাতার সাজে সেজে আবাহন করে পথিককে, সেখানে সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ মিলে মিশে একটা সামগ্রিক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু যে বনে মানুষখেকোর ভয় থাকে সে বনে দৃশ্য যতই সুন্দর হ'ক না, স্নায়ু সবসময় সজাগ হয়ে থাকে কোন অদৃশ্য বিপদের আশঙ্কায়।

বিপদের আশঙ্কা শুধু শিকারের উত্তেজনাই বাড়ায় না জঙ্গলের প্রতিটি দৃশ্য ও শব্দকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। যে বিপদ জানা, যার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আপনি তৈরি সে ধরনের বিপদ আপনার আনন্দ উপভোগে বাধার সৃষ্টি করে না। পাথরের পেছনে কোনো ক্ষুধার্ত, হিংস্র বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে বলে সামনের ভায়োলেট ফুলের ঝাড়ের সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র মলিন হয় না। ছাতারে পাখি যখন গাছের নিচ থেকে চিৎকার করে জঙ্গলে পথচারীদের কোনো বিপদ সংকেত পাঠায় তখনও ওর গাছের ওপরে কালো মাথাওয়ালা সিবিয়া পাখির গান কম মধুর লাগে না।

অনেক সৌভাগ্যবান লোক আছেন যাঁদের ধাতে কোনো ভয় ডর নেই। আমি কিন্তু তাঁদের দলে পড়ি না। বন্যজীবনের সঙ্গে সারা জীবনের পরিচয় সত্ত্বেও

বাঘের নখ দাঁতকে সেই প্রথম দিনটির মতনই ভয় পাই যেদিন একটি বাঘ ঘুমোবার জায়গা করার জন্যে আমাকে আর ম্যাগিকে জঙ্গল থেকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই ভয়কে দমন করার জন্যে, কাটিয়ে ওঠার জন্যে, এখন আমার আছে অভিজ্ঞতা যা আমার প্রথম জীবনে ছিল না। আগে মনে হত সবদিকেই বিপদ ঘিরে আছে, যে কোনো শব্দ শুনলেই ভয় পেয়ে যেতাম। এখন ঠিক বুঝতে পারি কোথায় বিপদ লুকিয়ে আছে, কোন শব্দটির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাছাড়া, আগে বন্দুক ছুঁড়লে মনে মনে একটা অনিশ্চয়তা থাকত কোথায় গিয়ে লাগবে বুলেটটা। এখন কিন্তু একটা আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে। জানি যে আমি যে দিক লক্ষ করেই বন্দুক ছুঁড়ি গুলিটা মোটামুটি সেই দিকেই যাবে। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়। আমি যে দুটি গুণের কথা বললাম এ দুটি না থাকলে একা পায়ে হেঁটে মানুষখেকো বাঘ মারার চেষ্টা একটা বিশ্রি রকমের আত্মহত্যারই সামিল।

সেদিন এপ্রিলের সকালবেলা আমি যে জঙ্গুলে পথ দিয়ে হাঁটছিলাম সেটা এমন একটা অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে যেখানে একটা মানুষখেকো বাঘ উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। এ পথটা যে বাঘটা প্রায়ই ব্যবহার করে তার প্রমাণ ছিল এখানে সেখানে তার আঁচড়ের দাগ। এ দাগগুলো পুরোনো হয়ে এসেছে আর এর মধ্যে বাঘটার থাবার কোনো ছাপ আমি খুঁজে পেলাম না। এ দাগগুলোর সঙ্গে মিশেছে নানাধরনের চিতা, সম্বর, ভাল্লুক, কাকার আর শুয়োরের পায়ের দাগ। এ জঙ্গলে নানা ধরনের পাখি আর ফুলের বৈচিত্র্যের তা অন্তই নেই। ফুলের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল সাদা প্রজাপতি অর্কিড; এই ফুলগুলি গাছের গা বেয়ে ঝরনার মত নেমে এসেছে। যে গাছের গায়ে এদের শেকড় জড়ানো সে গাছের গুঁড়ি ডালপালা ফুলে লতায় পাতায় ঢাকা প্রায় দেখাই যায় না। এই রকমই একটা গাছে আমি দেখেছিলাম একটা হিমালয়ের কালো ভাল্লুকের বাসা। সত্যই ভাল্লুকটির শিল্পজ্ঞানের তারিফ না করে থাকা যায় না। কি সুন্দর বাসাটি। জমির থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে একটা বিশাল ওক গাছ হয় তুষারের চাপে অথবা ঝড়ে ভেঙে গেছে। যেখানে গাছটা ভেঙেছে সেখানে মানুষের কবজির সমান চওড়া কিছু ডালপালা গাছের গোড়া থেকে কোনাকুনিভাবে বেরিয়েছে। এই জায়গাটা পাহাড়ী শ্যাওলায় ভরা আর সেই শ্যাওলায় শেকড় চালিয়ে দিয়ে উঠেছে সাদা প্রজাপতি অর্কিড। এই অর্কিড-গুলোর মধ্যেই একটা ভাল্লুক ডালপালা গুলো বেঁকিয়ে গাছের গুঁড়িটার কাছে টেনে একটা বাসা বানিয়েছে। ভাল্লুকরা সাধারণত বাসা তৈরির জন্যে এমন সব ডালপালা বেছে নেয় যা বেঁকে যায় কিন্তু ভাঙে না। এ ধরনের বাসার সঙ্গে ভাল্লুকের পারিবারিক জীবনের কোনো সম্পর্ক সাধারণত থাকে না এবং

বাসাগুলি আমি দেখেছি দুই থেকে আট হাজার ফুট উঁচুতে। শীতকালে যখন ভাল্লুকেরা বুনো খেজুর আর মধুর খোঁজে আরো ওপর থেকে নিচে নেমে আসে তখন পিঁপড়ে, মাছির হাত থেকে এই বাসাগুলি তাদের বাঁচায়। বেশি উচ্চতায় এই বাসাগুলিতে ভাল্লুকেরা বেশ আরামে রোদ পোয়াতে পারে।

একটা রাস্তা দিয়ে চলতে ভাল লাগলে তার দূরত্ব সম্বন্ধে সব সময় চেতনা থাকে না। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর জঙ্গল শেষ হল। সামনেই একখণ্ড ঘাসে ঢাকা জমি। সেখান থেকে নজরে পড়ল দূরে একটা গ্রাম। খোলা জায়গা দিয়ে হাঁটার সময়ে গ্রামের লোক নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেয়েছিল। আমি গ্রামে পৌঁছতে দেখি গ্রামসুদ্ধ লোক জড় হয়েছে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। আমার অবাক লাগে যে কুমায়ুনের যে কোনো সুদূর গ্রামে যদি কোনো আগন্তুক হঠাৎ এসে পড়ে, তার আসার উদ্দেশ্য কি জানা না থাকলেও সে যা সমাদর পায় তা পৃথিবীর অন্য কোথাও লোকে ভাবতে পারবে না। আমিই সম্ভবত প্রথম সাহেব যে একা পায়ে হেঁটে তাদের গ্রামে হাজির হয়েছি। আমি সেই ভিড়ের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই একটা শতরঞ্জি পাতা হয়ে গিয়েছে তার ওপর বসানো হয়েছে একটা মোড়া। আমি বসতে না বসতেই আমার হাতে পেতলের পাত্রে একপাত্র দুধ ধরিয়ে দেওয়া হল। আমার জীবনটাই প্রায় কেটেছে পাহাড়ীদের সঙ্গে। তাই ওদের ভাষা, নানা অঞ্চলের কথাবার্তার টান সবই আমার জানা এমনকি ওরা কি ভাবছে না ভাবছে তাও আমি বলে দিতে পারি। আমি রাইফেল হাতে পৌঁছনো মাত্রই ওরা ধরে নিয়েছে যে আমি এসেছি দুর্ধর্ষ মানুষখেকোটার হাত থেকে ওদের উদ্ধার করতে; কিন্তু ওদের অবাক লাগছে যে এত সকাল সকাল আমি পায়ে হেঁটে এলাম কোত্থেকে? সব থেকে কাছে যে ডাকবাংলোটি সেটাই তো এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে।

দুধ খেতে খেতেই আমি তাদের কয়েকটা সিগারেট বিলি করলাম। তারপর নানাধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমিও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম ওদের। জানলাম গ্রামটির নাম তামালি। বহু বছর ধরে গ্রামটি মানুষখেকোর উপদ্রবে ভুগছে। কেউ কেউ বলল আট বছর আবার কেউ বলল দশ বছর। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, যে বছর বাচি সিং কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটতে গিয়ে তার পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে আর দানি সিং ত্রিশ টাকা দিয়ে যে কালো ষাঁড়টা কিনেছিল সেটা যেবার পাহাড় থেকে পড়ে মরে যায়, ঠিক সেই বছরটিতেই মানুষখেকোটা প্রথম হানা দেয় এই অঞ্চলে। তামালিতে মানুষ-খেকোর হাতে শেষ মারা গেছে কুন্দনের মা। সে মারা গেছে গত মাসের (মার্চ) বিশ দিনের দিন। যখন মারা যায় তখন সে গ্রামের আর সব মেয়েদের সঙ্গে

নিচের একটা মাঠে কাজ করছিল। বাঘটা মাদী না মদ্দা কেউ জানে না তবে সেটা যে বিরাট সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। বাঘটার জন্যে সারা গ্রামে এমন একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে যে গ্রামের আশপাশের জমিগুলো কেউ আর চাষ করে না। প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার আনার জন্যেও আর টনকপুরে যেতে চায় না কেউ। বাঘটা তামালি ছেড়ে কখনও একনাগাড়ে বেশিদিন দূরে থাকে না, প্রায়ই ফিরে ফিরে আসে। আমাকে ওরা খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল এখানে থেকে যাওয়ার জন্যে কারণ তল্লাদেশের অন্য যে কোনো জায়গার থেকে এখানেই বাঘটা মারবার সুযোগ অনেক বেশি।

যারা দ্বিধাহীনভাবে আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমার ওপর নির্ভর করছে, তাদের একটা মানুষখেকোর খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। যাই হ'ক আমি কেন যাচ্ছি ওদের বুঝিয়ে বলতে ওরা বুঝল। আমায় ঘিরে ভিড় করে আসা জনা পঞ্চাশেক গ্রামবাসীকে আমি কথা দিলাম যে প্রথম সুযোগেই আবার আমি তামালিতে ফিরে আসব। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি রওনা দিলাম সেই গ্রামটির দিকে যেখানে মানুষখেকোটা তার শেষ শিকারটিকে মেরেছে।

সেই কুঁড়েঘর থেকে পথটা যেখানে এসে জঙ্গলের রাস্তায় মিলেছে সেখানে আমি একটা চিহ্ন রেখে এসেছিলাম যাতে আমার লোকজনেরা বোঝে যে আমি পূবদিকে গিয়েছি। সে চিহ্নটা তুলে পশ্চিম দিকের রাস্তায় বসিয়ে দিলাম। তা সত্ত্বেও ওরা যাতে ভুল না করে সেইজন্যে পূব দিকের রাস্তায় একটা 'রাস্তা বন্ধ' চিহ্ন লাগিয়ে দিলাম। যে চিহ্ন দুটির কথা আমি বললাম তা পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বত্র পরিচিত। এ চিহ্নগুলি যে আমি ব্যবহার করব তা আমার লোকজন জানত না কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা ঠিকই বুঝবে যে চিহ্নগুলি আমারই রাখা। আমার সংকেতও ওরা ঠিকই বুঝবে। প্রথম চিহ্নটি হল রাস্তার ওপর এক টুকরো পাথর বা একটা কাঠের সাহায্যে একটি ডালকে এমনভাবে রাখা যাতে অনুসরণকারী বুঝতে পারে ডালটির পাতাগুলি যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকেই তাকে যেতে হবে। দ্বিতীয় চিহ্নটি হল দুটো ডালকে কাটাকুটির (× এর) চিহ্নের মত ভাবে রাস্তার ওপর ফেলে রাখা।

পশ্চিম দিকের রাস্তাটার অধিকাংশই সমতল। রাস্তাটা গিয়েছে বিরাট বিরাট ওক গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, নিচে হাঁটু পর্যন্ত নানাধরনের ফার্নের ঝোপ। জঙ্গলের যেখানেই একটু ফাঁকা সেখান থেকে দেখা যায় দিগন্ত জোড়া উঠে গেছে পাহাড়ের পর পাহাড়, মিশেছে আকাশ ছোঁয়া বরফে ঢাকা চূড়ায়। এমন অপূর্ব দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না।

৪

মাইল চারেক পশ্চিমে যাওয়ার পর রাস্তাটা ঘুরে গেছে উত্তর দিকে তারপর একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে এক স্ফটিক-স্বচ্ছ পার্বত্য নদী। আমার বাঁ দিকের পাহাড়ে ঘন ওক গাছের জঙ্গলের মধ্যে থেকেই এসেছে নদীটা। পাথরের টুকরোর ওপর পা রেখে রেখে আমি নদীটা পেরোলাম। একটু চড়াইয়ে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখি একটু পূবেই একটা গ্রাম। গ্রাম থেকে কয়েকটি মেয়ে আসছিল নদীটির দিকে। তারা খোলা জায়গাটায় আমাকে দেখতে পেয়েই 'সাহেব এসেছে। সাহেব এসেছে।' বলে মহা উৎসাহে চিৎকার করতে লাগল। আমি গ্রামে পেঁছিবার আগেই গ্রামবাসীরা তাদের চিৎকার শুনেছে। পেঁছিনো মাত্রই আমার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল পুরুষ নারী শিশুর এক উত্তেজিত জনতা।

গ্রামের মোড়লের কাছে জানলাম গ্রামটির নাম তাল্লাকোট। আরও শুনলাম যে চম্পাবতে থেকে দুদিন আগে (৫ই এপ্রিল) এক পাটোয়ারী এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সে সবাইকে বলেছে যে নৈনিতাল থেকে এক সাহেব আসছে মানুষখেকো বাঘটাকে মারতে। পাটোয়ারী এখানে পেঁছিবার কিছু-ক্ষণের মধ্যে গাঁয়ের একটি মেয়ে মানুষখেকোর হাতে মরেছে। আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশমত মড়ি কোথাও সরানো হয় নি। শেষ পর্যন্ত আমি আসছি ধরে নিয়ে সেদিন সকালেই একদল লোককে পাঠানো হয়েছে মড়ির খোঁজ করতে; আর যদি তার কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেখানে আমার জন্যে একটা মাচান তৈরি করতে। গাঁয়ের মোড়ল যখন আমাকে এইসব খবরাখবর দিচ্ছিল তখনই ফিরে এল জনা তিরিশেকের সেই দলটি, এই লোকজনেরা আমায় জানাল যে বাঘটা মড়িকে যেখানে খেয়েছে সেখানে খুঁজে-পেতে তারা মেয়েটির দাঁতগুলি শুধু পেয়েছে। এমনকি তার কাপড়জামা পর্যন্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমি যখন জানতে চাইলাম বাঘ কোথায় মেয়েটিকে মেরেছে তখন দলের মধ্যে থেকে একটি বছর সতেরোর ছেলে বলল গাঁয়ের ওপাশে গেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে কোথায় মানুষখেকোটা তার মাকে মেরেছে। ছেলেটি আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল, তার পেছনে আমি আর আমার পেছনে গ্রামের ছেলেমেয়ে বুড়োর এক উৎসুক জনতা। আমরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পেঁছিলাম একটা জায়গায় সেখানে গজ পঞ্চাশের লম্বা ঘোড়ার পিঠের জিনের মত সরু একফালি জমি দুটো ছোট পাহাড়কে যোগ করেছে। দুটো বিরাট উপত্যকা এসে মিশেছে ওই জমিটার সঙ্গে। বাঁ দিকের অর্থাৎ পশ্চিম দিকেরটি নেমে গেছে লাধিয়া নদীর দিকে। ডানদিকেরটি খাড়াইভাবে দশ কি পনের মাইল দূরে নেমে গেছে কালি নদীতে। সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মতো

জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি ডানদিকের উপত্যকার দিকে তাকাল। এই উপত্যকাটির বাঁদিক অর্থাৎ উত্তর দিকটি ছোট ছোট ঘাসে ভরা, এখানে ওখানে কয়েকটা ঝোপঝাড়—ডানদিকটায় আগাছা আর গাছের জঙ্গল। ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় আটশো থেকে হাজার গজ দূরে আর আমাদের থেকে হাজার থেকে দেড়হাজাব গজ নিচে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেটি বলল, আরো কিছু মেয়ের সঙ্গে তার মা যখন ঘাস কাটছিল তখন ঠিক ওই জায়গাটাতেই সে মারা পড়ে। তারপর নালায় একটা ওক গাছ দেখিয়ে বলল ওই গাছের নিচেই তারা মায়ের বাঘে খাওয়া শরীরটা দেখতে পেয়েছে। হনুমানে ওই ওক গাছটির ডালপালা ভেঙেছে। সে আরও বলল সে বা তার দলেব লোকেরা বাঘটাকে দেখেনি, বাঘের কোনো আওয়াজও শোনে নি। শুধু তারা যখন পাহাড় বেয়ে নামছিল তখন তারা প্রথমে একটা ঘুরালের ডাক শোনে আর তার কিছুক্ষণ পরেই একটা হনুমান ডেকে ওঠে।

তাহলে একটা ঘুরাল আর একটা হনুমান ডেকেছিল। ঘুরাল অনেক সময় মানুষ দেখলেও চিৎকার করে ওঠে কিন্তু হনুমান। হনুমান তো তা করে না। অবশ্য বাঘ দেখলে দুজনেই ডেকে উঠবে। এটা কি সম্ভব যে বাঘটা মড়ির কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, লোকজনের দলবল হাজির হতেই সে সরে গেছে? হয়তো ঘুরালটাই তাকে প্রথমে দেখে, তারপরে দেখে হনুমানটা। আমি যখন ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম আর মনে মনে আমার সামনে ছড়িয়ে থাকা এই পুরো অঞ্চলটার একটা মানচিত্র এঁকে নিচ্ছিলাম তখন পাটোয়ারী খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিল। আমি বেনেসের কাছে যে দুটো বাচ্চা মোষ চেয়েছিলাম সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে আমায় জানাল যে সে চম্পাবত থেকে মোষ দুটো নিয়েই রওনা হয়েছিল। গত ৪টা এপ্রিল তল্লাকোট থেকে মাইল দশেক দূরে যে গ্রামটায় মানুষজনেব চোখের সামনেই মানুষখেকো বাঘটা একটা ছেলেকে মেরেছে, সেই গ্রামেই মোষদুটো সে রেখে এসেছে। মানুষখেকোটাকে মারতে পারে এমন কেউ সে গ্রামে নেই। তাই মৃত দেহটা তুলে আনা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট চম্পাবতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমাকে খবর দেওয়ার জন্যে টনকপুরে তার করা হয়েছে। ছেলেটিকে দাহ করার নির্দেশও সে দিয়ে এসেছে।

যে গ্রামে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমার লোকজন তখনো আসে নি। গাঁয়ের মোড়লকে ছোট নদীটির ধারে আমার তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করতে বলে আমি ঠিক করলাম বাঘটা যেখানে মড়িটা খেয়েছে একবার সেই জায়গাটা দেখে আসব। দেখব বাঘটা মাদী না মদ্দা। মাদী হলে বাঘটার কোনো বাচ্চাকাচ্চা আছে কিনা। আমি আগেই বলেছি কুমায়ুনের এই অঞ্চলটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। আমি গ্রামের মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন পথে

সবচেয়ে সহজে ওই উপত্যকায় নেমে যাওয়া যাবে। তখন যে ছেলেটির মাকে বাঘে খেয়েছিল আর যে আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়েছিল কোথায় বাঘটা তার মাকে খেয়েছে সে এগিয়ে এসে খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল—'আমি তোমার সঙ্গে আসব সাহেব, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

সব সময় মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে যারা বাস করে তাদের সাহস, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের ওপর বিশ্বাস রাখার ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ছেলেটির নাম দুঙ্গার সিং। তার মধ্যেও আমি দেখেছি সেই একই সাহস আর বিশ্বাস। বছরের পর বছর দুঙ্গার সিং বাস করেছে মানুষখেকোর দৌরাত্ম্যের মধ্যে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই সে দেখে এসেছে তার মায়ের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ। ঘুরাল আর হনুমানের ডাক শুনে সেও বুঝতে পেরেছে যে তার মায়ের হত্যাকারী হয়তো আশেপাশেই কোথাও ওঁত পেতে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে সেই বিপদসংকুল জায়গায় যেতে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। একথা সত্যি যে সে সদ্য সদ্য জায়গাটা একবার ঘুরে এসেছে। কিন্তু তখন তার সঙ্গে ছিল আরো জনা তিরিশেক বন্ধুবান্ধব। আর এ কথা কে না জানে যে সমষ্টি মানুষকে একটা নিরাপত্তা বোধ দেয়।

সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত উঁচু জায়গাটা থেকে পাহাড় বেয়ে নামবার কোনো পথ ছিল না। দুঙ্গার সিং আমাকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা ছাগল চরা রাস্তায়। আমরা যখন ছড়ানো ছেটানো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নিয়ে এগোচ্ছি তখন আমি দুঙ্গার সিংকে বললাম—আমি কানে ভাল শুনতে পাই না; যদি সে কোনো বিশেষ কিছু আমায় দেখাতে চায় তাহলে সে যেন থেমে পড়ে আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর যদি সে কিছু বলতে চায় তাহলে যেন আমার ডান কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে। আমরা যখন প্রায় চারশো গজ এগিয়েছি তখন দুঙ্গার সিং হঠাৎ থেমে পড়ল এবং পেছনের দিকে তাকাল। আমি ফিরে সেদিকে তাকাতেই দেখি পাটোয়ারী নেমে আসছে। তার পেছন পেছন বন্দুক হাতে একটা লোক। কোন খবর আছে মনে করে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু হতাশই হলাম শুনে যে পাটোয়ারী তার বন্দুকবাহককে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। আমি খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজী হলাম কারণ তাদের পায়ে ছিল ভারি ভারি জুতো—তাছাড়া বুঝলাম জঙ্গলের মধ্যে বেশ শব্দ না করে ওরা চলাফেরা করতে পারবে না।

আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরও চারশো গজ মত এগিয়ে একটা খোলা জায়গার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এখানে ছাগল চরার রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে, একটা বাঁ দিক দিয়ে নেমে গভীর নালার দিকে চলে গেছে, আরেকটা পাহাড়ে

পাক দিয়ে ডান দিকে চলে গেছে। দুঙ্গার সিং এখানে দাঁড়িয়ে গভীর নালাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল এই দিকেই বাঘটা তার মাকে খেয়েছে। যেখানে বাঘের থাবার ছাপ খুঁজতে যাব সে জমির ওপর ভারি জুতো পরা লোক আমি সঙ্গে নিতে চাই নি—কারণ তাতে ছাপগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই দুঙ্গার সিংকে লোক দুটির সঙ্গে খোলা জায়গাটায় রেখে আমি একাই গভীর নালাটার মধ্যে নামা ঠিক করলাম। সেইসব দুঙ্গার সিংকে বোঝাচ্ছি এমন সময় সে ঘুরে দাঁড়াল আর ওপরের পাহাড়ের দিকে তাকাল। সেদিকে চেয়ে দেখি সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত জায়গাটায় এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই আমি ছিলাম ওই জায়গাটায়; এক হাতের ইশারায় আমাদের চুপ করতে বলে আরেক হাত কানের কাছে দিয়ে দুঙ্গার সিং খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন শুনছিল আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়াচ্ছিল। শেষবারের মত মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—আমার ভাই আপনাকে জানাতে বলছে নিচে পোড়ো জমিটার ওপর রোদে পিঠ দিয়ে লাল মত কি একটা শুয়ে আছে।

ওই পোড়ো জমিটা বন্ধ্যা, ওখানে আর চাষবাস হয় না। ওখানে সত্যিই লালমত কিছু একটা শুয়ে আছে নিশ্চয়ই। যাই হ'ক, এরকম একটা সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যাবহার আমায় করতেই হবে। আমি দুঙ্গার সিংকে আমার রাইফেলটা দিয়ে পাটোয়ারী আর তার তল্পিদাবকে দুহাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম একটা গাছের কাছে। পাটোয়ারীর বন্দুক থেকে গুলি বার করে সেটা ঢুকিয়ে দিলাম একটা ঝোপের নিচে। তারপরে তাদের বললাম গাছটার ওপর চড়ে বসে থাকতে। আমি না বললে তারা যেন গাছ থেকে না নামে, নামলে প্রাণের ভয় আছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দুজন মানুষ এত উৎসাহের সঙ্গে গাছে উঠেছে বলে আমার জানা নেই। যতদূর সম্ভব উঁচুতে উঠে তারা যেভাবে ডালপালা আঁকড়ে ধরে বসে রইল তাতে মনে হ'ল গ্রাম থেকে, আমার পেছন পেছন আসা থেকে এ পর্যন্ত মানুষখেকো মারা সম্বন্ধে তাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ছাগল চলা রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে গিয়ে পড়েছে একটা থাক-কাটা ফসলের জমিতে। এই জমিটিতে বহুদিন চাষবাস বন্ধ—এখন ভরে আছে ওট ঘাসে। জমিটা প্রায় একশ গজ লম্বা—আমার দিকে চওড়া প্রায় দশ ফুট আর যেদিকটা পাহাড়ের গায়ে মিশেছে সেদিকটা ফুট তিরিশেক চওড়া। প্রায় পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত জমিটা চলে গেছে সোজা তারপরেই বাঁক নিয়েছে বাঁ দিকে, দুঙ্গার সিং সেই জমিটার দিকে আমায় তাকাতে দেখে বলল তার ভাই যে লাল জিনিসটা দেখেছে সেটা জমির ওধার থেকে ভাল দেখা যাবে। মাথা নিচু করে, জমির আলের ভেতরের দিকটা দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আমরা পেঁছিলাম জমির

ওধারে। এখানে মাটির ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে হাতে পায়ে শরীরটাকে টেনে মাঠের ধারে এসে ঘাস ফাঁক করে নিচের দিকে তাকালাম।

আমাদের নিচে একটা ছোট উপত্যকা। তারই ওধারে ঘাসের জমি খাড়াভাবে নেমে গেছে। তারপরেই ওক গাছের চারার ঘন বন। বনের পরেই গভীর নালাটি যেখানে বাঘটা মেরেছে দুঙ্গার সিং-এর মাকে। ঘাসের ঢালু জমিটা প্রায় তিরিশ গজ চওড়া। তারপরেই একটা বিরাট পাথর। কাছাকাছির গাছপালা দেখে মনে হল পাথরটা আশি থেকে একশো ফুট উঁচু হবে। ঢালু জমিটার কাছেই রয়েছে প্রায় একশো গজ লম্বা, দশ গজ চওড়া এক খণ্ড থাক কাটা জমি। জমিটা আমাদের সোজাসুজি। জমিটার এ-দিকটা মরকত মণির মত উজ্জ্বল সবুজ ঘাসে ঢাকা। বাকিটায় এক ধরনের সুগন্ধি আগাছা জন্মেছে। এই আগাছাগুলো চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা হয়। পাতাগুলো অনেকটা চন্দ্রমল্লিকার মত, নিচের দিকটা সাদা। একখণ্ড ঘেসো জমির ওপর উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্রায় দশ ফুট দূরত্বে শুয়ে আছে দুটো বাঘ।

কাছের বাঘটা শুয়ে আছে আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে. পাহাড়ের দিকে মুখ করে। অন্যটার পেটটা ছিল আমাদের দিকে আর লেজটা পাহাড়ের দিকে। কাছেরটাকে গুলি করা খুবই সহজ কিন্তু আমার ভয় হল দূরেরটা গুলির আওয়াজ শুনে তার মাথাটা যেদিকে আছে সেদিকে নেমে সোজা গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে। অথচ আমি যদি দূরেরটাকে প্রথমে গুলি করি তাহলে রাইফেলের শব্দে প্রথম বাঘটি হয় পাহাড়ে উঠে যাবে যেখানে লুকোবার জায়গা কম, না হয় আমার দিকে এগিয়ে আসবে। অনেক ভেবেচিন্তে আমি প্রথমে দূরেরটিকে গুলি করাই স্থির করলাম। আমার থেকে বাঘটার দূরত্ব ছিল প্রায় একশ কুড়ি গজ (আমার লক্ষ্য চড়াই-এর দিকে না সেইজন্যে গুলি করার সময় গুলি যাতে বেঁকে না যায় তার জন্যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। হিমালয়ে যাঁরা ওপর দিকে গুলি ছুঁড়বেন তাঁদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে গুলি কিছুটা বেঁকে যায়)। খেতের কিনারে হাতের পেছন দিকটা দিয়ে একটা কুশন মত করে নিয়ে তার ওপর রাইফেলটা স্থিরভাবে রেখে জানোয়ারটার হৃৎপিণ্ড আন্দাজ করে নিশানা করে আস্তে আস্তে ঘোড়া টিপলাম। বাঘটা একটা পেশীও নাড়াল না কিন্তু অন্য বাঘটা বিদ্যুতের মত ছুটে জমিটা আর বৃষ্টির জলের নালার মধ্যে যে পাঁচফুট চওড়া জায়গাটা আছে সেখানে একলাফে গিয়ে পড়ল। এখানে দাঁড়িয়ে বাঘটা তার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের সঙ্গীর দিকে তাকাল। আমার গুলি খেয়ে ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে সে গিয়ে পড়ল বৃষ্টির জলের নালাটার মধ্যে। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

আমার দ্বিতীয় গুলিটার পরেই আমি সেই সুগন্ধ আগাছার ঝোপে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম—মরা বাঘটার কাছেই। একটা বিরাট জানোয়ার তীব্র

বেগে ছ্বটে চলে যাচ্ছে জমিটার ওপর দিয়ে। বাঘদ্বটোর এত কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন তৃতীয়টিও বাঘ ছাড়া আর কিছ্বই নয়। আমি জানোয়ারটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু তার গতিপথ অন্বসরণ করতে পারছিলাম কেননা সে আগাছা ভেদ করে যাচ্ছিল, আর আগাছার পাতাগ্বলির নিচের দিকটা সাদাটে। প্রায় দ্বশো গজ দ্বরে পাতার আড়াল থেকে জানোয়ারটির বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই ঘাসের ঢাল্ব জমিটার ওপর একটা বাঘ বেরিয়ে এল। লক্ষ করে দেখলাম বাঘটা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সে ঢালটা নেমেছে ডানদিকে আর আমি যেখানে আছি সে ঢালটা বাঁ দিকে। বাঘটা পাহাড় বরাবর এগোচ্ছিল বলে এই ঢালটার দর্বন আমার পাশ দিক থেকে তাক করাও সহজ হয়ে গেল। রাইফেল ছ্বঁড়লাম।

গ্বলি খেয়ে বাঘের পড়ে যাওয়া, শরীর কুঁকড়ে যাওয়া আমি আগেও দেখেছি কিন্তু একটা গ্বলিতে এত নিশ্চিতভাবে কোনো বাঘের মৃত্যু আমি দেখি নি। বাঘটা কয়েক ম্বহ্বর্ত নিশ্চলভাবে পড়েছিল তারপরেই পা সামনের দিকে রেখে সে ঢাল্বর ওপর দিয়ে হড়কে পড়তে লাগল। যত নিচে নামছে ততই তার গতি বাড়ছে। বাঘটার ঠিক নিচেই, বড় পাথটার কয়েক ফুটের মধ্যে একটা আট দশ ইঞ্চি চওড়া ওক গাছের চারা ছিল। বাঘের পেটটা সেই চারা গাছে আটকে গেল—মাথাটা আর সামনের পা দ্বটো একদিকে এবং লেজ ও পেছনের পা দ্বটো ঝুলে রইল আরেক দিকে। রাইফেল কাঁধে রেখে ঘোড়ায় আঙ্বল দিয়ে আমি আরো কিছ্বক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু বাঘটার শরীরে কোথাও কোনো জীবনের স্পন্দন দেখলাম না। আমি দাড়িয়ে উঠে পাটোয়ারীকে ডাকলাম। সে এতক্ষণ গাছের মগডাল থেকে রাজার হালে প্বরো জিনিসটা দেখছিল। দ্বঙ্গার সিং ছিল আমারই কাছে জমিতে ব্বক দিয়ে শ্বয়ে, আর খ্বব ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দের আতিশয্যে নাচতে আরম্ভ করেছে। সে যেভাবে একবার বাঘদ্বটোর দিকে আর একবার সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত উঁচু জায়গাটায় সমবেত গ্রামবাসীদের দিকে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হল সে সেই রাতে এবং তার পরেরও অনেক অনেক রাতে কিভাবে এ গল্প শোনাবে সেই কথাই ভাবছে।[1]

আমি প্রথমে যখন বাঘ দ্বটোকে ঘ্বমিয়ে থাকতে দেখি তখন ভেবেছিলাম মান্বষখেকো বাঘটার একটা বাঘিনী জ্বটেছে কিন্তু আমার তৃতীয় গ্বলিতে যখন আরেকটা বাঘ বেরিয়ে এল তখন ব্বঝলাম যে ওরা বাঘিনী আর তার দ্বই বাচ্চা। এদের মধ্যে কোনটি মা, কোন দ্বটি বাচ্চা বলা বড় কঠিন কারণ আমি রাইফেলের 'সাইট'-এর মধ্যে দিয়ে যখন দেখি তখন তিনটে বাঘ একই আকারের মনে হয়েছিল। এ তিনটের মধ্যে একটিই যে তল্লাদেশের মান্বষখেকো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ পাহাড় অঞ্চলে বাঘ বিরল। আর তিনটে বাঘকেই

মারা হয়েছে লোকালয়ের কাছাকাছি যেখানে সদ্য-সদ্য একজন মানুষকে মেরে তারা খেয়েছে। তাদের মায়ের অপবাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল বাচ্চা দুটোকে। মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকেই তারা যে মায়ের আনা নরমাংসে ভাগ বসিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে মায়ের আশ্রয় থেকে বেরিয়েই তারা মানুষখেকো হত। 'কুমায়ুনের মানুষখেকো' প্রকাশিত হওয়ার পর যত আলোচনাই হয়ে থাক আমি এখনও বিশ্বাস করি আমি যে অঞ্চলের কাহিনী বলছি সে অঞ্চলে বাচ্চারা ছোটবেলায় নরমাংস খেয়েছে বলেই বড় হয়ে মানুষখেকো হয়ে ওঠে না।

জমিটার কোনায় পা ঝুলিয়ে বসে রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে আমি আমার সঙ্গীদের সিগারেট দিলাম আর বললাম সিগারেটটা খাওয়া হলেই আমি যাব নালার মধ্যে যে বাঘটা পড়েছে সেটার খোঁজে। বাঘটাকে যে মৃত অবস্থায় দেখব সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কয়েক মিনিটের এদিক সেদিকে কিছু এসে যাবে না। তাছাড়া ভাগ্যদেবী যে আমার ওপর এতটা প্রসন্ন হয়েছেন তার জন্যে নিজের মনেই একটু আনন্দ করতে ইচ্ছে করছিল। তল্লাদেশে পেণছনোর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঘটনাচক্রে দেখা পেয়ে গেলাম মানুষখেকোটার যেটা আট বছর ধরে বহু শত বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছিল। আর মানুষখেকো বাঘটা আর তার বাচ্চা দুটোকে মারতে আমার লাগল মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময়! শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু যখন উত্তেজনায় দপদপ করছে তখন স্থিরভাবে রাইফেল চালাতে পারলে সব শিকারীই আনন্দিত হয়। আমার এই আনন্দের সঙ্গে মিলেছিল আর একটা সান্ত্বনা যে কোনো আহত জানোয়ারকে অনুসরণ করে খুঁজে বেড়াতে হবে না। ।।রা পায়ে হেঁটে শিকার করে তাদের এই ঝুঁকিটি প্রায়ই নিতে হয়।

আমার সঙ্গীরা অবশ্য আমার সৌভাগ্যকে ভাগ্যদেবীর ওপর ছাড়তে নারাজ। তারা নৈনিতালের বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে পরামর্শ নিয়েছে যাতে আমাদের অভিযান ব্যর্থ না হয়। তল্লাদেশে যাত্রা করার একটা শুভদিনও তারা দেখে নিয়েছিল। আমরা যাত্রা করার সময় কোনো অশুভ সংকেতও তাদের চোখে পড়ে নি। সেইজন্যেই তাদের মতে আমার সাফল্যের সঙ্গে ভাগ্যের কোনো যোগ নেই আমি যদি বাঘগুলোকে না মারতে পারতাম তাহলে ওরা কখনই বলত না সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কারণ বাঘের মৃত্যুর সময় যতক্ষণ না ঘনিয়ে আসে, যত নিশানা করেই গুলি ছোঁড়া হ'ক না কেন বাঘ কখনই তাতে মরবে না। আমি যাদের সঙ্গে শিকারে গিয়েছি তাদের নানা ধরনের সংস্কারগুলি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। আমি নিজেই শুক্রবারে কোথাও যেতে চাই না। তাই কোনো পাহাড়ী যদি মঙ্গল বা বুধবার উত্তর দিকে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিকে অথবা রবিবার কি শুক্রবার পশ্চিমদিকে যাত্রা করতে না চায় তাহলে আমি ঠাট্টা

করি না। কোনো বিপজ্জনক অভিযানে বেরোনোর দিনক্ষণ ঠিক করতে দেওয়াটা একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এর ফলে সঙ্গীরা বিপদের ভয়ে মুষড়ে না থেকে অনেক ফুর্তি নিয়ে চলে। হাসিখুশি লোক সঙ্গে থাকলে ভাল লাগে বইকি ?

আমরা চারজনে জমিটার ধারে বসে সবে আমাদের সিগারেট শেষ করেছি হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, বাঘটা যে ওক গাছের চারাতে আটকে ছিল সেটা নড়তে আরম্ভ করেছে। শরীরের রক্তটা নিশ্চয়ই মাথার দিকে গড়িয়েছে তাই সেই দিকটা লেজের দিকের থেকে ভারি। তাই বাঘটা মাথা সামনে দিকে করে ক্রমেই হড়কে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। ওক গাছের চারাটা পেরিয়ে বাঘটা ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে পিছলে নেমে সেই পাথরটার ধারে গিয়ে পেঁছিল। বাঘটা গড়িয়ে পড়তে পড়তেই আমি রাইফেল তুলে গুলি করলাম। আমি তল্লাদেশে আমার সাফল্যের আনন্দে অভিভূত হয়ে ঝোঁকের মাথায় গুলি চালিয়েছিলাম। আর এখন বলতে লজ্জা করে যে সেদিন আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে এমন দিনে আমার পক্ষে কিছুই মারা অসম্ভব নয়—এমনকি একটা গড়িয়ে পড়া বাঘও নয়। বাঘটা গাছের আগা ভেঙে গড়িয়ে পড়ার পর একটা ডালপালা ভাঙার শব্দ পেলাম, তার পরেই একটা ভারি কিছু পড়ার শব্দ। আমার গুলি পড়ন্ত বাঘটার গায়ে লেগেছে কি না লেগেছে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঢালু জমিটার ওপর থাকলে বাঘটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হত, এখন তাকে নিয়ে রাস্তা ভাঙতে হবে অনেক বেশি।

সিগারেট খাওয়া শেষ করে আমি আমার সঙ্গীদের চুপচাপ বসে থাকতে বললাম তারপর গেলাম বৃষ্টির জলের নালায় বাঘটার খোঁজ করতে। পাহাড়টার খাড়াই ছিল খুব বেশি। আমি প্রায় পঞ্চাশ ফুট নেমেছি এমন সময় কানে এল দুঙ্গার শিংএর উত্তেজিত চিৎকার—দেখুন, সাহেব দেখুন! ওই বাঘটা যাচ্ছে! তখন আমার মাথায় নিচের বাঘটার চিন্তা তাই ওপর থেকে কোনো বাঘ তাড়া করে আসছে মনে করে চট করে বসে রাইফেল তুললাম। আমার তোড়জোড় দেখে ছেলেটি আবার চিৎকার করে উঠল "এদিকে নয় সাহেব, ওদিকে, ওদিকে!" সামনের দিকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি দুঙ্গার সিংএর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আঙুল দিয়ে উপত্যকার ওধারে পাহাড়ের নিচের ঢালুর দিকে যেদিকে তার মা মারা পড়েছে সেইদিকে দেখাচ্ছে। প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর দেখলাম একটা বাঘ কোনাকুনিভাবে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ে। বাঘটা বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। একবারে তিনচার পা করে গিয়েই একটু করে দাঁড়াচ্ছে। তার ডান কাঁধে রক্ত চাপ বেঁধে আছে। দেখেই বুঝলাম এটি সেই বাঘটি যে গাছপালা ভেঙে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল কারণ যেটা নালায় পড়েছিল, গুলি লেগেছিল তার বাঁ কাঁধে।

আমি যেখানে বসেছিলাম তার কাছেই পাহাড়ের গায়ে একটা সতেজ ঋজু পাইন গাছের চারা। রাইফেলে তিনশো গজের নিশানা ঠিক করার ব্যবস্থা করে নিলাম। তারপর বাঁ হাতে চারা গাছটা ধরে, রাইফেলটা কবজির ওপর রেখে ধীরে সুস্থে তাক করলাম। আমাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল চারশো গজের মত আর বাঘটা ছিল আমার থেকে একটু বেশি উচ্চতায়। তাই বাঘটা একটু না দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তারপর আস্তে ট্রিগার টিপলাম। বুলেটটা যেতে অবিশ্বাস্যরকম বেশি সময় নিল মনে হল। তারপরে একটু ধুলো উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা সামনের দিকে একটু ঝোঁক খেয়ে আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। বুঝলাম আমার নিশানা ঠিক হয় নি তাই বুলেটা লক্ষ্যস্থলের এক চুল ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন আমার আর বাঘটার মধ্যে দূরত্বও কমে এসেছে। ওটাকে মারা আমার এখন শুধু একটা বুলেটের অপেক্ষা। কিন্তু সেই বুলেটটাই আমার নেই। বাঘটা যখন গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তখন বোকার মত অন্য বুলেটটা আমি ফেলে দিয়েছি। শূন্য রাইফেল হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাঘটা আস্তে আস্তে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল তারপর মুছে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে।

যে শিকারীদের হিমালয় অঞ্চলে শিকারের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা হয়তো আমাকে বোকা ভাববেন কারণ আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম কেবলমাত্র একটা হাল্কা ·২৭৫ রাইফেল আর সেই সঙ্গে পাঁচ রাউণ্ড গুলি। কেন নিয়েছিলাম তার কারণ আমি বলছি :

(ক) এই রাইফেলটি আমি বিশ বছর ধরে ব্যবহার করছি এবং এটির সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর।

(খ) এটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে বেশ হাল্কা, এতে নিশানা হয় নিখুঁত আর তিনশ গজ দূরত্ব পর্যন্ত লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা এতে আছে।

(গ) কর্নেল বারবার আমাকে বলেছিলেন ভারি রাইফেল ব্যবহার না করতে আর হাল্কা রাইফেলেও প্রয়োজনের বেশি গুলি না করতে।

গুলি সম্বন্ধে আমি একথাই বলতে পারি যে সেদিন সকালে আমি বাঘ মারব বলে বেরোই নি। আমি বেরিয়েছিলাম বাঘটা যে গ্রামে শেষ মানুষ মেরেছে সেই গ্রামটা দেখব বলে আর হাতে যদি সময় বেশি থাকে তাহলে একটা বাচ্চা মোষ টোপ হিসাবে বাঁধব বলে। এ পর্যন্ত যা ঘটল তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমি ওই মোক্ষম গুলিটা বোকামি করে ফেলে না দিলে পাঁচ রাউণ্ড গুলিই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আমার লোকেরা ঠিক সময়মত এসে সেই উঁচু জায়গায়টায় দাঁড়িয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের সব গতিবিধি লক্ষ করছিল। তারা জানত আমার রাইফেলের ম্যাগাজিনে পাঁচটা গুলিই আছে। আমার পঞ্চম গুলির পরে

আহত বাঘটা যখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন মাধো সিং আরো গুলি নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে নেমে এল।

সবুজ ঘাসের ওপরে আর নালার মধ্যে যে বাঘদুটি মরে পড়েছিল সে দুটোই প্রায় পূর্ণবয়স্ক। যে বাঘটি আহত হয়ে চলে গেল সেটি যে ওদের মা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—সেইটিই তল্লাদেশের মানুষখেকো। মাধো সিং আর দুঙ্গার সিংকে বাঘের বাচ্চা দুটো গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে আমি একাই রওনা হলাম সেই আহত বাঘিনীর সঙ্গে মোলাকাতের চেষ্টা করতে। যে ভাঙা ডালপালার ওপর বাঘটা পড়েছিল সেখানে রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে। সেই হাল্কা রক্তের দাগ অনুসরণ করে আমি পেঁছিলাম সেই জায়গাটায় যেখানে বাঘিনীটাকে আমি শেষ গুলি করেছিলাম। আমার বুলেটটা তার পিঠ ঘেঁযে কিছুটা লোম উড়িয়ে নিয়েছে মাত্র। দেখলাম কিছুটা লোম এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে—তার সঙ্গে লেগে আছে একটু রক্ত। আমার বুলেটটা ওর পিঠ ঘেঁষে পাথরে লেগে আওয়াজ করা মাত্রই ও সামনের দিকে একটা ঝোঁক নিয়েছিল। তখনই নিশ্চয় ওর ক্ষত থেকে কিছুটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে পাহাড় পর্যন্ত রক্তের ফোঁটা ক্রমেই কমে এসেছে। ওপরের ঘাসের বনে রক্তের দাগ সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। কাছাকাছিই একটা প্রায় একশো গজ চওড়া আগাছার জঙ্গল ছিল—আমার সন্দেহ হল বাঘিনীটা সেই জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়েছে! জঙ্গলটা পাহাড়ের ওপর খাড়া উঠে গেছে প্রায় তিনশো গজ। কিন্তু তখন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নিশানা করে গুলি চালানো কঠিন তাই আমি স্থির করলাম আজ গ্রামে ফিরে যাওয়াই ভাল। কাল সকালেই জঙ্গলটা ভাল করে খোঁজা যাবে।

৫

পরদিন সকালটা কেটে গেল বাঘের বাচ্চা দুটোর ছাল ছাড়িয়ে টান-টান করে শুকোতে দিতে। সেজন্যে নৈনিতাল থেকে আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম ছয় ইঞ্চি লম্বা পেরেক। আমি যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন কম করেও শ খানেক শকুন আমার তাঁবুর আশপাশের গাছগুলোর মাথায় নেমে এসেছে। মানুষখেকোর শিকারদের কাপড়চোপড় কোথায় গিয়েছে তার হদিস এতক্ষণে মিলল। বাঘের বাচ্চাদুটো সেই রক্ত মাখা কাপড়গুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে গিলে ফেলেছিল।

আমি যখন বাচ্চাগুলোর ছাল ছাড়াচ্ছিলাম তখন গ্রামের লোকজন আমায় ঘিরে বসেছিল। আমি তাদের বললাম যে আগাছার জঙ্গলে বাঘিনীটা আশ্রয় নিয়েছে মনে হয় সে জায়গাটা খেদানোর ব্যাপারে আমার গাড়োয়ালীদের সাহায্য করার জন্যে কিছু লোকজন দরকার। তারা খুব উৎসাহের সঙ্গেই ওই কাজ

করতে রাজী হল। আমরা যখন রওনা হলাম তখন বেলা প্রায় দুপুর। লোকজনেরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে, সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত উঁচু জায়গাটা ধরে পাহাড়ের ওপর দিকে গেল—অর্থাৎ বাঘিনীটা যেখানে আশ্রয় নিতে পারে ভেবেছিলাম তার থেকে কিছুটা উঁচুতে। আমি সেই ছাগল-চলা রাস্তাটা দিয়ে নিচে উপত্যকার দিকে গেলাম—এই রাস্তাতেই গতকাল বিকেলে আমি বাঘিনীটাকে অনুসরণ করেছিলাম। আগাছার জঙ্গলটার শেষ প্রান্তে একটা বিরাট পাথর ছিল—প্রায় একটা ছোটখাট বাড়ির মত বড়। আমি সেটার ওপর দাঁড়াতে পাহাড়ের ওপরের লোকজন আমায় দেখতে পেল। আমি টুপি নাড়িয়ে ওদের খেদা শুরু করার নির্দেশ দিলাম। বাঘিনীটার হাতে যাতে কেউ না জখম হয় সেইজন্যে আমি ওদের বলে দিয়েছিলাম হাততালি, চিৎকারের পর ওরা যেন সেই আগাছার জঙ্গলে বড় বড় পাথর ফেলে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে একটা কাকার আর একটা কালিজ বেরিয়ে এল কিন্তু আর কিছুই না। যখন পাথর ফেলে ফেলে জঙ্গলের প্রায় প্রতিটি ফুট তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়ে গেল তখন আমি আবার টুপি নেড়ে লোকজনদের খেদা শেষ করে গ্রামে ফিরে যেতে বললাম।

লোকজনরা চলে যেতে আমি আবাব জঙ্গলটা খুঁজলাম—কিন্তু বাঘিনীটাকে পাওয়ার কোনো আশাই আর ছিল না। আগের দিন তাকে যখন পাহাড়ে উঠতে দেখি তখন সে ক্ষতের যন্ত্রণায় খুব কাতর ছিল। গুলি খাওয়ার পর যেখানে সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেখানকার রক্ত পরীক্ষা করে বুঝলাম যে ক্ষতটা ওপর ওপরই হয়েছে, খুব গভীর নয়। তবে বাঘিনীটা কুড়ুলের কোপ খাওয়ার মত অমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলই বা কেন আর মরার মত এক চারাটার থেকে ঝুলে পড়েই বা ছিল কেন? এই প্রশ্নগুলির কোনো সদুত্তর আমি তখ খুঁজে পাই নি—এখনও পাই না। পরে আমি আমার নিকেলে মোড়া নরম মাথাওয়ালা গুলিটা বাঘিনীর ডান কাঁধের হাড়ের জোড়ের মধ্যে আটকানো দেখতে পাই। একটা বিদ্যুৎগতি বুলেট যখন হাড়ে আটকে থেমে যায় তখন যে কোনো জানোয়ারই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঘ যে কোনো সাধারণ জানোয়ারের থেকে ভারি আর তার জীবনীশক্তিও প্রচণ্ড, তবে কেন যে একটা হাল্কা ·২৭৫ রাইফেলের বুলেট তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দশ পনের মিনিট অজ্ঞান করে রেখেছিল তা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

পাহাড়ের ওপর উঠে এসে আমি একটু দাঁড়ালাম আর চারপাশের এলাকাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। পাহাড়টা ঢেউ খেলিয়ে চলে গেছে মাইলের পর মাইল—আর দুপাশে দুটো উপত্যকার মধ্যে দেয়াল যেন ওটা। বাঁ দিকের উপত্যকাটা, যেখানে আগাছার জঙ্গল সেটা ঘাসে ঢাকা, ডানদিকের উপত্যকায় ঘন গাছ ও আগাছার জঙ্গল আর ঢালু পাথুরে জমি নেমে একটা পাথরের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

পাহাড়ের ওপর একটা পাথরে বসে সিগারেট ধরিয়ে গতকাল সন্ধের ঘটনাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম : (ক) বাঘিনীটা আমার গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর থেকে গাছপালা ভেঙে জঙ্গলে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত অজ্ঞান ছিল। (খ) গাছ আগাছার নরম গদীর ওপর পড়ে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল বটে কিন্তু বাঘিনীটা তখনও হতবুদ্ধি ছিল। (গ) এই অবস্থায় সে নাক-বরাবর এগিয়ে গিয়ে পাহাড়টা সামনে পেয়ে তাতেই উঠেছিল কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে তার কোনো হুঁশ ছিল না।

এখন আমার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে বাঘিনীটা কোনদিকে আর কত দূরে গিয়েছে, খোঁড়া পায়ে পাহাড়ের নিচে নামা ওপরে ওঠার থেকে অনেক কঠিন। বাঘটা এই হতবুদ্ধি অবস্থাটা কাটিয়ে উঠলেই পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচে নামা বন্ধ করে চোটটা সামলে নেওয়ার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে। কোনো আশ্রয় খুঁজে পেতে গেলে বাঘিনীটাকে পাহাড় পার হতেই হবে। সেইজন্যে এখন সর্বপ্রথম দেখা দরকার সে তাই করেছে কিনা। এই পাহাড়ের মাথাটা ক্ষুরের মত ধারাল না হলে একটা নরম থাবাওয়ালা জানোয়ার তার মাইলের পর মাইল বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কোথায় গিয়েছে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হত। পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি একটা জন্তু জানোয়ারের পায়ে চলার পথ রয়েছে। কতরকম জন্তু জানোয়ার এখান দিয়ে চলাফেরা করে বোঝার পক্ষে আদর্শ জায়গা। পথটার বাঁ দিকে ঢালু ঘাসের জমি আর ডানদিকে চাতালের মত একটা পাথর। তারপরেই গভীর খাদ।

সিগারেটটা শেষ করে আমি সেই জানোয়ারদের পায়ে চলা পথটা ধরে এগোলাম। পথে দেখলাম ঘুরাল, বনছাগল, সম্বর, হনুমান আর শজারুর পায়ের দাগ। একটা মদ্দা চিতার থাবার ছাপও চোখে পড়ল। যতই দূরে এগোচ্ছি ততই আমি হতাশ হয়ে পড়ছি কারণ আমি জানি যে এই পথে বাঘিনীটার পায়ের থাবার ছাপ না পেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়ার আশা কম। আমি পাহাড়ের ওপর দিয়ে তখন মাইল খানেক এগিয়েছি। পথে দুটো ঘুরাল আমাকে দেখে ভয় পেয়ে বাঁ দিকের ঢালু ঘেসো জমিটার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম সেই বাঘিনীটার থাবার ছাপ আর কিছুটা রক্ত শুকিয়ে চাপ বেঁধে রয়েছে। থাবার ছাপটা দেখে মনে হয় গতকাল বিকেলে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বাঘিনীটা সোজা ঘাসের ঢালু জমি বেয়ে নেমে যায়। তারপর হতবুদ্ধি ভাবটা কাটলে সে পাহাড় ঘুরে এই জন্তু জানোয়ারদের পায়ে চলার পথটার কাছে এসেছে। আমি থাবার ছাপ ধরে ধরে এগোলাম প্রায় আধমাইল। শেষে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখানে ডানদিকের পাথরের চাতালটা সরু হয়ে প্রায় পনের গজে দাঁড়িয়েছে। বাঘিনীটা সেখানে নিশ্চয় চাতালটা বেয়ে নামার চেষ্টা করেছে—

বোধহয় ওর মতলব ছিল খাদের ওপারের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া। আহত পায়ে হয়তো সে বিশেষ জোর পায় নি ; মাথাও হয় তো তার ঝিমঝিম করছিল— যে কারণেই হক মাথা সামনের দিকে দিয়ে হড়কে কিছুটা নামার পরই সে ওই গভীর খাদে পড়ার ভয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরিয়ে, পা দুটো ছড়িয়ে নখে মাটি আঁকড়ে ধরে সে ওপরে উঠে আসার বৃথা চেষ্টা করে। আমি নিজে পাহাড়ী ছাগলের মত স্বচ্ছন্দগতিতে হাঁটতে পারি কিন্তু আমার পক্ষেও ওই খাদের ঢাল বেয়ে নামা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই আমি ওই পথ দিয়ে আরো কয়েকশো গজ এগিয়ে পাহাড়ের একটা ফাটলের কাছাকাছি এলাম। এ ফাটলটা বেয়ে আমি খাদের রাস্তা ধরলাম।

ত্রিশ ফুট চওড়া নালাটা ধরে আমি যখন ওপরের দিকে উঠলাম তখন দেখতে পেলাম, সেই পাথরের চাতালটা নালা থেকে ষাট থেকে আশি ফুট ওপরে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতখানি উঁচু থেকে পাথরের ওপর পড়লে কোনো জানোয়ারই বাঁচতে পারে না। বাঘিনীটা যেখানে পড়েছে সেই জায়গাটার কাছে এগিয়ে যেতে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল—একটা বেশ বড়সড় জানোয়ারের পেটের সাদা দিকটা দেখা যাচ্ছে। আমার আনন্দ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, কারণ জানোয়ারটা 'সারাও' নামের একটা বন্য ছাগল, বাঘিনী নয়। সারাওটা সম্ভবত পাহাড়টার ওপর সেই সরু চাতালটাতে শুয়ে ছিল। ওপরে বাঘিনীর পায়ের শব্দে আর বোটকা গন্ধে হয়তো ওর ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাবড়ে গিয়ে ও নিচে লাফ মারে। ফলে, একটা পাথরের ওপর পড়ে ওর ঘাড়টা ভেঙে গেছে। সারাওটা যেখানে লাফ মারে তার কাছেই একটা জায়গায় কিছুটা আলগা বালি ছিল। বাঘিনীটা লাফ মেরে পড়ে সেই বালির ওপর। তাতে ওর বিশেষ ক্ষতি হয় নি শুধু কাঁধের ক্ষতটা দিয়ে রক্তপড়া আবার শুরু হয়। প্রায় গজখানেক দূরে সারাওয়ের মৃত দেহটার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাঘিনীটা খাদ পেরিয়ে চলে যায়। এখান থেকে বাঘিনীটা পরিষ্কার রক্তের নিশানা রেখে গেছে। নালাটার ডান দিকের পাড়টা মাত্র কয়েক ফুট উঁচু। কিন্তু বাঘিনীটা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও তার ওপরে উঠতে পারে নি। আমি বুঝতে পারলাম এখানে থেকে প্রথম যে জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে সেইরকম জায়গাতেই বাঘিনীটা আছে। কিন্তু আমার ভাগ্য নেহাতই খারাপ। কিছুক্ষণ আগে থেকেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘেরা তোড়জোড় শুরু করেছিল, এখন বাঘিনীটা কোথায় নালার পাড় বেয়ে উঠেছে দেখার আগেই মুষলধারে একপসলা বৃষ্টি এল। ফলে রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে গেল। কিন্তু একদিক থেকে ভাগ্য আমার ওপর সুপ্রসন্ন। আমার ভয় ছিল বাঘিনীটা ঘেসো ঢালু জমির ওপর দিয়ে নেমে চলে যাবে—তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু এখন আমি জানি ঠিক কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে মোলাকাত আমার হবেই।

৬

পরদিন আমি আমার ছয়জন গাড়োয়ালীকে সঙ্গে নিয়ে নালাটার কাছে ফিরে এলাম। সারা কুমায়ুনে সারাওয়ের মাংসের খুব আদর। ঘাড়ভাঙা সারাওয়ের মাংসও খুব টাটকা ছিল। আমার সঙ্গের লোকজনও খুব খুশি। ওরা যখন সারাওটার ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত, আমি গতকাল যেখান থেকে ফিরেছিলাম সেই জায়গাটাতে গেলাম। এখানে দেখলাম ডান দিকে দুটি গভীর সরু নালা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। এর একটার মধ্যে দিয়ে বাঘিনীটা গিয়ে থাকতে পারে ভেবে আমি কাছের নালাটা দিয়ে কয়েক শো গজ এগিয়ে গেলাম—কিন্তু দেখলাম পাড়গুলোর খাড়াই এত বেশি যে এখান দিয়ে বাঘিনীর ওঠা অসম্ভব। তাছাড়া নালাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বর্ষার বৃষ্টিতে নিশ্চয় ফুট তিরিশেক উচু একটা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছিল। আমি যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সেখানে এসে লোকজনদের ডেকে নিলাম। তারা মূল নালা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমার চায়ের জন্যে এক কেটলি গরম জল করতে ব্যস্ত ছিল। তারপর আমি দ্বিতীয় নালাটা পরীক্ষা করার জন্যে এগোলাম। কিছুটা এগিয়ে দেখি বাঁ দিক দিয়ে একটা জন্তু-জানোয়ারের পায়ে চলার পথ নেমে এসেছে পাহাড় বেয়ে। পথটা বেশ ব্যবহার হয় মনে হল। সেই পথে আমি দেখতে পেলাম বাঘিনীটার থাবার ছাপ —গত সন্ধের বৃষ্টিতে অবশ্য কিছুটা ধুয়ে গেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার কাছেই একটা বিরাট পাথর। পাথরটার কাছে গিয়ে দেখি ওদিকটায় একটা খাঁজ মত রয়েছে। সেই খাঁজটার ওপর শুকনো পাতাগুলো যেন কোনো একটা চাপে মসৃণ হয়ে গেছে আর তার ওপর চাপ চাপ রক্ত। বাঁঘিনীটা নালার মধ্যে পড়েছিল এখন থেকে প্রায় ঘণ্টা চল্লিশেক আগে। তারপরে বাঘিনীটা নিশ্চয়ই এখানেই ছিল। আমি যখন লোকজনদের চায়ের জল গরম করার জন্যে হাঁক দিয়েছিলাম বাঘিনীটা নিশ্চয়ই আমার গলার আওয়াজ শুনে সরে যায়।

সব বাঘের মেজাজ একরকম হয় না তাই একথা বলা কঠিন যে কোনো আহত বাঘের কাছে কেউ পায়ে হেঁটে গেলে বাঘটা কি করবে। আহত বাঘ কদ্দিন বিপজ্জনক থাকে অর্থাৎ বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালে আক্রমণ করতে পারে সেকথা বলা মুশকিল। আমি একটা বাঘকে দেখেছিলাম, পালাতে গিয়ে তার পেছনের পায়ে প্রায় ইঞ্চিখানেক কেটে যায়। এই আঘাত পাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সে প্রায় একশো গজ দূর থেকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে। আমি আরও একটা বাঘ দেখেছিলাম যে বহু ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড চোয়ালের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কয়েক ফুটের মধ্যে লোক গেলেও সে আক্রমণের চেষ্টা করে নি। কিন্তু আহত মানুষখেকো বাঘদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। বলা মুশকিল যে কেউ কাছাকাছি এলে আহত বাঘটি তাকে আক্রমণ করবে কিনা। তাছাড়া

জখমটা যখন আন্তর্শরীর নয়, তখন খাদ্য সংগ্রহের জন্যেও বাঘ আক্রমণ করতে পারে। বাঘেরা সাধারণত আহত না হলে বা মানুষখেকো না হলে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের হয়। তা যদি না হত তাহলে যেসব বনে বাঘ আছে সেখানে হাজার হাজার লোকের কাজকর্ম করা সম্ভব হত না। আর আমার মতন লোকের পক্ষেও কোনো অনিষ্ট না ঘটেই বছরের পর বছর জঙ্গলে জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হত না। মাঝে মাঝে কোনো বাঘ তার বাচ্চার খুব কাছাকাছি আসা বা যে মড়িটা সে আগলে রেখেছে তার আশপাশে যাওয়া পছন্দ করে না। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে প্রথমে সে তার বিরক্তি প্রকাশ করে। তাতে যদি কাজ না হয়, তখন সে একটু একটু ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে। এ গর্জনেও যদি কিছু না হয় তাহলে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আগন্তুকের। কয়েক বছর আগে আমার যে অভিজ্ঞতার কথা এখন বলছি তাতেই প্রমাণিত হয় বাঘেরা কত ভাল মেজাজের জীব। আমাদের কালাধুঙ্গির বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে বোর নদীতে একদিন আমি আর আমার বোন ম্যাগি মাছ ধরছিলাম। আমি দুটো ছোট ছোট মহাশোল মাছ ধরে একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম, এমন সময় জিওফ হপকিন্স সেখানে এক হাতির পিঠে চড়ে এসে উপস্থিত। জিওফ হপকিন্স পরে উত্তর-প্রদেশের কনসারভেটর অফ ফরেস্ট পদে উন্নীত হন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে আশা করছেন কিন্তু বাড়িতে মাংস কম পড়ে যাওয়ায় ২৪০ রুক রাইফেলটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন কিছু কাকার বা বনময়ূরীর সন্ধানে, আমার মাছ ধরা হয়ে গিয়েছিল তাই উনি বলতেই ওঁর সঙ্গে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে রাজী হয়ে গেলাম। হাতিতে চড়ে আমরা নদীটা পেরিয়ে গেলাম এবং মাহুতকে কাকার ময়ূর পাওয়া যায় এমন একটা জঙ্গলের দিকে যেতে বললাম। আমরা যাচ্ছিলাম ছোট ছোট ঘাস আর বুনো কুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এমন সময়ে আমি দেখলাম একটা চিতল মরে পড়ে আছে একটা গাছের নিচে। হাতিটাকে থামিয়ে আমি নেমে গেলাম চিতলটা কিভাবে মরেছে দেখার জন্যে। মাদী চিতলটা বয়স্ক আর মারাও গেছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না দেখে আমি ভাবলাম বোধহয় সাপের কামড়েই মারা গেছে চিতলটা। আমি যখন হাতিতে ওঠার জন্যে পেছনে ফিরেছি তখন দেখি একটা পাতার ওপর এক ফোঁটা তাজা রক্ত। রক্তের দাগের আকার দেখেই মনে হ'ল যে জানোয়ার থেকে রক্তটা ছিটকে পড়েছে সে মরা চিতলটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। রক্তের ছিটে থেকে জানোয়ারটা যেদিকে গেছে সেদিকে লক্ষ করে দেখি সেদিকেও খানিকটা রক্তের দাগ। এই নতুন রক্তের দাগটা দেখে আমার অবাক লাগল। তখন হাতিটাকে আমার অনুসরণ করতে বলে আমি রক্তের নিশানা মত এগিয়ে গেলাম। ঘাসের ওপর দিয়ে ষাট সত্তর

গজ যাবার পর পাঁচ ফুট উঁচু এক ঘন ঝোপের সামনে এসে পড়লাম। রক্তের দাগ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এসে আমি দুহাত দিয়ে ঝোপটা ফাঁক করলাম। কারণ মাছ ধরার ছিপটা আমি হাতির পিঠে ফেলে এসেছিলাম। আমার হাতের ঠিক নিচেই একটা চিতল হরিণ পড়ে আছে। তার শিং দুটো যেন মখমলে মোড়া। হরিণটাকে একটা বাঘ খাচ্ছিল। আমি যেই ঝোপটা সরালাম বাঘটা আমার দিকে মুখ তুলে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ হচ্ছে—"এতো আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল।" আমিও নিজের মনে ওই একই কথা বলছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমি এত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে আমার নড়ার শক্তি পর্যন্ত ছিল না আর খুব সম্ভব তখন আমার হৃৎপিণ্ডও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই আমি দাঁড়িয়েছিলাম নিশ্চল পাথরের মত। আমি বাঘটার এত কাছে ছিলাম যে সে ইচ্ছে করলেই ওর থাবা বাড়িয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা না করে বাঘটা কয়েক মুহূর্ত সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল, ঘুরে গেল এবং অপূর্ব সাবলীল ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে তার পেছনের ঝোপে চলে গেল। আমার আসার একটু আগে বাঘটা সেই কুলগাছের জঙ্গলে হরিণটাকে মেরেছে আর মরা চিতলটার পাশ দিয়ে নিচে হরিণটাকে এই ঝোপের মধ্যে টেনে আনার সময় রক্তের দাগ রেখে এসেছে। সেই দাগই আমি অনুসরণ করেছিলাম। হাতির পিঠে যে তিনজন ছিল তারা বাঘটা লাফ দেওয়ার পরে তাকে দেখতে পেল! মাহুত ভয়ে চিৎকার করে উঠল—"খবর্দার সাহিব। শের হ্যায়!" ও আমাকে সাবধান হতে বলছিল।

আমার লোকজনদের কাছে ফিরে এসে আমি এক কাপ চা খেলাম। ততক্ষণে ওরা সারাওটা কেটেকুটে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত করে তৈরি করল। তারপর আমরা গেলাম পাথরের সেই খাঁজটার কাছে যেখানে রক্ত জমে ছিল। এই ছয়জনই আমার সঙ্গে বহুবার শিকারে গিয়েছে। রক্তের পরিমাণ দেখে ওরা বলল বাঘটার শরীরে এমন কোনো একটা গভীর ক্ষত হয়েছে যার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওটা মারা যাবে। এ বিষয়ে আমি ওদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না কারণ আমি জানি যে বাঘটা আঘাত পেয়েছে শরীরের ওপর-ওপর। সময় পেলেই বাঘটা সেরে উঠবে এবং যত বেশি দিন সে বাঁচবে ততই তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

একটা সরু নালা একটা খাড়া পাহাড় বরাবর চলে গেছে, তার ডান দিকের জমিটা নালার দিকে ঢালু এবং সেই জমির ওপর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের নিচেটায় তেমন আগাছা নেই। নালার বাঁ দিকের জমিটা ওপরের দিকে উঠে গেছে আর তাতে রয়েছে খাটো বাঁশ এবং অন্যান্য আগাছার ঘন জঙ্গল। এই ছবিটা মনে মনে ভেবে নিলেই বুঝতে পারবেন কিরকম জায়গায় আমি আমার লোকজনদের নিয়ে সেদিন সারাদিন কাটিয়েছিলাম।

আমার পরিকল্পনা ছিল নালার ডান দিকটায় আমার লোকজনকে পাঠিয়ে সবচেয়ে উঁচু গাছ খুঁজে উঠে বসতে বলব যাতে তারা আমায় নজরে রাখতে পারে, আর যদি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার দরকার থাকে তাহলে শিস্ দিতে পারে। পাহাড়ীরা, কোনো কোনো ছোকরার মত দাঁতের ফাঁকে শিস্ দিতে ওস্তাদ। বাঘিনীর থেকে ওদের বিপদের কোনো আশংকা নেই কারণ ওদের দিকে বাঘটা লুকনোর মত কোনো ঝোপঝাড় নেই। তাছাড়া ওরা সবাই খুব ভাল গাছে উঠতে পারে। পাথরের খাঁজটা ছাড়ার পর বাঘিনীটার থাবার ছাপ দেখে বুঝলাম যে সেটা নালার বাঁ পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এই পাহাড়ের পথেই আমি তার পিছু নিলাম।

আমি অন্য কোথাও জোর দিয়ে বলেছি যে অরণ্যগাথা বিজ্ঞান নয় যে পাঠ্যপুস্তক পড়ে তা শেখা যাবে। এ শেখা যায় অল্প অল্প করে—অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। এ অভিজ্ঞতা অর্জন চিরকাল ধরে চলতে পারে এর কোনো সময় সীমা নেই। অনুসরণ করার বিদ্যাও একইভাবে অর্জন করতে হয়। অনুসরণের কাজে এত ধরনের রকমফের আছে যে শিকারে গেলে এই কাজটিই আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয় আর এ কাজে উত্তেজনাও প্রচুর। অনুসরণের ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি মোটামুটি স্বীকৃত। একটি হল রক্তের নিশানা অনুসরণ করা আর একটি হল এমন একটি পথ অনুসরণ করা যেখানে রক্তের নিশানা নেই। এ দুটি পদ্ধতি ছাড়াও আমি অনেক সময় ঘায়ের মাছি বা মাংসভুক পাখি অনুসরণ করেও আহত জানোয়ারের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু জখমে সবসময়ে রক্ত পড়ে না, থাবার ছাপ দেখে, অথবা গমনকালে ওরা গাছপালার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাই দেখে জখম জানোয়ারকে অনুসরণ করতে হয়। অনুসরণের কাজ সহজ বা কঠিন হওয়া নির্ভর করে যে জ.নর ওপর দিয়ে অনুসরণ করা হচ্ছে তার ওপর এবং যে জানোয়ারকে অনুসরণ করা হচ্ছে তার পায়ে শক্ত খুর না নরম থাবা তার ওপর। আমার চিৎকার শুনে বাঘিনীটা যখন পাথরের খাঁজ ছেড়ে যায় তখন তার ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার বিষিয়ে ওঠা ক্ষত থেকে যে সামান্য পুঁজ গড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্যে তার থাবার ছাপ আর পথের আশপাশের গাছপালার অবস্থা দেখেই আমাকে অনুসরণের কাজ চালাতে হচ্ছিল। যে মাটির ওপর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম তাতে ওইভাবে অনুসরণ করা কঠিন নয়, কিন্তু এতে সময় লাগবে অনেক—আর তাতে বাঘিনীটারই লাভ হবে।

কারণ তাকে অনুসরণ করে খুঁজে পেতে আমার যতই সময় বেশি লাগে ততই তার ঘাটা শুকিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত তাকে হয়তো আর খুঁজেই পাব না। কারণ গত কয়েক দিনের পরিশ্রমে আমিও ক্রমে কাহিল হয়ে পড়ছিলাম।

প্রথম একশো গজ আমায় চলতে হল হাঁটু সমান উঁচু ঢেঁকিশাকের মধ্যে দিয়ে। এইটুকু পথ তার চলার রাস্তা অনুসরণ করা কঠিন হল না কারণ সে এগিয়েছে মোটামুটি সরল রেখা ধরে। এরপরেই শুরু হয়েছে রিঙ্গলের ঘন ঝোপ। আমার নিশ্চিত ধারণা হল বাঘিনীটা এই ঝোপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিন্তু সে আমাকে আক্রমণ না করলে তাকে গুলি করার কোনো আশা আমার নেই—কারণ রিঙ্গল ঝোপের জড়াজড়ি করা গাছের মধ্যে দিয়ে গেলে আওয়াজ হবেই। ঝোপটা যখন প্রায় আধাআধি পেরিয়েছি তখন হঠাৎ একটা কাকার ডেকে উঠল। বাঘিনীটা তাহলে চলতে শুরু করেছে, তবে পাহাড় বেয়ে সোজা না উঠে সে নিশ্চয় বাঁ দিকে খোলা জায়গাটার দিকেই গেছে কারণ কাকারটা তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে। আমি ফিরে এসে বাঁ দিকে গেলাম কিন্তু সেদিকে কোনো খোলা জায়গা পেলাম না কিংবা যে কাকার হরিণটা ডাকছিল তাকেও দেখতে পেলাম না। একটু পরেই কাকারটা থেমে গেল এবং কতকগুলি কালিজ পাখি কিচিরমিচির শুরু করে দিল। বাঘিনীটা তাহলে এখনও এগিয়ে চলেছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না।

একটা শব্দ শুনে তার দিক এবং দূরত্ব ঠিক করা যে কোনো শিকারীর পক্ষেই একটা বিশেষ গুণ। আমি এ ব্যাপারটা প্রায় নিখুঁত করে এনেছি বলে আমার মনে মনে একটা গর্ববোধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার সেই দুর্ঘটনায় ওই ক্ষমতাটি থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমি আমার নিরাপত্তার জন্যে আর আমার শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করতে পারব না। জঙ্গলের বাসিন্দাদের যে ভাষা শেখার জন্যে আমার এত বছর লেগেছে সেই ভাষা শুনে আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার কানের ওপর আর আমি কোনোদিনই নির্ভর করতে পারব না। আমার অন্য কানটা ঠিক থাকলেও হয়তো কাজ চালানো যেত কিন্তু সেটার পর্দাও বহুদিন আগে এক বন্দুক-দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়েছিল। যাই হ'ক এ সম্বন্ধে সাত পাঁচ ভেবে এখন কোনো লাভ নেই। আমার যে অক্ষমতাই থাক না কেন, এখন আমি মেনে নিতে রাজী নই যে কোনো বাঘ সে মানুষখেকোই হ'ক আর যাই হ'ক, আমার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে। বিশেষ করে যখন আমরা দুজনেই দুজনের জীবনের ওপর তাক করে আছি আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাউকেই বিশেষভাবে সাহায্য করছে না।

আমি আবার সেই ঝোপে ফিরে গেলাম। এবার বাঘিনীটাকে খোঁজার চেষ্টা করলাম সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির ওপর নির্ভর করে। বারবার সম্বর, কাকার হরিণ আর হনুমানের ডাক থেকেই বুঝলাম এ বনে শিকার আছে প্রচুর। কালিজ, জে, রসিক-দামা, ডাক শুনে বুঝলাম এখন পাখিরাও ভিড় করেছে বাঘিনীটার

চারিদিকে। সাধারণত এই শব্দগুলোই আমায় পথ চিনিয়ে নিয়ে চলে কিন্তু এখন সেদিকে কোন নজর না দিয়ে আমি বাঘিনীটাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করে চললাম। এখন সে পাহাড়ের ওপর উঠছে—কখনও চলছে সোজা, কখনও এঁকেবেঁকে এ-ঝোপ ও-ঝোপের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ের প্রায় মাথায় একটা মাঠের মত জায়গা ছোট্ট শক্ত শক্ত ঘাসে ভরা—জায়গাটার আয়তন হবে প্রায় একশো গজ। এই খোলা জায়গাটার ওধারে ঘন আগাছার দুটো বড় ঝোপ রয়েছে। এ দুটো ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা গিয়ে উঠেছে একেবারে পাহাড়টির মাথায়। এই ঘাসের ওপর আমি বাঘিনীটার খাবার ছাগ হারিয়ে ফেললাম। বাঘিনীটা টের পেয়েছিল তাকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে তাই সে যতটা সম্ভব আড়াল নিয়েই চলার চেষ্টা করছিল। আমার ডান পাশের ঝোপটি অন্য ঝোপটির থেকে গজ তিরিশেক কাছে। তাই আমি ডান দিকটাই প্রথমে দেখা ঠিক করলাম। আমি যখন জঙ্গলটার দু-এক গজের মধ্যে এসে পড়েছি তখন হঠাৎ একটা শুকনো ডাল ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। ডালটা ভাঙল যেন কোনো ভারি জানোয়ারের চাপে। আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে শব্দটা বাঁ দিকের ঝোপ থেকেই আসছে। আমি ঘুরে শব্দটা লক্ষ্য করে বাঁ দিকের ঝোপের দিকে এগোলাম। এইটাই হল ওই দিন আমার দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল। প্রথমটা হল চিৎকার করে আমার লোকজনকে চা করতে বলা। এখন, আমার লোকজন পরে আমাকে বলেছিল, আমি নাকি প্রায় বাঘিনীটার পায়ে পায়েই খোলা জায়গাটা পেরিয়েছিলাম। আমি যখন বাঁ দিকে ফিরলাম তখন সে ঝোপের কয়েক গজ ভেতরেই একটা ছোট্ট খোলা জায়গায় শুয়েছিল আর নিশ্চয়ই সে আমায় অপেক্ষাতেই ছিল।

বাঁ দিকের ঝোপে বাঘিনীটার কোনো চিহ্ন না দেখে আমি আবার খোলা জায়গাটায় ফিরে এলাম। হঠাৎ শুনলাম আমার লোকজনদের শিস্। ওরা আমার ডানদিকে কয়েকশো গজ দূরে একটা গাছের ওপর উঠেছিল। আমি ওদের দিকে ফিরে হাত নেড়ে জানালাম যে ওদের আমি দেখতে পেয়েছি। তখন তারা হাত পা নেড়ে সংকেত করে আমায় একবার ওপর একবার নিচে দেখাতে লাগল। ওরা আমায় বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে বাঘটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অন্য দিক দিয়ে নেমে গেছে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরু পথটা ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে ওপারে খানিকটা খোলা জায়গা দেখতে পেলাম। ওই জায়গাটায় সদ্য সদ্য ঘাস পোড়ানো হয়েছে আর আগের দিন বিকেলে বৃষ্টি হওয়ার দরুন সেই জমির ছাই-মাখা মাটি ভিজে রয়েছে। ভিজে মাটির ওপর আমি বাঘিনীর খাবার ছাপ পেলাম। পাহাড়টা ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে একটা ছোট্ট ঝরণার দিকে নেমে গেছে। আমি যেদিন তল্লাকোটে এসে পৌঁছই সেদিন এই নদীটাই পার হয়েছি কয়েক মাইল ওপর দিকে। শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম

করে, জল খেয়ে বাঘিনীটা ঝরণা পার হয়ে ওপারের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। তখন সন্ধে হয়ে আসছে তাই আমি পাহাড়ের ওপর ফিরে এলাম এবং আমার লোকজনদের ডেকে নিলাম।

যে বড় পাথরটার কাছ থেকে আমি বাঘিনীটার থাবার ছাপ অনুসরণ করতে শুরু করি সেখান থেকে ঝরনাটা পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে মাইল চারেক কিন্তু এই পথটা অতিক্রম করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় সাত ঘণ্টা। দিনটা যদিও ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু সময়টা কেটেছে বেশ উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই। এ শুধু আমার কথা নয়। আমাকে তো এগোবার সময় প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে মানুষখেকোর খপ্পরে না পড়ি। গাছের ওপর থেকে আমার ও বাঘিনীটার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করা আমার গাড়োয়ালী লোকজনদের পক্ষেও কম উত্তেজনার হয় নি। দিনটাও ছিল আমাদের পক্ষে দীর্ঘ। বেরিয়েছি সেই ভোরবেলায় আর যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন রাত প্রায় আটটা।

৭

পরদিন সকালে আমার লোকজনেরা যখন খাওয়া-দাওয়া সারছিল, আমি বাঘের চামড়াগুলো আবার নতুন করে মাটিতে গেঁথে গেঁথে শুকোতে দিলাম আর কাঁচা জায়গাগুলোতে ছাই আর ফিটকিরি ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলাম। বাঘের চামড়ার জন্যে অনেক যত্ন করতে হয় কারণ চর্বি পুরো ছাড়িয়ে না নিলে বা কান ঠোঁট থাবা এগুলো খুব ভালভাবে পরিষ্কার না করলে, চামড়ার লোম-গুলো খসে পড়তে থাকে। ফলে চামড়াটা নষ্ট হয়ে যায়। দুপুরের কিছু আগেই আমি বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম। দুজন লোককে ক্যাম্পে রেখে গেলাম, সারাও-এর চামড়াটার ব্যবস্থা করার জন্যে। বাকি চারজনকে সঙ্গে নিয়ে আগের দিন বিকেলে বাঘিনীকে যে পর্যন্ত অনুসরণ করেছি সেই জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যে উপত্যকার ওপর দিয়ে ঝরণাটা বয়ে গেছে সেটা বেশ চওড়া মোটামুটি সমতল আর তার বিস্তার হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূব দিকে। উপত্যকার বাঁ দিকে সেই পাহাড়টা যার ওধারে কাল আমি বাঘিনীটাকে অনুসরণ করেছি। ডানদিকের পাহাড়টার ওপর দিয়ে চলে গেছে টনকপুরে যাওয়ার রাস্তাটা। মানুষখেকোর দৌরাত্ম্য শুরু হওয়ার আগে তল্লাকোটের যত গরু মোষ চরানোর জন্যে নিয়ে আসা হত এই উপত্যকাটায়। এর ফলে উপত্যকাটা জুড়ে জালের মত ছড়িয়ে আছে সরু সরু গরু মোষ চলার পথ আর মধ্যে মধ্যে বুজে আসা নালা। উপত্যকাটার চারিদিকে নানা আকারের ঘাস, ঘন আগাছার ঝোপ আর জঙ্গল। এই পথগুলোর ওপর সম্বর, কাকার, ভাল্লুকের থাবার ছাপও দেখলাম। এগুলো মারার পক্ষে জায়গাটা প্রশস্ত সন্দেহ নেই কিন্তু একটা মানুষখেকো বাঘকে খুঁজে বের করা এ ধরনের জমির ওপর বেশ দুঃসাধ্য

ব্যাপার। বাঁদিকের পাহাড়টা থেকে উপত্যকার অনেকটা দেখা যায়। তাই আমি আমার লোকজনদের পাহাড়ের মাথায় গাছের ওপর চড়িয়ে দিলাম—একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের দূরত্ব দুশো গজ মতন। এতে তারা চারিদিকে নজরও রাখতে পারবে আর প্রয়োজন হলে এগিয়েও আসতে পারবে। সব ব্যবস্থা করে আমি গেলাম আগের দিন বাঘিনীটার থাবার ছাপ অনুসরণ করে যে জায়গাটা পর্যন্ত গিয়েছি সেই জায়গায়।

বাঘিনীটা আমার গুলিতে আহত হয় ৭ই এপ্রিল আর আজ ১০ই। সাধারণভাবে আঘাত পাওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে বাঘ আর বিপজ্জনক থাকে না অর্থাৎ মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে না। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায় আর তা নির্ভর করে ক্ষতের গভীরতা এবং আহত বাঘের মেজাজের ওপর। আঘাত সামান্য হলে চব্বিশ ঘণ্টা পরে লোকজনের সাড়া পেলে বাঘ সাধারণত সরে যায় কিন্তু শরীরের ক্ষত যদি খুব যন্ত্রণাদায়ক হয় তাহলে বাঘ বেশ কিছু দিন ধরে ভয়ের কারণ হয়ে থাকে। এ বাঘিনীটার ক্ষত ঠিক কি ধরনের সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। গতকাল সারাদিন যখন সে আমায় আক্রমণের কোন চেষ্টা করেনি তখন তাকে আহত বাঘ বলে মনকে স্তোকবাক্য না দিয়ে সোজাসুজি মানুষখেকো ভাবাই ভাল, এতক্ষণে বাঘিনীটা নিশ্চয় খুব ক্ষুধার্ত কারণ মেয়েটিকে মেরে বাচ্চাদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার পর তার পেটে আর কিছুই পড়ে নি।

বাঘিনীটা যেখানে ঝরনাটা পার হয়েছে সেখানে তিন ফুট চওড়া ও দু ফুট গভীর একটা বৃষ্টির জলের নালা ছিল। এই নালাটার দুদিকেই ঘন আগাছার ঝোপঝাড়। বাঘিনীটা গিয়েছে এই নালার পথ ধরেই। ওর থাব[illegible]াগ অনুসরণ করে এসে পড়লাম একটা গরু মোষ চরার পথে। এখানে নালাটা ছেড়ে ও ডানদিকের রাস্তায় গিয়েছে। এই রাস্তা ধরেই তিনশো গজ মত এগিয়ে একটা ঘন পাতাওয়ালা গাছ। এর নিচেই শুয়ে বাঘিনীটা রাত কাটিয়েছে। ক্ষতর যন্ত্রণায় সে সারারাত ছটফট করেছে, এপাশ ওপাশ করেছে কিন্তু পাতার ওপর কোনো রক্ত বা পুঁজের দাগ চোখে পড়ল না। এখান থেকেই তার থাবার টাটকা ছাপ দেখে আমি এগোতে লাগলাম। আমাকে এগোতে হচ্ছিল খুব সাবধানে কারণ অসতর্কতার যে কোনো মুহূর্তে বাঘিণীটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে। সন্ধের মধ্যে তার থাবার ছাপ ধরে বহু পথ আমার হাঁটা হল। বহু নালা, জন্তু জানোয়ার গরু মোষের পায়ে চলার পথ আমি পেরিয়ে এলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত বাঘিনীটার ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নি। সূর্যাস্তের পর আমি আমার লোকজনদের ডেকে জড় করে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। রাস্তায় ওরা আমাকে বলল যে জন্তু জানোয়ার আর পাখির ডাকে ওরা বাঘিনীটা জঙ্গলের কোনখান দিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু ওরাও বাঘিনীটাকে দেখে নি।

যে মানুষখেকো বাঘ চোট খায় নি তাকে শিকার করতে যখন হাওয়ার উলটো মুখে হাঁটতে হয় তখন সবচেয়ে বড় ভয় থাকে পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার। অবশ্য দুপাশ থেকেও বাঘ লাফিয়ে পড়তে পারে তবে, সে বিপদ তুলনামূলক-ভাবে কম। হাওয়াটা যখন থাকে পেছন দিকে তখন ভয় থাকে শুধু দুদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার। ঠিক তেমনিই হাওয়াটা যদি বইতে থাকে ডানদিক থেকে তাহলে বাঁ দিকে আর পেছনে বিপদের আশঙ্কা থাকে আর বাঁ দিক থেকে যখন হাওয়া বয় তখন ডানদিকে আর পেছনে নজর রাখা উচিত। এর কোনো ক্ষেত্রেই বাঘ মানুষখেকো হ'ক বা নাই হ'ক, সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ একেবারে মুখোমুখি কোনো জিনিসকে আক্রমণ করা বাঘের স্বভাব বিরুদ্ধ। সাধারণভাবে মানুষখেকোরা এমন একটা দূরত্ব থেকে আক্রমণ করে যেখান থেকে ওরা শিকারের ওপর লাফ দিয়ে পড়তে পারে। সেই জন্যেই আহত বাঘের চেয়ে মানুষখেকোরা অনেক বেশি বিপজ্জনক। কারণ আহত বাঘ আক্রমণের সময় সব সময় একটা দূরত্ব মেনে চলে, সে দশবিশ গজই হোক বা একশো গজ হ'ক। তার মানে মানুষখেকো আক্রমণ করলে প্রস্তুতির কোনো সময় পাওয়া যায় না যা কিছু করার তা করতে হয় বিদ্যুৎগতিতে। কিন্তু আহত বাঘের ক্ষেত্রে অন্তত রাইফেলটা তোলা, কোনোরকমে নিশানা করার সময়টা পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গুলি চালাতে হবে চট করে আর আকুল প্রার্থনা জানাতে হবে যে দুএক আউন্সের একটা সীসের টুকরো যেন কয়েকশো পাউন্ড মাংস পেশী আর হাড়ের চলার গতি রুদ্ধ করে।

এ বাঘিনীটার বেলায় আমি জানতাম যে ক্ষতর জন্যে ওটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারবে না—আর আমি যদি কোনোরকমে ওর আওতার বাইরে থাকতে পারি তবেই আমি নিরাপদ। কিন্তু আমি ওকে দেখার পর গত চারদিনে ওর জখমটা হয়তো সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই জন্যে আমি যেদিন ১১ই এপ্রিল সকালে ওর পায়ের ছাপের ফেলে-আসা জায়গাটা খুঁজতে বেরোলাম, আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে কোনো পাথর, ঝোপঝাড় গাছ বা অন্য যা কিছুর পেছনে বাঘিনীটা লুকিয়ে থাকতে পারে এমন জায়গা থেকে দূরে দূরে থাকব।

বাঘিনীটা গতকাল সন্ধে বেলা টনকপুরের রাস্তার দিকে এগোচ্ছিল। যেখানে ও শুকনো ঘাসের ওপর রাত কাটিয়েছিল সে জায়গাটা আবার আমি খুজে বার করলাম। তারপর ওর টাটকা থাবার ছাপ ধরে এগোলাম। ঘন ঝোপ ঝাড় সে এড়িয়ে গেছে সম্ভবত তার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে চলতে পারবে না বলেই। যেভাবে সে নালা, জন্তু জানোয়ারের চলার পথ ধরে এগিয়েছে তা দেখে মনে হয় ওর চলাটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন নয়। হয় তো কিছু মেরে

খাওয়ার মতলব আছে ওর। কিছু দূর এগিয়েই একটা নালার মধ্যে দেখলাম বাঘিনীটা একটা বাচ্চা কাকার হরিণ পেয়েছে—বাচ্চাটার বয়েস কয়েক সপ্তাহ হবে কিনা সন্দেহ। বাচ্চাটা যখন বালির ওপর শুয়ে রোদ্দুরে ঘুমোচ্ছিল তখন বাঘিনীটা ওকে ধরে। এমনভাবে ওটাকে খেয়েছে যে ওর ছোট ছোট খুরগুলো ছাড়া আর দেহের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার থেকে তখন বাঘিনীটার দূরত্ব মিনিট খানেক কি মিনিট দুয়েকের। বুঝলাম বাচ্চা হরিনটা খেয়ে বাঘিনীটার কিছুই হয় নি শুধু খিদে বেড়ে গেছে। তাই আরো শতর্ক হয়ে গেলাম। যে নালা, জন্তু জানোয়ারের পায়ে চলার পথ ধরে বাঘিনীটা এগোচ্ছিল সেগুলো মাঝে মাঝে এঁকেবেঁকে ঝোপঝাড় পাথরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আমার শরীরের অবস্থা ভাল থাকলে পিছু নিয়েই বাঘিনীটার নাগাল হয়তো আমি পেয়ে যেতাম কিন্তু ভাগ্যের মার ছাড়া কি বলব; সেদিন আমার শরীর একেবারেই ভাল ছিল না। আমার মাথা মুখ গলা সব এত ফুলে গিয়েছিল যে ওপর নিচে বা পাশে ঘাড় ফেরানই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ওপর বাঁ চোখটা ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। যাই হ'ক সৌভাগ্যক্রমে আমার ডান চোখটা ভালই ছিল আর তখন পর্যন্ত আমার শ্রবণ-শক্তি সম্পূর্ণ চলে যায় নি।

সেদিন সারাটা দিন আমি বাঘিনীটার পেছনে পেছনে ঘুরলাম। আমি ওকে দেখি নি আর আশা করি সে-ও আমাকে দেখতে পায় নি। যেখানেই সে কোনো জলের নালা ধরে, জন্তু জানোয়ার বা গরু বাছুর চলার পথ ধরে গভীর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে, সেখানেই আমি সেই ঝোপঝাড়গুলো এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে উলটোদিকে আবার বাঘিনীর থাবার ছাপ খুঁজে গিয়েছি। এ অঞ্চলটা ভাল করে জানা না থাকায় আমার অসুবিধে আরও বেড়ে গিয়েছিল। এর জন্যে যে শুধু প্রয়োজনের থেকে বেশি মাইল আমাকে হাঁটতে হল তাই নয়, বাঘিনীটার গতিবিধি অনুমান করা বা তার মোকাবিলা করাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সেদিনকার মত আমার অনুসরণ যখন শেষ হ'ল বাঘিনীটা তখন গ্রামের পথে পা বাড়িয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে বুঝতে পারলাম যে 'দুঃসময়ের' ভয় আমি করছিলাম তা এসে গিয়েছে। একটা ফোড়া থেকে দুঃসহ যন্ত্রণা বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ছিল শিরায় শিরায়, মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। একটার পর একটা বিনিদ্র রাত কাটানো আর শুধু চা খেয়ে থাকা আমার সব সাহস যেন শুষে নিচ্ছিল। আরও একটা রাত বিছানায় বসে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করা, কি একটা যেন ঘটবে তারই অপেক্ষায় থাকা—এ চিন্তাটাই আমার কাছে কেমন অসহ্য বোধ হল। আমি তল্লাদেশে এসেছি ওখানকার পাহাড়ী লোকজনদের সন্ত্রাসমুক্ত করব বলে আর নিজের খারাপ সময়টাও কিছুটা কাটিয়ে উঠব বলে। কিন্তু এ পর্যন্ত

যা করেছি তাতে ওখানকার লোকজনের বিপদ কাটা দূরে থাক, বরং বেড়েই গেছে। বাঘিনীটা গত আটবছরে প্রায় দেড়শো মানুষ মেরেছে। এখন ওর স্বাভাবিক শিকারের ক্ষমতা না থাকলে আর জখমটা সেরে না উঠলে সবচেয়ে সহজে যা মারা যায়, অর্থাৎ মানুষ, তাই ও মারবে। কারণ ওকে খেতে তো হবেই কিছু। বাঘিনীটার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া আমায় করতেই হবে। আর সেটা আজ রাতেই বা হবে না কেন!

চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী কায়দায় তৈরি প্রচুর দুধ দেওয়া এক কাপ চা খেয়ে আমি রাতের খাওয়া সারলাম। তারপর আমার আটজন লোককে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম যে তারা যেন কাল বিকেল পর্যন্ত আমার জন্যে এই গ্রামেই অপেক্ষা করে। তার মধ্যে যদি আমি না ফিবি তাহলে তারা যেন আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সকালবেলা নৈনিতালে রওনা হয়ে যায়। বলা শেষ হলে আমি বিছানার ওপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেলাম। আমার লোকেরা আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আছে। ওরা আমাকে ভাল করেই জানে। তাই কোথায় যাচ্ছি কেউ জিজ্ঞাসা করল না বা আমায় থামাবারও চেষ্টা কেউ করল না। তারা সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমায় চলে যেতে দেখল। তাদের গাল বেয়ে রুপোলী রেখার মত যদি কিছু দেখে থাকি সে নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল—কি জানি চাঁদেব আলোয়ও তো অনেকরকম বিভ্রম হয়। আমি যখন চলে গেলাম তখন ওরা সার বেঁধে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৮

আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে আনন্দ স্মৃতির মধ্যে একটি হচ্ছে শীতকালে যখন আমরা দলবেঁধে চাঁদের আলোয় জঙ্গলে বেড়াতে যেতাম আর ফিরে এসে প্রচুর চা খাবার খেতাম। এই ভাবে হাঁটা অভ্যেস করলে রাতের জঙ্গল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে অহেতুক ভয় আছে তার অনেকখানি কেটে যায় আর তাছাড়া জঙ্গলে রাতে যে নানাধরনের শব্দ হয় তার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ মেলে। এর পরে আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতা, জঙ্গল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই ১১ই এপ্রিল রাতে কাকডাকা জ্যোৎস্নায় যখন আমি তল্লাদেশের মানুষখেকোর সঙ্গে আমার শেষ বাজি ধরার জন্যে বেরোলাম তখন আমার আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব ছিল না—যদিও অনেকের কাছেই মনে হবে এভাবে বেরনো আত্মহত্যারই সামিল।

বাঘ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ দীর্ঘদিনের—প্রায় যতদূর আমার স্মৃতি যায় ততদিনের। আর এমন একটা অঞ্চলে আমার জীবন কেটেছে যেখানে বাঘও ছিল প্রচুর আর তাদের লক্ষ করার সুযোগও আমার যথেষ্ট ছিল। আমি যখন খুব

ছোট ছিলাম তখন আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটা বাঘ দেখব। ব্যাস্‌ আর কিছুর দরকার নেই। পরে আমার বাঘ মারার ইচ্ছে হল। পায়ে হেঁটে বাঘ মারলাম পঞ্চাশ টাকায় কেনা একটা সৈন্যদলের রাইফেল দিয়ে। এটা কিনেছিলাম এক জাহাজীর কাছ থেকে। মনে হয় চোরাই মাল, পরে ও ওটাকে শিকারের রাইফেল বানিয়ে নিয়েছিল। যাই হ'ক তারও পরে আমার ইচ্ছে হল বাঘের ছবি তোলার। কালক্রমে আমার এই তিনটে ইচ্ছেই পূরণ হয়েছিল। এই ছবি তোলার সময়েই বাঘ সম্বন্ধে যেটুকু আমি জানি সেটা জানার সুযোগ আমার হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে 'জঙ্গলের স্বাধীনতা' পাওয়ার পর, যা আমি ছাড়া অন্য একজন মাত্র শিকারীই ভারতবর্ষে পেয়েছেন, আমি স্বাধীনভাবে অবাধে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সব জঙ্গলে ঘোরার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, একবার একনাগাড়ে সাড়ে চার মাস ধরে লক্ষ করে তাদের স্বভাব ও শিকারের কাছে তাদের এগিয়ে আসা, শিকারকে মারা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলাম। বাঘ কখনো তার শিকারের পেছনে ধাওয়া করে না, হয় সে শিকারের জন্যে ওঁত পেতে বসে থাকে, না হয় তাকে গোপনে অনুসরণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সে হয় লাফ দিয়ে শিকারের ঘাড়ে পড়ে, না হয় কয়েক গজ দৌড়ে তারপর লাফ দেয়। কোনো জানোয়ার যদি বাঘের লাফ দেওয়ার দূরত্বটা এড়িয়ে চলতে পারে, বাঘকে যদি ঠিকমত অনুসরণ করতে না দেয় আর দৃশ্য, গন্ধ, শব্দ থেকে বিপদের আভাস বুঝে নিতে পারে তাহলে তার আর পরিণত বয়স পর্যন্ত বাঁচায় কোনো বাধা নেই, জানোয়ারদের যে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি, মানুষের তা নেই কারণ সভ্যতা অনেক কিছুর মত মানুষের এই ক্ষমতাটিও কেড়ে নিয়েছে। তাই মানুষ যখন কোনো মানুষখেকোর কবল থেকে বাঁচার চেষ্টা করে তখন নিরাপত্তার জন্যে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় তার দৃষ্টিশক্তির ওপর। আমার মানসিক চাঞ্চল্য আর শারীরিক যন্ত্রণার জন্যে সে রাতে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন আমার বিরাট একটা অসুবিধে ছিল এই যে সে রাতে শুধু একটা চোখেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। অসুবিধেটা যাতে মনে শেকড় গেড়ে না বসে সেইজন্যে আমি মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম এই ভেবে যে আমি যদি বাঘিনীটার খুব কাছাকাছি না যাই তাহলে সে আমার কিছুই করতে পারবে না অথচ আমি তাকে অনেক দূর থেকেই মারতে পারব। আমি যে আমার লোক-জনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম পরদিন সন্ধেবেলার মধ্যে আমি না ফিরলে নৈনিতালে চলে যেতে তা বাঘিনীটার সঙ্গে পেরে উঠব না বলে নয়, আমার মনে একটা আশঙ্কা ছিল হয়তো আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব, হয়তো নিজেকে রক্ষা করার মত শক্তি আমার থাকবে না।

কোনো জায়গা দিয়ে এগোবার সময় মনে মনে একটা মানচিত্র এঁকে নেওয়ার সুবিধে হল, ফেরার সময় কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে অসুবিধে হয় না।

যেখানে বাঘিনীটার থাবার ছাপ ছেড়ে আমি চলে এসেছিলাম সেখান থেকেই আবার অনুসরণ শুরু করলাম। আমার ভাগ্য ভাল কারণ বাঘিনীটা এগোচ্ছিল বুনো জন্তু জানোয়ার ও গরু-মোষের পায়ে চলার পথ ধরেই। অন্য কোনো পথ ধরে গেলে আমার পক্ষে হয়তো অনুসরণ চালানো সম্ভব হত না। সম্বর আর কাকারগুলো এখন মাঝে মাঝেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছে—কেউ ঘাস খেতে, কেউ আত্মরক্ষার জন্যে। আমি তাদের বিপদ সংকেত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু ওদের গতিবিধি দেখেই আন্দাজ করতে পারছিলাম বাঘিনীটা কখন চলতে শুরু করেছে বা কোনদিকে যাচ্ছে। একটা সরু আঁকাবাঁকা গরু মোষের পায়ে চলার পথ ধরে বাঘিনীটার থাবার ছাপ ঢুকেছে একটা ঘন আগাছাপূর্ণ ঝোপের মধ্যে। আমি ঝোপটা ঘুরে অন্যদিকে গিয়ে আবার থাবার ছাপটা ধরার চেষ্টা করলাম। ঝোপটা পেরতে আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকেও বেশি সময় আমার লাগল। ঝোপটা পেরিয়েই একটা খোলা জায়গা ছোট ছোট ঘাসে ভরা আর মাঝে মাঝে বড় বড় ওক গাছ। এখানে একটা বেশ বড়সড় গাছের ছায়ায় দাঁড়ালাম। হঠাৎ ছায়াটার নড়াচড়া থেকে অনুমান করলাম যে গাছটার ওপর নিশ্চয়ই হনুমানদের বাস। রওনা হওয়ার পর প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে আমি বহু পথ হেঁটেছে। এ-জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ কারণ বিপদের আভাস পেলেই হনুমানগুলো আমায় সতর্ক করে দেবে। সেইজন্য ভাবলাম এখানেই কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক। গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, ঝোপটার দিকে মুখ করে আধঘণ্টাটাক বিশ্রাম করেছি কি না করেছি এমন-সময় একটা বুড়ো হনুমান বিপদ সংকেত জানিয়ে ডেকে উঠল। বাঘিনীটা ঝোপ ছেড়ে খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এসেছে তাই হনুমানটা দেখতে পেয়েছে ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমিও দেখতে পেলাম বাঘিনীটাকে—আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। ও ছিল আমার ডানদিকে প্রায় একশো গজ দূরে—ঝোপটার থেকে ওর দূরত্ব তখন প্রায় দশ গজ। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে ও ডেকে ওঠা হনুমানটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

রাত্তিরে গুলি চালানোর অভ্যাস আমার আছে কারণ শীতকালে কালাধুঙ্গিতে আমাদের প্রজাদের ক্ষেতখামার শুয়োর, হরিণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রায়ই আমার তলব পড়ত। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় প্রায় একশো গজ দূরত্ব পর্যন্ত কোনো জানোয়ারকে আমি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে মারতে পারি। অধিকাংশ শিকারীর মত গুলি চালানোর সময় আমি দু চোখই খোলা রাখি। কারণ এক চোখ দিয়ে জানোয়ারটাকে লক্ষ করা যায়, আর অন্য চোখ দিয়ে রাইফেলের নিশানা ঠিক করা যায়। অন্য যে কোনো সময় হলে আমি বাঘিনীটা উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, তারপরে গুলি করতাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার বাঁ চোখটা বন্ধ আর একচোখে গুলি চালানোর পক্ষে একশো

গজ দূরত্বটা অনেক বেশি। আগের দুই রাত বাঘিনীটা একটা জায়গাতে শুয়েই রাত কাটিয়েছে—হয়তো বেশির ভাগ সময়টা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। আজও ও তাই করতে পারে। এখন ও শুয়ে আছে পেটের ওপর ভর দিয়ে, মাথাটা ওপর দিকে করে। কিন্তু রাত্রে ও যদি পাশ ফিরে শোয়, আর ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে আমি সেই গরু মোষ চলার পথটায় ফিরে গিয়ে ওর থাবার ছাপ দেখে দেখে ঝোপটার পাশ দিয়ে ওর গজ দশেকের মধ্যে পৌঁছতে পারি। কিংবা আমি খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছাকাছি যেতে পারি—সেখান থেকে আমার গুলি নিশ্চিত লক্ষ্যভেদ করবে। যাই হ'ক, এখন আমার নিশ্চল হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। এখন সবই নির্ভর করছে বাঘিনীটার মর্জি'র ওপর।

বাঘিনীটা একভাবেই শুয়ে রইল প্রায় আধঘণ্টা কি তারও বেশি—মাঝে মাঝে মাথাটা সে নাড়াচ্ছিল এদিক সেদিক। বুড়ো হনুমানটা ঘুম-জড়ানো গলায় বিপদ সংকেত দিয়েই চলল। শেষে বাঘিনীটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আমার ডানদিক বরাবর চলতে শুরু করল। দেখেই বুঝলাম হাঁটতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ও যেদিকটায় যাচ্ছে সেদিকে ওর ঠিক সোজাসুজি একটা দশ পনের ফুট গভীর খোলা নালা। নালাটা প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট চওড়া। এখানে আমার পথে নিচের দিকে নালাটা আমায় পেরোতে হয়েছিল। বাঘিনীটা এখন আমার থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে চলে গেছে—ওর আমাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাই আবার অনুসরণ শুরু করলাম। এ গাছ ও গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, ওর থেকে আরো একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে ও নালা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই আমি আমাদের দূরত্বটা কমিয়ে আনলাম পঞ্চাশ গজে। বাঘিনীটা এখন আমার লক্ষ্যের সীমার মধ্যে। কিন্তু ও দাঁড়িয়ে আছে ঘন ছায়ার আড়ালে। ওর ল্যাজের যেটুকু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তা দেখে গুলি করা সম্ভব নয়। ও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটখানেক—সে এক দীর্ঘ উদ্বিগ্ন মিনিট। তারপর নালাটা পেরানোই ঠিক করল ও—খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল নালাটার পাড়ে।

বাঘিনীটা চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়া মাত্রই আমি ঝুঁকে পড়ে কোনো শব্দ না করে সামনে দৌড়তে শুরু করলাম। মাথা নিচু করে দৌড়নো আমার পক্ষে নেহাতই বোকামি হয়েছে কারণ কয়েক গজ দৌড়নোর পরই আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমার কাছেই মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে ছিল দুটি ওকের চারা—পরস্পরের গায়ে ঘেঁষে ছড়িয়েছে তাদের ডালপালা। আমি মাটিতে রাইফেল রেখে একটা গাছে প্রায় দশ বার ফুট উঠে গেলাম। এখানে বসার, পা মেলার আর হেলান দেওয়ার মত কয়েকটি ডাল ছিল। আমি সামনের ডালপালা আঁকড়ে ধরে মাথাটা ডালের ওপর হেলিয়েছি এমন সময় সেই

মারাত্মক ফোড়াটা ফাটল। আমার ভয় ছিল ফোঁড়াটা ফাটবে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু তা না হয়ে আমার বাঁ কান আর নাকের মধ্যে দিয়েই গলগল করে বেরিয়ে এল পুঁজরক্ত।

'হঠাৎ কোনো তীব্র যন্ত্রণা থেমে যাওয়ার আনন্দের তুলনা নেই'—একথা যিনি বলেছিলেন তিনি যন্ত্রণায় যেমন কষ্ট পেয়েছিলেন তেমনি হঠাৎ কষ্ট উপশমের আনন্দ পেয়েছিলেনও তিনিই। প্রায় মাঝরাত নাগাদ আমার যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূর হল। যখন পূবের আকাশ আসন্ন ভোরের ছোঁয়ায় ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসছে, আমি কনুই থেকে মাথা তুললাম। এক নাগাড়ে চার ঘণ্টা একটা সরু ডালে বসে থাকার ফলে আমার পায়ে খিঁচ ধরেছিল—সেই ব্যাঘাতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়; কিছুক্ষণ আমি ধন্দ ধরার মত বসে রইলাম—আমি কোথায় আছি, আমার কি হয়েছে কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। বুঝতে অবশ্য দেরি হল না। ব্যথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথা, মুখ, ঘাড় ফোলা চলে গেছে। আমি এখন যেদিকে খুশি মাথা ঘোরাতে পারি। আমার বাঁ চোখটা ফোলা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেছে আর এখন ঢোক গিলতেও কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আমি বাঘিনীটাকে গুলি করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছি সত্যিই কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমার 'দুঃসময়' কেটে গেছে—বাঘিনীটা যেখানে যত দূরেই যাক আমি ওকে খুঁজে বার করবই। সময় যাই লাগুক না কেন আমি নিশ্চয় আরেকটা সুযোগ পাব।

আমি শেষ যখন বাঘিনীটাকে দেখি তখন ও এগোচ্ছিল গ্রামের দিকে। যে গাছে উঠতে আমার এত কষ্ট হয়েছিল সেই গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে লাফিয়ে মাটিতে নেমে এলাম তারপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে একই দিকে রওনা দিলাম। ঝরনাটার ধারে এসে আমি নিজেকে এবং আমার জামাকাপড় যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে নিলাম। আমার লোকেরা কিন্তু আমার নির্দেশ মত গ্রামে রাত কাটায় নি; আমার তাঁবুর কাছে একটা আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে ঘিরে সবাই বসে ছিল। আগুনের ওপর ফুটছিল এক কেটলি জল। যখন ভিজে সপসপে অবস্থায় ওরা আমায় দেখতে পেল তখন ওরা আনন্দে উত্তেজনায় লাফ দিয়ে উঠল—"সাহেব! সাহেব! আপনি ফিরে এসেছেন! আর আপনি ভাল আছেন!" "হ্যাঁ", আমি উত্তর দিলাম "আমি ফিরে এসেছি—আর বহাল তবিয়তে।" কোনো ভারতীয় যখন আনুগত্য প্রকাশ করে তখন সে হিসেব করে না আর তার মধ্যে কোনো খাদ থাকে না। আমরা যখন তল্লাকোটে পৌঁছলাম তখন গ্রামের সর্দার আমার লোকজনকে দুটো ঘর ছেড়ে দিল কারণ ওখানে খিল দেওয়া দরজার বাইরে শোওয়া বিপজ্জনক। আমার সেই 'দুঃসময়ের' রাতে, বাইরে বিপদ আছে জেনেও আমার লোকজন বাইরে বসেছিল যদি আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় ভেবে—আর এক কেটলি জল ওরা ফুটন্ত অবস্থায়

রাখছিল আমি যদি ফিরি আমায় চা দেবে বলে। চা খেয়েছিলাম কিনা আমার ঠিক খেয়াল নেই কিন্তু মনে আছে সে রাতে আমি শুয়ে পড়ার পর একজোড়া খুব ইচ্ছুক হাত আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিয়েছিল, আর আমার পায়ে একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা নিশ্চিন্ত ঘুম তারপরে একটা স্বপ্ন। কেউ আমাকে খুব উত্তেজিত গলায় ডাকছে আর অন্য একজন কেউ সমান উত্তেজিতভাবে তাকে আমায় ডাকতে বারণ করছে। এই স্বপ্নটাই একটু রকমফের হয়ে বারবার আমার সামনে আসতে লাগল—অবশেষে আমার ঘুমের জাল ছিঁড়ে এই কথাগুলো পরিষ্কার আমার কানে এল—"ওঁকে ঘুম থেকে না ওঠালে উনি খুব রেগে যাবেন।" কেউ একজন উত্তর দিল—"ওঁকে তুল না, উনি খুব ক্লান্ত।" শেষের বক্তা গঙ্গারাম। আমি ওকে ডেকে লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসতে বললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার তাঁবুটা ছেলে বুড়োর এক উত্তেজিত জনতায় ভরে গেল—সবাই সমস্বরে আমায় বলতে লাগল যে মানুষখেকোটা গ্রামের অন্য প্রান্তে সদ্য সদ্য ছটি ছাগল মেরেছে। আমি জুতো পরতে পরতে জনতার দিকে তাকিয়ে দুঙ্গার সিংকে দেখতে পেলাম। যখন বাঘিনীর বাচ্চা দুটোকে মারি তখন এই ছেলেটিই আমার সঙ্গে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ছাগলগুলো কোথায় মারা পড়েছে ও তা জানে কিনা আর আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। "হ্যাঁ, হ্যাঁ," সে খুব উৎসাহ ভরে উত্তর দিল "আমি জানি কোথায় তারা মারা পড়েছে। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।" গাঁয়ের সর্দারকে বললাম জনতাকে সামলাতে তারপর আমার ২৭৫ রাইফেলটি নিয়ে দুঙ্গার সিংএর সঙ্গে গ্রামের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠেছিলাম আর এখন ঝাঁকির দরুন মাথার যন্ত্রণার ভয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলারও কোনো প্রয়োজন নেই—তাই বহুদিন পরে বেশ স্বচ্ছন্দে সহজভাবে হাঁটতে পারছিলাম।

৯

আমি যেদিন প্রথম তল্লাকোটে পেঁছিই সেদিন এই দুঙ্গার সিংই আমাকে নিয়ে যায় দুটো উপত্যকার মধ্যে সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত জায়গাটিতে। ডান দিকের উপত্যকাটি খাড়াভাবে নেমে গেছে কালি নদীর দিকে। এই উপত্যকারই ওপর দিকে আমি বাচ্চা দুটোকে মেরেছিলাম আর বাঘিনীটাকে জখম করেছিলাম। বাঁ দিকের উপত্যকাটির খাড়াই অত বেশি নয়—ওপরের পাড় থেকে একটা ছাগল চলা রাস্তা নেমে গেছে নিচে। এই উপত্যকাটার মধ্যেই ছাগলগুলো মারা পড়ে। ওই সরু রাস্তাটি দিয়ে ছেলেটি দৌড়তে শুরু করল—আমিও তার পিছু নিলাম। পাথুরে এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর

দিয়ে পাঁচ-ছশো গজ গিয়ে পথটা এসে ঠেকেছে একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে। ওপার দিয়ে পথটি আবার এঁকেবেঁকে উপত্যকার বাঁদিকে চলে গেছে। পথটা যেখানে এসে ঝরনাটার সঙ্গে মিশেছে সেখানে একখণ্ড অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। এই খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে ডানদিক থেকে বাঁদিক পর্যন্ত একটা পাথরের ঢিবি। তার ওদিকে একটা গর্ত মতন রয়েছে। সেই গর্তের মধ্যেই পড়ে আছে তিনটে ছাগল।

পাহাড় থেকে দৌড়ে নামার সময়েই ছেলেটি আমায় বলেছিল যে বেলা দুপুর নাগাদ দশ পনেরটা ছেলের হেফাজতে বেশ বড় একপাল ছাগল ওই গর্তটায় ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বাঘ, ওদের মনে হল সেটা মানুষখেকোটাই হবে, কোত্থেকে যেন লাফিয়ে পড়ে আর ছটা ছাগলকে মেরে ফেলে। বাঘ দেখে ছেলেগুলো সমস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে—তখন আর কিছু লোকজন যারা আশে পাশে জ্বালানী কাঠ কুড়োচ্ছিল, তার চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে। এই হট্টগোল, চিৎকার, ছাগলের দৌড়োদৌড়ির মধ্যে বাঘটা সরে পড়ে। কোনদিকে যে গিয়েছে তা ওরা কেউই লক্ষ করে নি। তিনটে মরা ছাগল নিয়ে লোকজন ছেলেরা গ্রামের দিকে দৌড়ে আসে আমাকে খবর দেওয়ার জন্যে আর তিনটে ছাগল ওই গর্তের মধ্যেই পড়ে থাকে পিঠ ভাঙা অবস্থায়।

সেই আহত মানুষখেকোই যে ছাগল মেরেছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই কারণ আমি যখন তাকে গত রাতে শেষ দেখি তখন সে সোজা গ্রামের দিকেই যাচ্ছিল। তাছাড়া আমার লোকজনও আমাকে বলেছিল আমি ক্যাম্পে ফেরার ঘণ্টাখানেক আগে ঝরনার ধারে একটা কাকার ডেকে উঠেছিল—ওরা যেখানে বসেছিল তার থেকে প্রায় একশো গজ দূরে। আমায় দেখেই কাকারটি ডাকছে মনে করে ওরা আগুনটা জ্বালিয়েছিল। আগুনটা জ্বালিয়ে ওরা ভালই করেছিল কারণ পরে আমি দেখেছিলাম বাঘিনীটার থাবার ছাপ আগুনের চারিদিক ঘুরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। নিশ্চয়ই কোন মানুষ শিকারের খোঁজে গিয়েছিল ও। শিকার জোটাতে না পেরে ও নিশ্চয়ই গ্রামের আশে-পাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল। খাদ্য সংগ্রহের প্রথম সুযোগেই ও ছাগলগুলো মারে। এ কাজগুলো ও সারে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আর তখন জখমের যন্ত্রণায় ও নিশ্চয়ই খুব খোঁড়াচ্ছিল।

আমি জায়গাটার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না তাই দুঙ্গার সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম ওর কি মনে হয়? কোনদিকে গেছে বাঘটা? উপত্যকার নিচের দিকটা দেখিয়ে সে বলল তার মনে হয় নিচের ঘন জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকেছে বাঘটা। আমি বাঘটাকে খুঁজতে যাব মনস্থ করে ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জঙ্গলটা সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ একটা কালিজ কিচিরমিচির করে উঠল। কালিজের ডাক শুনেই ছেলেটি ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ওপর দিকটায়

তাকাল—আমাকেও ইশারায় জানিয়ে দিল কোন দিক থেকে পাখিটা ডাকছে। আমাদের বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে কিছু কিছু ঝোপঝাড় আর ছড়ানো ছেটানো খাটো খাটো গাছ। আমি জানতাম বাঘটা ওই পাহাড় বেয়ে ওঠে নি। আমি খুঁজছি দেখে দুঙ্গার সিং আমায় বলল কালিজটা পাহাড়ের ওপর থেকে ডাকছে না, পাহাড় ঘুরে একটা নালা আছে, ডাকটা আসছে সেই দিক থেকেই। পাখিটা যখন আমাদের দেখতে পায় নি তখন তার ভয় পেয়ে ডাকার একমাত্র কারণ হতে পারে বাঘিনীটা। আমি দুঙ্গার সিংকে বললাম এখন আমাকে ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে ও যেন গ্রামে ফিরে যায়। ও দৌড়ে বিপদ সীমানা পেরনো পর্যন্ত আমি রাইফেল নিয়ে ওর ফেরার পথ পাহারা দিলাম তারপর একটা সুবিধেমত বসার জায়গা খোঁজার জন্যে ফিরলাম।

এ অঞ্চলের একমাত্র গাছ হল বিশাল বিশাল পাইন। এ গাছগুলোয় ত্রিশ চল্লিশ ফুট পর্যন্ত কোনো ডালপালা না থাকায় গাছে ওঠা এক দঃসাধ্য ব্যাপার। সেই জন্যে আমাকে বাধ্য হয়ে মাটিতেই বসতে হবে। দিনের বেলা হলে কোন চিন্তা ছিল না কিন্তু বাঘিনীটা ফিরতে ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়, আর ওর যদি ছাগল ভেড়া ছেড়ে মানুষের মাংস খাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে থাকে তাহলে চাঁদের আলো ওঠার আগে ঘণ্টা দুয়েক অন্ধকারে কাটানোর জন্যে আমার অনেক বরাতজোর দরকার হবে।

গর্তটার এদিকে বাঁ দিক থেকে ডানদিক পর্যন্ত যে ঢিবিটা চলে গেছে তার এপাশে ছিল একটা বড় চ্যাটালো পাথর। তার কাছেই অন্য আরেকটা, একটু ছোট। আমি দেখলাম ওই ছোট পাথরটার ওপর বসলে আমি বড় পাথরটার আড়াল পাব। এতে বাঘিনীটা যেদিক থেকে আসতে পারে সেদিকে, শুধু আমার মাথাটাই বেরিয়ে থাকবে। সেই জন্যে এখানে বসাই আমি স্থির করলাম। আমার ঠিক সামনেই একটা বিরাট গর্ত—প্রায় চল্লিশ গজ চওড়া; তার ওপারের চড়াটা প্রায় কুড়ি ফুট মত উঁচু। ঐ পাড়ের ওপর রয়েছে দশ থেকে কুড়ি ফুট চওড়া একটা সমতল জায়গা—জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে ডানদিকে। এর ওপারেই খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। লোকজন আর রাখাল ছেলেরা যখন দৌড়ে পালায় গর্তের মধ্যে ছাগল তিনটে তখনও জ্যান্ত ছিল—এখন তারা মৃত। থাবা মারার সময় বাঘিনীটা একটা ছাগলের পিঠের ছাল চামড়া তুলে নিয়েছিল।

কালিজটা এখন আর চিৎকার করছে না। আমি ভাবতে লাগলাম পাখিটা ডেকেছিল কখন? আমি ছেলেটার সঙ্গে এখানে পেঁছনোর পর যখন বাঘিনীটা নালা বেয়ে ওপর দিকে যাচ্ছিল তখন না বাঘিনীটা ফিরে আসবার সময়? একটা হচ্ছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার ব্যাপার কিন্তু অন্যটি হলে যা ঘটার তা অচিরেই

ঘটবে। আমি বেলা দুটোর সময় আমার ঘাঁটি আগলে বসেছিলাম। আধঘণ্টাটাক পরে একজোড়া নীল হিমালয় অঞ্চলের 'ম্যাগপাই' পাখি উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে এল। এই সুন্দর পাখিগুলো বাসা বাঁধার মরসুমে ছোট ছোট পাখির বাসা ভেঙে দেয় বটে কিন্তু জঙ্গলে কোথাও কিছু মরলে ওদের খুঁজে বার করার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি 'ম্যাগপাই' পাখিগুলোকে দেখার আগেই ওদের ডাক শুনেছিলাম—ওদের গলায় খুব জোর। মরা ছাগলগুলো দেখে ওরা ডাক থামিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল। তারপর কয়েকবার হুঁশিয়ারির ডাক ডেকে তারা ছাল ছাড়ানো ছাগলটার পিঠে উঠে খেতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে একটা রাজ শকুন আকাশে চক্কর দিচ্ছিল। 'ম্যাগপাই'গুলোকে ছাগলটার পিঠে দেখে সেটা যেন হাওয়ায় ভেসে নেমে এল আর পালকের মত হাল্‌কা চালে বসল একটা পাইন গাছের মরা ডালে। এই সাদা বুক, কালো পিঠ ও লাল মাথা পা-ওয়ালা রাজ শকুনগুলোই সর্বপ্রথম মড়ির সন্ধান পায়। অন্য জাতের শকুনের তুলনায় এগুলো আকারে ছোট বলে ভোজসভায় এদের আগেই হাজির হতে হয়। কারণ অন্যেরা এলে ওদের পিছিয়ে যেতে হয়।

শকুনটির আসাকে আমি মনে মনে স্বাগত জানালাম কারণ ওর গতিবিধি থেকে না-জানা অনেক কিছুই আমি জানতে পারব। পাইন গাছের ওপর থেকে ও বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে; ও যদি নেমে এসে ম্যাগপাই পাখিগুলোর সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে বুঝতে হবে বাঘিনীটা চলে গেছে কিন্তু ও যদি গাছেই বসে থাকে তার মানে হবে বাঘিনীটা আশেপাশেই কোথাও আছে। পরের আধঘণ্টা দৃশ্যটা একইরকম থাকল—ম্যাগপাই দুটো ছাগলের মাংস ঠুকরে ঠুকরে খেতে থাকল, শকুনটা সেই মরা ডালের ওপর বসেই রইল—তারপর ঘন বৃষ্টির মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই আবার কালিজটা কিচিরমিচির আরম্ভ করল আর ম্যাগপাইগুলো খুব জোরে ডাকতে ডাকতে উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বাঘিনীটা আসছে। গতরাতে হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়ার দরুন যে সুযোগ হাতে এসেও ফস্কে গেল সেই সুযোগই আবার আসছে। বাঘিনীটাকে আমি গুলি করতে পারব—যখন ভেবেছিলাম তার অনেক আগেই।

পাহাড়ের ওপর কয়েকটা ছোটখাট আগাছার ঝোপ থাকার দরুন নালাটা আমার নজরে পড়ছিল না। একটু পরে এই ঝোপের মধ্যে দিয়েই আমি বাঘিনীটাকে দেখতে পেলাম। সে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কুড়ি ফুট উঁচু পাড়ের ওপর সেই সমতল জমিটার ওপর দিয়ে—তার চোখ আমারই ওপর। আমার মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে, তাও নরম টুপিটা চোখের ওপর পর্যন্ত টানা; আমি যদি নড়াচড়া না করি তাহলে ও আমায় দেখতে পাবে না জানতাম। তাই রাইফেলটা চ্যাটালো পাথরটার ওপর রেখে আমি নিশ্চল মূর্তির মত

বসে রইলাম। আমার ঠিক উল্টো দিকে এসে বাঘিনীটা বসল—আমাদের দুজনের মাঝে শুধু একটা পাইন গাছের গুঁড়ি। আমি গাছটার একপাশ দিয়ে ওর মাথা আর অন্য পাশ দিয়ে ওর পেছনের কিছুটা অংশ আর ল্যাজ দেখতে পাচ্ছিলাম। এখানে সে কয়েক মিনিট বসে রইল—শুধু ঘায়ের ওপর যে মাছিগুলো ভনভন করে বিরক্ত করছিল সেগুলোকে মাঝে মাঝে তাড়াবার চেষ্টা করছিল সে।

১০

আট বছর আগে, বাঘিনীটি যখন এখনকার চেয়ে তরুণী, একটি শজারুর সঙ্গে মোলাকাতে ও ভীষণ ভাবে জখম হয়। যখন এই চোটটা খায়, তখন হয়তো ওর বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাদের স্তন্যপান করাবার জন্য নিজে খাওয়া দরকার আর সে-সময়টা নিজের স্বাভাবিক শিকার যোগাড় করতে না পেরে ও মানুষ মারতে শুরু করে। এ কাজ করে ও প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে নি। ও মাংসাশী প্রাণী। মানুষের হ'ক, বা অন্য কোনো জন্তু জানোয়ারের হ'ক, মাংসটাই একমাত্র খাদ্য যা ও হজম করতে পারে। অবস্থা বিপাকে পড়লে জানোয়ার তো বটেই, এমন কি মানুষও এমন সব খাবার খায়, যা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা কখনই খেতে চাইবে না। সম্পূর্ণ নরখাদক জীবনে বাঘিনীটি মাত্র দেড়শো মানুষ মেরেছে, বছরে তা কুড়িটিরও কম, এই ঘটনা থেকে আমার ধারণা এই সহজলভ্য শিকারের দিকে ও তখনি ঝুঁকেছিল যখন ওর বাচ্চা হয়, এবং যখন এই জখমের কারণে ও নিজের ও স্ব-পরিবারের বাঁচার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বাভাবিক খাদ্য আহরণে অক্ষম হয়।

বাঘিনীটার জন্যে তল্লাদেশের মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—যে ক্ষতি ও করেছে তার দাম আজ দিতে হচ্ছে ওকে। ওর দুঃখ দুর্দশার থেকে ওকে চিরকালের মত মুক্তি দেওয়ার জন্যে আমি অনেকবার রাইফেলের নিশানা জুড়েছিলাম ওর মাথা লক্ষ্য করে কিন্তু আকাশ ভরা মেঘ থাকার ফলে আমার পক্ষে প্রায় ষাট গজ দূরে একটা তুলনামূলকভাবে ছোট্ট জিনিস তাক করে মারার মত যথেষ্ট আলো ছিল না।

অবশেষে বাঘিনীটা উঠে দাঁড়িয়ে তিন পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তারপরে আমার দিকে পাশ ফিরে নিচে ছাগলগুলোব দিকে তাকাল। চ্যাটালো পাথরটার ওপর কনুই রেখে আমি তার হৃৎপিণ্ড যেখানে হতে পারে সেরকম একটা বিন্দু সহজে লক্ষ্য করে রাইফেলের ঘোড়া টিপলাম, দেখলাম তার পেছনের পাহাড়ে একটু ধুলো উড়ে গেল। ধুলো দেখেই আমার মনে একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত ঝলসে গেল—আমি যে শুধু হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগাতে পারি নি তাই নয়, পুরো জানোয়ারটাই আমার তাক ফসকে গেছে। কিন্তু তবুও আমি

যে রকম সযত্নে নিশানা করেছি তাতে তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। যা সন্দেহাতীতভাবে হয়েছে তা হচ্ছে গুলিটা ওর শরীর সম্পূর্ণ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, কোথাও বাধা পায় নি। আমার গুলি খেয়ে বাঘিনীটা সামনের দিকে লাফ দিল, তারপর খুব ভয় পাওয়া, একটা জানোয়ারের মত সমতল জমিটার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল, ওর ছোটাটা কিন্তু আহত জানোয়ারের মত নয়। আমি আরেকটা গুলি করার আগেই ও আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

বাঘিনীটা আমাকে এমন চমৎকার সুযোগ দিল আর আমি ওকে মারতে পারলাম না এতে খেপে গেলাম আমি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে ও আমাকে এড়িয়ে পালাতে পারবে না। পাথরটার ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে আমি দৌড়ে গর্তটা পার হয়ে কুড়ি ফুট উঁচু পাড় বেয়ে উঠে সমতল জায়গাটার ওপর দিয়ে যেখানে বাঘিনীটা অদৃশ্য হয়েছে সেখনে এসে পড়লাম। সেখানে দেখি আলগা কতকগুলো পাথরের পর একটা চল্লিশ ফুটটাক খাড়াই নেমে গেছে। বাঘিনীটা এই দিক দিয়েই বিরাট লাফ মেরে চলে গেছে। এখানে লাফ দিলে পা মচকে যাওয়ার ভয় আছে তাই হাঁটু গেড়ে বসে হেঁচড়ে হেঁচড়ে নামলাম নিচ পর্যন্ত। এই খাড়াই-এর নিচেই রয়েছে একটা বহু ব্যবহৃত পায়ে চলার পথ—বাঘিনীটা নিশ্চয়ই ওই পথ ধরেই এগিয়েছে কিন্তু জমি খুব শক্ত হওয়ার দরুন ও পথে ওর থাবার ছাপ খুঁজে পাওয়া কঠিন। পথটার ডানদিকে একটা নুড়ি ভর্তি ঝরনা—এই ঝরণাটাই আসার পথে আমি আর দুঙ্গার সিং পার হয়েছি কিছুটা ওদিক থেকে। ঝরনাটার পাশ থেকে উঠে গেছে একটা ঘাসে ঢাকা খাড়া পাহাড়। ঝরনাটার বাঁ দিকে আরেকটা পাহাড়—তার ওপরে রয়েছে শুধুমাত্র কয়েকটা পাইন গাছ। পথটা কিছুদূর পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। এই পথ ধরে পঞ্চাশ কি ষাট গজ এগিয়েছি এমন সময় শুনি একটা 'ঘুরাল' হুঁশিয়ারি জানাচ্ছে। ঘুরালটা থাকতে পারে একমাত্র আমার ডান দিকে, ঘাসে ঢাকা পাহাড়টিতে। বাঘিনীটা সম্ভবত ঝরণাটা পেরিয়ে ওই পাহাড়ে উঠে গেছে, এই মনে করে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম বাঘিনীটিকে দেখা যায় কিনা দেখার জন্যে। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকাতেই দেখি একদল লোক সেই ঘোড়ার পিঠের মত উঁচু জায়গাটার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে ওরা চিৎকার করে, হাতের ইশারায় আমাকে এগিয়ে যেতে বলল, পথটা ধরে একদম নাক বরাবর সোজা। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার দৌড়তে লাগলাম এবং একটা মোড় ঘুরতেই পথের ওপর দেখতে পেলাম তাজা রক্তের দাগ।

জানোয়ারের চামড়া সাধারণত ঢিলে থাকে। যদি কোনো জানোয়ার স্থিরভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় গুলি খায় এবং তারপরেই যদি সে বেগে ছুটতে থাকে তাহলে তার চামড়ার ফুটো আর শরীরের মাংসের ফুটো এক লাইনে থাকে না। এর ফলে

যতক্ষণ জানোয়ারটা জোরে দৌড়য় ততক্ষণ তার ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে না বললেই চলে—পড়লেও তা অতি সামান্য। তবে জানোয়ারটার দৌড়ের বেগ যখন কমে আসে তখন দুটো ফুটো কাছাকাছি হয়ে যায় আর রক্ত ঝরতে থাকে। যতই সে আস্তে চলে রক্ত ঝরা ততই বাড়তে থাকে। কোনো জানোয়ারের গায়ে গুলি ঠিকমত লেগেছে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে গুলি করার সময়ে যেখানে জানোয়ারটি ছিল সেখানে লোমের কুচির খোঁজ করা উচিত। লোমের কুচি থাকলে বুঝতে হবে গুলি জানোয়ারটার গায়ে লেগেছে আর না থাকলে ধরে নিতে হবে গুলি জানোয়ারটাকে একেবারেই ফসকে গেছে।

মোডটা ঘুরে বাঘিনীটার গতি মন্থর হয়ে এসেছে কিন্তু রক্তের ছিটে থেকে বোঝা গেল তখনও সে দৌড়চ্ছে। ওকে ধরার জন্যে আমি জোরে দৌড়তে সুরু করলাম। কিছুটা যাওয়ার পরই দেখি আমার বাঁদিকে পাহাড় থেকে একটা পাথর বেরিয়ে আছে। এখানে পথের বাঁকটা এমন কোণ কেটে হঠাৎ মোড় নিয়েছে যে গতির মুখে আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, পাহাড়ের গা ছাড়া আমার ধরারও কিছু ছিল না. পথটার ধার দিয়ে খাড়াভাবে নিচে পড়লাম। দশ পনের ফুট নিচে ছিল একটা রডোডেনড্রনের চারা এবং চারা গাছটার পরেই একটা বিরাট খাদ। খাদটার নিচে একটা অন্ধকার ভয়াবহ চেহারার নালা। নালার জল পাহাড়ের গোড়ায় একটা সমকোণ সৃষ্টি করে ঘুরে গেছে; আমি চারাগাছটা পেরোবার সময়ে নরম মাটিতে আমার পা বসে যাচ্ছিল তাই ডান হাতে চারাগাছটা চেপে ধরলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে চারা গাছটা শেকড় সুদ্ধু উপড়ে এলে না—যদিও বেঁকে গিয়েছিল তবু গাছটা ভাঙে নি। খুব আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি প্রাণোচ্ছল মেডেন হেয়ার ফার্নে ঢাকা পিছল ও নরম পাহাড়ের গায়ে পা ঠুকে ঠুকে পা রাখার মত জায়গা করে নিলাম।

বাঘিনীটাকে ধরার সুযোগ চলে গেল বটে কিন্তু এখন বেশ রক্তের স্পষ্ট দাগের নিশানা ধরে ধরে এগনো যাবে। আর তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যে চলার পথটা এতক্ষণ উত্তর দিকে চলছিল সেটা এখন একটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড়ের উত্তর দিক ঘেঁষে পশ্চিম মুখে চলেছে। এই পথ ধরে আরো দুশো গজ মত এগোবার পর আমি এসে পড়লাম পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটা সমতল জায়গায়। শরীরে রাইফেলের গুলির চোট লাগার পর একটা বাঘের এর থেকে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয় তাই ঢেঁকিশাক আর বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাপে ঢাকা সমতল জায়গাটির দিকে আমি খুব সতর্কভাবে এগোতে লাগলাম।

যে বাঘ তার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর তার মত ভয়াবহ জীব ভারতের জঙ্গলে আর কিছু নেই। বাঘিনীটা বদলা নেওয়ার মত একটা চোট খেয়েছে কিছুক্ষণ আগেই। ছটা ছাগল মেরে আর আমার গুলি খাওয়ার পর জোরে ছুটে বাঘিনীটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে পাঁচদিন আগে ওর পায়ে যে গুলির

ক্ষত হয়েছিল ওর জোরে ছোটার পক্ষে তা কোনো বাধাই নয়। আমি মনে মনে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারবে আমি ওর পিছু নিয়েছি আর আমি ওর আওতার মধ্যে এসে পড়েছি, ও আমাকে একটা মরণ কামড় দেবেই দেবে। সে আক্রমণের মোকাবিলা আমায় সম্ভব করতে হবে শুধু মাত্র একটি বুলেট দিয়ে। রাইফেলের বোল্টটা খুলে ফেলে আমি কার্টিজটা খুব ভাল করে পরখ করে নিলাম। আশ্বস্ত হলাম যে সম্প্রতি আমি কোলকাতার ম্যান্টন কোম্পানীর কাছ থেকে যে নূতন কার্টিজগুলি আনিয়েছি এটি তারই একটি। আমি আবার ওটা বন্দুকে ভরে বোল্টটা লাগিয়ে সেফটি ক্যাচ খুলে ফেললাম।

ঢেঁকিশাকের পথটা গেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু ঝোপের মধ্যে দিয়ে। গাছগুলো পথের দুপাশ থেকে এসে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। রক্তের দাগ সেই পথ ধরে এগিয়ে ঢেঁকিশাকের ঝোপের দিকে গেছে। বাঘিনীটা ওই পথের ওপরেই কি ডাইনে বা বাঁয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। সুতরাং প্রতিটি ফুট সতর্কতার সঙ্গে দেখতে দেখতে আমি ঢেঁকিশাকের ঝোপের দিকে এগোলাম—আমার দৃষ্টি সামনের দিকে কারণ এরকম অবস্থায় ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করা বোকামি। আমি যখন ঝোপের তিন গজের মধ্যে এসে পড়েছি, তখন পথের ডান দিকে গজ খানেকের মধ্যে হঠাৎ একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম; বাঘিনীটা ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আহত এবং দীর্ঘ সময়ের উপবাসী হলে কি হয়, একটা শেষ লড়াই না করে ও ছাড়বে না। তবে শেষ লাফটা আর সে দিতে পারে নি। ও উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রথম গুলিটা ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয় গুলিতে ওর ঘাড়টা গেল ভেঙে।

খালি পেটে দিনের পর দিন ব্যথায় কষ্ট আর অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রমের ধকল সইবার ফলে আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপতে শুরু করেছে। বহু কষ্টে আমি সেই বাঁকটার কাছে এসে পেঁছিলাম যেখানে ভাগ্যক্রমে রডোডেনড্রনের চারাটা না থাকলে নিচের পাথরে পড়ে আমার হয়তো প্রাণটাই যেত।

গ্রামের সমস্ত মানুষ, তার সঙ্গে আমার লোকজনেরাও তখন দুই পাহাড়ের মাঝে সেই ঘোড়ার পিটের মত উঁচু জায়গাটায় এসে জড় হয়েছে। তাদের দিকে টুপি তুলে নাড়তে না নাড়তেই, প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে ছেলে বুড়ো সব দলে দলে নেমে আসতে লাগল; আমার ছ'জন গাড়োয়ালীই পেঁাছল সব থেকে আগে। অভিনন্দনের হিড়িক কমতে কুমায়ুনের সব থেকে বেশি গর্বিত ছয়জন গাড়োয়ালী একটা বাঁশের সঙ্গে তল্লাদেশের মানুষখেকোকে বেঁধে বিজয় গর্বে বয়ে নিয়ে চলল তল্লাকোট গ্রাম অভিমুখে। গাঁয়ে মেয়েদের ও শিশুদের দেখাবার জন্যে একটা খড়ের গদীর ওপর বাঘিনীটিকে শুইয়ে রাখা হল।

আমিও ফিরে গেলাম ক্যাম্পে বহু সপ্তাহ পর আজ পেটভরে কিছু খাওয়ার জন্যে। ঘণ্টাখানেক পরে একদঙ্গল মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমি বাঘিনীটার ছাল ছাড়ালাম।

আমার প্রথম বুলেটটা, অর্থাৎ ·২৭৫ নিকেলের খোলে ভরা নরম ডগার বুলেটটা যেটা গত ৭ই এপ্রিল ছুঁড়েছিলাম, সেটা দেখি বাঘিনীটার ডান কাঁধের জোড়ের মধ্যে শক্তভাবে আটকে আছে। যখন সে লাফ দিয়ে পড়ে ওপারের পাহাড় দিয়ে চলে যায় তখন দ্বিতীয় আর তৃতীয় যে দুইটি গুলি আমি ছুঁড়েছিলাম তার একটিও তার গায়ে লাগে নি। চতুর্থ গুলিটা, যেটা ১২ই এপ্রিল ছোঁড়া হয়েছিল সেটা ওর শরীর ভেদ করে চলে গেছে কিন্তু কোথাও হাড়ে আটকায় নি। শেষ পর্যন্ত ও মারা গেছে আমার পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুলিতে। ওর ডান পা ও কাঁধ থেকে আমি প্রায় বিশটা শজারুর কাঁটা বার করলাম। কাঁটাগুলো দুই থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা। এই কাঁটাগুলো ওর মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকেছিল আর নিঃসন্দেহে বলা যায় এগুলিই ওর মানুষখেকো হওয়ার কারণ।

পরের দিন আমি চামড়াটা মোটামুটি শুকিয়ে নিলাম আর তিনদিন পরে আমি আমার 'দুঃসময়' পেছনে ফেলে বাড়ি ফিরে এলাম। বেনেস, দুঙ্গার সিং আর তার ভাইকে ডেকে পাঠালেন এবং আলমোড়ায় একটি অনুষ্ঠানে আমাকে সাহায্য করার জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানানো হল। আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাদের দেওয়া হল কিছু উপহার। নৈনিতালে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে স্যার ম্যালকম হেইলি আমাকে পাঠালেন কর্নেল ডিক নামে এক কর্ণ বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি লাহোরে, তাঁর হাসপাতালে তিন মাস ধরে আমার চিকিৎসা করলেন। তাঁরই চিকিৎসায় আমার শোনার ক্ষমতা আস্তে আস্তে ফিরে এল। এখন আমায় আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড়ষ্টভাবে মিশতে হয় না—সঙ্গীত এবং পাখির গান উপভোগ করার আনন্দ আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

উপসংহার

অরণ্যগাথা ("জাঙ্গল লোর") লেখার আগে যে গল্প আপনাদের শোনাতে চাই নি সেই তল্লাদেশের মানুষখেকো বাঘের কাহিনী বলা শেষ হল। আমি জানি বহু লোকের কাছেই বিশেষ করে যাঁদের বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের কাছে আমার গল্পটি অবিশ্বাস্য মনে হবে। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে বাঘ শিকার করা, বিশেষ করে মানুষখেকো মারা খুব জনপ্রিয় স্পোর্ট নয়—একথা আমার থেকে ভাল আর কেউ জানে না। আমি এও জানি যে পায়ে হেঁটে আহত বাঘকে অনুসরণ করা এমন একটা কাজ যা কেউ করতে চায় না আর

সকলেই ভয় করে। কিন্তু এসব জানা সত্ত্বেও আমি পায়ে হেঁটে এক মানুষখেকো মারার গল্পই শোনালাম—যার পেছনে শুধু দিনে নয় রাত্রিতেও আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—শোনালাম এক আহত বাঘকে অনুসরণ করার কাহিনী। সেইজন্যে, এ গল্প যদি কারুর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দিন পনেরর ছুটি কাটানোর পক্ষে সারা কুমায়ুনে, আলমোড়া জেলার পূর্ব প্রান্তের মত এত মনোরম জায়গা খুব কমই আছে। অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে হিমালয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো এখন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যে কোনো খেলোয়াড়, তরুণ সৈনিক দল বা ছাত্ররা আমার নিম্নলিখিত নির্দেশ মত ঘুরে এসে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন।

টনকপুর থেকে যাত্রা শুরু করুন। কিন্তু তার আগে পেশকারকে বলুন আপনার সঙ্গে একজন তহশিল পিওন দিতে। সে আপনাদের সেই জায়গাটি দেখিয়ে দেবে যেখানে একটি হাতির সঙ্গে দুটি বাঘের এক স্মরণীয় লড়াই হয়েছিল। টনকপুর থেকে বরমদেও হয়ে পূর্ণগিরিতে যান। এখানে মন্দিরে দর্শন সেরে সারদা নদীর ওপরে যে আলো দেখা যায় যে সম্বন্ধে এবং এই রকম আরো বহু ঘটনা সম্বন্ধে যেমন পিণ্ডারী হিমবাহের পাদদেশে এক বৃদ্ধকে দেখা যায় আলোর কাছে বসে মালা জপছে—এই সব বিষয়ে প্রধান পুরোহিত ও মন্দিরের পূজারীর কাছ থেকে জেনে নিন। পূর্ণগিরি থেকে পুরোহিতরা যে পথে যাতায়াত করেন সেই পথটি আপনাদের নিয়ে যাবে থাক গাঁয়ে। গ্রামটি খুব সুন্দর জায়গায়। এখানে বিশ্রাম করতে করতে এবং চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গাঁয়ের মোড়লকে বা যারা আপনাদের ঘিরে বসে থাকবে তাদের যে কোনো একজনকে থাক এবং চুকার মানুষখেকো বাঘ মারার গল্প বলতে বলুন। মোড়লের আত্মীয়, সুদর্শন পাহাড়ী ব্রাহ্মণ তেওয়ারী আপনাদের দেখাবে কোথায় তার ভাই মারা পড়েছে যার মৃতদেহ সে আমায় দেখিয়েছিল। চুকা যাওয়ার পথে সে সেই পাথরটা আপনাদের দেখাবে যেখানে থাকের মানুষখেকোটা আমি মেরেছিলাম। যদি আপনার সময় থাকে তাহলে যেখান থেকে আমি চুকার মানুষখেকোকে গুলি করেছিলাম সেই বট গোষ্ঠীর ফিকাস গাছটাও সে আপনাদের দেখাতে পারে। চুকায় কুনওয়ার সিং-এর খোঁজ করবেন—তার কাছেও শুনবেন দুটো বাঘ মারার গল্প।

চুকা থেকে তল্লাকোট অনেকখানি রাস্তা তাই ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই বেরনো ভাল। লাঢিয়া যেখানে সারদা নদীতে মিশেছে সেই জায়গাটা পেরোলে পৌঁছবেন সেম্-এ। সেম্ গ্রামের সর্দারকে যখন আমি জানতাম তখন সে নেহাতই ছোট। সে আপনাকে দেখাবে বাড়ির কাছে কোন জায়গাটায় ঘাস কাটার সময় মানুষখেকো তার মাকে মেরেছিল। সেম্ গ্রামটি পেছনে ফেলে

একটা কঠিন চড়াই পেরিয়ে আপনি ছোট্ট একটা গাঁয়ে এসে পেঁছিবেন যেখানে একটা আমগাছ তলায় আমি একটা রাত কাটিয়েছিলাম। পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে জঙ্গল বরাবর এগিয়ে গেলে আপনি ছোট্ট একটা ঝরনা পাবেন। ঝরনাটা পার হয়েই এক টুকরো খোলা জায়গা—এইখানেই আমার ৪০ পাউণ্ড তাঁবুটা ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ আপনি তল্লাকোটে পেঁছে গেলেন।

তল্লাকোটের মালওজার (জোতদার) দুঙ্গার সিংয়ের বয়স এখন প্রায় বছর চল্লিশেক হবে। তাঁকে আমার সেলাম জানাবেন আর তাঁকে বলবেন আপনাকে সেই ঘোড়ার পিঠের জিনের মত উঁচু জায়গাটাতে নিয়ে যেতে যার দুই দিকে দুই উপত্যকার বিস্তার। প্রথমে তাকাবেন পূর্বদিকের উপত্যকাটার দিকে—দুঙ্গার সিংকে সেই ঝোপটি দেখিয়ে দিতে বলবেন যেখানে তার মা মারা পড়েছিল, সেই ওক গাছটা যার নিচে বাঘ তার মড়ি খেয়েছিল, সেই বাঁজা-ফসলী জমিটা, যেখানে মারা হয়েছিল বাঘিনীর বাচ্চা দুটোকে আর সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়টা যার ওপর দিয়ে আহত বাঘিনীটা চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এসে কয়েক পা হেঁটে পশ্চিম দিকের উপত্যকাটার মুখোমুখি দাঁড়ান। দুঙ্গার সিং আরো আপনাকে দেখিয়ে দেবে কোথায় ছটা ছাগল মারা পড়েছিল, আমার গুলি যখন বাঘিনীটাকে ভেদ করে যায় তখন কোথায় সে দাঁড়িয়েছিল, সেই পায়ে চলার পথটা যার ওপর দিয়ে দৌড়েছিল আর আমি তার পিছু নিয়েছিলাম।

তল্লাদেশের মানুষখেকো শিকারের সময়, মূল শিকারের সঙ্গে যোগ নেই এমন দর্শকের ভিড় যা হয়েছিল তা অন্য কোনো বাঘ মারার সময়ে কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাদের কেউ কেউ হয়তো মারা গেছে কিন্তু অনেকেই আজো আছে যারা আমার তল্লাদেশে যাওয়ার কথা, সেই ঘটনাবহুল এক সপ্তাহের কথা কোনোদিন ভুলবে না।

কুমায়ুনের নরখাদক

উৎসর্গিত

য়ুনাইটেড নেশনের সকল সাহসী সৈন্য,
নাবিক ও বিমান-সেনানীকে, যাঁরা ১৯৩৯-১৯৪৫-এ
তাঁদের দেশের সেবাকল্পে
দৃষ্টিশক্তি হারান

ভূমিকা

সংযুক্তপ্রদেশের. জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘের বিষয়ে মেজর করবেটের অভিজ্ঞতার সত্য বিবরণী এই গল্পগুলি, অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চারের সুবিবৃত কাহিনী যাঁরা উপভোগ করেন, তাঁদের কাছে এগুলি পেশ করতে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি।

মেজর করবেটের বইয়ে উপভোগ ও জ্ঞানলাভ করার অনেক কিছু পাবেন শিকারীরা। প্রথম বাঘটির মহড়া নেবার আগে প্রতি আনকোরা শিকারী যদি এটি পড়ে নেন, তাহলে এই জানোয়ারগুলি শিকারের সময়ে আরো কম মানুষ মারা পড়বেন ও গুরুতর জখম হবেন। কেননা বিপজ্জনক শিকারের সফল-পশ্চাদ্ধাবনে সাহস ও উত্তম লক্ষ্যভেদনৈপুণ্যের ওপর আরো কিছু দরকার। সাফল্যের জন্য আগিয়ে-ভাবার ক্ষমতা, প্রস্তুতি ও লেগে থাকার গোঁ হল অপরিহার্য।

তাদের মধ্যে এক নিষ্ঠুর ও ভয়াল সত্তার উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট ভয়ানক আতঙ্কের হাত থেকে যিনি মুক্তি দিয়েছেন সেই মানুষ হিসেবে গ্রন্থকারের নামটি সংযুক্ত প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলের গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত। মানুষখেকো বাঘ অথবা চিতার উপস্থিতির ফলে গ্রামজীবনে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তার সম্মুখীন হয়ে বহু জেলা অফিসার সাহায্য চেয়ে জিম করবেটের কাছে এসেছেন—আমার বিশ্বাস কখনও তা বৃথা হয় নি। সত্যি বলতে কি. ভুক্তভোগী মানুষ এবং সরকার, দুয়ের পক্ষেই এই অস্বাভাবিক এবং বিপজ্জনক জানোয়াবগুলির বিনাশ এক মহামূল্যবান কাজ।

পাঠক এই গল্পগুলিতে গ্রন্থকারের প্রকৃতিপ্রেমের বহু প্রমাণ পাবেন। আমার ভারতবাস কালে যে-সব ছুটি নিতে পেরেছি, তার কিয়দংশ মেজর করবেটের সাহচর্যে কাটাবার ফলে তাঁর বিষয়ে জোর গলায় বলতে পারি যে. যাঁদের সঙ্গে যে-কোনো মহাদেশেই শিকার করেছি কোনো মানুষই অরণ্যের ভাষা ওঁর চেয়ে ভাল বোঝেন না। বন্যপ্রাণী লক্ষ্য করে কি সুতীব্র আনন্দ তিনি পেয়েছেন তা বহুবার বলেছেন আমায়। ওঁর চোখ ওঁকে যা এনে দিয়েছে. প্রধানত তার স্মৃতিই ওঁকে এখন ওঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণটি যুদ্ধে অন্ধ সৈন্যদের সহায়তায় উৎসর্গ করতে প্রেরণা দিয়েছে, এবং এর বিক্রি থেকে সকল লভ্যাংশ সেণ্ট ডানস্টান্সের ভাণ্ডারে দানের ব্যবস্থা করতে অনুপ্রাণিত করেছে, এ আমি নিঃসন্দেহে বলছি। যে-সকল মানুষ স্বদেশ এবং মানবমুক্তির

মহান আদর্শের-জন্যে নিজেদের দৃষ্টিশক্তি দান করেছে, তারা শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও এই সংস্থাটিতে কার্যক্ষম সুখী জীবন কাটাতে শিখতে পারে এবং এর করুণাকর কার্যকলাপ এখন ভারতের সেনাবাহিনীর কাছেও এসে পৌঁছিয়েছে।

—লিনলিথগো

ভাইসরয় হাউস
নিউ দিল্লী

গ্রন্থকারের নিবেদন

যেহেতু এ-বইয়ের বহু গল্পই হল মানুষখেকো বাঘ বিষয়ে, এই প্রাণীগুলির কেন মানুষখাবার প্রবণতা দেখা দেয় তা ব্যাখ্যা করা হয়তো উচিত হবে।

মানুষখেকো বাঘ হল সেই বাঘ, যে তার নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত পারিপার্শ্বিকতার চাপে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত এক খাদ্যসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। দশভাগের ন'ভাগ পারিপার্শ্বিকতার চাপ হল জখম, দশম ভাগটি হল বৃদ্ধ বয়স। যে-জখম একটি বিশেষ বাঘকে মানুষ খাওয়া শুরু করতে বাধ্য করেছে, তা এক হেলাফেলায় ছোঁড়া গুলি এবং জখম জানোয়ারটিকে অনুসরণ করে মারায় ব্যর্থতার পরিণাম হতে পারে; অথবা এক শজারুকে হত্যার সময় বাঘের চটে যাওয়ার পরিণামও হতে পারে। মানুষ বাঘের স্বাভাবিক আহার নয়, জখম অথবা বৃদ্ধ বয়সের কারণে বাঘ যখন অলস হয়ে পড়ে, একমাত্র তখনই বাঁচার তাগিদে তারা মানুষের মাংসের আহারসূচি শুরু করতে বাধ্য হয়।

হয় তাক করে অনুসরণ করে নয় ওঁৎ পেতে থেকে বাঘ যখন তার স্বাভাবিক শিকারকে মারে, আক্রমণের জন্যে তার ভরসা হল তার গতিবেগ, আর তারপরেই, তার দাঁত ও নখের অবস্থা। তাই যখন কোনো বাঘ এক বা অধিক বেদনাদায়ক ক্ষতে কষ্ট পায়, অথবা যখন তার দাঁত পড়ে গেছে অথবা খুঁতো হয়েছে এবং নখগুলো ক্ষয়ে গেছে আর যে জানোয়ার খেতে সে অভ্যস্ত, তা সে ধরতে পারছে না, প্রয়োজনের তাগিদে সে মানুষ মারতে বাধ্য হয়। আমার বিশ্বাস, জানোয়ারের মাংস থেকে মানুষের মাংস বদলে যাবার ব্যাপারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটে। 'আকস্মিক' বলতে আমি যা বোঝাচ্ছি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো বাঘিনীর ব্যাপারটি বলছি। তুলনামূলকভাবে তরুণ জানোয়ার এই বাঘিনীটি এক শজারুর সঙ্গে সংঘর্ষে একটি চোখ হারায়

আর এক থেকে ন'ইঞ্চি লম্বা প্রায় পঞ্চাশটি শজারুর কাঁটা তার বাহু এবং ডানদিকের সামনের পা-র তলার নরম অংশে গেঁথে বসে যায়। কাঁটাগুলির অনেকগুলিই হাড়ে বাধা পেয়ে ইংরেজি 'U' হরফের ছাঁদে বেঁকে যায় আর তার সুচলো ও ভাঙা দুটি মুখই কাছাকাছি চলে আসে। বাঘিনী যখন দাঁত দিয়ে কাঁটা টেনে বের করতে চেষ্টা করে তখন সেখানে পুঁজ-পচা ঘা দাঁড়ায় আর যখন উপবাসী বাঘিনীটি একটা ঘন ঘাস ঝোপের ভেতরে শুয়ে ঘা চাটছিল, একটি মেয়ে ঠিক সেই জায়গাটি তার ঘরপালা পশুর ঘাস কাটার জন্যেই বাছাই করে। প্রথমে বাঘিনী কোনো তোয়াক্কা করে নি, কিন্তু সে যেখানে শুয়ে আছে, একেবারে সেই পর্যন্ত যখন পৌঁছে যায় মেয়েটি, ঘাস কাটতে কাটতে, সে একবার আঘাত হানে, সে আঘাতে মেয়েটির খুলি চুরমার হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে, কেননা পরদিন যখন মেয়েটিকে পাওয়া যায় সে একহাতে আঁকড়ে ছিল কাস্তে আর অন্য হাতে এক গোছা ঘাস ধরেছিল, তা যখন কাটতে থাকে তখনই সে চোট খায়। মেয়েটি যেখানে পড়ে যায়, সেখানেই, তাকে ফেলে রেখে বাঘিনী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক মাইলেরও বেশি চলে যায় আর একটি পাতিত গাছের নিচে এক নাবালে আশ্রয় নেয়। দুদিন বাদে একটি লোক এই পাতিত গাছ থেকে কুপিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আসে, বাঘিনী শুয়েছিল গাছের দূরস্থ পার্শ্বে, সে তাকে মারে। লোকটি গাছের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে যায়, যেহেতু সে কোট আর শার্ট খুলে ফেলেছিল আর বাঘিনী ওকে মারার সময় ওর পিঠ নখ দিয়ে ছিঁড়েছিল, লোকটি যখন গাছের গুঁড়ির ওপর পড়ে ঝুলছিল, ওর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের গন্ধ থেকে সম্ভবত বাঘিনীর প্রথম মনে হয় মানুষটা এমন কিছু, যা দিয়ে ও খিদে মেটাতে পারে। সে যাই হ'ক না কেন, ওকে ফেলে চলে যাবার আগে বাঘিনী ওর পিঠ থেকে সামান্য খানিকটা খায়। একদিন বাদে কোনো প্ররোচনা ব্যতিরেকেই সে ঠাণ্ডা মাথায় তার তৃতীয় শিকারকে হত্যা করে। এর পর থেকে সে মানুষখেকো হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আর শেষ হিসেব চুকিয়ে দেবার আগে চব্বিশটি মানষকে হত্যা করে।

তাজা মড়ির কাছে যে বাঘ, অথবা এক জখম বাঘ, অথবা ছোট বাচ্চাসহ বাঘিনী—যে মানুষরা তাদের বিরক্ত করে, তাদের মধ্যে মারবে ; কিন্তু কল্পনা প্রচুর বিস্তার করলেও এদের কোনোমতেই মানুষখেকো বলা চলে না, যদিও তাই হামেশা বলা হয়ে থাকে। কোনো বাঘকে 'মানুষখেকো' শ্রেণীভুক্ত করার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে একবার, আবারও একবার, সংশয়ের অবকাশ রাখব তার প্রসঙ্গে, আর হত্যার ব্যাপারটি সরকারী-নথিতে এক বাঘ বা এক চিতার, যারই হ'ক, হত্যা হিসেবে রেকর্ড হতে দেবার আগে তথাকথিত নিহতকে সামিল করব পোস্টমর্টেমে। হয় বাঘ নয় চিতার, অথবা সমতলে হয় নেকড়ে নয় হায়েনার দ্বারা নিহত বলে কথিত মানুষের পোস্টমর্টেমের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ;

কেননা যদিও দৃষ্টান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম, আমি বহু ঘটনার কথা জানি যখন প্রমাদবশে মাংসাশী প্রাণীকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে।

এক জনপ্রিয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, সমস্ত মানুষখেকোই বুড়ো এবং ঘেয়ো, মানুষের মাংসে লবণের আধিক্যকে ঘায়ের কারণ বলা হয়ে থাকে। মানুষ-অথবা জানোয়ারের মাংসে লবণের তুলনামূলক পরিমাণ বিষয়ে মত প্রকাশের যোগ্যতা আমার নেই তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এবং বলছি যে মানুষ-খেকোদের চামড়ায় মানুষের মাংসের খাদ্যসূচির ফলাফল হানিকর হওয়া দূরে থাকুক, একেবারে বিপরীত ফল দর্শায়। কেননা আমি যত মানুষখেকো দেখেছি, তাদের চামড়া রীতিমত চমৎকার।

মানুষখেকো প্রসঙ্গে আর একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস হল এই প্রাণীগুলির শাবকরা স্বাভাবিকভাবেই নরখাদকে পরিণত হয়। এটি মনে হওয়া অবশ্যই যুক্তিসংগত; কিন্তু এর পেছনে কোনো ঘটনার সত্য নেই. আর শাবকেরা নিজে নিজেই যে মানুষখেকো হয়ে ওঠে না তার কারণ হল মানুষ, বাঘ বা চিতার স্বাভাবিক আহার নয়।

তার মা যা দেয় শাবকেরা তাই খায়, আর এমনকি আমি এও জেনেছি যে বাঘের বাচ্চারা তাদের মাকে মানুষ মারতে সাহায্য করেছে; কিন্তু আমি এমন কোনো ঘটনার কথা জানি না যে কোনো শাবক, তার বাপ-মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে মুক্ত হবার পর অথবা তার বাপ-মা নিহত হবার পর, মানুষ মেরেছে।

কোনো স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণীর দ্বারা মানুষ নিহত হলে, প্রায়ই সংশয় জেগেছে যে, যে-জানোয়ারটি ওই হত্যার জন্যে দায়ী, সেটি বাঘ না চিতা। সাধারণত—যার কোনো ব্যতিক্রম আমি দেখি নি—দিবালোকে সংঘটিত নিধনের জন্যে দায়িত্ব বাঘের আর যে নিধন অন্ধকারে ঘটেছে তা চিতারই কীর্তি। উভয় জানোয়ারই বন্যচারী আধা-নিশাচর, প্রায় একই অভ্যাসে অভ্যস্ত, নিধনের কায়দাকানুন একই, আর উভয়েই তাদের মানুষ-মড়িকে অনেক দূর বহনে সমর্থ। সুতরাং এটাই স্বাভাবিকভাবে ধরা যায় যে তারা শিকারও করবে একই সময়ে; এবং এটা তাদের না করার কারণ হল উভয় জানোয়ারের মধ্যেকার সাহসের তারতম্য। যখন কোনো বাঘ নরখাদকে পরিণত হয়, তখন মানুষকে আর তাদের কোনো ভয় থাকে না, আর যেহেতু তারা যেমন রাত্রে চরে, তার চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে মানুষ যাতায়াত করে দিনে, সেকারণেই দিবালোকে তাদের পক্ষে শিকার সংগ্রহ সম্ভব হয় আর মনুষ্যবসতিতে রাত্রে হানা দেবার কোনো প্রয়োজন তাদের হয় না। অন্যদিকে, অনেক মানুষ মারা সত্ত্বেও চিতার মানুষের ভয় কাটে না; এবং যেহেতু দিবালোকে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াতে এর ঘোরতর অনিচ্ছা, সেকারণেই রাতের পথচারীকে অথবা রাতে তাদের ঘর ভেঙে সে শিকার সংগ্রহ করে। দুটি জানোয়ারের এই প্রকার চরিত্রের জন্যে, যেমন

একজন মানুষের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে দিনে নিধন করে, আর অন্যজন ভীতির কারণে শিকার করে রাতে, মানুষখেকো চিতার চেয়ে মানুষখেকো বাঘ মারা অনেক সহজ।

মানুষখেকো বাঘের শিকারের হার নির্ভর করে, (ক) যে অঞ্চলে সে কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সেখানকার স্বাভাবিক খাদ্যের যোগান, (খ) যে অক্ষমতা তাকে মানুষখেকোতে পরিণত করেছে তার প্রকারভেদ এবং (গ) সেটি মন্দা অথবা শাবকসহ বাঘিনী কি না।

আমাদের মধ্যে যাঁরা কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত গড়ে তোলবার অবকাশ পান নি, তাঁদের অন্যের মতই স্বীকার করে নিতে হয়, এবং বিশেষ করে বাঘের বিষয়ে যেটা স্পষ্টত প্রতীয়মান—এখানে অবশ্য আমি সাধারণভাবেই বাঘকে বোঝাতে চাই, বিশেষ করে মানুষখেকো নয়। যে লেখক প্রথম তাঁর কাহিনীর দুবৃত্ত শত্রুর কু-চরিত্র বর্ণনায় রং চড়িয়ে বাঘকে, 'বাঘের মত নৃশংস' এবং 'বাঘের মত রক্তলোলুপ' শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন, তখন তিনি যে জানোয়ারকে কুখ্যাত করছেন, তার সম্পর্কে শুধু দুঃখজনক অজ্ঞতাই প্রকাশ তিনি করেন নি ; আরো কি—তৈরি করেছেন বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি, তা বিশ্ব-প্রচার লাভ করেছে ; সাধারণের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, যাদের নিজস্ব মত গঠনেব সুযোগ ঘটেছে, তারা ছাড়া বাকি সকল মানুষেরই বাঘ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার জন্যে ওই শব্দসমষ্টিগুলি মুখ্যত দায়ী।

'বাঘের মত নৃশংস' ; 'বাঘের মত রক্তলোলুপ' ; এই উক্তিগুলি যখন ছাপার হরফে দেখি—আমার মনে পড়ে ছোট্ট একটি ছেলের কথা—সে একটা আদ্যিকেলে গাদা-বন্দুকে সশস্ত্র—বন্দুকটির ডান নলের দৈর্ঘ্যের ছ-ইঞ্চি অব্দি ছিল ফাটা, তামার তার জড়িয়ে তার কুঁদো আর নলগুলোর খসে-পড়া আটকানো হয়েছিল। মনে পড়ে ছেলেটি ঘুরছে 'তরাই' ও 'ভাবার'-এর জঙ্গল দিয়ে, সে এমন দিন, যখন আজ যত বাঘ বেঁচে আছে তার একটার জায়গায় তখন ছিল দশটা বেঁচে। রাত এলে সে যেখানে আছে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ছে—সঙ্গ ও তাপ যোগাতে আছে ছোট্ট একটা আগুন। বারবার বাঘের ডাকে জেগে উঠছে সে—কখনো দূরে, হাতের কাছেই অন্য সময়ে। আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছে আরেকটা কাঠ আর পাশ ফিরে তার বাধা-পড়া ঘুম আবার ঘুমিয়ে নিচ্ছে অস্বস্তির তিলেক চিন্তা না করে। নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতা, আর ওর মত যারা জঙ্গলে সময় কাটিয়েছে তারা ওকে যা বলেছে তা থেকেই ও জেনেছে, বাঘকে ক্ষতি না করলে বাঘ তার কোনো অনিষ্ট করবে না। দিনের আলোর প্রহরে ছেলেটি যে বাঘ দেখছে এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে, আর যখন তা সম্ভব হচ্ছে না, নিজের পথে ফের চলবার আগে ও দাঁড়িয়ে পড়ছে নিশ্চল, যতক্ষণ না বাঘ পেরিয়ে চলে যায়। আর আমার মনে পড়ছে তার একবারের কথা—ফাঁকা

জায়গায় চরন্ত আধা ডজন বন-মোরগকে তাক করছিল ছেলেটি, আর একটি কুলঝোপের কাছ অব্দি গুড়ি মেরে গিয়ে ঝুঁকে দেখবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঝোপটি দুলে দুলে উঠেছিল। একটি বাঘ ঝোপটির দূরস্থ-পার্শ্বে বেরিয়ে এসেছিল হেঁটে আর ঝোপ পেরিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, ছেলেটির দিকে চেয়েছিল। ওর মুখের অভিব্যক্তি, কথা কওয়ার মতই স্পষ্ট করে বলেছিল, 'হেলো, বাচ্চা! এখানে কি করছ?' আর কোনো উত্তর না পেয়ে ঘুরে গিয়েছিল আবার, আর একবারটিও পেছনপানে ফিরে না চেয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল অতি মন্দগতিতে। আর তখন, আবার আমার মনে পড়ে দশ-দশ হাজার-হাজার পুরুষ, রমণী ও বালকবালিকার কথা। তারা যখন জঙ্গলে কাজ করছে, বা ঘাস কাটছে, বা শুকনো কাঠ কুড়োচ্ছে, যেখানে বাঘ গুড়ি মেরে আছে তার কাছ দিয়েই চলছে ফিরছে দিনের পর দিন। যখন নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে, তারা জানেও না, এই তথাকথিত 'নৃশংস' ও 'রক্তলোলুপ' প্রাণীটির পর্যবেক্ষণের আওতাতেই ছিল তারা।

যেদিন বাঘটি কুলঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর আধখানা শতাব্দী গড়িয়ে চলে গেছে; তার শেষের বত্রিশটি বছর কেটেছে মোটামুটি নিয়মিত মানুষখেকো শিকারে; আর যদিও এমন সব দৃশ্য দেখা হয়েছে যা কঠিন হৃদয়কেও কাঁদিয়ে ছাড়ত—আমি একটি ঘটনাও দেখি নি, যখন কোনো বাঘ সুপরিকল্পনায় নৃশংস হয়েছে,—কিংবা এমন রক্তলোলুপ হয়েছে, যে নিজের খিদে অথবা শাবকদের খিদে মেটাবার জন্যে যতটা মারা দরকার, তার চেয়েও বেশি মেরেছে বিনা উসকানিতে।

সৃষ্টি-পরিকল্পনায় বাঘের ভূমিকা হল, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা এবং যদি ক্বচিৎ কদাচ রূঢ় প্রয়োজনের তাড়নায় সে একটি মানুষ মারে; কিংবা যখন মানুষ কর্তৃক তার স্বাভাবিক খাদ্য নির্মমভাবে নিঃশেষ করা হয়েছে তখন, যত ঘরপালা পশু মেরেছে বলে বলা হচ্ছে তার দুই শতাংশও সে মেরে থাকে; এই কাজগুলির জন্য একটি গোটা প্রজাতিকেই নৃশংস ও রক্তলোলুপ বলে চিহ্নিত করা ন্যায়সংগত নয়।

এ কথা স্বীকৃত যে শিকারীরা হচ্ছেন রক্ষণশীল; তার কারণ হল, নিজ ধারণা গঠন করতে তাঁদের বহু বছর লেগেছে; আর যেহেতু প্রতি ব্যক্তিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থাকে—গৌণ বিষয়ে, কখনো বা বড় বড় বিষয়েও মতপার্থক্য হবে এ স্বাভাবিকই; সেই কারণেই, আমি যত মত প্রকাশ করেছি তার সবগুলিই ঢালাও স্বীকৃতি পাবে বলে আমি নিজের পিঠ চাপড়াব না।

তবে, আমি স্ব-বিশ্বাসে স্থির যে একটি বিষয়ে সব শিকারীই আমার সঙ্গে একমত হবেন, তা তাঁদের দেখার ব্যাপারটি গাছের ওপরের মাচান, হাতির পিঠ অথবা পায়ে হাঁটা, যেখান থেকেই ঘটে থাকুক না কেন—তা হল, বাঘ এক

দরাজ-কলিজা ভদ্রলোক, সীমাহীন সাহস তার—আর যেদিন তাকে বিলুপ্ত করা হবে, স্ব-প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠতমটিকে হারাবার ফলে ভারত দরিদ্রতরই হবে—আর বাঘের সমর্থনে জনমত সংগঠিত না হলে লোপ সে পাবেই পাবে।

বাঘের অসদৃশে চিতারা খানিকদূর অব্দি উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত-ভোজী; আর যখন অবাধ বন্যপ্রাণী জবাইয়ের কারণে তারা তাদের স্বাভাবিক আহার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন মানুষের মাংসের প্রতি প্রবণতাপ্রাপ্ত হয়ে ওরা মানুষখেকো হয়।

আমাদের পাহাড়ের বাসিন্দারা প্রধানত হিন্দু, সেজন্য তাঁরা তাঁদের মৃতদের অগ্নিসংকার করেন। শবদাহ সব সময়েই অনুষ্ঠিত হয় কোন ঝরনা বা নদীর পাড়ে, যাতে করে ছাই ভেসে চলে যেতে পারে গঙ্গায়, এবং তারপর সমুদ্রে। যেহেতু অধিকাংশ গ্রামই পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থিত, আর অনেক ক্ষেত্রেই ঝরনা বা নদী উপত্যকার বহু মাইল ভেতরে; তখন এক ছোট্ট সম্প্রদায়ের জন-শক্তির ওপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দরুন রীতিমত চাপ পড়ে—তা বোঝা যায়; কেন না শববাহী দলের ওপরেও, সংকারের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঠ যোগাড় করা ও বওয়ার জন্যে মানুষ যোগাড় করতে হয়। সময় যখন স্বাভাবিক, তখন এ সব আচারানুষ্ঠান খুব ভালভাবেই নির্বাহ করা হয়; কিন্তু মহামারীর আকার ধারণ করে কোনো রোগ যখন পর্বতাঞ্চল প্লাবিত করে চলে যায়, যত তাড়াতাড়ি সংকার করা যাচ্ছে তার চেয়ে আরো তাড়াতাড়ি যখন বাসিন্দারা মরতে থাকে; গ্রামে তখন খুব সংক্ষিপ্ত একটি অনুষ্ঠান করা হয়—মৃতের মুখে একটি জ্বলন্ত কয়লার টুকরো গুঁজে দেওয়া হয়, শবটি পাহাড়ের কিনারে বয়ে নিয়ে গিয়ে নিচের উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হয়।

যে এলাকায় কোনো চিতার স্বাভাবিক আহার দুষ্প্রাপ্য, এই শবগুলি পাওয়ার ফলে সে চিতা খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মাংসের স্বাদে মজে যায়; যখন রোগটি চলে যায় আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, তার খাওয়ার যোগান বন্ধ হয়ে গেল দেখে স্বাভাবিকভাবেই সে মানুষ মারতে শুরু করে।

যারা দুজনে মিলে পাঁচশো পঁচিশটি মানুষ মেরেছিল, কুমায়ুনের সেই দুটি মানুষখেকো চিতার মধ্যে একটি এসেছিল কলেরার এক ভীষণ সংক্রমণের পায়ে পায়ে অন্যটি পেছু পেছু এসেছিল এক রহস্যময় রোগের—১৯১৮তে ভারত ব্যেপে সে রোগ বয়ে চলে যায় এবং তাকে 'যুদ্ধ-জ্বর' বলে আখ্যাত করা হয়েছিল।

চম্পাবতের মানুষখাকী

১

এডি নোলেসের সঙ্গে মালানিতে যখন শিকার করছিলাম, তখনই প্রথম সেই বাঘটার কথা শুনি, যেটি পরে সরকারী স্বীকৃতি পায় 'চম্পাবতের মানুষখেকো' নামে।

এডি এ-প্রদেশে বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, পারঙ্গম স্পোর্টসম্যান হিসেবে আর তাঁর অফুরন্ত শিকার গল্প সংগ্রহের জন্যে। তিনি ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় পরম ভাগ্যবান পুরুষদের অন্যতম, যাঁরা জীবনে শ্রেষ্ঠতম সমস্ত কিছুরই অধিকারী। অব্যর্থ নিশানা আর আঘাত হানার ক্ষমতায় তাঁর রাইফেল ছিল তুলনারহিত, তাঁর এক ভাই ছিলেন ভারতবর্ষে বন্দুক ছোঁড়ায় শ্রেষ্ঠ আর অন্য ভাই ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সেরা টেনিস খেলোয়াড়। সুতরাং এডি যখন আমাকে জানালেন যে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিকারী তাঁর শ্যালক চম্পাবতের মানুষখেকো মারবার জন্যে সরকার কর্তৃক প্রেরিত হচ্ছেন, তখন নিশ্চিতভাবেই অনুমান হয়েছিল যে, জন্তুটার কার্যকলাপের সময়কাল অবশ্যই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বাঘটা কিন্তু যা হ'ক, কোন অজ্ঞাত কারণে মারা যায় নি আর চার বছর পর আমি যখন নৈনিতালে গিয়েছিলাম, তখন সে সরকারের অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরস্কার ঘোষণা, বাঘ শিকারী নিয়োগ এবং আলমোড়ার

ডিপো থেকে গর্খা-দলও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ-সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিহত মানুষের সংখ্যা শঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে।

বাঘিনীটি, কেননা জানোয়ারটি তাই বলেই প্রমাণিত, এসেছিল নেপাল থেকে; সেখানে দুশো মানুষকে মারবার পর একদল সশস্ত্র নেপালী তাকে তাড়িয়ে বের করে দেয় এবং পুরোদস্তুর মানুষখেকোরূপেই সে কুমায়ুনে পেঁছিয় আর যে চার বছর সে কুমায়ুনে কার্যকলাপ চালায়, তাতে ওই সংখ্যাটির সঙ্গে যুক্ত হয় দুশো চৌত্রিশ।

এই যখন অবস্থা, সে সময় নৈনিতাল পেঁছিবার কিছু পরেই বার্থুড আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বার্থুড, যিনি তৎকালে নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এবং যিনি তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর হলদোয়ানির এক অখ্যাত কবরে শায়িত, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যে, যারা তাঁকে জানত তারাই তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে যখন তিনি তাঁর জেলার লোকদের ওপর মানুষখেকোটার উৎপাত ও সে-কারণে তাঁর উদ্বেগের কথা বলেন, তখনই তিনি আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে পরবর্তী মানুষ হত্যার খবর পাওয়া মাত্রই আমি চম্পাবত রওনা হব।

অবশ্য, আমি দুটি শর্ত আরোপ করেছিলাম প্রথমত, সরকারী পুরস্কার বাতিল করতে হবে আর অন্যটি হল, দক্ষ শিকারীদের ও আলমোড়া থেকে আসা সৈনাদের প্রত্যাহার। আমার এহেন শর্ত আরোপের কারণসমূহ কোনো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না কারণ আমি নিশ্চিত যে সব স্পোর্টসম্যানই পুরস্কার লোভী শিকারীদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হতে আমারই মত ঘৃণাবোধ করবেন আর হঠাৎ গুলি খাবার ঝুঁকি এড়াতে আমার মতই উদ্বিগ্ন থাকবেন। উক্ত শর্তগুলি মেনে নেওয়া হয় আর এক সপ্তাহ পরে এক ভোরবেলায় বার্থুড এসে আমাকে জানান যে রাত্রে রানাররা খবর এনেছে দাবিধুরা ও ধুনাঘাটের মধ্যে পালি গ্রামে মানুষখেকোর দ্বারা এক মহিলা নিহত হয়েছেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই যাত্রা করতে হবে, আগের দিন এরকম অনুমান করেই আমি তাঁবুর জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ছ জন লোক নিযুক্ত করেছিলাম এবং প্রাতরাশের পর বেরিয়ে আমরা ধারী পর্যন্ত সতের মাইল হাঁটি। মোরনোলায় পরদিন সকালে প্রাতরাশ সারা হল, রাতটা আমরা কাটালাম দাবিধুরায় আর পরদিন সন্ধেবেলায়, মহিলাটি নিহত হবার পাঁচদিন পর, পালিতে পেঁছিলাম।

গ্রামের মানুষেরা, সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ, মহিলা ও শিশু ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত অবস্থায় ছিল এবং আমি যখন পেঁছিলাম, যদিও সূর্য তখনো আকাশে, দেখলাম, সমস্ত অধিবাসীরা ঘরের মধ্যে বন্ধ দরজার পেছনে; আর

যতক্ষণে আমার লোকেরা উঠোনে আগুন জেলেছে এবং আমি এক পেয়ালা চা নিয়ে বসেছি, ততক্ষণে এখানে-ওখানে সাবধানতায় একটা একটা দরজা খুলেছে আর ভয়ার্ত জীবেরা জড়ো হয়েছে।

শুনলাম, পাঁচ দিন যাবৎ কেউই ঘরের চৌকাঠের ওপারে যায় নি—উঠোনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই এই বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করে। খাবার-দাবারেও টান পড়েছে এবং যদি বাঘটাকে মারা বা বিতাড়িত করা সম্ভব না হয় তবে লোকেদের উপোস করতে হবে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বাঘটা তখনো কাছেই আছে। তিন রাত্রি ধরে বাড়িগুলো থেকে একশো গজ দূরে রাস্তার ওপরে তাকে ডাকতে শোনা গেছে আর সেদিনই গ্রামের নিম্ন প্রান্তে চষা জমির ওপর তাকে দেখা গেছে।

গ্রামের মোড়ল অত্যন্ত আগ্রহে আমার জন্যে একটা ঘর ছেড়ে দিল ; কিন্তু যেহেতু আমাদের আটজনকে ওই ঘরে থাকতে হত, আর তার একটিমাত্র দরজা খুললে ওই অস্বাস্থ্যকর উঠোন, সেকারণেই আমি খোলা জায়গাতেই রাত্রি যাপন করা স্থির করলাম।

রাতের খাবারের নামে কোনোমতে তৈরি করা কিছু খাবার খেয়ে, আমার লোকগুলোকে নিরাপদে ঘরে বন্ধ দেখে, আমি রাস্তার ধারে একটা গাছে পিঠ দিয়ে জায়গা করে নিলাম। গ্রামবাসীরা বলেছিল যে বাঘটার এই রাস্তা ধরে যাতায়াত করার অভ্যাস আছে এবং যেহেতু আকাশে ছিল পূর্ণ চাঁদ, ভাবলাম, আমার একটা গুলি করার সুযোগ মিললেও মিলতে পারে—অবশ্য যদি আমি তাকে প্রথমে দেখি।

শিকারের খোঁজে জঙ্গলে আমি অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু মানুষখেকোর খোঁজে রাত কাটানো আমার এই প্রথম। আমার ঠিক সামনেই পুরো রাস্তাটা চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে ঝুঁকে পড়া গাছগুলো ফেলেছে ঘন ছায়া। যখন রাত্রের বাতাসে গাছের ডালপালা আন্দোলিত আর ছায়ারা সঞ্চারমান, তখন এক ডজন বাঘকে আমি আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম, আর ঝোঁকের মাথায় মানুষখেকোর করুণার ওপর নিজেকে ছেড়ে দেবার জন্যে তিক্ত অনুশোচনা অনুভব করলাম। গ্রামে ফিরে যাওয়া আর নিজে থেকে নিজের ওপর যে দায়িত্ব নিয়েছি, তা বহনে আমার যে খুব ভয় আছে, তা প্রকাশে আমার সাহসের অভাব ছিল এবং যেমন ভয়ে, তেমনি ঠাণ্ডায় দাঁত কপাটি অবস্থায় সুদীর্ঘ রাতটা বসে কাটালাম। আমি যে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীর মুখোমুখি ছিলাম, সেটা যখন ধূসর উষার রঙে আলোকিত হল, আমার উঁচু টান করা হাঁটু দুটোর উপর তখন মাথাটা রেখে চোখ বুঝলাম আর একঘণ্টা পরে আমার লোকেরা যখন আমাকে খুঁজে পায় তখন আমি ঘুমে অচেতন ; আর বাঘের, আমি না সাড়া পেয়েছি, না দেখেছি কিছু।

গ্রামে ফিরে গিয়ে যেখানে গ্রামের মানুষ মাঝে মাঝে নিহত হয়েছে, সেই জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে, লোক পাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু এ কাজ করতে তারা অনিচ্ছুক ; রাতটাতে আমি বেঁচে গেছি দেখে, তারা খুবই অবাক হয়েছে, দেখলাম। যেদিকে লোক মারা পড়েছে, উঠোন থেকেই, তারা সেদিকটা আমাকে দেখিয়ে দিল। শেষ হত্যা,—যেটি আমাকে ঘটনাস্থলে এনেছে—গ্রামের পশ্চিমে পাহাড়ের উঁচনো ঢালের মোড় ঘুরে ঘটেছে। হতভাগ্য মেয়েটি যখন নিহত হয়, তখন সংখ্যায় প্রায় বিশজন রমণী ও বালিকা, যারা গৃহপালিত পশুর জন্যে ওক পাতা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল, তারা আমাকে ঘটনাটির বিশদ বিবরণী দিতে ব্যগ্র হল। জানা গেল, মধ্যাহ্নের দু ঘণ্টা আগে দলটি বেরিয়ে পড়ে এবং আধ মাইল যাবার পর পাতা কাটার জন্যে গাছে চড়ে। নিহত রমণী এবং আরো দুজন মেয়ে গিরিখাতের কিনারে অবস্থিত একটি গাছ বেছে নেয়, পরে দেখেছিলাম, খাতটি আন্দাজ চার ফুট গভীর এবং দশ থেকে বার ফুট চওড়া। যত পাতা তার দরকার ছিল, কেটে নিয়ে মেয়েটি গাছ থেকে নেমে আসছিল, তখন বাঘটি কাছে আসে অলক্ষে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায় এবং মেয়েটির পা কামড়ে ধরে। যে ডাল ধরে সে নিচে নামছিল তা থেকে মেয়েটির মুঠি খুলে আসে, তাকে গিরিখাতের ভেতরে টেনে নিয়ে বাঘ তার পা ছেড়ে দেয় এবং যখন সে উঠে পড়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করেছে, বাঘ তার গলা কামড়ে ধরে। মেয়েটিকে মারবার পর গিরিখাতের কিনার দিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে কোনো নিবিড় জমিন-ঝোপে উধাও হয়।

এ-সমস্তই ঘটে গাছের ওপরে থাকা দুটি মহিলা থেকে কয়েক ফুট দূরে আর তা প্রত্যক্ষ করে পুরো দলটা। বাঘ তার শিকার নিয়ে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ভীত-চকিত মহিলা ও মেয়েরা দৌড়ে গ্রামে ফেরে। পুরুষেরা দুপুরে খাবার জন্যে তখন সবে এসেছে আর সকলে একত্র হতে, নাকারা, রান্নার ধাতব বাসনপত্র—কার্যত যা কিছু দিয়ে আওয়াজ সৃষ্টি সম্ভব, নিয়ে সবাই উদ্ধারকারী দল গড়ল। পুরুষরা রইল সামনে, মেয়েরা রইল পেছনে।

যে খাদটায় মহিলাটি মরেছিল, সেখানে পৌঁছে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। এখন কি করা যায়। কিন্তু তিরিশ গজ দূরত্বের ঝোপ থেকে প্রচণ্ড গর্জনে বাঘটা জল্পনা-কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটায়। দলটা একসঙ্গেই ফিরে দাঁড়াল আর এলোপাথাড়ি ছুটল গ্রামের দিকে। তারপর উত্তেজনা প্রশমিত হতেই, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে যে কে আগে ছুটেছে এবং দলকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলার কারণ হয়েছে। স্বর উচ্চ গ্রামে উঠতেই থাকল, যতক্ষণ না বলা হয় যে যদি কেউই ভীত হয়ে না থাকে আর সকলেই যদি নিজেকে সাহসী বলে দাবি করে, তাহলে কেন ফিরে যাওয়া হচ্ছে না এবং আরো সময় নষ্ট

না করে মহিলাকে উদ্ধার করে হচ্ছে না? প্রস্তাবটি গৃহীত হয় আর তিনবার দলটি খাত পর্যন্ত যায়। তৃতীয়বারের বার বন্দুক হাতে সশস্ত্র লোকটি গুলি ছোঁড়ে আর গর্জনরত বাঘটাকে ঝোপ থেকে বার করে আনে; অতঃপর উদ্ধার-চেষ্টা অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গেই পরিত্যক্ত হল। সে কেন 'ঝোপের দিকে গুলি না চালিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করল,' এ কথা বন্দুকধারী লোকটাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলল যে, বাঘটা খেপেই ছিল, আর যদি কোনোক্রমে সে তাকে আঘাত করত, তবে অবশ্যই বাঘটা তাকে মেরে ফেলত।

সেদিন সকালে তিনঘণ্টা ধরে বাঘের সন্ধানে পদচিহ্ন লক্ষ করে গ্রাম পরিক্রমা করলাম আশায় আর আতঙ্কে। অন্ধকার ঘনজঙ্গলাবৃত গিরিখাতেব এক-জায়গায় যখন আমি একটা ঝোপের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই একঝাঁক কালিজ পাখি ডানা ঝাপটিয়ে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল আর আমার মনে হল, আমার হৃদস্পন্দন চিরদিনের মত থেমে গেছে।

আমার খাওয়ার জন্যে আখরোট গাছের নিচে, আমার লোকেরা একটু জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছিল। প্রাতরাশের পর গ্রামের মোড়ল, যখন গম কাটা হবে, তখন আমাকে পাহারায় মোতায়েন থাকতে অনুরোধ করল। সে বলল যে যদি আমার উপস্থিতিতে ফসল কাটা হয় না, তবে আর হয়তো হবেই না, কারণ, লোকেরা ঘর থেকে বেরুতে অত্যন্ত ভয় পাচ্ছে। আধঘণ্টা পরে গ্রামের সমস্ত মানুষ কাজে লেগে গেল, সহায়ক ছিল আমার লোকেরা আর তখন গুলিভরা রাইফেল নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পাহারায়। সন্ধের মধ্যেই পাঁচটি বড় মাঠের শস্য কাটা হয়ে গেল, বাকি রইল গৃহগুলির নিকটবর্তী দুটো ছোট জমি। সে সম্পর্কে মোড়ল বলল যে পরদিন ওগুলোর ব্যবস্থা করতে তার অসুবিধা হবে না।

গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটেছিল আর সম্পূর্ণ আমার একার ব্যবহারের জন্যে অন্য একটি ঘর দেওয়া হয়েছিল। সে-রাত্রে যাতে করে হাওয়া ঢুকতে পারে আর মানুষখেকোটাকে ঠেকানো যায়, সেজন্য দরজার মুখটা কাঁটাঝোপ দিয়ে ভালভাবে ঠেসে, আমি গতরাত্রের না-হওয়া ঘুমটাকে পুরিয়ে নিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার উপস্থিতিতে লোকের মনে নতুনতর আশা সঞ্চারিত হতে শুরু করে ও তারা অনেক বেশি অবাধে চলাফেরা করছিল, কিন্তু যে-জঙ্গলটার ওপর আমি কিছু গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম, সেটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে পুনর্বার অনুরোধ করবার মত তাদের যথেষ্ট বিশ্বাস তখনও আমি অর্জন করতে পারি নি। এই লোকেরা চারপাশের মাইলের পর মাইল জমির প্রত্যেক ফুটকে চেনে আর যদি ইচ্ছে করে, তবে দেখাতে পারে কোথায় আমার বাঘটির দেখা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা, অথবা, অন্তত কোথায় আমি দেখতে পারি তার

থাবার ছাপ। মানুষখেকোটা যে বাঘ, এটা স্বীকৃত তথ্য কিন্তু এটা জানা ছিল না যে জানোয়ারটা তরুণ না বয়স্ক, পুরুষ না মেয়ে আর এই তথ্য, যা আমাকে তার সঙ্গে মোকাবিলায় সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা কেবলমাত্র তার থাবার ছাপ পরীক্ষা করেই আমি নিশ্চিত বলতে পারতাম।

সেদিন খুব সকালে চা-পান সেরে আমি জানালাম যে আমার লোকেদের জন্যে মাংসের দরকার আর গ্রামবাসীদের বললাম যে তারা যদি আমায় দেখিয়ে দেয় যে কোথায় আমি ঘুরাল (পাহাড়ী ছাগল) মারতে পারি। পূব থেকে পশ্চিমে লম্বালম্বি শৈলশিরার চূড়ায় গ্রামটি অবস্থিত আর ঠিক রাস্তাটার নিচেই, যেখানে আমি রাত কাটিয়েছিলাম, পাহাড়টা সোজা উত্তরে নেমে গিয়েছে ঘাসে ঢাকা ঢালুতে। আমাকে বলা হয়েছিল যে এই ঢালুগুলিতে অনেক ঘুরাল মেলে, আর কিছু লোক স্বেচ্ছায় আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে রাজী হল। এই সম্মতিতে আমার আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক ছিলাম। তিনজন লোক বেছে নিয়ে আমি যাত্রা করলাম ; আর মোড়লকে বলে গেলাম যে সে যেমনটি বলেছে, তত ঘুরাল যদি পাই, তাহলে আমার লোকদের জন্যে একটার সঙ্গে, গ্রামের লোকদের জন্যেও দুটো মারব।

রাস্তা পেরিয়ে, ডাইনে-বায়ে সুতীক্ষ্ন নজর রেখে একটা খাড়া শৈলশিরা বেয়ে নিচে নেমে গেলাম কিন্তু কিছুই নজরে এল না। পাহাড়ের আধমাইল নিচে খাতগুলো একজায়গায় এসে মিলেছে, এবং এই সংযোগস্থলের ডানদিকে শিলাময় ঘাসে ঢাকা ঢালুর চমৎকার দৃশ্য। নিঃসঙ্গ একটি পাইন গাছ বেড়ে উঠেছে ওখানে। তাতেই পিঠ রেখে বসে কয়েক মিনিট ধরে ঢালুটাকে তন্ন তন্ন করে দেখছিলাম, তখনই পাহাড়ের অনেক উঁচুতে একটা নড়াচড়ার শব্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুনর্বার ওই নড়াচড়ার শব্দে দেখলাম একটা ঘুরাল কান নাড়ছে ; জানোয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে ঘাসের মধ্যে আর কেবলমাত্র তার মাথাটাই দেখা যাচ্ছে। লোকেরা ওই নড়াচড়া দেখে নি আর এখন যেহেতু মাথাটা স্থির আর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে আছে, সেকারণেই আর তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। জানোয়ারটার অবস্থান সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দিয়ে আমি লোকদের বসিয়ে রাখলাম আমার গুলি চালানো দেখার জন্যে। আমি ছিলাম একটা পুরনো মার্টিনী হেনরী রাইফেলে সশস্ত্র ; এটা এমন একটা অস্ত্র, তার যে-কোনো দূরত্বে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের কাছে এর সাংঘাতিক ধাক্কাও তুচ্ছ মনে হয়। দূরত্বটা ছিল দুশো গজের কাছাকাছি। শুয়ে পড়ে রাইফেলটাকে সুবিধামত পাইনের শিকড়ে রেখে, আমি সতর্ক নিশানায় গুলি ছুঁড়লাম।

কার্তুজ থেকে কালো পাউডার বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল আর লোকেরা বলল, কিছুই ঘটে নি ; আমি সম্ভবত পাথরে অথবা মরা পাতার স্তূপে গুলি চালিয়েছি। যেখানে ছিলাম, ঠিক সেইখানে বসে থেকে

আমি আবার রাইফেলে গুলি ভরলাম আর তখনই দেখলাম যে, যেখানে আমি গুলি ছুঁড়েছিলাম, তার সামান্য নিচেই ঘাস নড়ছে আর তারপরেই ঘুরালের পেছনের অংশটা বেরিয়ে এল। যখন আস্ত জানোয়ারটা ঘাস থেকে বেরিয়ে এল, সে গড়াতে আরম্ভ করল, আর ঢালু পাহাড় বেয়ে নামার ফলে তার গতিবেগ বৃদ্ধি পেল। নিচুর দিকে অর্ধেক পথ নেমেই সে অদৃশ্য হল ঘন ঘাসের জঙ্গলে, সেখানে শুয়ে থাকা দুটো ঘুরালের অশান্তি ঘটিয়ে। হাঁচির মত সতর্কতাসূচক ডাক ছেড়ে দুটো জানোয়ার ঘাসের মধ্যে থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের ওপর দিকে লাফিয়ে উঠতে থাকল। এখন দূরত্ব অনেক কম, নিশানা-ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ করে, দুটোর মধ্যে বড়টার গতিবেগ শ্লথ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তারপর ওটার পিঠের মধ্যে গুলি চালালাম, আর যেইমাত্র অন্যটি ঘুরে দাঁড়াল ও পাহাড়ের ওপর দিয়ে কোনাকুনি ছুটতে থাকল, আমি এটার কাঁধের মধ্যে গুলি করলাম।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করার সৌভাগ্য কখনো কখনো একজনের হয়। অসুবিধাজনক অবস্থায় শুয়ে দুশো গজ দূরে ঘুরালের গলায় একটা সাদা দাগ লক্ষ করে ষাট ডিগ্রি কোণে গুলি চালাবার পর মনে হয় নি যে গুলি লাগবার লাখে একটাও সম্ভাবনা আছে, এবং তা সত্ত্বেও কালো বারুদ চালিত ভারি সীসের বুলেট একচুলও নড়ে যায় নি আর সঠিক নিশানা বিঁধে তৎক্ষণাৎই জানোয়ারটার মৃত্যু ঘটিয়েছে। তার ওপর খাড়াই পাহাড়ের একপাশটা ছোট ছোট খাত ও উঁচিয়ে বেরিয়ে আসা পাথরে ভাঙা ভাঙা মতন, মরা জানোয়ারটা পিছলে গড়িয়ে পড়েছে সেই জায়গাতেই, যেখানে তার দুজন সঙ্গী শুয়েছিল। ও ঘাসে ঢাকা জমিটা ছাড়ার আগেই সঙ্গী দুজন পাহাড় [illegible] পিছলে গড়িয়ে পড়েছিল। যারা কখনো ইতিপূর্বে রাইফেলের কার্যকারিতা দেখে নি, আমাদের সামনে তিনটে মৃত জানোয়ারের খাতে পড়া দেখে, সেই সমস্ত লোকের বিস্ময় ও উল্লাস দেখা এক মহাআনন্দের জিনিস। মানুষখেকো বিষয়ে সমস্ত চিন্তা ক্ষণকালের জন্যে তিরোহিত হল, কারণ তারা হুড়োহুড়ি করে নিচে খাতে নেমেছিল শিকার উদ্ধারে।

একাধিক দিক দিয়েই সেদিনের অভিযান এক বিরাট সার্থকতা ; কারণ, সকলের জন্যে মাংসের রেশন যোগান দেবার সঙ্গেই এটা আমাকে সমস্ত গ্রামের আস্থা এনে দিল। সকলেই জানেন যে, শিকারের গল্প বারবার বললেও একঘেয়ে হয় না, এবং যখন ঘুরালের ছাল ছাড়িয়ে ভাগ করা হচ্ছিল, তখন আমার শিকার-সঙ্গী তিনজন কল্পনার রাশ ছেড়ে দিল। যে-খোলা জায়গায় বসে আমি প্রাতরাশ সারছিলাম, সেখান থেকেই আমি সমবেত জনসমষ্টির উল্লাস শুনতে পাচ্ছিলাম। তখনই তাদের বলা হচ্ছিল যে এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে ঘুরাল মারা হয়েছে, আর যে ম্যাজিক বুলেট ব্যবহৃত হয়েছে, তা কেবলমাত্র

ওইরকম ভাবে—জানোয়ারদেরই মারে নি,—সেইসঙ্গে ওগুলোকে সাহেবের পায়ের কাছে এনে জড়োও করেছে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মোড়ল জানতে চাইল যে কোথায় আমি যেতে চাই আর কতজন লোক আমি আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছুক। চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো উৎসুক মানুষগুলোর মধ্যে থেকে আমি বেছে নিলাম আমারই দুজন প্রাক্তন সঙ্গীকে আর গাইড হিসাবে তাদের সঙ্গে করে শেষ মানুষ শিকারের জায়গাটা দেখতে চললাম।

আমাদের পাহাড়ের অধিবাসীরা হিন্দু ও তাদের শবদেহ দাহ করে। যখন তাদের কেউ মানুষখেকোর হাতে নিহত হয়, তখন আত্মীয়দের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যে তার শরীরের কোনো অংশ, এমন কি কয়েক টুকরো হাড় থাকলেও, তা উদ্ধার করে এনে দাহ করা। এই মহিলার ক্ষেত্রে দাহকার্য তখনও পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নি এবং আমাদের বেরুবার মুখে আত্মীয়েরা অনুরোধ জানান যে শরীরের কোনো অংশ পেলে, আমরা যেন ফিরিয়ে আনি।

খুব ছেলেবেলা থেকে জঙ্গলের চিহ্ন পড়া ও ব্যাখ্যা করা ছিল আমার নেশা। বর্তমানক্ষেত্রে আমি, যারা মহিলাটি নিহত হবার সময়ে উপস্থিত ছিল, সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যপক্ষে জঙ্গলের চিহ্নাদি হল, যা কিছু ঘটেছে তার সত্য বিবরণী। জায়গাটায় পেঁৗছে এক নজরে, মাটিই আমাকে দেখিয়ে দিল যে বাঘটা কেবলমাত্র একটা পথেই গাছের কাছে আসতে পারে আর তা হল খাত ধরে উজিয়ে আসা। গাছের একশো গজ নিচে খাতে নেমে, পরীক্ষা করে, দুটো বড় শিলাখণ্ডের মাঝখানে ওপর থেকে পড়া মিহিন মাটিতে বাঘের থাবার ছাপ পেলাম। এই থাবার ছাপই বুঝিয়ে দিল যে জানোয়ারটা হল এমন একটি বাঘিনী যে যৌবন সামান্য দিন পার করেছে। খাতের সামান্য ওপরে, গাছটা থেকে গজ দশেক দূরে, শিলাখণ্ডের পেছনেই শুয়ে ছিল বাঘটা, সম্ভবত মহিলাটির গাছ থেকে নামার অপেক্ষায়। ওর উদ্দিষ্ট শিকারের যতগুলো পাতার প্রয়োজন ছিল, প্রথমত তা কাটা শেষ করে, প্রায় দু'ইঞ্চি মোটা একটা ডাল ধরে সে যখন নিজের দেহটি নামাচ্ছিল, তখনই বাঘটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে, আর তারপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মহিলাটির পা কামড়ে ধরে তাকে টেনে নিচের খাতে নিয়ে যায়। ডালটা থেকেই বোঝা যায় কী-পরিমাণ মরিয়াভাবে মহিলাটি ওটাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যেখানে ডালটা, শেষ পর্যন্ত, তার পাতাগুলো তার হাত ফসকে বেরিয়ে যায়, সেখানে ওকের রুক্ষ বাকলের গায়ে আটকে আছে তার হাতের তালু ও আঙুল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা ফালা ফালা চামড়া। বাঘিনীটা যেখানে মহিলাটিকে হত্যা করেছে সেখানে রয়েছে ধস্তাধস্তির চিহ্ন আর অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুকনো রক্ত। এখান থেকে, রক্তের ধারা খাত

পার হয়ে বিপরীত দিকের পাড় বেয়ে উঠে গেছে। সে রক্ত এখন শুকনো, তবু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খাত পেরিয়ে রক্তের ধারা অনুসরণ করে আমরা পেয়ে গেলাম ঝোপের মধ্যে সেই জায়গাটা, যেখানে বাঘিনী তার মড়িটাকে খেয়েছে।

এটাই সাধারণের বিশ্বাস যে মানুষখেকোরা নিহত মানুষের মাথা, হাত এবং পা খায় না। এটা অসত্য। মানুষখেকোরা, ব্যাঘাত না ঘটলে, রক্তমাখা কাপড়-চোপড় সমেত সবই খায়, যেমনটি আমি এক সময়ে একটি ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ; যাই হ'ক, সেটি অন্য ঘটনা, এবং অন্য কোনো সময়ে বলা যাবে।

এক্ষেত্রে আমরা পেলাম মহিলাটির কাপড়জামা আর কয়েকটুকরো হাড়। সেগুলো পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে আমরা নিয়ে এলাম ওই উদ্দেশ্যে। অত্যন্ত স্বল্প হলেও যা অবশিষ্ট ছিল, দাহ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তা ওই উঁচু জাতের মহিলার চিতাভস্ম মা-গঙ্গার বুকে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

চা পানের পর আমি অন্য একটা বিয়োগান্ত দৃশ্যের স্থান পরিদর্শন করলাম। সাধারণের চলাচলের রাস্তা দ্বারা মূল গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েক একর ছোট জমিন। এই জমিনের মালিক রাস্তার ঠিক ওপরে পাহাড়ের গায়ে নিজেই একটা কুঁড়েঘর তৈরি করেছিল। তার স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ের মা—ছেলে ও মেয়ের বয়স যথাক্রমে চার ও ছয়। দু-বোনের মধ্যে তার স্ত্রীই ছিল ছোট। এই দু-বোন একদিন কুঁড়ের ওপরে পাহাড়ে ঘাস কাটতে বেরিয়েছিল, তখন অকস্মাৎ বাঘিনী বেরিয়ে এসে বড় বোনকে তুলে নিয়ে যায়। তার দিদিকে ছেড়ে দিয়ে পরিবর্তে তাকে নিয়ে যাক বলে কাস্তে ঘুরিয়ে চিৎকার করতে করতে ছোট বোনটি বাঘিনীর পেছনে প্রায় একশো গজ দূর পর্যন্ত ছুটতে থাকে। মূল গ্রামের লোকেরা এই অবিশ্বাস্য বীরত্বব্যঞ্জক কার্জটি স্বচক্ষে দেখে মৃতা মহিলাকে একশো গজটাক বয়ে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে রেখে যে মেয়েটি তার পিছু নিয়েছিল, বাঘিনী তার দিকে মুখ ফেরায়। ভয়ংকর গর্জন করে সে মহিলাটির দিকে লাফ দেয়, আর মেয়েটি ঘুরে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে গ্রামে ঢোকে। ধরা যায়, তার অজান্তে গ্রামের লোকেরা যা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের তা বলাই ছিল তার ইচ্ছে। সে সময়ে মহিলাটির অসংলগ্ন আওয়াজের কারণ তার দম ফুরিয়ে যাওয়া, ভয় এবং উত্তেজনা। আর যতক্ষণ না উদ্ধারকারী দল, তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে যায়, ও ব্যর্থ হয়ে ফেরে, ততক্ষণ জানাই যায় নি যে মহিলা তার কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে। গ্রামটিতে আমাকে এই গল্পই বলা হয়েছিল আর আমি যখন পথ বেয়ে উঠে দু ঘরের কুঁড়েটায় পৌঁছলাম, তখন মহিলাটি সেখানে কাপড় কাচছিল। বিগত বারমাস ধরে সে তখন বোবা।

তার চোখের উদ্বেগজনক চাহনি ছাড়া, বোবা মহিলাকে স্বাভাবিকই মনে হল এবং যখন আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়ালাম আর তাকে বললাম যে, যে-বাঘটা তার বোনকে হত্যা করেছে তাকে মারতে চেষ্টা করতেই আমি এসেছি,

তখনই সে দ্‌হাত জোড় করল আর নিচু হয়ে আমার পা ছ্‌ঁল, ফলে নিজেকে মনে হল এক হতভাগ্য প্রতারক। সত্য যে, আমি এসেছিলাম মান্‌ষখেকোটাকে মারবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই কিন্তু যে-জানোয়ারটার খ্যাতি আছে যে সে একই জনবসতিতে দ্‌বার হত্যা করে না, মড়ির কাছে আরেকবার ফেরে না এবং যার বিচরণক্ষেত্রের বিস্তৃতি বহ্‌শত বর্গমাইল, সেক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্যসাধনের সম্ভাবনা প্রায় সেই, দ্‌টো খড়ের গাদা থেকে স্‌চ খ্‌ঁজে বার করা।

প্রচুর পরিকল্পনা করলাম নৈনিতালে ফিরতি পথে; এর একটা পথে ইতিমধ্যেই চেষ্টা করেছি, ব্‌নো ঘোড়াও আরেকবার আমাকে ও-পথে ঠেলতে পারবে না, আর এখন যখন আমি ঘটনাস্থলে অন্যগ্‌লিও সমানই অচিত্তাকর্ষক। তার ওপরে সেখানে এখন কেউই ছিল না, যার কাছে আমি পরামর্শ চাইতে পারি, কারণ জানিতকালে কুমায়্‌নে এটাই প্রথম মান্‌ষখেকো; এবং তৎসত্ত্বেও কিছ্‌ একটা করা দরকার। সেজন্যেই পরের তিনদিন, গ্রামের লোকেরা যে-সমস্ত জায়গায় বাঘিনীর দেখা পাবার সম্ভাবনার কথা বলেছে, জঙ্গলের মধ্যে মাইলের পর মাইল ধরে স্‌র্যোদয় থেকে স্‌র্যাস্ত পর্যন্ত সে-সমস্ত জায়গা ঘ্‌রলাম।

এখানে কয়েক মিনিটের জন্যে গল্পটা থামিয়ে, এই পাহাড়ী অঞ্চল জ্‌ড়ে আমার সম্পর্কে যে গ্‌জব চলেছে, তার প্রতিবাদ জানাতে চাই, আর তা হল, এই ঘটনাকালে এবং পরবর্তীকালে কয়েকবার, পাহাড়ী মহিলার পোশাক পরে জঙ্গলে গিয়ে মান্‌ষখেকোকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে, তারপর কাস্তে অথবা কুড়োল দিয়ে তাদের মেরেছি। পোশাক বদলের ব্যাপারে এ-পর্যন্ত আমি যা করেছি তা হল, শাড়ি ধার করে গায়ে জড়িয়ে ঘাস কেটেছি অথবা গাছে উঠে পাতা কেটেছি আর কোনোবারই এই ছলনা কাজের বেলা সফল হয় নি। যদিও আমার জ্ঞানত, দ্‌বার, আমি যে-গাছে ছিলাম, মান্‌ষখেকোরা তা তাক করেছে, একবার একটা পাথরের পেছনে ল্‌কিয়ে আর অন্যবার একটা উপাড়িত গাছের পেছনে থেকে। তাদের গ্‌লি করবার কোনো স্‌যোগই তারা আমাকে দেয় নি।

ফেরা যাক ম্‌ল কাহিনীতে। বাঘিনীটা এই অঞ্চল পরিত্যাগ করেছে মনে হওয়ায়, পালির লোকেদের খেদ সত্ত্বেও, স্থির করলাম, পালির ঠিক প্‌বে পনের মাইল দ্‌রে চম্পাবতে চলে যাব। খ্‌ব সকালে যাত্রা করে, ধ্‌নাঘাটে প্রাতরাশ সেরে, স্‌র্যাস্তের মধ্যে চম্পাবতে পেঁাছে যাত্রা শেষ করলাম। এই এলাকার রাস্তাঘাট খ্‌বই বিপজ্জনক মনে করা হয় আর লোকেরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা বাজারে যায় দল বেঁধে। ধ্‌নাঘাট ত্যাগের পর, আমার আটজন লোকের দলের সঙ্গে রাস্তার কাছাকাছি গ্রাম থেকে লোকেরা এসে জ্‌টল আর আমরা চম্পাবতে পেঁাছেছিলাম তিরিশ জন মিলে। আমার সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন কুড়িজনের একটা দলের সঙ্গে দ্‌মাস আগে চম্পাবতে গিয়েছিল এবং তারা আমাকে এই কর্‌ণ কাহিনীটি বলল।

'চম্পাবতের এধারে কয়েক মাইল ধরে রাস্তাটা পাহাড়ের দক্ষিণ মুখ বেয়ে উপত্যকার প্রায় পঞ্চাশ গজ ওপর দিয়ে সমান্তরালভাবে চলে গেছে। দুমাস আগে আমরা কুড়িজন পুরুষের একটা দল চম্পাবতের বাজারে যাচ্ছিলাম। এই রাস্তা ধরে যাবার সময় দুপুর নাগাদ, নিচের উপত্যকা থেকে ভেসে আসা একজন মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে ভয়ে থমকে গেলাম। চিৎকার যত কাছে আসতে থাকল, রাস্তার ধারে সকলে একসঙ্গে জড়সড় হয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকলাম, আর তখনই ক্রমে চোখে পড়ল, বাঘ একটি বিবস্ত্রা মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছে। বাঘের এক দিকে, মহিলাটির চুল মাটিতে ঘষটাচ্ছে আর অন্যদিকে মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছে তার পা দুটো,—বাঘটা কামড়ে আছে তার কোমরের পেছনটা—আর সে বুক চাপড়ে, তাকে সাহায্য করবার জন্যে একবার ডাকছে ভগবানকে, একবার মানুষকে। পঞ্চাশ গজ দূরে, একেবারে আমাদের চোখের সামনে বাঘ তার বোঝা নিয়ে চলে গেল আর দূরান্তে কান্নার শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।'

'আর তোমরা কুড়ি জন মানুষ কিছুই করলে না?'

'না, সাহেব, কিছুই করি নি, কারণ আমরা ভয় পেয়েছিলাম, আর ভয় পেলে মানুষ কি করতে পারে? তাছাড়া যদি আমরা বাঘটাকে না খেপিয়ে এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে না এনে, মহিলাকে উদ্ধার করতে পারতাম, তাতেও মহিলার কোনোই লাভ হত না, কারণ তার শরীর তখন রক্তে মাখা এবং জখমের কারণেই তার মৃত্যু হত।'

পরে জানতে পারি যে নিহতা চম্পাবতের নিকটস্থ গ্রামেরই বাসিন্দা এবং শুকনো ডাল সংগ্রহ করবার সময়ে বাঘ তাকে নিয়ে যায়। তার সঙ্গীরা ছুটে গ্রামে ফিরে এসে শোরগোল তোলে, আর উদ্ধারকারী দল বেরুবার মুখেই ওই কুড়িজন ভীত মানুষ পৌঁছয়। যেহেতু এই লোকগুলো জানত যে বাঘ তার শিকার নিয়ে কোন দিকে গেছে, সেকারণেই তারা দলে যোগ দেয় এবং এর পরবর্তী ঘটনা এরাই ভাল বলতে পারবে।

'যখন আমরা মহিলাটিকে উদ্ধার করতে বেরোলাম তখন আমাদের দলে পঞ্চাশ বা ষাট জন শক্তসমর্থ লোক, এবং দলের কয়েকজনের হাতে বন্দুক। যেখানে মহিলা কাঠগুলো সংগ্রহ করেছিল, সেগুলো সেখানেই পড়ে আছে এবং যেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়, তা থেকে এক ফার্লং দূরে আমরা পেলাম তার ছেঁড়া কাপড়-জামা। তারপর থেকে লোকেরা ঢাক বাজাতে আর বন্দুক ছুঁড়তে আরম্ভ করে এবং এভাবেই আমরা একমাইলেরও বেশি গিয়ে উপত্যকার মুখে পৌঁছালাম; দেখা পেলাম মহিলার, একটা বড় পাথরের চাতালের ওপর মরে পড়ে আছে, বালিকার চেয়ে সামান্যই বড় মনে হল তাকে। সমস্ত রক্ত চেটে তার শরীর পরিষ্কার করা ছাড়া, বাঘটা তাকে ছোঁয়ওনি, এবং দলে কোনো

মহিলা না থাকায়, দু-একজন তাদের কটিবস্ত্র খুলে ঢেকে দেয়। আমরা পুরুষেরা তা দিয়ে তার শরীর জড়াবার সময়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম, কারণ তাকে দেখাচ্ছিল, যেন চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, ছুঁলে পরেই জেগে উঠবে লজ্জায়।'

শক্ত-বন্ধ দরজার অন্তরালে সুদীর্ঘ রাত পাহারায় জেগে কাটাবার সময়ে এমন অভিজ্ঞতার কথা বারবার বলতে বলতে বছরের পর বছর মানুষখেকোর দেশের বাসিন্দা, মানুষের চরিত্র এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী যে বদলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? আর বাইরের যে কোনো লোকেরই মনে হবে যে, সে সরাসরি একটা নগ্ন বাস্তবতা ও নখ-দাঁতের নীতির জগতে পা দিয়েছে, যে-কারণে একদন্তী বাঘেদের অধিরাজ্যের কালে মানুষ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল অন্ধকার গুহার ভেতর। সেই সুদূর চম্পাবত-দিনগুলিতে আমি ছিলাম তরুণ আর অনভিজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওই উপদ্রুত অঞ্চলে সামান্যকাল থাকাতেই এই বিশ্বাসে পৌঁছেছিলাম যে, মানুষখেকোর ছায়ায় বসবাস ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছুই হতে পারে না ; পরবর্তী বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে।

চম্পাবতের যে তহশীলদারকে উদ্দেশ্য করে আমাকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছিল, তিনি, যে-ডাকবাংলোতে আমি উঠেছিলাম, সেখানে সে-রাত্রে দেখা করতে এলেন, এবং প্রস্তাব করলেন যে পরদিন আমার কয়েক মাইল দূরত্বের একটা বাংলোয় চলে যাওয়া উচিত, তার কাছাকাছি এলাকায় বহু মানুষ মারা পড়েছে।

পরদিন খুব সকালেই তহশীলদারকে সঙ্গে করে বাংলোটির দিকে রওনা হলাম, এবং যখন বারান্দায় বসে প্রাতরাশ সারছিলাম. তখন দুজন লোক খবর নিয়ে এল যে দশ মাইল দূরের একটা গ্রামে, একটা গরুকে বাঘে মেরেছে। চম্পাবতে একটা জরুরী কাজে যাবার অজুহাতে তহশীলদার বিদায় নিল এবং জানাল যে সে সন্ধ্যায় বাংলোয় ফিরে রাতটা আমার সঙ্গে কাটাবে। আমার পথপ্রদর্শকেরা পথ হাঁটায় ওস্তাদ, তাই উৎরাই বেয়ে দশ মাইলের সমস্ত পথ আমরা পেরোলাম সাধ্য-সম্ভব স্বল্প সময়ে। গ্রামে পৌছতে, আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা গোয়ালে ; সেখানে দেখলাম, চিতা একটা এক-সপ্তাহের বাছুরকে মেরে খানিকটা খেয়েছে। চিতা মারার কোনো সময় বা ইচ্ছা না থাকায় পথপ্রদর্শকদের বখশিশ দিয়ে বাংলোর দিকের ফিরতি পথে পা বাড়ালাম। এখানে ফিরে দেখলাম তহশীলদার তখনো ফেরে নি. আর যেহেতু তখনো ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি সময় দিনের আলো বাকি ছিল. আমি বেরিয়ে পড়লাম বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে একটি জায়গা দেখতে। ও বলল, সেখানে একটি বাঘ নিয়মিত জল পান করে। যে ঝরনার উৎস বাগিচাটিতে সেচের জল যোগায়,

আমাদের পাহাড়ের বলিষ্ঠ, সুখী সরল মানুষ এরা

এক গ্রাম মোড়ল

এক কৃষাণ

আশি পাউণ্ড বোঝা পিঠে একটি মেয়ে

দেখলাম এ সেই জায়গা। ঝরনাটির চারধারে নরম মাটিতে বহু দিনের পুরনো থাবার চিহ্ন ছিল; তবে, যে গিরিখাতে পালি গ্রামের রমণীটি মারা পড়ে সেখানে আমি যে থাবার ছাপ দেখি এবং সযত্নে পরীক্ষা করি, এ পদরেখাগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বাংলোতে ফিরে দেখলাম তহশীলদার ফিরে এসেছে এবং আমরা যখন বারান্দায় বসলাম, তাকে বললাম আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা। আমাকে বাজে উদ্দেশে অতদূর যেতে হয়েছিল বলে দুঃখ প্রকাশ করে ও উঠে পড়ল, বলল যেহেতু তাকে এক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, ওকে এখনই রওনা হতে হবে। এ-ঘোষণায় আমার কম বিস্ময় হল না, কেননা, সেদিন দুবার ও বলেছে রাতটা আমার সঙ্গে কাটাবে। ওর রাতে থাকার প্রশ্নটি নয়, আমাকে উদ্বিগ্ন করেছিল যে ঝুঁকি ও নিচ্ছিল। যা হ'ক আমার সকল যুক্তিতেই ও কালা সাজল, এবং যে ধোঁয়াটে লণ্ঠন সামান্য আলোর আভা ছড়াচ্ছে মাত্র, তাই নিয়ে একটি লোকের অনুসরণে যে অঞ্চলে দিবালোকে মানুষ চলে শুধু বড় দল বেঁধে সেখান দিয়ে চার মাইল হাঁটার জন্য, সে যখন বারান্দা থেকে নেমে গেল অন্ধকার রাতের মধ্যে আমি এক অতি সাহসী মানুষের উদ্দেশে মাথার টুপি খুললাম। ওকে চোখের আড়ালে চলে যেতে দেখে নিয়ে আমি ঘুরলাম ও বাংলোতে ঢুকলাম।

এই বাংলোটির একটি কাহিনী বলার আছে আমার কিন্তু তা আমি এখানে বলব না। কেননা এ বই হল জঙ্গলের গল্পের, এবং 'প্রকৃতির নিয়মের ও পারের' গল্প সে-গল্পের সঙ্গে ভাল খাপ খায় না।

২

আমি পরদিন সকালটি কাটালাম অতি বিস্তৃত ফল বাগিচা ও চা বাগান ঘুরে ঘুরে এবং ঝরনাটিতে স্নান করে, আর দুপুর নাগাদ আমাকে অত্যন্ত আশ্বাসিত করে তহশীলদার নিরাপদে ফিরে এল চম্পাবত থেকে।

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচে পাহাড়ের লম্বা ঢালু বরাবর তাকিয়ে দেখলাম দূরান্তে চষা খেত ঘেরা গ্রাম আর সেখান থেকে একটা লোক বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে আমাদের দিকেই উঠে আসছে। আরো কাছে আসতেই দেখলাম, লোকটা কখনও হাঁটছে, কখনও দৌড়চ্ছে, এবং দেখেই বোঝা গেল যে সে কোনো জরুরী খবর বহন করে আসছে। তহশীলদারকে, কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি বলে, আমি দ্রুতপদে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে থাকলাম এবং লোকটা আমাকে আসতে দেখে দম নেবার জন্যে বসে পড়ল। তার কথা শোনার মত কাছে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এখুনি এস সাহেব, মানুষখেকোটা এইমাত্র একটা মেয়েকে মেরেছে'। 'একটু অপেক্ষা কর', প্রত্যুত্তরে জবাব দিয়ে, ফিরে

ছুটলাম বাংলোর দিকে। রাইফেল আর কার্তুজ নিতে নিতে তহশীলদারকে খবর দিয়ে তাকে, গ্রামের দিকে আমাকে অনুসরণ করতে বললাম।

যে লোকটা আমার কাছে এসেছিল, সে ছিল সেইসব ধৈর্য-ছুটিয়ে দেওয়া লোকদের অন্যতম যাদের পা-চলা আর কথা বলা একসঙ্গে চলে না। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে আর দৌড়তে শুরু করলেই মুখ বন্ধ। সুতরাং তাকে মুখ বন্ধ করে রাস্তা দেখাতে বলে নিঃশব্দে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে দৌড়তে থাকলাম।

গ্রামটিতে পুরুষ, নারী ও শিশুদের এক উত্তেজিত জনতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং সাধারণভাবে এ-সব ক্ষেত্রে যা ঘটে, সকলে একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। একজন লোক বৃথাই সে-কলরব থামাবার চেষ্টা করছিল। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে, কি ঘটেছিল বলতে বললাম। গ্রাম থেকে এক ফার্লং মত দূরে সামান্য ঢালুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওক গাছগুলোকে নির্দেশ করে, সে বলল, জনা বার মিলে যখন গাছগুলোর নিচে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করছিল, তখনই হঠাৎ একটা বাঘের আবির্ভাব ঘটে আর বছর ষোল-সতেরর একটি মেয়েকে ধরে। দলের অন্য সকলে দৌড়ে গ্রামে ফেরে, আর যেহেতু জানা ছিল যে আমি বাংলোতেই আছি, সে কারণেই একজন লোককে আমাকে খবর দেবার জন্যে পাঠানো হয়।

যে লোকটির সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, তার স্ত্রী ওই দলে ছিল এবং গিরিস্কন্ধের ওপর যে গাছটির নিচ থেকে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটি নির্দেশ করে দেখাল। বাঘটি তার শিকারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, যদি তা হয়ে থাকে কোন দিকে সে গেছে, তা দেখতে দলের কেউই পেছন ফিরে চায় নি।

আমি না ফেরা অবধি গ্রামে থাকতে এবং কোনো গণ্ডগোল না করতে জনতাকে নির্দেশ দিয়ে আমি গাছটির দিকে রওনা হলাম। এখানে জমিন একেবারে চারদিকে ফাঁকা এবং মেয়েটি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ করায় মনোযোগ আকৃষ্ট না হওয়া অবধি কেমন করে বাঘের মত এক বড়সড় জানোয়ার একেবারে অদেখায় বারটি লোকের কাছে এগুল, তার উপস্থিতির ঠাহর মিলল না, তা ধারণা করা কঠিন।

মেয়েটি যেখানে নিহত হয়, সেই জায়গাটি এক তরল রক্তের চাপে চিহ্নিত এবং তার কাছে সেই প্রগাঢ় লাল রক্তচাপের তীব্র বৈপরীত্যে মেয়েটি যা পরেছিল সেই উজ্জ্বল নীল রঙের পুঁতির একটি ছিন্ন হার। এই জায়গাটি থেকে রক্তের নিশানা গিরিস্কন্ধ অবধি গিয়ে, ঘুরে গেছে।

বাঘিনীটির থাবার ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার একদিকে, যেদিকে মেয়েটির মাথা ঝুলেছিল, সেদিকে বড় বড় ঝলকে রক্ত, অন্যদিকে মেয়েটির পা রগড়ে চড়ার দাগ। পাহাড়ের উৎরাইয়ে আধমাইল গিয়ে মেয়েটার শাড়িটা পেলাম

আমি, এবং শৈলপার্শ্বে তার ঘাগরা। আবার একবার বাঘিনীটি নিয়ে যাচ্ছে এক নগ্ন মেয়েকে কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিষয় এবার তার বোঝা মৃত।

শৈলপার্শ্বের ওপর থাবার চিহ্ন চলে গেছে এক ব্ল্যাক থর্নের ঝোপ দিয়ে, তার কাঁটার ওপর মেয়েটির কাজল-কালো লম্বা চুলের গোছা আটকে আছে। তারপর একখণ্ড বিছুটি বন, বাঘিনী গেছে তার ভেতর দিয়ে এবং এই বাধাটি ঘুরে যাবার এক পথ খুঁজছিলাম যখন, পেছনে শুনলাম পায়ের শব্দ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি রাইফেল হাতে একটি লোক আমার দিকে আসছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যখন গ্রামে নির্দেশ রেখে এসেছি কেউ গ্রাম ছেড়ে বেরুবে না, সে কেন আমার পেছন পেছন এসেছে। ও বলল, তহশীলদার ওকে আমার সঙ্গে আসতে নির্দেশ দিয়েছে এবং আদেশ অমান্য করতে ও ভয় পায়। যেহেতু দেখে মনে হল আদেশ বহনে ও দৃঢ়সংকল্প এবং এ-বিষয়ে তর্ক করার অর্থ হচ্ছে মূল্যবান সময় নষ্ট করা, যে ভারি বুটজোড়া পরেছিল, তা ওকে খুলতে বললাম এবং সেগুলি ও এক ঝোপের নিচে লুকোলে পরে আমার সঙ্গে লেগে থাকতে এবং পেছন পানে কড়া নজর রাখতে উপদেশ দিলাম।

আমি পরেছিলাম খুব পাতলা একজোড়া মোজা, হাফ প্যান্ট এবং একজোড়া রবার সোলের জুতো এবং যেহেতু বিছুটি বন ঘুরে যাবার কোনো পথ আছে বলে মনে হল না, তাই তার ভেতর দিয়েই বাঘিনীকে অনুসরণ করলাম—প্রচুর অসুবিধা সত্ত্বেও।

বিছুটি বনের ওপারে রক্তসংকেত তীক্ষ্ন মোড় নিয়েছে বাঁয়ে, অতি খাড়াই পাহাড় ধরে সিধে নেমে গেছে। পাহাড়টি ঢেঁকিশাক এবং শৃগালে নিবিড় আচ্ছাদিত। একশো গজ নিচে রক্তের দাগ চলে গেছে এক সরু এবং খুব গভীর জলনালীতে, তা ধরে যেতে বাঘিনীটির বেশ অসুবিধা হয়েছে, যে পাথর ও মাটি খসে পড়েছে তা দেখেই বোঝা গেল। পাঁচ বা ছশো গজ এই জলনালী ধরে গেলাম আমি, যতই এগোলাম ততই বেশির চেয়ে বেশি বিচলিত হতে থাকল আমার সঙ্গীটি। এক ডজন বার আমার বাহু আঁকড়ে ধরল ও, এবং সাশ্রুকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল যে হয় এদিকে, নয় ওদিকে, নয় আমাদের পেছনে বাঘিনীর আওয়াজ পাচ্ছে ও। উৎরাই-এর আধা পথ নেমে আমরা পৌঁছলাম প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক বিশাল প্রস্তর-খণ্ডের কাছে এবং যেহেতু এতক্ষণে মানুষখেকো শিকার প্রসঙ্গে লোকটির সইবার ক্ষমতা মাত্রা পেরিয়ে গেছে, আমি না ফিরে আসা অবধি ওকে ওই পাথরটিতে চড়ে বসে থাকতে বললাম। মহা আনন্দে ও উঠে গেল এবং চূড়ায় পৌঁছে ও ঠিক আছে বলে ইশারা জানাল যখন, জলনালীর উজানে আমি চলতে থাকলাম। জলনালীটি পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গিয়ে সোজা নেমে গেছে একশো গজ, সেখানে বাঁ দিক থেকে নিচে নেমে আসা এক গভীর গিরিখাতে মিলিত হয়েছে। এই সংযোগস্থলে

এক ছোট্ট জলাশয় এবং তার কাছে এগোলাম যেমন, দেখলাম আমার দিকের জলে রক্তের ছোপ।

বাঘিনী মেয়েটিকে সোজা এখানে নিয়ে এসেছে এবং আমি আসতে তার খাওয়ায় বাধা পড়েছে। এখানে-সেখানে হাড়-গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে, আর বাঘিনীর থাবার চাপে যে সব গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আস্তে আস্তে লাল রঙা জল এসে জমেছে। জলের কাছে একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম কিন্তু কাছে এসে দেখলাম সেটি মানুষের পায়ের অংশ। জীবনে অনেক নরখাদক শিকার করেছি, কিন্তু এ রকম মর্মান্তিক দৃশ্য আর কখনও দেখি নি। নিটোল একটা পা, হাঁটুর নিচে থেকে এমনভাবে কামড়ে কেটেছে যাতে মনে হয় কেউ বুঝি কুড়োল দিয়ে এক ঘায়েই কেটেছে, আর সেই কাটা থেকে তাজা রক্ত তখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে।

পা-টি দেখতে দেখতে বাঘিনীর কথা ভুলে মেরে দিয়েছিলাম একদম আর হঠাৎ মনে হল আমি এখন ভীষণ বিপদে। তাড়াতাড়ি রাইফেলের বাঁট ধরে ট্রিগারগুলিতে দু আঙুল রেখে মাথা তুললাম, আর যেমন তুলেছি, দেখলাম আমার সামনেই একটা পনের ফুট উঁচু পাড় আর সেখান থেকে একটু করে মাটি গড়িয়ে নেমে এসে ঝুপ করে জলাশয়ে পড়ল। এই মানুষখেকো শিকারের খেলায় আমি আনকোরা, নইলে যেভাবে নিজেকে এক আক্রমণের জন্য মেলে ধরেছিলাম, তা করতাম না। রাইফেলটি ওপরপানে তড়িঘড়ি তোলার জন্যই সম্ভবত আমার প্রাণ বাঁচাল। ও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা বন্ধ করতে গিয়ে অথবা চলে যাবার জন্যে ফিরতে গিয়ে পাড়ের ওপব থেকে বাঘিনী ওই মাটিটুকু খসিয়ে নিচে ফেলে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওঠার পক্ষে পাড়টি বড়ই খাড়াই এবং ওটিতে ওঠার একমাত্র উপায় হল একবারে দৌড়ে ওঠা। জলনালীটির উজানে স্বল্প দূর গিয়ে আমি দৌড়লাম ভাটিপানে, লাফ দিয়ে পেরোলাম জলাশয়টি এবং একটি ঝোপ আঁকড়ে ধরে নিজেকে টেনে পাড়ের ওপর তোলাব জন্য অন্য কূলের উজানে যতটা দূরে যাওয়া দরকার, তা চলে গেলাম। নীল বাসকফুলের এক সমাবেশ, তার নুয়ে-পড়া ডাঁটিগুলো ধীরে আগেকার মত সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তারাই দেখিয়ে দিল কোথা দিয়ে ঠিক এখনি বাঘিনীটি পেরিয়ে গেছে এবং আর একটু এগিয়ে, যখন আমাকে একবারটি দেখতে এসেছিল, তখন কোথায় রেখে এসেছিল ওর মড়ি তা দেখতে পেলাম এক ঝুলন্ত শৈলের নিচে।

এখন মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, এবং ওর থাবার ছাপ এগিয়ে গেছে বেশ কয়েক বিঘা বিস্তৃত এক ছড়িয়ে-থাকা বড় বড় পাথর-ভরা জমিতে, সেখানে চলা কঠিন এবং বিপজ্জনক দুই-ই। শিলাগুলির মধ্যবর্তী ফাটল ও অতলান্ত খাদ—ফার্ন ও কর্‌বিন্দা লতায় ঢাকা। যদি কোনরকমে একবার পা ফসকায়

তাহলে তার পরিণামে শরীরের কোনো অঙ্গ ভেঙে যাবার ভয় বিলক্ষণ। এত অসুবিধার দরুন আমি এগোচ্ছিলাম ধীরে ধীরে এবং থাওয়া চালিয়ে যেতে বাঘিনী এ-পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছিল। যে-সব জায়গায় ও জিরিয়েছে, সে-জায়গা এক ডজন বার দেখতে পেলাম আমি এবং প্রতি জিরেনের পর রক্তের নিশানা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

এটি ওর চারশো ছত্রিশ নম্বর নরহত্যা। ওর আহারে সময় ব্যাঘাত ঘটানোতে ও বেশ অভ্যস্ত, তবে আমার মনে হয় এই প্রথম ওকে এমন নাছোড়বান্দা-ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ও তর্জন-গর্জন করে তার রাগ দেখালো। বাঘের গর্জন. তার পরিপূর্ণ মহিমায় কদর করতে হলে আমি তখন যেভাবে ছিলাম, তেমনি পরিস্থিত হওয়া প্রয়োজন—চারদিকে শিলাখণ্ড, মধ্যে মধ্যে নিবিড় ঝোপ-জঙ্গল এবং অলক্ষিত অতলান্ত গহ্বর ও গুহায় নিঃশেষে পড়ে যাওয়া এড়াবার জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপ পরখ করে ফেলবাব অমোঘ প্রয়োজন।

আপনারা যারা আরাম করে বসে এ কাহিনী পড়ছেন, তাঁরা আমার সে-সময়ের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ তারিফ করতে পারবেন বলে আশা করতে পারি না। গর্জনের শব্দ এবং আক্রমণের সম্ভাবনা একই সঙ্গে আমাকে ভীত করল এবং আশা যোগাল। যদি আক্রমণ করবার জন্য বাঘিনীর মেজাজ যথেষ্ট চটে তবে যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা সিদ্ধ করবার এক সুযোগই দেবে না শুধু, বাঘিনী যত যন্ত্রণা ও বেদনা ঘটিয়েছে, তার শোধ নেবার সুযোগ করে দেবে আমায়।

তবে সে গর্জন ভয় দেখানো মাত্র এবং যখন ও দেখল, আমাকে দূরে হটাবার বদলে ওটি আমাকে ওর পদাঙ্ক অনুসরণে তাড়াতাড়ি দৌড় করাচ্ছে, ও গর্জন বন্ধ করল।

প্রায় চারঘণ্টার ওপর আমি ওর পেছু পেছু চলেছি। যদিও বারবার ঝোপ-জঙ্গলকে নড়তে দেখেছি, কিন্তু আমি ওর চামড়ার একটি লোমও দেখি নি এবং উল্টোদিকের পর্বতপার্শ্বের উৎরাইয়ে পলাতকা ছায়ার পানে এক পলক চাহনি আমাকে হুঁশিয়ারী জানিয়ে দিল, অন্ধকারের আগে যদি গ্রামে পৌঁছতে চাই, তবে এখনই আমার পেছন ফিরে হাঁটবার সময় হয়েছে।

অবচ্ছিন্ন পা-টির পরলোকগত মালিক এক হিন্দু এবং সৎকারের জন্য ওর কোনো শরীরাংশ প্রয়োজন হবে। তাই যখন জলাশয়টি পেরোলাম, তীরে একটি গর্ত খুঁড়লাম এবং পুঁতে দিলাম পা-টি। সেখানে এটি বাঘিনীর হাত থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যখন চাওয়া হবে, পাওয়া যাবে।

পাথরের ওপর অবস্থিত আমার সঙ্গীটি আমাকে দেখে বেজায় স্বস্তি পেল। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে এবং যে-গর্জন ও শুনেছে তাতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, বাঘিনীটি আর একটি শিকার সংগ্রহ করেছে এবং খোলাখুলি স্বীকার করল, ওর মুশকিল দাঁড়িয়েছিল কেমন করে একা গ্রামে ফিরবে তাই।

আমি যখন জলনালীটির উৎরাইয়ে নামছিলাম, তখন মনে হল গুলিভরা বন্দুকবাহী এক দুর্বলচিত্ত লোকের সামনে হাঁটার চেয়ে আরো কোনো বিপজ্জনক কিছু আছে বলে আমি জানি না। তাই সাবধান হওয়ার জন্য আমি লোকটির পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। খানিক বাদে হঠাৎ পা পিছলে লোকটি পড়ে যাবার পর দেখি তার বন্দুকটি আমার দিকেই মুখ করে আছে। তখন আমার মত পরিবর্তন করলাম। সেদিন থেকে ইবটসনের সঙ্গে ছাড়া,—নরখাদক শিকারের সময়ে একলা-যাওয়াই আমি স্থির করেছি। কেননা, সঙ্গী যদি নিরস্ত্র হয়, তাকে রক্ষা করা কঠিন এবং সে সশস্ত্র হলে পরে নিজেকে রক্ষা করা আরো কঠিন।

যেখানে লোকটি তার বুটজুতো লুকিয়েছিল, পাহাড়ের সেই মাথায় পেঁছে ধূমপানের এবং আমার আগামীকালের পরিকল্পনা ভেবে ঠিক করার জন্য আমি বসলাম।

নিশ্চয়ই মড়ির যেটুকু বাকি আছে বাঘিনী সেটা রাতেই শেষ করবে এবং পরদিন শিলাগুলির মধ্যে ওৎ পেতে থাকবে, সে প্রায় সুনিশ্চিত।

যেখানে ও আছে, সেখানে ওকে খুজে বের করার আশা আমার সামান্যই এবং যদি গুলি করতে না পেরে শুধু ব্যাঘাতই ঘটাই, ও বোধ হয় অঞ্চলটি ছেড়ে চলে যাবে এবং আমি ওর খেই হারিয়ে ফেলব। কিন্তু যদি যথেষ্ট লোক যোগাড় করতে পারি তবে জঙ্গলে বীট দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

পর্বতপুঞ্জের এক বিশাল অ্যাম্পিথিয়েটারের দক্ষিণপ্রান্তে বসেছিলাম আমি, কোনোরকম জনবসতি ছিল না চোখের সামনে। পশ্চিম থেকে প্রবেশকারী একটি নদী ছুটফটিয়ে নেমে গেছে নিচে, অ্যাম্পিথিয়েটারের এপার-ওপার জুড়ে রচনা করেছে এক গভীর উপত্যকা। পূর্বদিকে নিরেট পাথরে বাধা পেয়েছে নদীটি এবং উত্তরে ঘুরে গিয়ে এক সংকীর্ণ গিরিসংকট পথে বেরিয়ে গেছে অ্যাম্পিথিয়েটার থেকে।

আমার সামনের পাহাড়টি প্রায় দুহাজার ফুট উচ্চতায় উঠেছে, এখানে ওখানে এক একটি পাইন-গাছ-চিহ্নিত বেঁটে বেঁটে ঘাসে সেটি ঢাকা এবং ঘুরাল ছাড়া আর কিছু বেয়ে ওঠার পক্ষে পুবের পাহাড় ভীষণ খাড়াই। নদী থেকে ওই খাড়াই পাহাড় অবধি শৈলশিরার সমস্ত দৈর্ঘ্যটি বীট করার মত যথেষ্ট মানুষ যোগাড় করতে যদি পারি, এবং ওদের সহায়তায় বাঘিনীকে যদি ঠাঁইনাড়া করতে পারি, তবেই সংকীর্ণ গিরিসংকটটির ভেতর দিয়ে পেছনে পালানোর পথ নেওয়া বাঘিনীর পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হবে।

মানতেই হবে, এই বীট দেওয়া কাজটি বেজায় কঠিন কেননা যার ওপর বাঘিনীকে ছেড়ে এসেছি, সেই উত্তরমুখী চড়া পর্বতপার্শ্বটি নিবিড় বনে ঢাকা এবং মোটামুটি তিনপোয়া মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া। যাই হ'ক যদি

বীটকারীদের আমার নির্দেশ বহনে বাধ্য করতে পারি তবে একটি গুলি ছুঁড়তে পারার সুযোগ মেলা সম্ভব।

তহশীলদার গ্রামে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পরিস্থিতিটি ওর কাছে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, যত মানুষ পারে তা সংগ্রহে ও যেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং যেখানে মেয়েটি নিহত হয়েছে পরদিন সকালে দশটায় সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করে। ওর সাধ্যে যা সম্ভব, তার সব কিছু করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চম্পাবতের উদ্দেশে রওনা হল ও এবং আমি পাহাড়ের চড়াই ভেঙে বাংলোতে এলাম।

পরদিন ঊষার সূচনাতেই উঠে পড়লাম আমি এবং ভরপেট আহারের পর আমার লোকজনকে মালপত্র বেঁধেছেঁদে চম্পাবতে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বললাম এবং যেখানটায় বীট দেওয়া হবে বলে মনস্থ করেছি তা আরেক-বারটি দেখে নিতে গেলাম। যে পরিকল্পনা করেছি, তার ভুল কিছু দেখলাম না এবং আমার সঙ্গে তহশীলদারকে যেখানে দেখা করতে বলেছি সেই জায়গায় হাজির হলাম নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগেই।

মানুষ যোগাড়ে ওকে যে কষ্ট পেতে হবে তাতে সন্দেহ ছিল না কিছু। কেননা এলাকাটিতে মানুষখাকীর ভয় লোকের মনে গভীরভাবে চেপে বসেছে এবং মানুষজনকে ঘরের আশ্রয় থেকে বেরুতে বাধ্য করতে নরম জোরাজোরির চেয়ে জোরাল চাপ দরকার হবে। দশটার সময় তহশীলদার ও একটি লোক হাজির হল, তারপর থেকে লোকরা আসতে থাকল, দুজন—তিনজন এবং দশজন করে, অবশেষে দুপুর নাগাদ দুশো আটানব্বইজন লোক জমায়েত হল।

তহশীলদার জানিয়ে দিয়েছিল যে সমস্ত লাইসেন্স বিহীন বন্দুক দেখলে ও চোখ বুজে থাকবে এবং আরো বলেছিল যার দরকার ও গুলি বারুদ যোগাবে; আর সেদিন যে-সব অস্ত্র হাজির করা হয়, তাতে এক মিউজিয়মের সংগ্রহ হতে পারত।

লোকরা যখন জড় হল এবং ওদের যা দরকার সে গুলি-বারুদ পেল, আমি ওদের নিয়ে গেলাম সেই গিরিপার্শ্বে, যেখানে মেয়েটির ঘাগরা পড়েছিল। উল্টোদিকের পাহাড়ের যে পাইন গাছটি বাজে পুড়ে গেছে এবং যার বাকল খসে গেছে সেটি দেখিয়ে আমি ওদের শৈলশিরা ধরে সার বেঁধে দাঁড়াতে বললাম। যখন পাইন গাছের নিচ থেকে ওরা আমাকে একটি রুমাল নাড়াতে দেখবে তখন যারা সশস্ত্র তারা তাদের বন্দুক ছুঁড়বে আর অন্যরা ঢাকঢোল বাজাবে, চেঁচাবে এবং পাথর গড়িয়ে ফেলবে। আমি যতক্ষণ না ফিরছি এবং নিজে তাদের ডেকে নিচ্ছি ততক্ষণ কেউ কোনো কারণেই শৈলশিরা ছেড়ে যাবে না। যখন ভরসা পেলাম, উপস্থিত সকলেই আমার নির্দেশগুলি শুনেছে এবং বুঝেছে. আমি রওনা হলাম তহশীলদারের সঙ্গে। ও বলল বীটারদের চেয়ে

আমার সঙ্গে থাকলে ও অধিক নিরাপদ থাকবে, কারণ ওদের এক-আধটা বন্দুক ফেটে জখম হওয়ার খুবই সম্ভবনা ছিল।

অনেকখানি জায়গা ছেড়ে ঘুরে গিয়ে আমি উপত্যকার উচ্চতর প্রান্তটি পেরোলাম, উল্টোদিকের পাহাড়ে উঠলাম এবং পথ করে নিয়ে নামলাম বাজে পোড়া পাইন গাছটির কাছে। এখান থেকে পাহাড় খাড়াই নেমে গেছে। তহশীলদারের পায়ে ছিল পাতলা পেটেন্ট লেদারের একজোড়া জুতো, ও বলল, ওর পক্ষে আর বেশিদূর এগনো অসম্ভব। ফোসকাকে আরাম দেবার জন্য ও যখন ওর অকেজো জুতো জোড়া খুলছে, আমি আগের কথামত সংকেত জানাতে ভুলে গেছি মনে করে শৈলশিরার লোকগুলি তাদের বন্দুকগুলো ছুঁড়ল এবং প্রচণ্ড এক হল্লা তুলে দিল। গিরিসংকটটি থেকে তখনো আমি দেড়শো গজ দূরে। এ দূরত্বটুকু পার হতে গিয়ে আমি যে এক ডজন বার আমার ঘাড় ভাঙি নি,—আমার পাহাড়ে বড় হওয়া এবং তার কারণে ছাগলের মত হুঁশিয়ার-পা হওয়াই তার কারণ।

পাহাড় বেয়ে ছুটে নামছি যখন, লক্ষ করলাম, গিরিসংকটেব মুখের কাছে আছে সবুজ এক টুকরো ঘাস ঢাকা জমি। আর তখন যেহেতু এর চেয়ে আরো ভাল জায়গা খোঁজ করার কোনো সময় নেই, যে পাহাড় বেয়ে এখনই নেমে এসেছি, তার দিকে পিঠ করে ঘাসের মধ্যে বসলাম আমি। ঘাস প্রায় দুফুট উঁচু এবং আমার শরীরের অর্ধেক ঢেকে রাখল তা এবং আমি যদি একেবারে নিশ্চল থাকি আমাকে দেখতে না পাবার সম্ভাবনা রইল ভালমত। যে পাহাড়ে বীট হচ্ছে তা আমার মুখোমুখি আর যে-গিরিসংকটের উদ্দেশে বাঘিনী ছুটবে বলে আশা করছি তা আমার বাঁ কাঁধের পেছনে।

শৈলশিরায় তখন বিশৃংখল হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। বন্দুকের গুলি বর্ষণনিনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্মত্ত ঢাক-ঢোলের আওয়াজ এবং শত শত লোকের-চিৎকার। যখন এই হল্লা চূড়ান্তে, আন্দাজ তিনশো গজ দূরে, আমার সামনের ডানদিকে দুটি গিরিখাতের মধ্যবর্তী এক ঘাসের ঢাল ধরে বাঘিনীকে বড় বড় লাফে ছুটে নামতে দেখলাম। মাত্র স্বল্প দূরই গেছে ও, তখন পাইন গাছের নিচের অবস্থিতি থেকে তহশীলদার ওর 'শট্-গানের' দুটি নলেই গুলি ছুঁড়ল। গুলির শব্দ শুনে বাঘিনী সাঁ করে ঘুরে গেল আর যে পথ দিয়ে এসেছে সেই দিকেই ফিরে গেল সিধা এবং ঘন ঝোপে ও যখন উধাও হচ্ছে আমি রাইফেল উঁচিয়ে এক গুলি ছুঁড়লাম ওর উদ্দেশ্যে।

শৈলশিরার ওপরের লোকগুলি তিনটি গুলি শুনে সিদ্ধান্ত করল যে, বাঘিনীটি নিহত হয়েছে। তা খুব অস্বাভাবিক নয়। সবগুলো বন্দুক নিঃশেষে ফুটিয়ে ওরা এক চূড়ান্ত নিনাদ করল। আমি তখন নিঃশ্বাস আটকে, যে আর্তনাদ শৈলশিরায় বাঘিনীর আগমন ঘোষণা করবে, তা শোনার

জন্যে অপেক্ষা করছি তখন সহসা আমার সামনে বাঁ দিকে বাঘিনী আড়াল থেকে বেরুল এবং এক লাফে নদী পেরিয়ে সিধে গিরিসংকটের উদ্দেশ্যে চলে এল। সী-লেভেলে সাইটেড (রাইফেলের দুটি সাইট থাকে, তা দিয়ে উদ্দিষ্ট শিকার ও শিকারীর অন্তর্বর্তী দূরত্ব পরিমাপ করতে হয়। অনেক রাইফেলের সাইট নড়িয়ে পাল্লা ঠিক করা চলে, সেগুলি অ্যাডজাস্টিবল্ এবং অনেক রাইফেলের সাইট অনড় বা ফিক্স্‌ড। এখানে উল্লিখিত রাইফেলটি পরোক্ত শ্রেণীর। তার সাইট সমান পাল্লা বা সী-লেভেলে ফিক্স্‌ড এবং পর্বতে শিকার হচ্ছে বলে এ রাইফেলের গুলি উদ্দিষ্ট শিকারের চেয়ে একটু উচুতে ছুঁড়লে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলার সম্ভাবনা।—সম্পাদিকা) ·500 মডিফায়েড কর্ডাইট রাইফেলটি এ-পর্বতোচ্চতায় ওপর পানে গুলি পাঠাল এবং যখন বাঘিনী নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেল, আমি ভাবলাম বুলেট ওর পিঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে এবং পালাবার পথ বন্ধ দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। আসল ব্যাপার কি, ঠিকমতই মেরেছিলাম ওকে, তবে একটু পিছিয়ে। মাথা নিচু করে আমার দিকে আধা ঘুরে গেল ও এবং তিরিশ গজেরও কম পাল্লায় ওর কাঁধের ওপর গুলি করার চমৎকার সুযোগ করে দিল। এই দ্বিতীয় গুলিতে ও শিউরে উঠল কিন্তু কান চেপটে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়েই রইল, আর কাঁধে রাইফেল নিয়ে বসে আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম ও আক্রমণ করলে কি করা সবচেয়ে ভাল হবে আমার, কেননা রাইফেল গুলিশূন্য এবং আমার আর কার্তুজ নেই। তিনটি কার্তুজই এনেছিলাম সঙ্গে আমি, কেননা কখনও ভাবি নি দুটির বেশি গুলি ছোড়ার সুযোগ পাব এবং এক জরুরী সংকটের জন্য ছিল তৃতীয় কার্তুজটি।

সৌভাগ্যক্রমে অতি গরহিসেবীভাবে জখম জানোয়ারটি আক্রমণের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত করল। অতি মন্থরগতিতে ফিরল ও, ডানদিকের নদীটি পেরোল, কয়েকটি মাটিতে পড়ে থাকা পাথর টপকে গেল এবং পৌঁছল এক সরু কার্নিসে। সেটি ওই দুরারোহ পাহাড়ের গা কোনাকুনি পেরিয়ে চলে গেছে এক বিশাল চ্যাটাল উঁচিয়ে থাকা পাথরে। যেখানে এই পাথরটি শৈলপ্রাচীরে মিলেছে, একটি ছোট ঝোপ শিকড় আঁকড়ে আছে সেখানে, আর সেটির কাছে গিয়ে বাঘিনী তার ডালপালা ছিঁড়তে থাকল। সাবধানতার প্রশ্ন বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে তহশীলদারকে বললাম ওর বন্দুক আনতে। প্রত্যুত্তরে এক চীৎকৃত দীর্ঘ জবাব এল, একটি শব্দই শুনলাম—"পা"। নিজের রাইফেল নামিয়ে রেখে একছুটে পাহাড়ে উঠলাম, তহশীলদারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম বন্দুক এবং দৌড়ে ফিরে এলাম।

নদীর কাছে এগুলাম যখন, ঝোপ ছেড়ে বাঘিনীটি সেই উঁচনো পাথরের ওপর, আমি যে দিকে আছি সে দিকে বেরিয়ে এল। যখন ওর বিশ ফুটের মধ্যে, বন্দুকটি তুললাম এবং সাতঙ্কে দেখলাম যে নলদুটি এবং ব্রীচ-ব্লকের মাঝখানে

এক ইঞ্চির আট-তৃতীয়াংশ এক ফাঁক আছে। যখন দুটি নলে ফায়ার করা হয় তখন বন্দুক ফাটে নি, সম্ভবত এখনও ফাটবে না, কিন্তু পিছু ধাক্কা খেয়ে কানা হয়ে যাবার বিপদ আছে। যাই হ'ক, সে-ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে এবং যে পেল্লায় পুঁতিটি সাইটের কাজ করছিল, সেটি বাঘিনীর হাঁ-করা মুখের দিকে নিশান করে বসিয়ে আমি গুলি ছুঁড়লাম। হয়তো আমি ওপর-নিচে নড়ে গিয়েছিলাম কিংবা হয়তো বেলনাকার বুলেটটি বিশ ফুট নির্ভুল পাঠাবার ক্ষমতা বন্দুকটির ছিল না। যাইহ'ক গুলিটি বাঘিনীর মুখ ফসকাল এবং বিধল ওর ডান থাবায়, সেখান থেকে পরে আমি আঙুলের নখ দিয়ে সেটি সরিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ও তখন শেষ অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং পায়ের ওপর আঘাতটি ওকে সমুখপানে টলিয়ে ফেলে দেবার কাজ যথেষ্টই করল। পাথরটার এক ধার দিয়ে মাথাটি ঝুঁকিয়ে ও মৃত্যুতে শান্ত হল।

গিরিসংকট দিয়ে পালাবার চেষ্টায় যে মুহূর্তে বাঘিনী আড়াল ছেড়ে বেরোয়, তখন বীটারদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সহসা পাহাড়ের চড়াইয়ে স্বল্প দূর থেকে 'ওই তো পাথরের ওপর পড়ে আছে ওটা! চল টেনে নামাই, ওটাকে টুকরো টুকরো করে কাটি', এ-চিৎকার শুনে ওদের অস্তিত্বের কথা আমার মনে পড়ল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি নি যখন শুনলাম, 'টুকরো টুকরো করে কাটি', তবু শুনেছিলাম ঠিকই, কেননা অন্যরাও এখন বাঘিনীটিকে দেখে ফেলেছে এবং পর্বতগাত্রের ওপরে চতুর্দিক থেকে ফিরে ফিরে একই চিৎকার হতে থাকল।

যে কার্নিস দিয়ে তখন আহত জানোয়ারটি পাথরে উঠেছিল তা সৌভাগ্যক্রমে বীটকারীদের উল্টোদিকে এবং তাতে পা রাখার মত সামান্য জায়গা ছিল। যখন পাথরটিতে পৌঁছে বাঘিনীকে টপকে গেলাম—প্রাণপণ আশা করছিলাম ও মরেছে, কেননা ওকে পাথর ছুঁড়ে পরখ করবার আচরিত বিধি পালনের সময় ছিল না আমার—লোকগুলি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এবং ফাঁকা জায়গাটি পেরিয়ে বন্দুক, কুড়োল, মরচেধরা তলোয়ার, বর্শা নাচিয়ে ছুটে আসতে থাকল।

বার থেকে চোদ্দ ফুট উঁচু পাথরটিতে পৌঁছে ওদের এগনো বাধা পেল, কেননা নদীটি যখন বন্যাস্ফীত, তখন তার আঘাতে ক্ষয়ে পাথরটির বহির্ভাগ এত মসৃণ হয়ে গিয়েছিল যে পায়ের একটি আঙুল পর্যন্ত রাখার জো তাতে ছিল না। ওদের ভয়াল শত্রুকে দেখে জনতার সে উন্মত্ত ক্রোধ সম্পূর্ণ বোধগম্য কেননা ওদের মধ্যে একটি লোকও ছিল না যে ওর হাতে কষ্ট পায় নি। একটি লোক, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খ্যাপা, দলনেতার কাজ করছিল সে। একটি তলোয়ার নাচিয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে ছুটতে সে সমানে চেঁচাচ্ছিল, 'এই সেই শয়তান, যে আমার স্ত্রী আর দুই ছেলেকে মেরেছে'! জনতার বেলা যা হয়,

যেমন আকস্মিক জ্বলে উঠেছিল তেমনি নিভে গেল উত্তেজনা এবং যে লোকটি স্ত্রী ও পুত্রদের হারিয়েছে, তার প্রশংসায় এ বলতেই হবে যে, সেই প্রথম হাতিয়ার নামিয়ে রাখল। পাথরটির কাছে এসে ও বলল, 'যখন আমাদের দুশমনকে দেখলাম আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম সাহেব, কিন্তু পাগলামি কেটে গেছে এখন, আর আমাদের মাপ করে দিতে বলছি আপনাকে আর তহশীলদার সাহেবকে।' অব্যবহৃত কার্তুজটি বের করে বন্দুকটি বাঘিনীর-ওপর রাখলাম তার পরে দু হাতে ভর করে ঝুলে পড়ে অন্যদের সাহায্যে নিচে নেমে পড়লাম। কেমন করে পাথরে উঠেছিলাম, তা যখন লোকগুলিকে দেখালাম, তখন ওরা মরা জানোয়ারটিকে অতীব সন্তর্পণে নামিয়ে এক ফাঁকা জায়গায় বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখল। তারপব সবাই ভিড় করে ঘিরে তাকে দেখতে লাগল।

নিচে আমার দিকে চেয়ে বাঘিনী যখন পাথরটির ওপব দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ করেছিলাম ওর মুখে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে এবং এখন ওকে পরীক্ষা করে দেখলাম ওর মুখের ডান ধাবের ওপর ও নিচের কুকুর-দাঁত ভাঙা. ওপরেরটি আধ-ভাঙা, নিচেরটি হাড় অব্দি। এক বন্দুকের গুলিতে জখমের এই পরিণাম, ওর দাঁতের চিরস্থায়ী জখম. এটিই স্বাভাবিক শিকার সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ওর নরখাদক হবার কারণ হয়েছিল।

ওখানেই বাঘিনীটির চামড়া না-ছাড়াবাব জন্যে লোকগুলি অনুনয় জানাল আমাকে এবং গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে ওকে ওদের হাতে সন্ধে অবধি রেখে দিতে বলল। বলল, স্বচক্ষে ওদের মেয়েরা ও ছোটরা যদি না দেখে, তারা বিশ্বাসই করবে না এই ভয়ংকর শত্রুটি মরেছে।

এখন গাছ থেকে দুটি ডাল কেটে বাঘিনীব দু পাশে রা- হল এবং পাগড়ি, কোমরবন্ধ ও লেংটি দিয়ে ওকে ওগুলোব সঙ্গে ভালভাবে খুব শক্ত করে বাঁধা হল। সব হয়ে গেলে পরে ডালদুটি তোলা হল এবং আমরা খাড়া পাহাড়টির পায়ের কাছে গেলাম। যে নিবিড় বনাচ্ছাদিত পাহাড়ে ওরা এখনি বীট করেছে তার চড়াই ভেঙে যাওয়ার পরিবর্তে লোকগুলি এই পাহাড়টির চড়াই ভেঙেই বাঘিনীকে নিয়ে যেতে চাইল। কারণ ওদের গ্রামগুলি এই পাহাড়টির নিকটেই। পেছনের লোকটি শক্ত করে তার সামনের মানুষটির কোমরবন্ধ বা পোশাকের অন্য কিছু আঁকড়ে ধরল, এই সহজ পন্থায় দুটি মানুষ-দড়ি তৈরি করা হল। যখন স্থির হল এ মানুষ-দড়িগুলি ধকল সইবার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা এবং পোক্ত হয়েছে. ওরা ডাল দুটিতে কাঁধ দিল। বাহকদের দুধারে রইল আরো মানুষ, যাতে তারা পা রাখার জায়গা পায়, পা ফসকে না যায়—এবার শোভাযাত্রাটি চলল পাহাড়ের চড়াই ভেঙে. যেন এক পিপীলিকা-বাহিনী দেওয়াল বেয়ে উঠছে একটি মরা পোকা নিয়ে, এমনিই দেখাল ওদের।

প্রধান বাহিনীর পেছনে চলল দ্বিতীয় আরেকটি ক্ষুদ্রতর বাহিনী—তহশীলদারকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ওই হাজার ফুট চড়াইয়ের কোনো পর্যায়ে যদি মানুষ দিয়ে তৈরি দড়ি ছিঁড়ে যেত, হতাহতের সংখ্যা হত ভয়াবহ, তবে দড়ি ছেঁড়ে নি। লোকগুলি পাহাড়ের মাথায় উঠল। রওনা হল পূর্বদিকে, বিজয় যাত্রার গান গাইতে গাইতে, আর আমি ও তহশীলদার ঘুরলাম বাঁ দিকে এবং চললাম চম্পাবতের উদ্দেশে।

আমাদের পথ ওই শৈলশিরা ধরে এবং যার কাঁটায় মেয়েটির লম্বা চুলের গোছা আটকে গিয়েছিল সেই ব্ল্যাকথর্ন ঝোপের মধ্যে আবার দাঁড়ালাম আমি, শেষবারের মত নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম অ্যাম্পিথিয়েটারটিকে, ওটি আমাদের সাম্প্রতিক কীর্তির রঙ্গমঞ্চ।

পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নামার সময়ে বীটাররা সেই হতভাগিনী মেয়েটির মাথাটি খুঁজে পেয়েছিল। গিরিসংকটের মুখ থেকে তখন পাতলা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। চম্পাবতের মানুষখাকীর শেষ শিকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হচ্ছিল ঠিক যেখানে জানোয়ারটিকে মারি সেইখানে।

ডিনারের পর যখন তহশীলদারের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে ঘুরে নামছে পাইন কাঠের মশালের এক দীর্ঘ মিছিল এবং অচিরে স্তব্ধ নৈশ বাতাসে ভেসে এল বহুলোকের সমবেত কণ্ঠে এক পাহাড়ী গান। এক ঘণ্টা বাদে বাঘিনীকে আমার পায়ের কাছে শুইয়ে দেওয়া হল।

অতগুলো লোক ভিড় করে থাকলে জানোয়ারটির চামড়া ছাড়ানো কঠিন, তাই কাজটি সংক্ষেপিত করার জন্যে আমি ধড় থেকে মাথা আর থাবাগুলো কাটলাম এবং সেগুলো চামড়ার সঙ্গে সংলগ্ন রেখে দিলাম, পরে ওগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে। শবটির কাছে পুলিস-পাহারা মোতায়েন করা হল আর পরদিন অঞ্চলের সকল মানুষ জমায়েত হল যখন, বাঘিনীর ধড়, পা ও লেজ ছোট ছোট টুকরোয় কেটে কেটে দেওয়া হল। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা গলায় যে পদক পরে তার জন্যে এই মাংস ও হাড়ের টুকরোগুলো দরকার। অন্যান্য শক্তিসম্পন্ন জাদু-জিনিসের সঙ্গে বাঘের কোনো অংশের যোগ হলে পরে তা ধারণকারীকে সাহস এবং বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে অক্ষত থাকার ক্ষমতা যোগায় বলে প্রসিদ্ধি আছে। বাঘিনী যা আস্ত গিলেছিল, মেয়েটির সে আঙুলগুলি তহশীলদার পরে স্পিরিটে ডুবিয়ে আমাকে পাঠায় এবং আমি সেগুলি নন্দাদেবী মন্দিরের কাছে নৈনিতাল লেকে সমর্পণ করি।

আমি যখন বাঘিনীর চামড়া ছাড়াচ্ছিলাম; তহশীলদার ও তার কর্মচারীরা—সংলগ্ন গ্রামগুলির গ্রামমোড়ল ও গ্রামবৃদ্ধ এবং চম্পাবত বাজারের ব্যবসায়ীদের সহায়তায় আগামীকাল এক বিরাট ভোজ ও নাচের প্রোগ্রাম ঠিক করছিল—তাতে

আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে,—যে পথ ও গ্রাম-পথ মানুষখাকী চার বছর বন্ধ করে রেখেছিল তা ব্যবহার করতে পারছে বলে আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে মানুষের সে বিশাল জমায়েতের শেষ লোকটিও চলে গেল যখন, আমি তহশীলদারের সঙ্গে শেষবারের মত ধূমপান করলাম। আমি আর থাকতে পারব না আর উৎসবে ওকেই আমার ঠাঁই নিতে হবে এ কথা ওকে বলে আমি এবং আমার লোকজন আমাদের পঁচাত্তর মাইল যাত্রাপথে রওনা হলাম—হাতে দুদিন আছে পথটি কাবার করতে।

সূর্যোদয়ে আমার লোকজনকে পেছনে ফেলে রেখে আমার ঘোড়ার জিনে বাঘিনীর চামড়া বেঁধে নিয়ে আমি আগেভাগে রওনা হলাম—যেখানে রাতটা কাটাতে চাই, সেই দাবিধুরায় কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়ে চামড়াটি সাফ করব বলে। পাহাড়ের ওপর পালি গ্রামে সেই কুটিরটি পেরোচ্ছি যখন, মনে হল, ওর বোনের মৃত্যুর শোধ নেওয়া হয়েছে জানলে সেই বোবা মেয়েটির হয়তো কিছুটা শান্তি হবে। তাই ঘোড়াটিকে ছেড়ে রাখলাম চরে খেতে—ও হিম-রেখার কাছাকাছি বড় হয়েছে এবং ওক গাছ থেকে শুরু করে বিছুটি অব্দি সব কিছুই খেতে পারে—আমি পাহাড়ের চড়াই বেয়ে কুটিরে এলাম এবং দরজার মুখোমুখি একটি পাথরে মাথাটা রেখে চামড়াটা বিছিয়ে দিলাম। বাড়ির বাচ্চারা চোখ গোল-গোল করে কাণ্ডকারখানা দেখছিল। আর ওদের সঙ্গে আমাকে কথা কইতে শুনে ওদের মা দোরগোড়ায় এল, ও রান্না করছিল ভেতরে।

শক্ এবং কাউন্টার-শক বিষয়ে কোনো থিওরি আওড়াতে যাব না আমি, কেননা এসব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু এই জানি, এই রমণীটি—যে বারমাস যাবত বোবা হয়ে আছে বলে প্রসিদ্ধ, যে চারদিন আগে আমার প্রশ্নের জবাব দেবার কোনো চেষ্টাই করে নি—সে এখন ঘর থেকে পথে ছুটে ছুটে গেল আর এল, চেঁচিয়ে ডাকতে থাকল ওর স্বামীকে আর গ্রামের লোকদের, আসুক তারা তাড়াতাড়ি, দেখুক সাহেব কি এনেছে। বাকক্ষমতার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন বাচ্চাগুলিকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলল খুব, তাই মনে হল, ওরা মায়ের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

আমার জন্যে যতক্ষণ এক ডিশ চা তৈরি হতে থাকল, গ্রামে জিরোলাম আমি এবং কেমন করে মানুষখাকীকে মারা হয়েছে, যারা ভিড় করে এসেছিল সে লোকদের বললাম। এক ঘণ্টা বাদে আবার শুরু করলাম যাত্রা, আর পথ চলতি আধ মাইল অবধি পালি গ্রামের পুরুষদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক চিৎকার শুনতে পেলাম।

পরদিন সকালে এক চিতার সঙ্গে আমার এক বেজায় রোমাঞ্চকর সংঘর্ষ হয়েছিল, একথা উল্লেখ করছি শুধু এইজন্যে, যে ঘটনাটি দাবিধুরা থেকে আমার রওনা-হওয়ায় দেরি করিয়ে দিয়েছিল এবং আমার ছোট্ট ঘোড়া ও আমার ওপরে

বাড়তি ধকল চাপিয়ে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটি ভেতরেও যেমন পোক্ত, ঠ্যাঙেও তেমনি জোর তার, এবং ওপরে ওঠার সময়ে ওর ল্যাজ চেপে ধরে, সমতলে ওর পিঠে চেপে, নিচে নামার সময়ে ওর পেছন পেছন ছুটে, আমরা সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে নৈনিতাল অব্দি পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ কাবার করে দিলাম।

কয়েকমাস বাদে নৈনিতালে অনুষ্ঠিত এক দরবারে যুক্তপ্রদেশের ছোট লাট সার জন হিউএট, ওরা আমাকে যে সাহায্য করে তার জন্যে চম্পাবতের তহশীলদারকে একটি বন্দুক, এবং যখন মেয়েটির তল্লাস করছিলাম তখন যে লোকটি আমার সঙ্গে ছিল তাকে একটি চমৎকার শিকার-ছুরি উপহার দেন। দুটি হাতিয়ারেই প্রয়োজনীয় কথাগুলি ক্ষোদিত ছিল এবং দুটি পরিবারেই ওগুলি বংশের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হাতবদল হতে থাকবে।

রবিন

আমি ওর মা-বাবার একজনকেও কখনো দেখি নি। যে 'নাইট অফ দ্য ব্রুম্'-এর কাছ থেকে ওকে কিনেছিলাম, সে বলেছিল ও এক স্প্যানিয়েল, ওর নাম পিণ্ডা, ওর বাবা ছিল এক উৎসাহী শিকারী কুকুর। ওর বংশপরিচয় সম্পর্কে এটুকুই আপনাদের বলতে পারি আমি।

কুকুরছানা চাই নি আমি, নেহাতই ঘটনাচক্রে আমি সঙ্গে ছিলাম এক বান্ধবীর, তখন তাঁর নিরীক্ষণের জন্যে এক অতি নোংরা ঝুড়ি উপুড় করে সদ্যজাত সাতটি ছানাকে বের করা হল। ছানার দলটিতে পিণ্ডা সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে রোগা, এবং বোঝাই যাচ্ছিল টিকে থাকবার জন্যে লড়তে লড়তে ও একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌছেছে। ওর চেয়ে সামান্য কম হতভাগ্য ওর ভাইবোনদের কাছ থেকে চলে এসে ও একবারটি আমাকে ঘিরে হাঁটল আর তারপর কুঁকড়ে-মুকড়ে আমার বড় বড় পায়ের মধ্যিখানে শুয়ে পড়ল। ভীষণ শীত সে সকালে, যখন ওকে তুলে নিলাম, রাখলাম আমার কোটের ভেতর, আমার মুখ চেটে ও ওর কৃতজ্ঞতা দেখাতে চেষ্টা করল আর আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম ওর অসহ্য দুর্গন্ধ আমি টের পাচ্ছি না।

ওর বয়স তখন প্রায় তিন মাস, আর আমি কিনেছিলাম ওকে পনের টাকায়। এখন ওর বয়স প্রায় তের বছর আর ভারতের সবটুকু সোনা দিয়েও ওকে কেনা যাবে না।

যখন ওকে বাড়ি আনলাম, ভরপেট খাওয়া, গরম জল আর সাবানের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হল, আমরা ওর সারমেয়শালার নাম 'পিণ্ডা' খারিজ করে

দিলাম। এক বিশ্বাসী বুড়ো কলি কুকুর, যে একবার এক ভীষণ ক্রুদ্ধ মাদী ভাল্লুকের আক্রমণ থেকে ছ বছরের আমাকে এবং আমার চার বছরের ছোট ভাইকে বাঁচায়, তারই স্মৃতিতে ওর নতুন নামকরণ করলাম রবিন।

তৃষ্ণার্ত জমিতে যেমন বৃষ্টিপাতে ফল হয়, নিয়মিত আহারে রবিনের তেমনই হল এবং বালক আর কুকুরছানার শিক্ষারম্ভে 'বড় আগেভাগে হচ্ছে' বলে কিছু নেই—এই নীতিবশে; ওর থেকে খানিক দূরে সরে গিয়ে ওকে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দে অভ্যস্ত করাবার ইচ্ছেয়, ও আমাদের সঙ্গে কয়েক হপ্তা কাটাবার পরই এক সকালে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে।

আমাদের জমিজমার শেষ প্রান্তে আছে কয়েকটি ঘন কাঁটাঝোপ, যখন সেগুলো বেড় দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি, একটা ময়ূরী উড়ে ওপরে উঠল। রবিন আমাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছিল, ওর কথা সম্পূর্ণ ভুলে মেরে দিয়ে আমি গুলি করে পাখিটাকে ঝটপটিয়ে নিচে নামালাম। ওটা ধপ করে পড়ল কাঁটাঝোপে এবং ওকে ধাওয়া করে রবিন ছুটে ঢুকে গেল ভেতরে। আমার ভেতরে ঢোকার পক্ষে ঝোপগুলি বড় বেশি ঘন আর কাঁটাবোঝাই। তাই আমি ওগুলো বেড় দিয়ে দৌড়ে গেলাম ঝোপের পাশ বরাবর দূরে। সেখানে ঝোপগুলোর ওপারে ফাঁকা জমি এবং তারও ওপারে আবার গাছ ও ঘাসের নিবিড় বন; জানতাম জখম পাখিটা ওই দিকপানেই ছুটবে। সকালের রোদে ফাঁকা জমিতে বান ডেকেছে আর মুভি ক্যামেরায় সসজ্জ থাকলে পরে এক বিরল ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে যেতাম আমি।

ময়ূরীটি এক বৃদ্ধ পাখি, ঘাড়ের পালকগুলো ওর সমকোণ রচনা করে উঠে আছে, একটা ডানা ভাঙা, ও দৌড়চ্ছিল গাছের জঙ্গলের দিকে। শরীরের পেছন ভাগটি মাটিতে সেটে রবিন ওর লেজ কামড়ে ধরেছিল আর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টান খেতে খেতে যাচ্ছিল সঙ্গে। সামনে দৌড়ে গিয়ে বেজায় বোকার মত আমি পাখিটার গলা চেপে ধরলাম আর ওকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধরলাম। তাতে সঙ্গে সঙ্গে ও দুই পা ছুঁড়ল আর রবিনকে ডিগবাজি খাইয়ে ফেলে দিল দূরে। এক লহমায় সামলে নিয়ে উঠে পড়ল রবিন আর আমি যখন মরা পাখিটাকে শুইয়ে রাখলাম, একবার ওর মাথায়, একবার লেজে ছোট ছোট ঠোক্না মারতে মারতে ও ওটাকে ঘিরে নেচে বেড়াতে লাগল।

সে সকালের মত পাঠ সমাপ্ত হয়েছিল এবং যখন বাড়ি ফিরছি, আমাদের মধ্যে কে যে বেশি গর্বিত তা বলা কঠিন হত—রবিন, তার প্রথম পাখিটি বাড়িতে আনছে বলে, না একটা নোংরা ঝুড়ি থেকে আমি এক লড়াকু-রুস্তমকে তুলে নিয়েছিলাম বলে। শিকারের মৌসুম তখন শেষ হয়ে আসছে এবং পরের কয়দিন রবিনকে খুঁজে তুলে আনার জন্যে কোয়েল, ঘুঘু আর মাঝেসাঝে একটা তিতিরের চেয়ে বড় কিছু দেওয়া হল না।
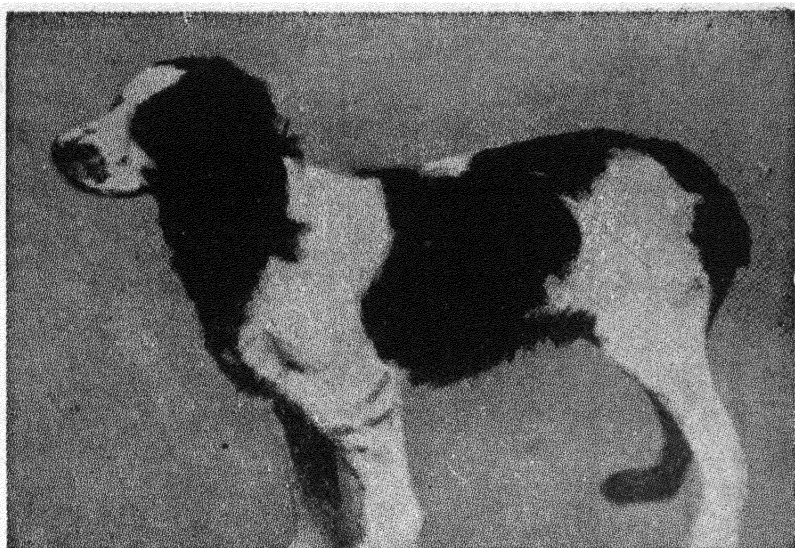
রবিন।
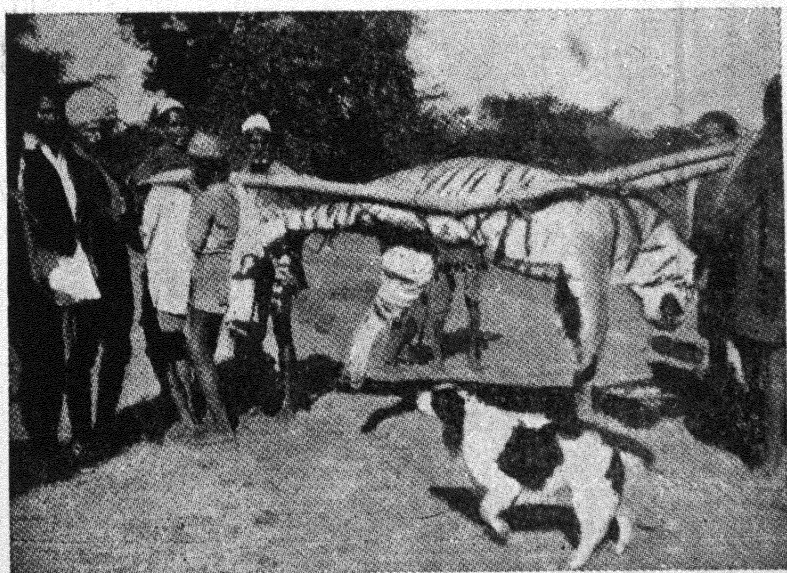
রবিন কুঁয়ার সাবকে বাড়িতে আনল।

গ্রীষ্মটা আমরা পাহাড়েই কাটালাম, এবং পাহাড়ের পাদদেশে নভেম্বরে বাৎসরিক ঠাঁইবদলের সময়ে, সুদীর্ঘ পনের মাইল পথযাত্রার শেষ ভাগে আমরা যেমন একটি হঠাৎ-ঘুরন্ত মোড় ঘুরেছি, পাহাড়ের গা থেকে লাফিয়ে নামল হনুমানদের একটা বড়-সড় দলের একটি, এবং রবিনের নাকের ক ইঞ্চি সামনে দিয়ে পথটা পেরোল। আমার শিস উপেক্ষা করে, যে পাশে খাদ, সে পাশ দিয়ে রবিন ছুটল হনুমানটার পেছনে, ওটা তড়িঘড়ি এক গাছে চড়ে নিরাপত্তা খুঁজল। এখানে সেখানে কয়েকটি গাছ, জমিটি ফাঁকা।—ত্রিশ বা চল্লিশ গজ খাড়াই নেমে গিয়ে আবার নিচের উপত্যকায় খাড়া উৎরাইয়ে নেমে যাবার আগে কয়েক গজের মত জমিটা সমতল।

এই সমতলের ডান পাশে কয়েকটি ঝোপ, সেগুলির মধ্য দিয়ে চলে গেছে একটি গভীর নালা, সেটি তৈরি হয়েছে যেখান দিয়ে বৃষ্টির জল বয়ে যাবার সময়ে মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে। ঝোপগুলোতে রবিন ঢুকতে না ঢুকতে বেরিয়ে এল। কান পেছনপানে লেপটে, লেজ গুটিয়ে ছুটতে লাগল প্রাণভয়ে। এক অতিকায় চিতা তার পেছনে লাফাতে লাফাতে ছুটছে এবং প্রতি লাফে ওর নিকটতর হচ্ছে।

আমি বে-হাতিয়ার আর ফুসফুসের সবটুকু দম দিয়ে 'হো' আর 'হুর্' চেঁচিয়েই আমি যা পারলাম, করলাম। এম-এর ডান্ডা-বাহী লোকজন তাতে সর্বশক্তিতে যোগ দিল, হট্টগোল উঠল চূড়ান্তে যখন একশো বা তারও বেশি হনুমান এর সঙ্গে যোগ করল বিভিন্ন পর্দায় তাদের বিপদজ্ঞাপক ডাক। পঁচিশ বা ত্রিশ গজ অবাধ চলল এই দৌড়বাজি এবং অসম রেস আর চিতাটি যেই রবিনের নাগালের মধ্যে পৌঁছল, কোন কারণ ব্যতিরেকেই সে বেগে চট ঘুরল এবং উধাও হয়ে গেল উপত্যকায়। ওদিকে রবিন পাহাড়ের এক ঢাল ঘুরে রাস্তায় আবার মিলিত হল আমাদের সঙ্গে। এই এক চুলের জন্যে প্রাণে-বাঁচা থেকে রবিন দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করে, তা সে পর-জীবনে কখনো ভোলে নি। প্রথম, হনুমানদের ধাওয়া করা বিপজ্জনক; দ্বিতীয়, কোন হনুমানের বিপদজ্ঞাপক ডাক এক চিতার উপস্থিতির জানান দেয়।

ওর শিক্ষায় যেখানে বাধা পড়ে, রবিন আবার বসন্তকালে সেখান থেকে শুরু করল, কিন্তু শীঘ্রই পরিষ্কার জানা গেল যে প্রথম জীবনের অবহেলা ও উপবাস ওর হার্টকে জখম করেছে, কেননা এখনও সামান্যতম পরিশ্রমের পরই অজ্ঞান হয়ে যায়।

যখন তার প্রভু বাইরে বেরোন, তখন বাড়িতে পড়ে থাকার চেয়ে নৈরাশ্যজনক শিকারী কুকুরের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। এখন পাখি শিকার রবিনের কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাই আমি যখন বড় জানোয়ার শিকারে বেরোতাম, ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে শুরু করলাম। হাঁস যেমন তড়িঘড়ি জলে অভ্যস্ত

হয়, ও তেমনি অভ্যস্ত হল শিকারের এই নতুন রীতিতে আর তখন থেকে যখনি আমি রাইফেল হাতে বেরিয়েছি, ও আমার সঙ্গে থেকেছে।

খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়া, চিতা অথবা বাঘের পদচিহ্ন খুঁজে নেওয়া এবং তা অনুসরণ করা, এই রীতিতে আমরা চলি। যখন থাবার ছাপ দেখা যায়, আমি খোঁজ চালাই, আর আমবা যে জানোয়ারের পিছু নিয়েছি তা যখন জঙ্গলে ঢুকে যায়, রবিন খোঁজ চালায়। এভাবে জানোয়ারটিকে পেয়ে যাবার আগে আমরা কখনো মাইলের পর মাইলও একটি জানোয়ারকে অনুসরণ করেছি।

মাচানে অথবা হাতির পিঠ থেকে নিচে জানোয়ারকে গুলি করা হয় যখন, তখনকার চেয়ে পায়ে হেঁটে শিকাবকালে একটি জানোয়ারকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা অনেক বেশি সোজা। একটা কথা, যখন জখম জানোয়ারকে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করতে হবে, তখন আনতাবড়ি গুলি মারা চলে না। আরেক কথা কি, ওপর থেকে নিচে গুলি করার চেয়ে জানোয়ার যেখানে আছে, মাটির সেই সমান স্তর থেকে গুলি করলে শরীরেব জরুরী অংশগুলি অনেক বেশি বিঁধবার নাগালেব মধ্যে থাকে।

যাই হ'ক, গুলি ছোঁড়া বিষয়ে সর্বোত্তম যত্ন নেওয়ার পরেও কোন কোন সময়ে আমি চিতা ও বাঘকে শুধু জখমই করেছি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় গুলিতে খতম হবার আগে তারা উন্মত্ত তাণ্ডব করে বেড়িয়েছে, আর যত বছর আমরা একসঙ্গে শিকার করে বেড়িয়েছি, তার মধ্যে মাত্র একবাব রবিন আমাকে বিপদের ভেতর ফেলে পালিয়েছিল।

সেদিন কিছুক্ষণ অনুপস্থিতির পর যখন ও আমার কাছে ফিরে আসে, আমরা ঠিক করেছিলাম ব্যাপারটির ইতি এখানেই, আর কখনো সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হবে না। তবে আমরা এখন আবো বুড়িয়েছি, সম্ভবত এখন আমাদের ভাবপ্রবণতাও কমেছে। আর রবিন—ও ত কুকুরদের চূড়ান্ত আয়ুসীমা সত্তর পেরিয়েছে, এখন যখন লিখছি, আমার পায়ের কাছে শুয়ে আছে ও, আর সে বিছানা ছেড়ে ও কোনদিন উঠবেও না—বিজ্ঞ বিজ্ঞ বাদামী চোখের হাসিতে আর ছোট্ট বেঁটে লেজের নাড়ায় ও আমাকে অনুমতি দিচ্ছে এগিয়ে এসে আপনাদের সে কাহিনী বলতে।

চিতাটি সে নিবিড় ঝোপ-জঙ্গল থেকে একেবারে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর বাঁ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন পানে না-তাকানো অব্দি আমরা ওকে দেখি নি।

চিতাটি এক অতিকায় মদ্দা, চামড়া চমৎকার গাঢ় রঙা, চকচকে, চামড়ার কালো বুটিগুলো দামী ভেলভেটের ওপর সুস্পষ্ট নক্শার মত জ্বলজ্বলে। কোন তাড়াহুড়ো না করে এক স্থির লক্ষ রাইফেলে ওর ডান কাঁধে গুলি ছুঁড়লাম আমি পনের গজের হ্রস্ব পাল্লায়।

কত অল্পের জন্যে ওর হার্ট ফসকে ফেললাম তাতে এসে যায় না কিছু এবং পঞ্চাশ গজ দূরে বুলেট যখন ধুলো ওড়াচ্ছে, ও তখন শূন্যে, উঁচুতে এবং যে ঘন ঝোপ-জঙ্গল থেকে এক মিনিট আগে বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যেই পড়ল ও ধপ করে ডিগবাজি খেয়ে। বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ গজ অব্দি ও ঝোপের ভেতর দিয়ে হুড়মুড় করে চলেছে শুনলাম আমরা এবং তারপর যেমন অতর্কিতে আওয়াজটা শুরু হয়েছিল, তেমনি অতর্কিতে তা থেমে গেল। এই সহসা শব্দে বিরতিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: হয় কাবু হয়ে চলতে চলতেই পড়ে গিয়ে মরেছে ও, নয় পঞ্চাশ গজ দূরে পেঁছে গেছে ফাঁকা জমিতে।

সেদিন অনেক দূর অব্দি চলে গিয়েছিলাম আমরা। সূর্য তখন অস্ত যাবার মুখে আর আমরা তখনো বাড়ি থেকে চার মাইল দূরে। জঙ্গলের এদিকটায় মানুষের পা ঘনঘন পড়ে না এবং রাতে সে পথে কেউ যাবার কোনো সম্ভাবনা দশ লক্ষে একবারটিও নেই। চিতাটিকে রেখে চলে যাওয়ার শেষ এবং সর্বোত্তম কারণ হল এম নিরস্ত্র। একে একা ফেলে রেখেও যাওয়া যায় না, আবার জখম জানোয়ারটির অনুসরণেও নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমরা উত্তর দিকে ঘুরে বাড়ির পথ ধরলাম। জায়গাটি চিহ্ন করে রেখে যাবার দরকার ছিল না আমার, কেননা প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়কাল ধরে আমি এই জঙ্গলগুলির ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছি দিনে, প্রায়ই রাতেও, এবং চোখ বেঁধে দিলেও ও-জঙ্গলের যে কোন অংশে পথ খুঁজে পেতে পারি আমি।

রবিন আমাদের সঙ্গে আগের সন্ধ্যায় ছিল না, এবং পরদিন সকালে, রাত সরে গিয়ে সবে যখন দিনকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, আমি আর রবিন হাজির হলাম সেই জায়গাটিতে, যেখান থেকে আমি গুলি ছুঁড়েছিলাম। রবিন চলছিল আগে, যেখানে চিতাটি দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার জমি ও অত্যন্ত হুঁশিয়ারীতে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বাতাস শুঁকতে শুঁকতে ও এগলো ঝোপঝাড়ের কিনারায় পড়ার সময়ে সেখানে চিতাটি বড় বড় ছোপ ফেলে গেছে রক্তের। জখমটি কোথায় হয়েছে তা নিশ্চিত জানবার জন্যে সে রক্ত পরীক্ষা করে দেখার কোন প্রয়োজন ছিল না আমার, কেন না আমি বুলেটটি বিঁধতে দেখেছি এবং ওপাশে দূরে সেই ধুলো ছিটকে ওঠাই হল প্রমাণ, বুলেটটি জানোয়ারটির শরীর ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

রক্তের নিশানা অনুসরণ করার দরকার পরে হতে পারে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে, অন্ধকারে চার মাইল পথ হাঁটার পর সামান্য বিশ্রামে ক্ষতি নেই কোনো, এবং অপরপক্ষে তা আমাদের পক্ষে খুব মূল্যবান বলেও প্রমাণিত হতে পারে। সূর্য এখন উঠি উঠি এবং এই নবীন প্রত্যূষে জঙ্গলের সকল প্রাণীরা এখন চলাফেরা করছে। আরো এগোবার আগে, জখম জানোয়ারটির প্রসঙ্গে ওদের কি বলবার আছে তা শোনা উচিৎ কাজ হবে।

কাছেই একটি গাছের নিচে পেয়ে গেলাম একটি শুকনো জায়গা, শিশিরে সে জায়গাটা ভিজে যায় নি। রবিন শুয়ে পায়ের কাছে, সিগারেটটি শেষ করেছি আমি, তখন আমাদের সামনে বাঁদিকে প্রায় ষাট গজ দূরে প্রথমে একটি, তারপর দ্বিতীয়টি, তারপর তৃতীয়টি, চিতল হরিণী ডাকতে শুরু করল। রবিন উঠে বসল, আস্তে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইল, আমার চোখের ইশারা বুঝে তেমনি সন্তর্পণে যেদিকে হরিণীরা ডাকছে, সেদিকে মাথা ঘোরাল। যেদিন প্রথম ও হনুমানের বিপদজ্ঞাপক ডাক শোনে সেদিনের পর থেকে ওর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে এবং সব প্রাণীর মত রবিনও ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে হরিণীরা জঙ্গলে অন্য সব প্রাণীদের চিতার উপস্থিতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী করে দিচ্ছে।

চিতলগুলি যে ভাবে ডাকছিল তাতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছিল চিতাটিকে ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আরেকটু ধৈর্য ধরলে ওরা বলে দেবে সেটা বেঁচে আছে কি না। ওরা মিনিট পাঁচেক ডেকেছে, তারপর হঠাৎ একবার সবাই ডেকে উঠল এক সঙ্গে, তারপর ফিরে গিয়ে আগের পর্যায়ে ডাকতে থাকল; চিতাটি জীবিত আছে, সে নড়াচড়া করেছে, এখন আবার স্থির হয়ে বসেছে। চিতাটি কোথায় আছে তা শুধু জানা দরকার আমাদের আর চিতলগুলির পিছু নিলে আমরা সে খবর পেতে পারি।

হাওয়া উজিয়ে পঞ্চাশ গজ চলে আমরা সেই নিবিড় ঝোপে-জঙ্গলে ঢুকলাম আর হরিণগুলিকে অনুসরণ করতে থাকলাম—খুব কঠিন কাজ নয়, কেন না বেড়ালের মত নিশ্চুপে রবিন যে কোন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে পারে, আর কোথায় যে পা ফেলতে হবে, অনেক দিনের অনুশীলন আমাকে তা শিখিয়েছে। ওদের কয়েক ফুটের মধ্যে না পৌঁছনো অব্দি চিতলগুলিকে দেখা যায় নি। ওরা দাঁড়িয়েছিল ফাঁকায়, চেয়েছিল উত্তর পানে। আমি যতদূর বুঝতে পারলাম, যে দিকে আগের সন্ধ্যায় হুড়মুড় শব্দ থেমে গিয়েছিল, ঠিক সেদিকেই চেয়েছিল।

এখন পর্যন্ত চিতলগুলি আমাদের প্রভূত সহায়তায় এসেছে। ওরা আমাদের বলে দিয়েছে চিতাটি শুয়ে আছে ফাঁকায়, ও বেঁচে আছে, এখন ওরা আমাদের দিক বাতলে দিল। একঘণ্টা সময়কালের বেশির ভাগটাই আমাদের লেগে গেল এই খবর যোগাড় করতে এবং এখন যদি চিতলগুলি আমাদের দেখে ফেলে আর আমাদের উপস্থিতি বিষয়ে জঙ্গলে প্রাণীদের সতর্ক করে দেয়, এ পর্যন্ত যে উপকার করেছে এক সেকেণ্ডে তা নস্যাৎ করে দেবে।

পায়ে পায়ে ফিরে গিয়ে ডাকন্ত হরিণদলের নিচের জমি দিয়ে গিয়ে ওদের পিছন থেকে গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করা, অথবা চিতার ডাক ডেকে ওদের আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া, কোনটি বেশি ভাল হয় এই নিয়ে যখন ভাবছি—তখন একটি হরিণী মাথা ফেরাল, সিধে চাইল আমার চোখে চোখে। পর

মুহূর্তে চীৎকার করে 'সাবধান ! মানুষ !' জানিয়ে দিয়ে যত জোরে পারে ছুটে পালাল ওরা। ফাঁকা জমিতে পেঁছিতে তখন আমার মাত্রই পাঁচগজ দৌড়বার আছে, কিন্তু আমি যতই চট্‌জল্‌দি হই না কেন, চিতাটি আরো চট্‌জলদি এবং আমি ওর শরীরের পশ্চাৎভাগ আর লেজটি কয়েকটা ঝোপের পেছনে উধাও হতে দেখবার সময় পেলাম শুধু। চিতলগুলি অত্যন্ত কার্য-কারিতায় আমার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে ; আর চিতাটিকে এখন ফিরে আবার খুঁজে বের করে ধরে ফেলতে হবে- এবার সে কাজ করতে হবে রবিনকে।

চিতাটিকে স্থির হয়ে বসার সময় দিতে, যাবার সময়ে ও নিজের গায়ের যে গন্ধ রেখে গেছে বাতাসে, আমাদের পেরিয়ে সে গন্ধকে বয়ে চলে যেতে দিতে, আমি ফাঁকা জমিটিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়েক মিনিট। তারপর রবিনকে নিয়ে গেলাম বাতাসের গতিপথ পেরিয়ে. বাতাস বইছিল উত্তর থেকে। আমরা যাট কি সত্তর গজ গেছি, রবিন ছিল আগে, ও থেমে গেল আর বাতাসের মুখোমুখি হতে ঘুরে দাঁড়াল। জঙ্গলে রবিন মূক হয়ে থাকে আর নার্ভের ওপর চমৎকার নিয়ন্ত্রণ আছে ওর। তবে একটি নার্ভ ওর পেছনের পা দুটির পিঠ দিয়ে নেমে গেছে। যখন ও এক চিতার দিকে চেয়ে থাকে অথবা চিতার গায়ের গন্ধ যখন তাজা এবং কড়া, তখন সে নার্ভটিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সেই নার্ভটি এখন কুঁচকে শিউরে উঠছে এবং পেছনের পায়ের ওপর-অংশের লম্বা লোমগুলোয় নাড়া দিচ্ছে।

গত গ্রীষ্মে, বহু সংখ্যক গাছ উপড়ে ফেলে এক অত্যন্ত উন্মত্ত ঘূর্ণিঝড় জঙ্গলের এ অংশটিতে আঘাত হেনেছিল ; রবিন এখন চেয়েছিল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে চল্লিশ গজ দূরে, সেই ঝড়ে উপড়ে ফেলা একটি গাছের দিকে। গাছটির ডালগুলো আমাদের দিকে, গুঁড়িটির দুপাশে পাতলা ঝোপ এবং বিক্ষিপ্ত বেঁটে ঘাসের গোছা।

অন্য যে কোনো সময়ে রবিন আর আমি সোজা ছুটে যেতাম শিকারের দিকে। কিন্তু এবারটা সামান্য একটু বাড়তি সাবধানতা দরকার ছিল। জখম হলে যে কারো তোয়াক্কা করে না এমন এক জন্তুর সঙ্গেই শুধু মোকাবিলা করছি না আমরা ; তার ওপরে, আমরা একটি চিতার সঙ্গে মোকাবিলায় নেমেছি, যে মানুষের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভকে জীইয়ে রাখতে পনের ঘণ্টা সময় পেয়েছে। ফলে তার সহজাত লড়িয়ে প্রবৃত্তিগুলি সবই পরিপূর্ণ জেগে উঠেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আগের সন্ধ্যায় যে ২৭৫ রাইফেলটি ব্যবহার করেছিলাম, এ সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ে সেটিই তুলে নিয়ে চলে এসেছি। যখন বহু মাইল পথ হাঁটতে হবে তখন বইবার পক্ষে এ রাইফেল ভাল, কিন্তু এক জখমী চিতার সঙ্গে

মোকাবিলা করবার সময়ে এ হাতিয়ার কেউ বেছে নেবে না। তাই সরাসরি না এগিয়ে আমি এমন একটি পথ ধরলাম যা আমাদের পতিত গাছটির সমান্তরালে, ওটির পনের গজ দূরে দিয়ে নিয়ে যাবে।

রবিন রইল আগে, পায়ে পায়ে আমরা একই লাইনে চললাম। ডালগুলো পেরিয়েছি, পৌঁছিয়েছি গুঁড়িটির উলটো দিকে, তখন রবিন দাঁড়িয়ে গেল। ওকে নজর করে নিশানা বুঝে নিয়ে আমি অচিরে দেখলাম কিসে ওর চোখ টেনেছে—চিতাটির লেজের ডগা ধীরে উঠল, তেমনি ধীরে নিচে নামল, আক্রমণ করার আগে সর্বদা চিতা এই হুঁশিয়ারীই দিয়ে থাকে।

গোড়ালি ভর করে বোঁ করে ডাইনে ঘুরে গিয়ে আমি রাইফেলটি কাঁধে তুলেছি মাত্র, তখনি চিতাটি মধ্যপথের ঝোপগুলো দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলিটি ছুঁড়লাম, ওকে মেরে ফেলা এমন কি আঘাত হানার আশাতেও নয়, ওকে লক্ষ্যচ্যুত করে দেবার জন্যে —তা বেরিয়ে গেল ওর পেটের তলা দিয়ে এবং ওর বাঁ উরুর মাংসল অংশ ফুটো করে চলে গেল। জখমের চেয়েও রাইফেলের আওয়াজেই, কাজ হল। আমাকে স্পর্শমাত্র না করে আমার ডান কাঁধ পেরিয়ে বাধ্য হয়ে বেঁকে চলে গেল চিতাটি। আর আমি আরেকটি গুলি মারতে পারার আগেই ও ওপারের ঝোপে উধাও হল।

আমার পায়ের কাছ থেকে নড়ে নি রবিন, আর যে জমির ওপর দিয়ে চিতাটি গেল, আমরা এক সঙ্গে তা পরখ করে দেখলাম। প্রচুর রক্ত দেখলাম আমরা, কিন্তু চিতাটির প্রচণ্ড লাফঝাঁপের ফলে পুরনো জখমগুলোর মুখ ছিঁড়ে তা পড়েছে, না নতুন গুলি লাগার ফলে, তা বলা অসম্ভব। যাই হ'ক, তাতে রবিনের এসে গেল না কিছু, সে এক লহমাও ইতস্তত না করে নিশানা ধরে নিল। নিবিড় ঝোপের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর আমরা পৌঁছলাম হাঁটু সমান উঁচু ঝোপে-জঙ্গলে, তারপর দুশো গজ খানেক এগিয়েছি, তখনি আমাদের সামনে চিতাটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম আর ওর দিকে রাইফেলটি তাক করতে পারার আগেই ও উধাও হল একটি ল্যানটানা ঝোপের নিচে। ঝোপটির ডালপালা মাটিতে বিছানো এবং সেটি একটি কামরা-তাঁবুর মত বড়। চিতাটিকে গা-ঢাকা দেবার এক আদর্শ স্থানই দেয় নি ঝোপটি, তার ওপরেও চিতাটির পরবর্তী আক্রমণ শুরু করার সব সুযোগ সুবিধাই হাতে তুলে দিয়েছে।

সকালের অ্যাডভেঞ্চারে আমি এবং রবিন খুব ভালই উৎরেছি, আমি সশস্ত্র হলেও চিতাটিকে আরো দূর ধাওয়া করা এখন বোকামিই হত, তাই বেশি ঝামেলা না বাড়িয়ে আমরা পেছন ফিরে বাড়ির পথ ধরলাম।

পরদিন সকালে আমরা লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে এলাম। খুব ভোর থেকেই

রওনা হবার জন্যে গোলমাল জুড়েছিল রবিন। সকালে বেলা জঙ্গলে যে কত বিচিত্র গন্ধ, সম্ভব হলে, সব উপেক্ষা করে ও আমাকে সে চার মাইল দৌড়ে পার করিয়ে ছাড়ত।

একটি ৪০০/৪৫০ রাইফেলে সজ্জিত করেছি নিজেকে, ফলে আগের দিন যেমন, তার চেয়ে অনেক খুশি বোধ হচ্ছিল। আমরা যখন ল্যানটানা ঝোপটি থেকে বহু শত গজ দূরে তখন রবিনকে গতিবেগ কমিয়ে সাবধানে এগোতে বাধ্য করলাম, কেননা বহু ঘণ্টা আগে যেখানে এক জখমী জানোয়ারকে ছেড়ে আসা হয়েছে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে এ ধরে নেওয়া কখনো নিরাপদ নয়। নিচের মর্মান্তিক ঘটনাটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

আমার পরিচিত এক শিকারী এক অপরাহ্নে একটি বাঘকে জখম করেন, এবং এক উপত্যকায় বহু মাইল ধরে রক্তের নিশানা অনুসরণ করেন। যে জায়গায় নিশানা-অনুসরণ ছেড়েছেন সেখান থেকে তা আবার শুরু করার জন্যে পরদিন সকালে একদল লোকসহ রওনা হলেন তিনি, ওদের মধ্যে একজন ওঁর গুলিবিহীন রাইফেল নিয়ে পথ দেখিয়ে চলছিল। পূর্বাহ্নের রক্তের নিশানার ওপর দিয়েই ও চলছিল। যেখানে বাঘটিকে ছেড়ে আসা হয়, সেখান থেকে ওরা তখনো এক মাইল দূরে ; সামনের লোকটি হল স্থানীয় শিকারী—সে জখম বাঘটির উপর গিয়ে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে, এবং নিহত হয়। দলের বাকি সবাই পালায়, কয়েকজন গাছে উঠে পড়ে ও অন্যরা স্রেফ পালিয়ে যায়।

ল্যানটানা ঝোপটির নির্ভুল অবস্থিতি আমি দেখে রেখেছিলাম, এখন রবিনকে নিয়ে গেলাম একটি লাইন ধরে, সেটি ঝোপটির যে দিকটি আচ্ছাদিত, বহতা-বাতাসের বিপরীত, সে দিকটির কয়েক গজ ধরে যায়। বাতাসের স্রোত কেটে পার হয়ে এক জানোয়ারের অবস্থিতি হদিশ করবার এ-কৌশল বিষয়ে যা কিছু জানবার যোগ্য তা রবিন জানে। আর আমরা তখন স্বল্প পথই গিয়েছি, ঝোপটি থেকে তখনো আমরা একশো গজ দূরে, তখন সে দাঁড়াল, ফিরল. বাতাসের মুখোমুখি হল এবং আমাকে বুঝিয়ে দিল ও চিতাটির গন্ধ পাচ্ছে।

আগের দিনের মতই ও এক শায়িত গাছের মুখোমুখি। চিতাটি আমাদের আক্রমণ করার পর, যে নিবিড় ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা ওকে ল্যানটানা ঝোপ অব্দি অনুসরণ করেছিলাম, গাছটি একই সঙ্গে সেই ঝোপেরই কিনারেও, সমান্তরালেও। গাছটির যে দিকটি আমার দিকে, সেখানে জমি ফাঁকা কিন্তু দূরের দিকটায় কোমর-সমান ব্যাসোনটা ঝোপের নিবিড় বন। আমাদের প্রথমের লাইনটি ধরে চলার জন্যে রবিনকে ইশারা জানিয়ে আমরা ল্যানটানা ঝোপটি পেরিয়ে চলে গেলাম আর সে ঝোপে রবিন কোন আগ্রহই দেখাল না, চলে এল বৃষ্টির জলে ভাসিয়ে নেওয়া একটি খালে। এখানে আমার কোট খুলে ফেলে, সেলাইয়ে যতটা ভার সয়, কোটে ততগুলো পাথর ভরে নিয়ে

এই অভিনব ঝোলা কাঁধের ওপিঠে ঝুলিয়ে গাছের কাছের ফাঁকা জমিতে ফিরে এলাম।

পাথর নামিয়ে কোট পরে নিয়ে, মুহূর্তে ব্যবহারের জন্যে রাইফেলটি প্রস্তুত রেখে আমি গাছটি থেকে পনের গজ দূরে স্বস্থানে দাঁড়ালাম এবং প্রথমে গাছটির ওপর, তারপর গাছ থেকে দূরের দিকের ঝোপগুলিতে পাথরগুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। উদ্দেশ্য—যেখানে আমি ওর মোকাবিলা করতে পারব, সেই ফাঁকা জমিতে তেড়ে বেরিয়ে আসতে চিতাটিকে বাধ্য করা। ও এখনো জীবিত তা ধরে নিয়েই অবশ্য পাথর ছুঁড়ছি। আমার গোলাবারুদ সব ফুরিয়ে গেলে আমি কাশলাম, হাততালি দিলাম, চেঁচালাম, কিন্তু কি সে বোমাবর্ষণের সময়ে, কি তার পরে, ও বেঁচে আছে তা বোঝাতে চিতাটি নড়ল না—কোন আওয়াজও করল না।

সিধে গাছটি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওর দূরের দিকটায় চেয়ে দেখলে এখন আমার ঠিক কাজই করা হয় বটে, কিন্তু মনে পড়ল একটি পুরনো জঙ্গুলে শাহীবাত, 'ছাল না ছাড়ানো অব্দি চিতা মরেছে এ ধরে নেওয়া কখনোই নিরাপদ নয়।' আমি গাছটিকে চক্কর দিতে শুরু করলাম, উদ্দেশ্য—ডালগুলির ঠিক তলাটা এবং গুঁড়িটার দৈর্ঘ্যের আগা থেকে গোড়া দেখতে না পাওয়া অব্দি চক্করটি ছোট করে আনতে থাকব। প্রথম চক্করটির বৃত্তসীমা ঠিক করলাম প্রায় পঁচিশ গজ, এবং বৃত্তপথে দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত গেছি, তখন রবিন দাঁড়িয়ে গেল। কিসে ওর মনোযোগ আকর্ষিত হল তা দেখার জন্যে আমি নিচের দিকে চেয়েছি, পরপর গুরুগম্ভীর ও ক্রুদ্ধ গর্জন হল এবং চিতাটি সিধে আমাদের উদ্দেশ্যে তেড়ে এল। আমি শুধু দেখতে পেলাম, আমাদের পানে তাক করে এক সিধে লাইন বরাবর ঝোপ-জঙ্গলটি আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে থাকল আর বাঁই করে ডাইনে আধা পাক খাবার ও রাইফেলটি তুলে ধরবার সময়টুকুই পেলাম শুধু; তখন কয়েক ফুট দূরে চিতাটির মাথা ও কাঁধটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল।

ওর ঝাঁপিয়ে পড়া ও আমার গুলি ছোঁড়া একই সময়ে ঘটল, আর ও যেমন আমাকে পেরিয়ে চলে গেল, তেমনি আমি বাঁ দিকে পাশে সরে গিয়ে যদ্দুর পারি পিছন পানে হেলে আমার কোমরের কাছে রাইফেল ধরে দ্বিতীয় ব্যারেলটা থেকে গুলি ছুঁড়লাম।

কোন জখম জানোয়ার, তা সে চিতাই হ'ক বা বাঘই হ'ক, সে যখন মাথাবরাবর ঝাঁপ দেয় এবং উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়, সর্বদাই, বিনা ব্যতিক্রমে সে সামনে চলে যেতে থাকে, আর আবার উত্ত্যক্ত করা না হলে ফিরে এসে আক্রমণ করে না।

রবিনকে মাড়িয়ে-দেওয়া এড়াতেই বাঁ পাশে সরে গিয়েছিলাম আমি। আর

এখন যখন তাকে খুঁজতে নিচের দিকে চাইলাম, কোথাও দেখা গেল না ওকে। যত বছর ধরে আমরা একসঙ্গে শিকার করছি, এই প্রথম এক সংকটকালে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, আর ও বোধহয় এখন বাড়ি ফেরার পথ খুঁজতে চেষ্টা করছে—মধ্যবর্তী চার মাইল জঙ্গলে ওর জন্যে যত বিপদ অপেক্ষা করে আছে, সেগুলি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা অতীব সামান্য। জঙ্গলটি বাড়ি থেকে দূরে হওয়ার দরুন, এটির সঙ্গে ও পরিচিত নয়, আর সেখানে ওকে যেসব স্বাভাবিক বিপদের মুখোমুখি পড়তে হতে পারে, তার ওপরে আছে ওর হার্টের দুর্বল অবস্থা কারণে শঙ্কা।

তাই প্রবল উদ্বেগ ওর খোঁজ নেবার জন্যে আমি পেছনে ফিরলাম আর যখন ফিরেছি, চোখে পড়ল মাত্র একশো গজ দূরে একটি ছোট ফাঁকা জমির কিনারে একটি গাছের গুঁড়ির পেছন থেকে ওর মাথাটি বেরোচ্ছে। হাত তুলে যখন ইশারা করলাম, ও ঝোপ-জঙ্গলে অন্তর্ধান করল, তবে একটু বাদে, চোখ নামিয়ে কান ঝুলিয়ে ও নীরবে আমার পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল। রাইফেল নামিয়ে রেখে ওকে তুলে নিলাম কোলে। জীবনে এই দ্বিতীয়বার ও আমার মুখ চেটে দিল চাটতে চাটতে গলার ছোট ছোট শব্দে ও বলে চলল, আমাকে অক্ষত দেখে ও কত খুশি হয়েছে, আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবার জন্যে ও কি ভীষণ লজ্জিত নিজের আচরণে!

যে অপ্রত্যাশিত বিপদ আকস্মিকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাতে আমাদের দুজনের আচরণ যেন দৃষ্টান্তের মত বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে-বিপদ ভয় দেখাচ্ছে তা যদি কানে-শোনা যায়, চোখে-দেখা না-যায়, তাহলে সে অনিশ্চিত বিপদের মুখে মানুষ কি করে আর কুকুর কি করে। রবিনের ক্ষেত্রে 'বিপদটি', নীরবে দ্রুত পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে ওকে নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য করেছিল; আর আমার বেলা 'বিপদটি' আমার পা দুটো মাটির সঙ্গে আঠার মত সেঁটে দিয়েছিল আর দ্রুত বা যে কোন রকমে পিঠ ফিরিয়ে পালানো অসম্ভব করে তুলেছিল।

আমাদের অস্থায়ী বিচ্ছেদের জন্যে ওকে দোষ দেবার কিছু নেই একথা যখন রবিনকে মন-খুশি করে বোঝাতে সক্ষম হলাম, ওর ছোট্ট শরীরের কাঁপুনি যখন থামল, ওকে নামিয়ে দিলাম। যে চিতাটি এমন হিম্মতে লড়েছে, শেষ দান যে জিতে গিয়েছিল প্রায়, সে যেখানে মরে পড়ে আছে, দুজনে সেখানে এগিয়ে গেলাম।

আমি আপনাদের গল্পটি বললাম, আর যখন বলছিলাম, তার মধ্যেই রাবন -মানুষ সবচেয়ে বিশাল হৃদয়, সবচেয়ে বিশ্বাসী যে বন্ধুকে পেয়েছে—সেই রবিন চলে গেছে আনন্দ-মৃগয়া-ক্ষেত্রে—আমি জানি, সেখানে দেখব সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

চৌগড়ের বাঘগুলি

আমার সামনের দেওয়ালে যে পূর্ব কুমায়ুনের ম্যাপটি ঝুলছে, সেটি অনেকগুলি ক্রস্ চিহ্নে চিহ্নিত এবং প্রতিটি চিহ্নের নিচে একটি করে তারিখ। চৌগড়ের মানুষখেকো বাঘের নিহত মানুষের, হত্যার তারিখ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সরকারী নথিভুক্ত হিসেব বোঝাচ্ছে ওই ক্রস্গুলি। এ হিসেব নির্ভুল এমন দাবি আমি করি না, কেন না দু বছর ধরে আমি ম্যাপটি সম্পূর্ণ করি, আর এ সময়কালে সবগুলো হত্যার খবর আমাকে দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া যে সব মানুষ শুধু জখম হয় ও পরিণামে মারা যায়, ক্রস্চিহ্ন ও দিনাঙ্কে তাদের সম্মানিত করা হয় নি।

প্রথম ক্রসটির দিনাঙ্ক ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৫, এবং শেষটির ২১শে মার্চ ১৯৩০। সীমানাজ্ঞাপক ক্রসগুলির মাঝামাঝি দূরত্ব হল, উত্তর থেকে দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল, এবং পূব থেকে পশ্চিমে ত্রিশ মাইল। ১,৫০০ বর্গমাইলের এই এলাকাটি হল পাহাড় ও উপত্যকা, সেখানে শীতে পড়ে থাকে গভীর তুষার, আর উপত্যকাগুলি গ্রীষ্মে জ্বলে খাক হয়।

এই এলাকা জুড়ে চৌগড়ের বাঘ এক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই অঞ্চল জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আয়তনের গ্রাম। কয়েকটিতে একশো বা তারও বেশি সংখ্যায় মানুষ, অন্যগুলিতে আছে শুধু ছোট ছোট একটি বা দুটি পরিবার। পায়ে চলা পথ সংযুক্ত করেছে গ্রামগুলিকে। মানুষ খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফলে সেগুলি পায়ের চাপে শক্ত হয়ে গেছে। এই পথগুলির কয়েকটি গেছে নিবিড় বনের ভেতর দিয়ে, আর যখন কোনো নরখাদক সে-পথে

চৌগড় মানুষখেকো কর্তৃক নিহত মানুষের সংখ্যা

গ্রাম	সংখ্যা
থালি	১
দেবগুরা	১
বারহোঁ	২
চামোলি	৬
কাহোর	১
আম	২
ডালকানিয়া	৭
লোহার	৮
আঘাউরা	২
পাহাড়পানি	১
পদমপুরী	২
টান্ডা	১
নেসোরিয়া	১
ঝনগাঁও	১
কাবরাগাঁও	১
কালা আগর	৮
রিখাকোট	১
মাটেলা	৩
কুন্দল	৩
বাবিয়ার	১
খানসিউন্	১
গরগারি	১
হয়রাখান্	২
উখলধুংগা	১
পাখার	১
ডুংগার	২
গলনি	৩
	৬৪

বাৎসরিক হিসাব

	নিহত
১৯২৬	১৫
১৯২৭	৯
১৯২৮	১৪
১৯২৯	১৭
১৯৩০	৯
	৬৪

চলাকে বিপজ্জনক করে তোলে, গ্রামে গ্রামে সংযোগ চালু রাখা হয় চেঁচিয়ে। এক বিশাল পাথর, অথবা বাড়ির ছাত, এমনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি লোক কুক্ ছাড়ে প্রতিবেশী গ্রামের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং সে কুক্-ডাকের উত্তর এলে বার্তাটি তীক্ষ্ম ও উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে জানানো হয়। গ্রাম থেকে গ্রামে বার্তাটি ফেরে এবং এক অবিশ্বাস্য রকম সংক্ষিপ্ত সময়কালের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকার সবটুকুতে প্রচারিত হয়।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক জেলা-সম্মেলনে দেখলাম, এই বাঘটি মারতে চেষ্টা করব বলে কথা দিয়ে ফেলেছি। কুমায়ুন ডিভিশনে সে সময়ে তিনটি নরখাদক ছিল এবং যেহেতু চৌগড়ের বাঘটি সর্বাধিক ক্ষতি করেছিল, আমি প্রথমে ওটির উদ্দেশে যাওয়াই স্থির করলাম।

গভর্মেণ্টের দেওয়া সেই ক্রস ও দিনাংক সংবলিত ম্যাপটিতে দেখা গেল কালা আগর শৈলশিরার উত্তর ও পূবমুখের গ্রামগুলিতে মানুষখেকোটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। এই শৈলশিরাটি প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা; এটি উঠে গেছে ৮,৫০০ ফুট অব্দি এবং চূড়ার দিকে এটি নিবিড় বনে ঢাকা। এর উত্তর দিয়ে বরাবর চলে গেছে একটি জঙ্গুলে পথ। কোনো কোনো জায়গায় তা মাইলের পর মাইল গেছে ওক ও রডোড্রেনডনের নিবিড় জঙ্গল দিয়ে। অন্যত্র এটি জঙ্গল ও চাষ-জমির সীমারেখা সৃষ্টি করেছে। এক জায়গায় পথটি দড়ির ফাঁসের মত এক বৃত্ত রচনা করেছে, এই বৃত্তের মাঝে অবস্থিত কালা আগর ফরেস্ট বাংলো।

এই বাংলোটিই ছিল আমার উদ্দিষ্ট এবং ১৯২৯ সালের এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় সেখানে পৌছলাম আমি চার দিনের পদযাত্রার শেষে, শেষ পর্যায়ে ৪,০০০ ফুট খাড়া চড়াই ভাঙার পর।

এ অঞ্চলের শেষ নিহত মানুষ একটি বাইশ বছরের ছেলে। সে তাদের পালিত পশু চরাবার সময়ে নিহত হয়। আমার পৌছবার পরদিন সকালে আমি যখন প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম, যুবকটির ঠাকুমা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে আমাকে জানায়, কোনো প্ররোচনা ব্যতিরেকেই নরখাদকটি পৃথিবীতে তার যে একমাত্র আপনজন ছিল, তাকে মেরেছে। যেদিন ও জন্মায়, সেদিন থেকে শুরু করে ওর নাতির আদ্যোপান্ত ইতিহাস আমাকে বলে, ওর গুণগুলি বারবার তুলে ধরে সে আমাকে, বাঘের টোপ হিসেবে তার তিনটি দুধেল মোষকে নিতে বলল। বলল, ওর মোষের সহায়তায় আমি বাঘটি মারলে পরে ও এই মনে করে সান্ত্বনা পাবে, যে নাতির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ও সহায়তা করেছে।

এই পূর্ণবয়স্ক প্রাণীগুলি আমার কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু ওদের নেবার ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান জানালে আঘাত করা হবে তা জেনে আমি সেই বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাকে আশ্বস্ত করলাম, নৈনিতাল থেকে সঙ্গে

করে যে চারটি বাচ্ছা মন্দা মোষ এনেছি, সেগুলো খতম হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওর কাছে টোপের জন্যে সাহায্যার্থী হব। কাছাকাছি গ্রামের গ্রামমোড়লরা তখন একে একে জড়ো হয়েছে আর তাদের কাছে আমি শুনলাম যে শৈলশিরাটির পূব দিকের ঢালে, বিশ মাইল দূরে একটি গ্রামে দশদিন আগে শেষ দেখা গেছে বাঘটিকে ; সেখানে সে একটি লোক ও তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, খেয়েছে।

দশ দিনের পুরনো নিশানা অনুসরণ করার মত নয় এবং গ্রামমোড়লদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি শৈলশিরার পূর্বদিকে ডালকানিয়া গ্রামের উদ্দেশে রওনা হওয়া স্থির করলাম। কালাআগর থেকে ডালকানিয়া দশ মাইল দূরে, এবং যেখানে সেই লোকটি এবং তার স্ত্রী নিহত হয়েছে সে গ্রামের সঙ্গেও ডালকানিয়ার দূরত্ব সমানই।

ডালকানিয়া এবং তার সংলগ্ন গ্রামগুলি যত সংখ্যক ক্রস্ অর্জন করেছে তা থেকে বোঝা যায় এই গ্রামগুলির কাছাকাছিই বাঘটির প্রধান ঘাঁটি।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমি কালাআগর থেকে রওনা হলাম এবং চললাম জঙ্গলের পথ ধরে ; শুনেছিলাম পথটি আমাকে নিয়ে যাবে শৈলশিরার শেষে। সেখানে আমাকে জঙ্গুলে পথটি ছাড়তে হবে, একটি পথে পাহাড়ের উৎরাইয়ে যেতে হবে ডালকানিয়া। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে শৈলশিরান্ত অবধি চলে যাওয়া এ পথটি খুব কম ব্যবহার হয়। আর চলতে চলতে পথটিতে নিশানা খুঁজতে খুঁজতে বেলা দুটোর সময়ে আমি একটি জায়গায় পৌঁছলাম, সেখানে এসে পথটি শেষ হয়েছে। এখানে এসে ডালকানিয়ার একদল লোকের সঙ্গে দেখা হল। তারা কুক্-ডাক সংযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের গ্রামে আমার ক্যাম্প করার উদ্দেশ্যের কথা শুনেছে এবং শৈলশিরায় এসেছে আমাকে জানাতে—ডালকানিয়ার দশ মাইল উত্তরে একটি গ্রামে একদল মেয়ে যখন শস্য কাটছিল, তাদের বাঘটি আক্রমণ করেছে।

আমার ক্যাম্পের সরঞ্জামবাহী লোকরা আট মাইল হেঁটেছে, আরো হাঁটতে তারা বেশ ইচ্ছুকই ছিল। কিন্তু দশ মাইল দূরের সে গ্রামটির পথ খুব এবড়োখেবড়ো এবং ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তা গেছে—গ্রামবাসীদের কাছে এ খবর জেনে, আমার লোকজনকে ওদের সঙ্গে ডালকানিয়া পাঠাবার এবং বাঘের আক্রমণস্থলে একা যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

আমার ভৃত্য তখনি আমার জন্যে ভরপেট খানা পাকাতে ব্যস্ত হল এবং ভরপেট খেয়ে বেলা তিনটেয় আমি দশ মাইল হাঁটা পথে রওনা দিলাম। অনুকূল অবস্থায় দশ মাইলের পথ আড়াই ঘণ্টার ব্যাপার, কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি আর যা হ'ক, মোটেই অনুকূলে ছিল না। পাহাড়ের পূব দিক ধরে ধাবমান পথটি সুগভীর গিরিখাতে ঘুরে ঘুরে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। তার কিনারায় যথাক্রমে

আছে পাথর, নিবিড় ঘন ঝোপ আর গাছ পালা। যখন প্রতিটি আড়াল এক ক্ষুধার্ত নরখাদকের চেহারায় আকস্মিক মৃত্যুতে গোপন রাখতে সক্ষম এবং সে আড়ালের কাছে যেতে হয় সাবধানে, তখন অগ্রগতি মন্দ হতে বাধ্য। উদ্দিষ্ট স্থল থেকে আমি তখনো বহু মাইল দূরে, তখন নিভু-নিভু দিন আমাকে হুঁশিয়ারী জানিয়ে দিল, থামার সময় হয়েছে।

অন্য যে কোনো অঞ্চলে, তারার নিচে শুকনো পাতার এক বিছানায় ঘুমনো এক বিশ্রামভরা রাতের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এখানে মাটিতে ঘুমনো মানে এক অতি অপ্রীতিকর মৃত্যুকে আহ্বান জানানো। এক উপযুক্ত গাছ নির্বাচনে দীর্ঘদিনের অভ্যাস, তাতে আরামে ঘুমোবার ক্ষমতা, গাছের উপরে ঘুমনোকে এক তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যবসিত করেছে। এবারটা আমি বেছেছিলাম একটি ওক গাছ. এবং রাইফেলটি একটি ডালে শক্ত করে বেঁধে আমি কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, তখন গাছের নিচে বহু জানোয়ারের খসখস শব্দে জেগে উঠলাম। শব্দটি এগিয়ে গেল এবং অচিরে গাছের ছালের ওপর নখ আঁচড়ানোর আওয়াজ পেলাম ও বুঝলাম, একটি ভাল্লুক পরিবার কয়েকটি কারফল গাছে উঠছে ; পাহাড়-গাত্রের একটু নিচের দিকে গাছগুলিকে দেখেছিলাম (আমাদের পাহাড়ে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় কারফল দেখা যায়। গাছগুলি উচ্চতায় প্রায় চল্লিশ ফুট হয় এবং তাতে ছোট, লাল অতি সুমিষ্ট ফল হয়, মানুষ এবং ভাল্লুক উভয়েই তার কদর করে থাকে)।

খাবার সময়ে ভাল্লুকরা ভারি ঝগড়াটে এবং ওরা মন খুশি করে ভরপেট খেয়ে চলে না যাওয়া অব্দি ঘুমনো অসম্ভব হল।

অরণ্যবেষ্টিত পনের বিঘা হাসিল জমিতে দুটি কুঁড়েঘর ও একটি বাথান সংবলিত গ্রামটিতে আমি যখন পেঁছিলাম. তখন সূর্য দু ঘণ্টা হল উঠে গেছে। মানুষগুলি আতংকে বিবশ হয়ে ছিল এবং আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল। কুঁড়েঘরগুলি থেকে কয়েক গজ দূরের গমখেতটি সাগ্রহে দেখিয়ে দেওয়া হল আমায়। সেখানে শস্য কাটতে ব্যস্ত তিনটি মেয়েকে তাক করছিল বাঘটা পেট মাটিতে ঠেকিয়ে, তাকে সময় থাকতে কোনোমতে দেখে ফেলা হয়।

যে লোকটি বাঘটাকে দেখে ও চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে, সে আমাকে বলল, বাঘটা পিছু হটে জঙ্গলে ঢুকে যায়, সেখানে তার সঙ্গে যোগ দেয় দ্বিতীয় আরেকটি বাঘ, আর দুটি জানোয়ারই পাহাড়ের গা ধরে নেমে নিচের উপত্যকায় চলে যায়। দুটি কুঁড়েঘরের বাসিন্দারাই ঘুমোতে পারে নি, কেন না শিকার হাতছাড়া হওয়াতে সারারাত ধরে বাঘগুলো অল্পক্ষণ বাদে বাদে ডাকে এবং আমি পেঁছিবার সামান্য কিছুক্ষণ আগে ওরা ডাক থামিয়েছে সবে। এই যে কথাটি, যে বাঘ আছে দুটো তা ইতিমধ্যে যে রিপোর্ট পেয়েছি, তাকেই সমর্থন করল—মানুষখেকোটির সঙ্গে থাকে এক বড়সড় শাবক।

আমাদের পাহাড়ের লোকজন খুবই আতিথ্যপরায়ণ আর গ্রামবাসীরা যখন জানল, আমি জঙ্গলে রাতটা কাটিয়েছি, আমার ক্যাম্প ডালকানিয়াতে, ওরা আমার জন্যে খানা পাকাবার প্রস্তাব করল। আমি জানতাম তাতে ছোট্ট গ্রামটির ভাঁড়ারে টান পড়বে, তাই চাইলাম এক পেয়ালা চা। কিন্তু যেহেতু গ্রামে কোনো চা ছিল না, আমাকে দেওয়া হল ঝোলাগুড়ে অত্যধিক মিষ্টি করা টাটকা দুধের একটি গেলাস—অতীব তৃপ্তিদায়ক পানীয়, তেমন মন্দ লাগারও নয় —যখন ওতে অভ্যস্ত হয়ে যায় কেউ। আমার আতিথ্যদাতাদের অনুরোধে যখন গমের ফসলের বাকিটুকু কাটা হল, আমি পাহারায় মোতায়েন থাকলাম। আর ওদের শুভেচ্ছা নিয়ে মধ্যাহ্নে নেমে গেলাম উপত্যকায়, যেদিকে বাঘগুলিকে ডাকতে শোনা গেছে, সেইদিকে।

লাধিয়া, নন্ধাউর ও পূর্ব গৌলা, এই তিনটি নদীর জলবিভাজিকা থেকে শুরু হয়ে উপত্যকাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে বিশ মাইল। এটি নিবিড় বনে ঢাকা। নিশানা অনুসরণ অসম্ভব, আর বাঘগুলিকে দেখার আমার একমাত্র উপায় হল, ওদের আমার প্রতি আকৃষ্ট করা ; অথবা ওদের হদিস পেতে আরণ্য প্রাণীদের সাহায্য পাওয়া।

আপনাদের মধ্যে যদি কেউ পায়ে হেঁটে মানুষখেকো বাঘ শিকারের স্পোর্টে রত হতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাঁদের এটি জেনে রাখা ভালো যে, জঙ্গলের পাখি ও পশু, ঈশ্বরদত্ত চারটি প্রধান বায়ুস্রোত, এই জাতের শিকারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিকারী স্বীয় নিরাপত্তা এবং তিনি যে শিকারকে মারতে চান, তার গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্যে যে সব বিপদজ্ঞাপক-ডাকের ওপর বহুদূর অবধি নির্ভর করেন, সেগুলি যেসব প্রাণীরা ডাকে, তাদের নাম দেবার জায়গা এ নয়। কেননা এদেশে পাহাড়ের চড়াই অথবা উৎরাইয়ে তিন বা চার মাইল ওঠা বা নামার অর্থ দাঁড়ায়, তিন বা চার হাজার ফুট উচ্চতা এবং উচ্চতা ভেদে জানোয়ারের তারতম্য ঘটে। অবশ্য সকল উচ্চতাতেই বাতাস একটি সদাই-বিরাজ ব্যাপার এবং পায়ে হেঁটে মানুষখেকো শিকার প্রসঙ্গে এর গুরুত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি কথা অবান্তর হবে না এখানে।

বাঘরা জানে না যে মানুষের গন্ধ বিষয়ে কোনো বোধ নেই, আর কোনো বাঘ যখন মানুষখেকো হয়ে ওঠে, সে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে যেমন, মানুষের সঙ্গেও ঠিক একই আচরণ করে—উজান-বাতাসে উদ্দিষ্ট শিকারের কাছে এগোয়, নয়তো ভাটি-বাতাসে শিকারের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকে।

যখন উপলব্ধি করা যায়, যেসময়ে শিকারী বাঘের দেখা পেতে চেষ্টা করছেন, বাঘ তখন শিকারীকে তাক করছে অথবা তাঁর জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে সে খুবই সম্ভব, তখন ওপরে যে বিষয়ের কথা বলা হল, তার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাতাসের ব্যাপারটি শিকারীর অনুকূলে না থাকলে, বাঘের উচ্চতা,

লোমের রং ও নিঃশব্দে চলাফেরার ক্ষমতার কারণে এ প্রতিযোগিতা অতীব অসম হয়ে দাঁড়াত।

যখন চুপিসারে অথবা ওঁৎ পেতে মারা হয়, তখন সর্বক্ষেত্রেই শিকারের কাছে আসা হয় পেছন থেকে। শিকারী যদি বায়ুপ্রবাহকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে সমর্থ না হন, তবে যে জঙ্গলে মানুষখেকো অপেক্ষা করে আছে বলে বিশ্বাস করবার সকল কারণ আছে, তেমন নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করা শিকারীর পক্ষে আত্মহত্যার সামিল এক ব্যাপার হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, যদি ধরে নিই, এগোবার জমিটা এমন, যে-দিক থেকে বাতাস বইছে, শিকারীকে সেদিকেই এগোতে হচ্ছে, তাহলে বিপদ থাকবে শিকারীর পেছনে। সেক্ষেত্রে সে-বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে তিনি সামান্যই সক্ষম হবেন। তবে ঘন ঘন এদিক থেকে ওদিক বাতাস কেটে চলতে থাকলে শিকারী সে-বিপদকে যথাক্রমে বাঁয়ে ও ডাইনে রেখে চলতে পারবেন। ছাপার হরফে এ পরিকল্পনাটি তেমন চিত্তাকর্ষী বোধ না-হতে পারে, কিন্তু কার্যকালে এটিতে ফল দর্শায়। আর যে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এক ক্ষুধার্ত মানুষখেকো ওৎ পেতে আছে, তার ভেতর দিয়ে উজান-বাতাসে যেতে হলে এর চেয়ে ভাল বা নিরাপদ কোনো পন্থা আমি জানি না।

বাঘগুলিকে না-দেখে, জঙ্গলে তাদের উপস্থিতি বিষয়ে পাখি বা পশুর কাছে কিছুমাত্র জানান না-পেয়ে, সন্ধ্যা নাগাদ পৌছে গেলাম উপত্যকার উচ্চতর প্রান্তে। উপত্যকার উত্তর দিকে, অনেক উঁচুতে একটি বাথানই একমাত্র বসতস্থান যা চোখে পড়ল।

আজ, দ্বিতীয় রাতে, গাছ বাছাইয়ের ব্যাপারে সযত্ন ছিলাম আমি, এবং তার পুরস্কার পেলাম রাতভোর অনুপদ্রব বিশ্রাম। আঁধার ঘনাবার অল্প পরেই বাঘগুলি ডাকে, আর কয়েক মিনিট বাদে উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করে ভেসে আসে গাদাবন্দুকের দুটি গুলির আওয়াজ, তার পেছনে আসে গো-বাথানের গাইচরীদের প্রচুর হইহল্লা। তারপর থেকে নিশীথ নিঃশব্দই ছিল।

পরদিন বিকেলের মধ্যে আমি উপত্যকাটির সবটুকু আঁতিপাঁতি করে দেখে ফেললাম। ডালকানিয়ায় আমার লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে একটি ঘাসঢাকা ঢাল দিয়ে চড়াই ভাঙছি, এমন সময়ে বাথানটির দিক থেকে এক লম্বা টানা কুক্-ডাক শুনলাম। আবার একবার কুক্‌টি পুনর্বার ডাকা হল, এবং উত্তরে আমার জবাব পাঠালে পরে একটি লোককে একটা খুঁচিয়ে-বেরিয়ে আসা পাথরে চড়তে দেখলাম, এই সুকেন্দ্রিত জায়গা থেকে ও উপত্যকা পেরিয়ে চীৎকার করে ওর প্রশ্ন পাঠাল, নৈনিতাল থেকে যিনি মানুষখেকোকে মারতে এসেছেন, আমিই সেই সাহেব কি না! যখন তাকে বললাম, আমিই সেই সাহেব, সে খবর দিল যে দুপুর নাগাদ, উপত্যকার যেদিকে আমি আছি, সেদিকের এক

গিরিখাত থেকে ওর গরুর পাল ভয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং বাথানে ওরা পৌঁছলে পরে ও ওদের গুনতি করে, এবং গুনতির পর দেখে, একটি সাদা গরুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তা থেকে আধ মাইল পশ্চিমে, গতরাতে ও যে বাঘদের ডাকতে শুনেছে, ওর সন্দেহ, গরুটিকে তারাই মেরেছে। এ খবরের জন্যে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে, গিরিখাতটি তল্লাসী করতে রওনা হলাম আমি। খাতটির কিনারা ধরে স্বল্প দূর এগিয়েছি, পলায়মান গরুর পালের খুরের চিহ্ন পেয়ে গেলাম আর সে খুরের চিহ্ন ধরে পেছনপানে গিয়ে, যেখানে গরুটি নিহত হয়েছে সে জায়গাটি খুঁজে পেতে কোনো কষ্ট হল না আমার।

গরুটিকে মারার পর বাঘরা ওটাকে নিয়ে খাড়াই পর্বতপার্শ্ব ধরে গিরিখাতে নেমে গেছে। ছেঁচড়ে নেবার চিহ্ন ধরে এগনো বুদ্ধির কাজ নয় তাই উপত্যকা ধরে নেমে আমি অনেক দূর থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে গেলাম, এবং যেখানে মড়িটি থাকবে বলে আশা করছি সেখানে গেলাম গিরিখাতটির অন্য দিক থেকে।

গিরিখাতের যেদিক দিয়ে মড়ি নিয়ে নেমে যাওয়া হয়েছে, তার চেয়ে এ পাশটি কম খাড়াই এবং ওৎপেতে তাক করার আদর্শ জায়গা এটি, কচি ঢেঁকিশাক বনে ঘন ও নিবিড়। ছায়ার মত নিঃশব্দে, পায়ে পায়ে আমি ঢেঁকিশাকের বন দিয়ে পথ করে নিয়ে চললাম, গাছগুলি আমার কোমর ছাপিয়ে উঠেছে। আমি যখন গিরিখাতের অঙ্ক থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ দূরে, সামনে একটি নড়াচড়া চোখে ধরা পড়ল। বাতাসে ছিটকে উঠল একটি সাদা পা, সেটি ভীষণ জোরে ছটফটাল। পর মুহূর্তেই গলার গভীরে গর্জন— বাঘগুলি মড়ি নিয়ে বসেছে এবং সুস্বাদু গ্রাস নিয়ে ওদের ম·‍ ‍বিরোধ ঘটেছে।

বহু মিনিট ধরে আমি একেবারে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকলাম। পা-টি ছটফটাতে থাকল তবে গর্জনের আর পুনরাবৃত্তি হল না। এর চেয়ে কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা আমাকে দেখা যাবে না, এভাবে যদি ওই ত্রিশ গজ যেতে সক্ষম হইও এবং একটা বাঘকে মেরে ফেলতে পারি, তবুও অন্যটি আমার ওপর এসে পড়তে পাবে, নাও পারে। আর পড়লে পরে যে জমিতে আছি তা আমাকে প্রাণ বাঁচাবার কোনো সুযোগই দেবে না।

বাঁ দিকে আমার সামনে বিশ গজ দূরে, বাঘগুলির থেকে প্রায় সমানই দূরত্বে আন্দাজ দশ থেকে পনের ফুট উঁচু একটি পাথরের ঢিপি। চুপি চুপি ওটিতে পৌঁছতে পারলে হয়তো বাঘগুলিকে অনায়াসে মারতে পারব, তার পুরোদস্তুর সম্ভাবনা আছে। হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি টেনে, রাইফেলটিকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে ঢেঁকিশাকের ভেতর দিয়ে হামা টেনে সেই পাথরের আড়ালে পৌঁছলাম, দম ফিরে পেতে এক মিনিট থামলাম, নিশ্চিত হয়ে নিলাম যে রাইফেলে গুলি ভরা আছে, তারপর পাথরে চড়লাম। পাথরের

মাথা ও আমার চোখ এক সমান লাইনে যখন, তখন টপকে নিচে চাইলাম এবং বাঘ দুটিকে দেখলাম।

একটি বাঘিনী গরুটির পেছন থেকে খাচ্ছিল, অন্যটি কাছে শুয়ে থাবা চাটছিল। দুটি বাঘিনীকেই দেখতে সমান আকারের দেখাল, কিন্তু যেটি থাবা চাটছিল, তার রং অন্যটির চেয়ে অনেক-পর্দা পাতলা। এই হাল্কা রং ওর বয়সের কারণে, এবং এই বাঘিনীটিই বৃদ্ধ নরখাদকটি, এই সিদ্ধান্ত করে খুব সযত্নে ওর দিকে মাছি টিপ করলাম এবং গুলি ছুঁড়লাম।

আমার গুলিতে ও পেছনে ছিটকে উঠে চিত হয়ে পড়ে গেল, ওদিকে অন্যটি বড় বড় লাফে গিরিখাতটি ধরে ছুটল এবং আমি দ্বিতীয় ট্রিগারটি টিপতে পারার আগেই সে চোখের আড়ালে চলে গেল। যে বাঘিনীকে গুলি করলাম, সে আর নড়ে নি এবং ও মরেছে তাতে নিশ্চিত হবার জন্যে ওর গায়ে পাথর ছোঁড়ার পর আমি এগোলাম এবং তারপরই ভীষণ এক নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা হল। কেননা কাছে এসে একটি চাহনিতেই আমাকে বলে দিল আমি ভুল করেছি, মেরেছি শাবকটিকে—পরবর্তী বার মাসে পনেরটি প্রাণহানিতে এ ভুলের মাশুল গুণতে হয় এবং একবার আমার প্রাণও খোয়া যেতে বসে।

এই জোয়ান বাঘিনীটি যদি বা নিজে কোনো মানুষকে না মেরেও থাকে. সম্ভবত ওর মাকে মানুষ মারতে সাহায্য করেছে (পরে দেখেছিলাম আমার এ ধারণা সত্যি)—এ চিন্তায় নৈরাশ্য কিছুটা কমল। আর আমার অনুভূতিতে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার জন্যেও বলি, একথা সত্যি, মানুষের মাংসে লালিত হবার পর এই বাঘিনীটি ভবিষ্যতে মানুষখেকো হয়ে ওঠা সম্ভব. এই হিসেবে ওকে বিচার করা হবে, এও হতে পারত।

সহায়তা পেলে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকলে ফাঁকা জায়গায় বাঘের চামড়া ছাড়ানো এক সহজ কাজ। কিন্তু এখানে সে কাজ আর যাই হ'ক সোজা নয় কেননা আমি একা, চারদিকে ঘিরে আছে ঘন বন, আর একটি পেননাইফ আমার একমাত্র সরঞ্জাম। যদিও মানুষখেকোটির তরফ থেকে কোনো প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা নেই, কেননা বাঘরা কখনো ওদের দরকারের বেশি মারে না—তবু আমার মনের পেছনে এক অস্বস্তির অনুভূতি থেকেই গেল, বাঘিনীটি ফিরে এসেছে এবং আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে।

এ শ্রমসাধ্য কাজ শেষ হবার আগেই সূর্য অস্ত গেল প্রায়, এবং যেহেতু আমাকে আরো একটি রাত জঙ্গলে কাটাতে হবে, যেখানে আছি সেখানেই থাকা স্থির করলাম। ওর থাবার ছাপ দেখে যেমন বুঝেছিলাম, বাঘিনীটি এক অতি প্রাচীন জানোয়ার এবং যেখানে যত বন্দুকবাজ মানুষ প্রায় তত বন্দুক আছে, এমন এক জেলায় সারা জীবন বাস করার ফলে ওর মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণ বিষয়ে আর কিছু শেখার নেই। রাতে কোনো সময়ে ও মড়ির কাছে

ফিরে আসতে পারে এবং সকালে আলো হওয়া অব্দি কাছাকাছি থাকতে পারে, এরকম হলেও হতে পারে।

বাধ্যতার কারণেই আমার গাছ বাছাইয়ের ব্যাপারটি বাঁধাবাঁধি হয়ে গেল এবং যে গাছে সে রাত কাটালাম, যত গাছে আমি বার ঘণ্টা কাটিয়েছি তার মধ্যে এটি সবচেয়ে কম আরামের বলে সকালের মধ্যেই প্রমাণ মিলল। থেমে থেমে বাঘিনীটি সারারাত ধরে ডাকল আর সকাল যতই কাছে এল, ডাকটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল, অবশেষে তা মিলিয়ে গেল আমার ওপরের শৈলশিরায়।

যখন বস্তুজগৎ দেখবার আওতায় এল, আমি নামলাম গাছ থেকে—শরীরে খিল ধরল, শরীর আড়ষ্ট, ক্ষুধার্ত, চৌষট্টি ঘন্টা আছি বিনা আহারে, পোশাক গায়ে সাঁটা—রাতে এক ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছে, বাঘিনীর চামড়া আমার কোটে বেঁধে নিয়ে রওনা হলাম ডালকানিয়ার উদ্দেশে।

বাঘের চামড়া যখন কাঁচা আছে, তা কখনো ওজন করি নি আমি, আর মাথা ও থাবাসুদ্ধ ওই চামড়াটি, যেটি সেদিন পনের মাইল বয়ে নিয়ে যাই, রওনা হবার সময়ে সেটির ওজন যদি ৪০ পাউণ্ড হয়ে থাকে, আমি হলফ করে বলতে পারি গন্তব্যে পৌঁছবার আগে সেটির ওজন দাঁড়িয়েছিল ২০০ পাউণ্ড।

নীল স্লেট পাথরের বড় বড় টালিবসানো, বারটি বাড়ির বারোয়ারী এক উঠোনে দেখলাম আমার লোকজন একশো অথবা তারও বেশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। দুটো বাড়ির মাঝখানের এক গজ চওড়া এক গলি দিয়ে আমার ঢোকা কারো চোখে পড়ে নি, এবং গোল হয়ে মাটিতে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে রক্তমাখামাখি, বিধ্বস্ত চেহারায় আমি যখন টলতে টলতে ঢুকলাম, তখন যে স্বাগতম পেয়েছিলাম তা থাকবে আমার স্মৃতিতে, যতকাল স্মৃতি থাকে, ততকাল।

গ্রাম থেকে একশো গজ দূরে নাড়া ভরা খেতে (নাড়া : শস্য কাটার পর তার যে গোড়া থাকে) আমার ৪০ পাউণ্ড তাঁবু খাটানো হয়েছিল, সেখানে আমি পৌঁছতে না পৌঁছতেই দুটো স্যুটকেস আর গ্রাম থেকে চেয়ে আনা তক্তায় বুদ্ধি করে তৈরি একটি টেবিলে আমার জন্যে চা সাজিয়ে দেওয়া হল। পরে আমাকে গ্রামবাসীরা বলে, মানুষখেকোটি আমাকে শিকার বলে শেষ করেছে একথা বিশ্বাসে অস্বীকার করে আমার লোকজন, তারা আমার সঙ্গে বহু বছর আছে আর অনুরূপ বহু অভিযানে আমার সঙ্গে গেছে; তারা আমি ফিরে আসব এই আশায় এক কেটলি জল রাতেদিনে ফুটন্ত রেখেছিল এবং ডালকানিয়া ও সমীপবর্তী গ্রামগুলির গ্রামমোড়লকে 'আমি নিখোঁজ' বলে আলমোড়া ও নৈনিতালে খবর পাঠাবার ব্যাপারে আগাগোড়া প্রবল বাধা দিয়েছিল।

গরম জলে স্নান—বাধ্য হয়েই তা খোলা জায়গায়, এবং তা প্রকাশ্যেই করতে হল, কে আমায় দেখল, তা ভাবার পক্ষে আমি তখন বড় বেশি নোংরা

বড় বেশি ক্লান্ত,—তারপর ভরপেট ডিনার। আমি রাতের মত শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিদ্যুতের একটি ঝলক, তারপর প্রচণ্ড বজ্রগর্জন, ঝড়ের আগমন ঘোষণা করল। খেতে তাঁবুর খোঁটা সামান্যই কাজে লাগে যখন তাড়াহুড়োয় খোঁটাটি যোগাড় করা হয়—আর তেমন খোঁটাতেই তাঁবুর দড়ি বাঁধা ছিল।

বাড়তি নিরাপত্তার জন্যে তাঁবুতে যা পাওয়া গেল সব দড়ি তাঁবুর মাথা দিয়ে কোনাকুনি করে ফেলে খোঁটার সঙ্গে বাঁধা হল। বৃষ্টি বাতাসের ঝড় রইল এক ঘন্টা। এ ছোট্ট তাঁবু যা সয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম প্রবল এক ঝড়। তাঁবু খাড়া রাখবার অনেকগুলো দড়িই ক্যানভাস থেকে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু খোঁটাগুলো আর কোনাকুনি দড়িগুলো টিকে গেল। আমার অধিকাংশ মালপত্রই জবজবে হয়ে ভিজে গেল। বেশ কয়েক ইঞ্চি গভীর এক ছোট্ট নদী বইতে থাকল তাঁবুর এ মাথা থেকে ও মাথা অব্দি। তবে আমার বিছানা তুলনায় অবশ্য শুকনোই ছিল, আর রাত ১০টার মধ্যে, যে বাড়িটি গ্রামের লোকরা ওদের ব্যবহারার্থে দিয়েছে, সে বাড়িতে বন্ধ দরজার পেছনে আমার লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে গেল এবং সঙ্গী হিসেবে একটি গুলি বোঝাই রাইফেল নিয়ে আমি তলিয়ে গেলাম ঘুমে, সে ঘুম বার ঘন্টা স্থায়ী হয়।

পরের দিনটা গেল মালপত্র শুকোতে এবং বাঘিনীর চামড়া সাফ করে টান টান করে মেলতে। যখন এইসব কাজকর্ম এগোচ্ছে, গ্রামবাসীরা ভিড় জমাল আমার অভিজ্ঞতা শুনতে, ওদের অভিজ্ঞতা বলতে, ওরা সেদিন খেতের কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। উপস্থিত প্রতিটি পুরুষই এক বা একাধিক আপনজনকে হারিয়েছে, বহুজন মানুষখেকোটির হানা দাঁত ও নখের চিহ্ন বইছে, তা তারা মৃত্যু অবধি শরীরে বইবে। মানুষখেকোটিকে মারবার এক সুযোগ নষ্ট হওয়ায় আমার খেদ, জড়ো হওয়া পুরুষদের সমর্থন পেল না। আগে একটি মানুষখেকো ছিল, একথা সত্যি। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নিহত মানুষদের অবশেষ উদ্ধার করতে যে উদ্ধারক দলগুলি গেছে, তারা মড়ির ওপর দুটি বাঘ দেখেছে এবং মাত্র একপক্ষ আগে একই সঙ্গে নিহত হয়েছে একটি লোক এবং তার স্ত্রী। দুটি বাঘই যে পাকা মানুষখেকো এদের কাছে এটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

আমার তাঁবুটি ছিল পাহাড়ের এক পাশে চুড়োর ওপর, এক ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মুখোমুখি। আমার ঠিক নিচে নন্‌ধাউর নদীর উপত্যকা, তাতে একটি পাহাড়, এটি একেবারেই অনাবাদী, আর দূরে একটা ন'হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। পাশে সরকারী ম্যাপ বিছিয়ে হাতে একটি ভাল বাইনোকুলার নিয়ে সে সন্ধ্যায় যখন আমি ধাপ কাটা খেতের কিনারে বসে আছি, গত তিন

বছরে বিশটি মানুষ যেখানে যেখানে নিহত হয়েছে, গ্রামবাসীরা তার সঠিক অবস্থিতি আঙুল দিয়ে দেখাল। চল্লিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মোটামুটি সমান দূরে দূরে ভাগ করে এই হত্যার ব্যাপার ঘটেছে।

এ অঞ্চলের জঙ্গলগুলিতে গরু চরাবার অধিকার দেওয়া আছে এবং ও গুলিতে পৌছিবার গো-রাস্তায় আমার চারটি তরুণ মোষকে বাঁধব বলে স্থির করলাম।

পরের দশদিন বাঘিনীটির কোনো খবর পাওয়া গেল না এবং সে সময়কাল আমি কাটালাম সকালে মোষগুলির খোঁজ নিয়ে, দিনে বনগুলি তল্লাসী করে এবং সন্ধ্যায় মোষগুলি বেঁধে। আমার তাঁবুর ওপরকার পাহাড়ের এক গিরিখাতে একটি গরু মারা পড়েছে এ সংবাদে এগারদিনের দিন আমার আশা বেড়ে গেল। তবে মড়িটি একবার দেখে জানলাম, গরুটি মারা পড়েছে এক বুড়ো চিতার হাতে, তার থাবার ছাপ আমি বারবার দেখেছি। গ্রামবাসীরা নালিশ জানাল, বহু বছর ধরে চিতাটি তাদের গরু, মোষ এবং ছাগল প্রচুর মেরে আসছে এবং আমি ওকে মারব বলে বসা ঠিক করলাম। মরা গরুটির কাছাকাছি এক অগভীর গুহা আমার যে আড়াল দরকার ছিল, তা দিল। সে গুহায় বেশিক্ষণ কাটাই নি আমি, চোখে পড়ল, গিরিখাতের উলটো পাশ দিয়ে চিতাটি নেমে আসছে; আমি গুলি ছুঁড়তে রাইফেল তুলছি, তখন গ্রামের দিক থেকে আমার উদ্দেশে এক অতি বিচলিত কন্ঠস্বর শুনলাম।

এ জরুরী আহ্বানের একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে এবং টুপিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আমি গুহা থেকে ছুটে বেরোলাম, চিতাটি তাতে বেজায় ঘাবড়ে গেল ও প্রথমে মাটিতে পেট চেপটে বসে পড়ল। তারপর সক্রোধ 'উফ্' গর্জনে যেপথ দিয়ে এসেছিল, তাই ধরে পালাল লাফ মেরে। গিরিখাতে যে-পাশে আমি, সে-পাশ ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠলাম। ওপরে উঠে লোকটিকে চেচিয়ে জানালাম আমি আসছি। আর যত জোরে পারি ছুটলাম ওর কাছে যেতে।

গ্রাম থেকে আগাগোড়া পথ পাহাড়ের চড়াই ধরে ছুটে এসেছে লোকটি, দম ফিরে পেলে ও খবর দিল, গ্রামের দূর প্রান্তে, আন্দাজ আধ মাইল দূরে একটি স্ত্রীলোক এইমাত্র মানুষখেকোর হাতে মারা পড়েছে। আমরা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উৎরাইয়ে ছুটছি, দেখলাম, ইতিপূর্বে উল্লিখিত চত্বরে জনতার এক ভিড় জমেছে। আবার একবার সংকীর্ণ গলি দিয়ে আমার ঢোকা চোখে পড়ল না কারো এবং জড়ো হওয়া লোকদের মাথার ওপর দিকে ঝুঁকে চেয়ে একটি মেয়েকে মাটিতে বসে থাকতে দেখলাম।

মেয়েটির বয়স অল্প। তার দেহের ওপরের দিকের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে সে বসেছিল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেবল নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার বুক ওঠানামা করছে, আর মুখ ও ঘাড় থেকে রক্ত গড়িয়ে বুকের মাঝখানে গিয়ে জমাট বাঁধছে।

আমার উপস্থিতি শীঘ্রই ঠাহরে এল এবং মেয়েটির কাছে আমার এগোবার জন্যে পথ ছেড়ে দেওয়া হল। আমি যখন ওর জখম পরীক্ষা করছি, এককুড়ি লোক, একসঙ্গে কথা কইতে কইতে আমাকে জানাল, খানিকটা ফাঁকা জমিতে মেয়েটির স্বামী আর বেশ কিছু লোকের চোখের সামনে মেয়েটিকে আক্রমণ করা হয়। ওরা একজোটে চেঁচিয়ে উঠতে ভয় পেয়ে বাঘটি মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এবং জঙ্গলের দিকে চলে যায়। মেয়েটি মরে গেছে ভেবে ও যেখানে পড়ে যায়, সেখানেই ওকে ফেলে রেখে ওর সঙ্গীরা আমাকে খবর দিতে ছুটে গ্রামে ফিরে আসে। ক্রমে মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পায় এবং গ্রামে ফিরে আসে। জখমের কারণে ও কয়েক মিনিটে মারা যাবে এ সুনিশ্চিত। তখন ওরা ওকে বয়ে নিয়ে যাবে আক্রমণের জায়গায় এবং ওর মড়িটা সামনে রেখে বসতে পারব আমি, গুলি করে মারতে পারব বাঘটিকে।

যতক্ষণ আমাকে এ সব খবর দেওয়া হতে থাকল, মেয়েটির চোখ আমার মুখ থেকে একবারও নড়ল না। জখম, ভয় খাওয়া জন্তুর মত মিনতিভরা টলটলে চাহনিতে ও আমার প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করতে থাকল। আমার তখন অবাধে নড়াচড়ার জায়গা দরকার, হতবুদ্ধি হয়ে গেছি, সে অবস্থা কাটানো দরকার, মেয়েটির নিশ্বাস নিতে খোলা বাতাস দরকার। সসংকোচে বলি, এগুলোর জন্য আমি যে ব্যবস্থা নিলাম তা খুব একটা কোমল হল না।

পুরুষদের মধ্যে শেষ জন যখন তাড়াতাড়ি চলে গেল, মেয়েরা, এতক্ষণ ছিল পেছনে, তাদের লাগিয়ে দিলাম জল গরম করতে আর আমার শার্টটা ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে—ওটা তুলনায় পরিষ্কার ও শুকনো ছিল; যাকে দেখে মনে হচ্ছিল হিস্টিরিয়া শুরু হবার পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই মেয়েটিকে ঠেলে পাঠালাম একটি কাঁচির জন্যে গ্রাম ঢুঁড়ে ফেলতে। জল ও ব্যাণ্ডেজ আগেই তৈরি হয়ে গেল, যে মেয়েটিকে কাঁচির খোঁজে পাঠিয়েছিলাম সে ফিরে এল, সঙ্গে কাঁচি। ও বলল, গ্রাম থেকে এই একমাত্র কাঁচিই বেরোল। বহুকাল যাবৎ মৃত এক দর্জির বাড়িতে কাঁচিটি পাওয়া গেছে, দর্জির বিধবা ওটি আলু খুঁড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করে। প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা মরচে ধরা ফলা দুটিকে কোনোমতে পরস্পরের কাছে আসতে বাধ্য করা গেল না। সে চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর রক্ত-জমাট ঘন চুলের গোছাগুলি না কেটে ফেলে রাখলাম।

প্রধান ক্ষত হল নখের ঘায়ে কাটা দুটি জখম। একটি দুচোখের মধ্যে থেকে শুরু হয়ে সোজা মাথার ওপর দিয়ে ঘাড়ের গোড়া অব্দি চলে গিয়েছে। সেটি খুলির চামড়া সমান দু-ভাগে চিরে দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অপরটি প্রথমটির কাছে শুরু হয়ে কপাল বরাবর ডান কান অব্দি চলে গেছে। এই বীভৎস হাঁ-করা ক্ষতগুলির ওপর ডান বুক, ডান কাঁধ ও ঘাড়ে কয়েকটি গভীর নখের আঘাত, আর ডান হাতের পিঠে একটি গভীর কাটা, মাথা বাঁচাবার ব্যর্থ

চেষ্টায় মেয়েটি যখন হাত তোলে এ জখমটি তখন করা হয়, এ একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

এক ডাক্তার বন্ধুকে একবার আমি পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারে নিয়ে যাই। এক উত্তেজনামধুর সকালের পর ফিরে এসে তিনি আমাকে এক হলদে তরল পদার্থের দু আউন্সের একটি শিশি দিয়ে যখনি আমি শিকারে বেরোই তখনি সেটি সঙ্গে রাখতে উপদেশ দেন। এক বছরেরও বেশি শিশিটি আমি আমার শিকার জ্যাকেটের ভেতরেব পকেটে বয়ে বেড়িয়েছি এবং তরল পদার্থটির খানিকটা উপে গেছে। তবু শিশিটির তিন ভাগ ছিল ভর্তি এবং মেয়েটির মাথা ও শরীর ধুয়ে সাফ করার পর আমি শিশিটির মাথা ভাঙলাম ও শিশির জিনিসটির শেষ ফোঁটাটি অব্দি ঢেলে দিলাম ক্ষতগুলিতে। এটি সারা হলে, খুলির ঝুলন্ত চামড়া জুড়ে রাখা দরকার বলে মাথা ব্যাণ্ডেজ করলাম, মেয়েটিকে তুলে নিলাম আর বয়ে নিয়ে গেলাম তার বাড়িতে—সে একটি ঘরেই বাসবসতি, রান্নাঘর ও নার্সারী। মেয়েরা এল পেছন পেছন।

দরজার কাছে আড়া থেকে ঝুলছে একটি খোলা ঝুড়ি, তার মালিক এখন খাওয়ার জন্যে হইহল্লা জুড়ল। এ এমন এক জটিল ব্যাপার, যে এর ব্যবস্থা আমি করতে পারি না অতএব এর সমাধানের ভার ছেড়ে দিলাম জড়ো হওয়া মেয়েদের ওপর। দশ দিন বাদে আমার চলে যাবার আগে যখন মেয়েটির সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করতে যাই, দেখলাম ও বসে আছে ওর বাড়ির দোরগোড়ায়, কোলে ঘুমন্ত শিশু।

যেখানে বাঘের নখ মাংসে সব চেয়ে গভীরে গেঁথে বসে যায়, সেই ঘাড়ের গোড়ায় একটি ঘা ছাড়া ওর সব ক্ষতই শুকিয়ে গেছে। যেখানে খুলির চামড়া নিখুঁত জুড়ে গেছে তা দেখাবার জন্যে ওর কোকিলকালো চুলের অজস্র সম্পদ ফাঁক কবে ও সহাস্যে বলল, ওর বোন ভুল করে দর্জির বিধবার কাছ থেকে ভুল কাঁচিটা ধার করে এনেছিল বলে ও খুব খুশি (কেন না এখানে ন্যাড়া মাথা হল বৈধব্যের চিহ্ন)। আমার বন্ধু সেই ডাক্তার এই লাইনগুলি যদি কোনোদিন পড়েন, আমি চাইব উনি জানুন, যে অমন ভেবেচিন্তে উনি আমার জন্যে যে হলদে তরল পদার্থের ছোট্ট শিশিটি যোগাড় করে দিয়েছিলেন, সেটি একটি অতীব সাহসী তরুণী মায়ের জীবন বাঁচিয়েছে।

আমি যখন মেয়েটিকে দেখছিলাম, আমার লোকজন একটি ছাগল যোগাড় করে। মেয়েটির রেখে আসা রক্তের নিশানার পেছন পেছন গিয়ে যেখানে আক্রমণটি হয়, সে জায়গাটি খুঁজে পেলাম আমি। ছাগলটিকে এক ঝোপে বেঁধে দিয়ে আমি কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র গাছ—একটি বেঁটে ওকগাছে চড়লাম ও রাত ভোর পাহারায় জাগব বলে তৈরি হলাম। মাঝেমধ্যে ঘুমিয়ে নেওয়াও সম্ভব ছিল না, কেন না আমার বসার জায়গা জমি থেকে মাত্রই সামান্য ক ফুট

উঁচুতে এবং বাঘিনীটি তখনো ডিনার খায় নি। যাই হ'ক, সারা রাতেও আমি আর কিছু দেখি নি, শুনি নি।

আগের সন্ধ্যায় এ কাজ করতে সময় পাই নি, সকালে মাটি পরীক্ষা করে দেখলাম যে মেয়েটিকে আক্রমণ করার পর বাঘিনীটি উপত্যকা ধরে আধ মাইল গেছে, সেখানে একটি গো-পথ নন্‌ধাউর নদী অতিক্রম করেছে। ডালকানিয়ার ওপরের শৈলশিরাটির উপরের জঙ্গলে পথের সঙ্গে এই গো-পথটি যেখানে মিশেছে, সেই অব্দি গো-পথে দু মাইল গেছে বাঘিনী। এখানে আসার পর জমি শক্ত হয়ে গেল, আমি নিশানা হারিয়ে ফেললাম।

শৌচ ব্যবস্থার অভাব মেনে নিয়ে ঘরের যত কাছাকাছি থাকা যায়, দুদিন ধরে চারদিকের সকল গ্রামের লোকরা তা থাকল। তারপর তৃতীয় দিন চারজন রানার আমার কাছে খবর আনল, ডালকানিয়ার পাঁচমাইল দক্ষিণে লোহালি নামে এক গ্রামে মানুষখাকী একটি শিকার নিয়েছে। রানাররা জানাল, জঙ্গল পথে দূরত্ব হল দশ মাইল, কিন্তু শর্টকাটে পাঁচ মাইল। তাই দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে ফিরতে চাইল। আমার প্রস্তুতি সমাধা হল চটপট এবং দুপুরের সামান্য পরে আমি আমার চার গাইড সহ রওনা হলাম।

দু মাইল ব্যাপী এক অতি দুরারোহ চড়াইপথ আমাদের পৌঁছে দিল ডালকানিয়ার দক্ষিণে দীর্ঘ শৈলশিরাটির চূড়ায়। যেখানে 'মড়ি' পড়েছে বলে খবর এসেছে, তিনমাইল নিচের সেই উপত্যকা এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমার গাইডরা কোনো বিশদ খবর দিতে পারল না। ওরা থাকে একটি গ্রামে, সেটি লোহালি থেকে এক মাইল দূরে এবং যেমনটি আগে বলা হয়েছে সেই একই পন্থায় তাদের কাছে সকাল দশটায় খবর আসে যে লোহালিতে একটি মেয়ে মানুষখেকোর হাতে মারা পড়েছে আর ডালকানিয়ার আমাকে এ খবর পৌঁছতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাহাড়ের যে চূড়ায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তা গাছপালাশূন্য এবং যতক্ষণে আমি দম ফিরে পেলাম ও একটি সিগারেট খেলাম, আমার সঙ্গীরা আমাকে জমিন্‌-নিশানীগুলি দেখাতে থাকল। আমরা যেখানে জিরোচ্ছিলাম তারই কাছে, একটি বড় পাথরের নিচের আড়ালে একটি ছোট পোড়ো কুটির, তার কাছে গোল কাঁটাঝোপের বেড়া। এই কুটিরটির বিষযে জিজ্ঞেস করতে, লোকগুলি আমাকে এই গল্পটি বলল।

চার বছর আগে একজন ভুটিয়া (সীমান্তের ওপারের একটি লোক) বিশ্রাম করার জন্য এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তার ছাগলগুলোকে হৃষ্টপুষ্ট করে পরবর্তী শীতের কাজের জন্য তাদের তন্দুরুস্ত করে তুলতে এই কুটিরটি তৈরি করে। লোকটি সারা শীতকাল পাহাড়ের পাদদেশের বাজারগুলি থেকে গুড়, লবণ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে জঙ্গল এলাকায় বিক্রি করত। কয়েক সপ্তাহ বাদে

ছাগলগুলি পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নেমে যায় এবং আমাকে যারা গল্পটি বলছে, তাদের শস্যের ক্ষতি করে। ওরা যখন প্রতিবাদ জানাতে উঠে আসে তখন দেখে কুটিরটি খালি, আর ভেড়া ছাগলের পাহারাদার যে হিংস্র কুকুর ওদের তাঁবুতে রাতে পাহারা দেবার জন্যে ভুটিয়ারা সর্বদা সঙ্গে রাখে সে কুকুরটি লোহার খুঁটিতে শেকলে বাঁধা, মৃত।

অসৎ উদ্দেশ্যে কিছু করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। পরদিন কাছাকাছি গ্রামগুলি থেকে পুরুষদের জড়ো করা হয় ও এক তল্লাসী দল গঠিত হয়। আন্দাজ চারশো গজ দূরে একটি বাজেপোড়া ওক গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার সংবাদদাতারা বলল যে ওটির নিচে মানুষটির দেহাবশেষ—তার খুলি, কয়েক কুচি হাড় ও পোশাক পাওয়া যায়। এটিই হল চৌগড়ের মানুষখাকীর প্রথম মানুষ শিকার।

যেখানে আমরা বসেছিলাম সেখান থেকে ওই খাড়াই পাহাড় বেয়ে নামার কোনো পথ নেই এবং লোকগুলি আমাকে জানাল, শৈলশিরা ধরে আমাদের আধ মাইল এগোতে হবে। সেখানে আমাদের একটি বেজায় খাড়াই ও এবড়োখেবড়ো পায়ে চলা পথ মেলা উচিত। সেটি ওদের গ্রাম পেরিয়ে আমাদের সিধে নিয়ে যাবে লোহালিতে। জায়গাটি আমরা নিচের উপত্যকায় দেখতে পাচ্ছিলাম।

শৈলশিরা ধরে যাবার পথের অর্ধেক আন্দাজ গিয়েছি তখন সহসা মনে হল আমাদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ রকম মনে করার জন্য কোনো যুক্তি দর্শাতে আমি অক্ষম। এ রকম মনে করার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হল না। এই সমগ্র এলাকায় শুধু একটি মানুষখাকীই আছে এবং তিন মাইল দূরে সে এক শিকার সংগ্রহ করেছে, তা ছেড়ে " এখানে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। যাই হ'ক, এই অস্বস্তির অনুভূতি লেগেই রইল এবং যেহেতু আমরা এখন ঘাস ঢাকা শৈলশিরার সব চেয়ে চওড়া অংশটিতে পৌঁছেছি, লোকগুলিকে বসতে বাধ্য করলাম, আমি না ফেরা অব্দি ওদের নড়াচড়া না করতে নির্দেশ দিলাম আর নিজে বেরুলাম তল্লাসী করে দেখব বলে।

শৈলশিরাটি যেখানে প্রথম ধরি, সেখান অব্দি আবার ফিরে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম, সযত্নে ফাঁকা জমিটি দেখে ঘুরে এলাম এবং ফিরে গেলাম যেখানে লোকগুলি বসেছিল। কোনো পশু বা পাখির বিপদজ্ঞাপক ডাক ইঙ্গিত জানায় নি কাছাকাছি কোথাও কোনো বাঘ আছে বলে, তবু সেখান থেকে আমি লোক চারজনকে আমার আগে আগে হাঁটালাম। সেফটিক্যাচে বুড়ো আঙুল রেখে সমানে পেছনে চাইতে চাইতে আমি এলাম পেছনে।

যে ছোট গ্রামটি থেকে আমার সঙ্গীরা রওনা হয়েছিল সেখানে পৌঁছলাম যখন, ওরা আমার কাছে বিদায় নিতে চাইল। এ অনুরোধে আমি খুবই খুশি হলাম। কেননা তখনো এক মাইল ব্যাপী নিবিড় জঙ্গল দিয়ে যেতে

হবে আমাকে। আমার পেছনে পেছনে অনুসরণ করে কিছু আসছে, এ ভাবটা মন থেকে অনেকক্ষণ হল কেটে গেছে। তবু শুধু নিজের জীবন বাঁচিয়ে চলতে আমার অনেক বেশি নিরাপদ, স্বস্তিকর লাগবে। বাইরের ধাপকাটা খেতগুলির সামান্য নিচে, যেখানে নিবিড় জঙ্গল শুরু হয়েছে, যেখানে একটি স্ফটিক স্বচ্ছ জলের ঝরনা, তা থেকে গ্রামটি জলের যোগান নেয়। এখানে নরম ভিজে মাটিতে আমি বাঘিনীটির থাবার টাটকা ছাপ দেখলাম।

যে গ্রামের উদ্দেশে আমি যাচ্ছি, তার দিক থেকে উজিয়ে আসা এই থাবার ছাপ, তার সঙ্গে ওপরের শৈলশিরায় আমার যে অস্বস্তির অনুভবের অভিজ্ঞতা হয়েছে দুয়ে মিলে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল, যে মড়ির ব্যাপারটি কোনো না কোনো ভাবে বিগড়ে গেছে এবং আমার অভিযান ব্যর্থ হবে। জঙ্গল থেকে যেমন বেরিয়ে এলাম, পাঁচটি কি ছয়টি ছোট ছোট বাড়ি সংবলিত লোহালি চোখের পটে ধরা দিল। এই বাড়িগুলির একটির দরজায় একদল লোক জড়ো হয়েছে।

খাড়াই ফাঁকা জমি ও সংকীর্ণ ধাপকাটা খেতের পথে আমার এগনো ওদের চোখে পড়ল। দরজার কাছের দলটি থেকে সরে এসে কয়েকটি লোক আমার সাক্ষাতের জন্য এগোল। তাদের মধ্যে একজন, একটি বৃদ্ধ, আমার পা ছুঁয়ে নিচু হল। দুগাল চোখের জলে ভাসিয়ে, ওর মেয়ের জীবন বাঁচাতে অনুনয় জানাল আমাকে। ওর কাহিনী যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই মর্মান্তিক। এ পৃথিবীতে ওর এক মাত্র আপন জন ওর বিধবা মেয়েটি, যে কাঠ জেবলে ওদের দুপুরের রান্না করবে তা সংগ্রহ করতে গিয়েছিল আন্দাজ সকাল দশটায়।

পাহাড়তলির মধ্য দিয়ে বইছে এক ছোট নদী এবং নদীটির ওপার থেকে পাহাড় উঠে গেছে খাড়া হয়ে। বাড়ি থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে, সবচেয়ে নাবাল খেতটির কিনারে মেয়েটি লকড়ি কুড়োতে শুরু করে। কয়েকটি রমণী কাপড় কাচছিল নদীতে, তারা একটু বাদে এক আর্ত চীৎকার শোনে ও মুখ তুলে চেয়ে দেখে একটা বাঘ মেয়েটিকে নিয়ে কাঁটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঁটাঝোপগুলি খেতের কিনার থেকে একেবারে নদীর ধার অবধি ছড়ানো।

গ্রামে ছুটে ফিরে এসে রমণীরা হইহল্লা তোলে। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাই করে না। সাহায্য চেয়ে উপত্যকার আরো ওপরের একটি গ্রামে খবর পাঠানো হয় চেঁচিয়ে। সেখান থেকে খবরটি একই উপায়ে জানানো হয় আরেকটি গ্রামে, সেখান থেকেই চারটি লোক আমার খোঁজে রওনা হয়। খবর পাঠাবার আধ ঘণ্টা বাদে জখম রমণীটি হামা টেনে ফিরে আসে বাড়ি। ওর কাহিনী হল, বাঘটি ঠিক যখন ওর ওপর ঝাঁপ মারবে তখনি ও দেখতে পায় এবং সেও লাফ দেয় খাড়া পাহাড়ের নিচে, আর যখন ও শূন্যে, বাঘ তখনি ওকে ধরে এবং দুজনেই একসঙ্গে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে

যায় নিচে। চেতনা ফিরে পেয়ে নিজেকে নদীর ধারে না দেখা অব্দি আর কিছুই মনে নেই ওর এবং সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে পারছিল না বলে হাতে হাঁটুতে ছেঁচড়ে ও গ্রামে ফিরে আসে।

এ গল্প বলা হতে হতে আমরা বাড়িটির দরজায় পেঁছে গেলাম। ঘরের চার দেওয়ালের একমাত্র মুক্তিপথ দরজাটি থেকে লোকজনকে পিছু হটিয়ে দিয়ে মেয়েটির গা থেকে আমি রক্ত মাখা চাদরটা টেনে সরিয়ে দিলাম। ওর শোচনীয় অবস্থা আমি বর্ণনা করতে চেষ্টাও করব না। পকেটে যার শুধু একটু পার্মাঙ্গানেট অফ পটাশ আছে এমন এক সামান্য মানুষ না হয়ে আমি যদি আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত এক পাশকরা ডাক্তারও হতাম, আমার মনে হয় না মেয়েটির প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হত। কেননা সেই গরম, বাতাসহীন বন্ধ ঘরে মেয়েটির মুখ ঘাড় ও শরীরের অন্যত্রের গভীর দাঁত ও নখের জখমগুলো তখনি বিষিয়ে উঠেছে। সৌভাগ্যক্রমে মেয়েটি তখন আধা অজ্ঞান। বৃদ্ধ পিতা আমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকেছিল। মেয়েটির মাথা ও শরীর থেকে জমাটবাঁধা রক্ত ধুয়ে দিলাম আমি, এবং আমার রুমাল ও পার্মাঙ্গানেটের কড়া দ্রবণ দিয়ে যত ভাল করে পারলাম, জখম গুলি পরিষ্কার করলাম। এতে যতটা উপকার হবে তার জন্যে যত না হ'ক, ওই বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আরো বেশি করে কাজটি করলাম।

আমার ক্যাম্পে ফিরে যাবার কথা ভাবার পক্ষে এখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে ও যেখানে রাত কাটাতে হবে তেমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া দরকার। নদী ধরে একটু এগিয়ে মেয়েরা যেখানে কাপড় কাচছিল তার অনতিদূরে একটি অতিকায় পিপল গাছ, তা ঘিরে একটি একফুট উঁচু শাঁধানো চাতাল। গ্রামবাসীরা সেখানে ধর্মের অনুষ্ঠান করে।

চাতালে পোশাক ছাড়লাম আমি, নদীতে স্নান করলাম, বাতাস যখন তোয়ালের কাজ সমাধা করল, আবার পোশাক পরলাম, গাছের গায়ে পিঠ ঠেস দিয়ে বসলাম এবং গুলিভরা রাইফেল পাশে রেখে রাত কাবারের জন্যে প্রস্তুত হলাম। রাত কাটাবার পক্ষে জায়গাটি অনুপযুক্ত একথা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু ওই গ্রাম, ওই উত্তপ্ত ও পচধরা পরিবেশ এবং ভনভনে মাছির ঝাঁকে বোঝাই ওই ঘর যেখানে একটি মেয়ে যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে নিশ্বাসের জন্য মরিয়া সংগ্রাম করছে, তার চেয়ে যে কোনো জায়গাই ভাল।

রাতে মেয়েদের শোকবিলাপ ঘোষণা করল যে জখমী মেয়েটির সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে এবং সকালের শুরুতে আমি যখন গ্রাম দিয়ে যাচ্ছি তখন সৎকারের তোড়জোড় বহুদূর এগিয়েছে।

ডালকানিয়ার সেই মেয়েটি এবং এই হতভাগিনী মেয়েটির অভিজ্ঞতা থেকে এখন বোঝা গেল যে-মানুষদের আক্রমণ করত, তাদের মারার জন্য বৃদ্ধ

বাঘিনীটি ওর শাবকের ওপর বহুদূরে অব্দি নির্ভর করেছিল। সাধারণত নরখাদক বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত প্রতি একশো জনের মধ্যে মাত্র একজন পালাতে পারে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল এই মানুষখাকীটির ক্ষেত্রে সরাসরি নিহত হবার চেয়ে বেশি মানুষ জখম হবে। যেহেতু নিকটতম হাসপাতাল পঞ্চাশ মাইল দূরে—যে এলাকায় মানুষখাকীটি ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে তার গ্রামগুলির সকল গ্রামমোড়লদের কাছে সংক্রমণ-নাশক ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজের এক যোগান পাঠাতে সরকারের কাছে আবেদন জানালাম যখন আমি নৈনিতাল ফিরি। পরবর্তী যাত্রায় জেনে খুশি হলাম সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়েছে এবং বিসংক্রমক ওষুধগুলি বেশ কিছু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ডালকানিয়ায় আরেক সপ্তাহ থাকলাম এবং এক শনিবার ঘোষণা করলাম সামনের সোমবার বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করব। প্রায় একমাস মানুষখাকীর সাম্রাজ্যে থাকা হল আমার। খোলা তাঁবুতে শোবার ও প্রতিটি পা ফেলা। শেষ পা ফেলা হতে পারে সে সম্ভাবনা রোজ অনেক, অগণিত মাইল হাঁটার লাগাবাঁধা ধকল আমার নার্ভের সহ্যক্ষমতায় চিড় ধরাতে শুরু করেছিল। গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে এ ঘোষণা গ্রহণ করল। আমার সিদ্ধান্ত বদল করায় আমাকে বাধ্য করা থেকে ওরা তখনি নিরস্ত হল যখন আমি কথা দিলাম প্রথম সুযোগেই ফিরে আসব।

রবিবার সকালে প্রাতরাশের পর ডালকানিয়ার গ্রামমোড়ল দেখা করতে এল এবং আমি যাবার আগে খাবার জন্যে কিছু জানোয়ার শিকার করে দিয়ে যেতে বলল। অনুরোধটি সানন্দে স্বীকার করা হল এবং চারজন গ্রামবাসী ও আমার একজন লোক সঙ্গে নিয়ে একটি ·২৭৫ রাইফেল ও একপাতা কার্তুজ নিয়ে আধ ঘণ্টা বাদে আমি নন্ধাউর নদীর অনেক দূরে পাশের পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমার ক্যাম্প থেকে আমি তার উপর দিকের ঢালে বহুবার ঘুরালকে ঘাস খেতে দেখেছি।

আমার সঙ্গীদের মধ্যে একটি গ্রামবাসী একটি লম্বা, শীর্ণ লোক, মুখ তার বীভৎসভাবে বিকৃত। আমার ক্যাম্পে সে ছিল বাঁধাধরা অতিথি এবং আমাকে ভাল শ্রোতা পেয়ে, মানুষখাকীর সঙ্গে ওর মোকাবিলার কথা বলেছিল, এতবার বলেছিল, যে আমি ঘুমের মধ্যেও বিনা চেষ্টায় গোটা গল্পটি বলতে পারি। চার বছর আগে সে সংঘর্ষ ঘটে এবং ওর মুখ থেকে সে গল্প শোনাই সব চেয়ে ভাল।

"পাহাড়ের গায়ে ঘাসের ঢালের তলে ওই পাইন গাছটা দেখছ সাহেব? হ্যাঁ, পুব দিকে একটা বড় সাদা পাথরঅলা ওই পাইন গাছটা। ওই ঘাসের ঢালের ওপর-কিনারে মানুষখাকীটা আমার ওপর চড়াও হয়। ঘাসের ঢালটা হল বাড়ির দেওয়ালের মত সোজা, পাহাড়ী মানুষ ছাড়া ওতে কেউ পা রাখতেই পারে না।

আমার আট বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে আমি একদিন ওখানে ঘাস কাটছিলাম। কাটা হয়ে গেলে সমতল জায়গাটায় ঘাসগুলি হাতে-হাতে বয়ে আনছিলাম।

"ঢালের একেবারে কিনারে ঝুঁকে ছিলাম আমি, ঘাসগুলো বাঁধছিলাম বড় একটা বাণ্ডিলে, তখন বাঘটা আমার ওপর ঝাঁপ দিল আর দাঁত বসাল। একটা আমার ডান চোখের নিচে, একটা আমার চিবুকে আর দুটো এখানে, আমার ঘাড়ের পেছনে। বাঘের মুখটা আমাকে প্রচণ্ড আঘাত হানে আর আমি পড়ে যাই চিত হয়ে। বাঘটা চেপে থাকে আমাকে—আমার বুকে ওর বুক, ওর পেট আমার পা দুটোর মাঝখানে। চিতিয়ে পড়ার সময়ে হাত দুটো ছটকে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম আর আমার ডান হাত ছুঁল গিয়ে একটা ওকের চারা। আমার আঙুলগুলো চারাটা আঁকড়ে ধরতে মাথায় একটা মতলব এল। আমার পা দুটো খোলা আছে, যদি সে দুটো গুটোতে পারি, পায়ের চেটো দুটো বাঘের পেটের নিচে উল্টো চাপে ঢোকাতে পারি, বাঘটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতেও পারি আর পালাতে পারি। মুখের ডান পাশের সবগুলো হাড় বাঘটা চূর্ণ করে ফেলছিল তাতে যন্ত্রণা অসহ্য হয়। কিন্তু জ্ঞান আমি হারাই নি। কেন জান সাহেব? তখন আমার জোয়ান বয়েস আর গোটা পাহাড়ে গায়ের বলে আমার তুল্য কেউ ছিল না। বাঘটাকে না-রাগাবার জন্যে অতি সন্তর্পণে আমি ওর দুপাশে পা গোটালাম আর খুব আস্তে ওর পেটের নিচে ঢোকালাম পায়ের চেটো। তারপর আমার বাঁ হাত ওর বুকে ঠেকিয়ে সর্বশক্তিতে ওপর পানে ধাক্কা দিয়ে আর লাথি মেরে বাঘটাকে আমি মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেললাম। আর আমরা ওই সিধা পাহাড়ের গায়ের একেবারে কিনারায় ছিলাম বলে বাঘটা হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। চারাগাছে আমার মুঠ শক্ত হাতে ধরা না থাকলে হয়তো ও আমাকে ওর সঙ্গেই নিয়ে নিচে পড়ত।

"পালিয়ে যাবার পক্ষে আমার ছেলে খুবই ভয় পেয়েছিল, আর বাঘ যখন পড়ে গেল, ওর লেংটিটা ওর কাছ থেকে নিলাম, মাথায় জড়ালাম আর ওর হাত ধরে ফিরে এলাম গ্রামে। নিজের ঘরে পেঁছে বউকে বললাম আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে ডাকতে, কেননা মরে যাবার আগে ওদের মুখ দেখতে চাই। আমার বন্ধুরা যখন জড়ো হল, আমার অবস্থা দেখল, আমাকে এক চারপাইয়ে তুলে ওরা পঞ্চাশ মাইল পথ বয়ে আলমোড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু তাতে আমি রাজী হই নি। কেননা যন্ত্রণা হচ্ছিল প্রবল, আর আমার শেষ সময় এসে গেছে নিশ্চিত জেনে যেখানে জন্মেছি, বাস করেছি সারা জীবন, সেখানেই মরতে চেয়েছিলাম আমি। জল আনা হল, কেননা আমার তেষ্টা পেয়েছিল, মাথায় যেন আগুন জ্বলছিল, কিন্তু যখন মুখে জল ঢালা হল, আমার গলার ফুটো দিয়ে জল গলে বেরিয়ে গেল। তারপর এক দীর্ঘ সময়কাল ধরে, হিসাব নেই তার, আমার মনে সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, মাথায়

আর ঘাড়ে ছিল অসহ্য যন্ত্রণা, যখন এ যন্ত্রণার শেষ করে দিতে মরণকে ডাকছি, তার জন্যে অপেক্ষা করছি, আপনা থেকেই জখম সেরে গেল, আমিও ভাল হয়ে গেলাম।

"আর এখন সাহেব, আমাকে যেমন দেখছ, আমি বুড়ো, রোগা, চুল আমার সাদা, আর মুখ এমন, যে আঁতকে না-উঠে কোনো মানুষ তা চেয়ে দেখতে পারে না। আমার শত্রু বেঁচেই আছে আর শিকার ধরে চলেছে। তবে ভুলেও ভেব না ওটা কোনো বাঘ, কেননা ও কোনো বাঘ নয়, ও দুষ্ট আত্মা, যখন মানুষের রক্ত-মাংসের আকাঙ্ক্ষা হয় তখন ও কিছুক্ষণের জন্যে বাঘের চেহারা ধরে। তবে ওরা বলে সাহেব, তুমি সাধু, আর যেসব শক্তি সাধুদের রক্ষা করে তারা এই দুষ্ট আত্মার চেয়ে শক্তিশালী। তুমি জঙ্গলে একা তিনদিন তিনরাত কাটিয়েছিলে, তুমি যা করবে বলেছিলে, সেইমতই প্রাণে বেঁচে অক্ষত বেরিয়ে এলে তুমি, এই ঘটনাতেই আমার কথা প্রমাণ হচ্ছে।"

লোকটির বিশাল আড়ার দিকে চেয়ে, যথার্থই এক দৈত্য ছিল বলে সহজে কল্পনা করা গেল ওকে। শক্তিসামর্থ্যে নিশ্চয় ও দানবই ছিল, কেননা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি জোর না থাকলে কোনো মানুষই বাঘিনীটিকে শূন্যে তুলতে, মাথার পাশ থেকে ওর থাবার দখল ছিঁড়ে ফেলতে, বাঘিনীকে খাড়া পাহাড়ের নিচে ছুঁড়ে ফেলতে পারত না—সে সময়ে বাঘিনী ওর মুখের অর্ধেকটা নিয়ে চলেও যায়।

আমার শীর্ণকায় বন্ধুটি নিজেকে আমাদের গাইড খাড়া করল এবং লম্বা, সবু হয়ে যাওয়া বাঁটযুক্ত একটি চমৎকার পালিশ-করা কুড়োল কাঁধে ফেলে গোলমেলে সব খাড়াই পথে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল নিচের উপত্যকায়। নন্ধাউর নদী পেরিয়ে আমরা বহু চওড়া ধাপকাটা খেত পেরোলাম, সেগুলি এখন মানুষখেকোর ভয়ে বরবাদ-আবাদী হয়ে গেছে। পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছে যা ভাঙতে শুরু করলাম, দেখা গেল—তা এক দুরূহ চড়াই, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলাম ওপারের ঘেসো ঢালে। আমার বন্ধুটি রোগা হতে পারে কিন্তু দমে কমতি যায় না ও, আর আমি শক্তপোক্ত হলে কি হয়, ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলাম শুধু দৃশ্যাবলীর তারিফ করতে ওকে ঘনঘন থামতে বলে।

গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘাসের ঢালটি কোণাকুণি পেরিয়ে আমরা গেলাম একটি পাথর-চুড়োর দিকে, সেটি ওপর পানে হাজার ফুট বা তার কাছাকাছি উঁচিয়ে উঠেছে। আমার তাঁবু থেকে এই চূড়াতেই আমি ঘুরালকে ঘাস থেকে দেখেছি, এটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গজিয়েছে ছোট ছোট ঘাসের গোছা। আমরা কয়েকশো গজ এগিয়েছি, তখন ওই ছোট্ট পাহাড়ী ছাগলগুলোর একটি এক গিরিখাত থেকে লাফিয়ে উঠল, আমার গুলিতে ধসে পড়ে পিছলে চলে গেল

চোখের আড়ালে। রাইফেলের শব্দে চমকিত হয়ে আরেকটি ঘুরাল পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠে পাথরটির গা বেয়ে উঠল, তেমন করে ঘুরাল অথবা ছাগ গোষ্ঠীতে ঘুরালের বড় ভাই থার্ শুধু উঠতে পারত। ঘুরালটি নিশ্চয় চূড়াটির পায়ের কাছে ঘুমিয়ে ছিল।

ও যেমন ওপরপানে চড়ছে, আমি শুয়ে পড়লাম এবং পাল্লা-নিশানী দুশো গজে রেখে ও থামার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আর তখনি ও বেরিয়ে এল একটি বেরিয়ে-আসা পাথরের ওপর, নিচে আমাদের পানে চাইল। আমার গুলিতে টলে পড়ে গেল ও, ফিরে পেল পায়ের ধরতাই এবং অতি আস্তে চড়াই ভাঙতে থাকল। দ্বিতীয় গুলিতে পড়ল ও, এক বা দুই সেকেণ্ড ঝুলে রইল এক সরু কার্নিসে, আর তারপর শূন্য দিয়ে পড়ল, যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেই ঘাসের ঢালে। মাটিতে পড়ে ও গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের একশো গজের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে গেল, অবশেষে দেড়শো গজ নিচে এক গো-পথে গিয়ে নিশ্চল হল।

পরের কয় মিনিটে যে দৃশ্য দেখলাম আমরা যতকাল ধরে শিকার করছি, তার জোড়া দৃশ্য দেখেছি মাত্র একবার, এবং সেবার লুঠ করেছিল একটি চিতা।

ঘুরালটি সবে থেমেছে, তখন ঘাসের ঢালের দিকের এক গিরিখাত থেকে থপথপিয়ে বেরিয়ে এল এক বিশাল হিমালয়ান ভাল্লুক। একবারও না থেমে বা পেছনপানে না চেয়ে দেখে গো-পথ ধরে দ্রুত হাল্কি চালে চলে এল। মরা ছাগলটির কাছে পৌঁছে ও বসে পড়ল, ওটাকে কোলে নিল, আর ও যেমন ছাগলটি শুঁকতে আরম্ভ করেছে, আমি গুলি ছুঁড়লাম। হয়তো গুলি ছুঁড়তে তাড়াহুড়ো করেছিলাম, অথবা বেঁকে যাবে বলে বেঁকিয়ে নিশানা করেছিলাম, যাইহ'ক, বুলেটটি নিচে চলে গেল আর বুকের বদলে বিঁধল ভাল্লুকটির পেটে। আমরা ছ জন, যারা মন দিয়ে দেখছিলাম, আমাদের মনে হল যে বুলেটের আঘাতটিকে ভাল্লুকটি ঘুরালের আক্রমণ মনে করল। কেননা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ও মরা জানোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে লাফাতে লাফাতে চলে এল পথ ধরে। আমাদের একশো গজ নিচ দিয়ে ও যখন যাচ্ছে, আমার পঞ্চম ও শেষ গুলিটি ছুঁড়লাম। বুলেটটি ওর পেছনের মাংসল অংশ ফুটো করে বেরিয়ে গেল তা পরে দেখেছিলাম।

লোকজন যখন দুটি ঘুরালকে উদ্ধার করছিল, রক্তের নিশানা পরীক্ষা করতে আমি নামলাম নিচে। গো-পথের ওপরকার রক্ত বুঝিয়ে দিল ভাল্লুকটি জবর জখম হয়েছে তবু ফাঁকা রাইফেল নিয়ে ওর অনুসরণে বিপদ ছিল কেননা সুসময়েও ভাল্লুকরা বদমেজাজী এবং জখম হলে পরে মুকাবিলা করতে গেলে এরা অতীব বিপজ্জনক।

লোকজন আমার সঙ্গে আবার এসে মিললে পরে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধালোচনা

সভা বসল। ক্যাম্প সাড়ে তিন মাইল দূরে এবং এখন যেহেতু বেলা দুটো—আরো গুলিবারুদ এনে শেষ অবধি অনুসরণ করে ভাল্লুকটিকে মারা ও অন্ধকার হতে না হতে ঘরে ফেরা সম্ভব হবে না। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হল যে আমরা জখম জানোয়ারটিকে অনুসরণ করব এবং পাথর ও কুড়োলটির সহায়তায় ওটিকে খতম করতে চেষ্টা করব।

পাহাড়টি খাড়াই, ঝোপ-জঙ্গল তেমন নেই এবং ভাল্লুকটি যদি ওপরেই থেকে যায়, তবে গুরুতর কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে আমাদের কাজটি হাসিল করতে পারি। সে সম্ভাবনা ভাল মতই আছে। তাই ভেবে নিয়ে রওনা হলাম আমরা। আমি পথ দেখিয়ে চললাম সামনে, আমার অনুসরণে চলল তিন জন, সবচেয়ে পেছনে দুজন লোক, প্রত্যেকের পিঠে একটি করে ঘুরাল বাঁধা। যেখানে আমার শেষ গুলি ছুঁড়ি সেখানে পেঁছিতে গো-পথে আরো আরো রক্ত আমাদের প্রভূত উৎসাহ দিল। দুশো গজ এগিয়ে রক্তের নিশানা নেমে গেল এক সুগভীর গিরিখাতে।

এখানে আমরা বাহিনীটিকে ভাগ করে ফেললাম, দুজন লোক খাত পেরিয়ে গেল দূরের দিকে, কুড়োলের মালিক ও আমি রইলাম কাছের দিকটায। ঘুরাল-বাহী লোকদুটি আমাদের পেছনে আসতে থাকল। আমরা পাহাড়ের উৎরাইয়ে এগোতে থাকলাম। আমাদের পঞ্চাশ ফুট নিচে গিরিখাতের অঙ্কে বেটে বাঁশগাছের এক ঠাস বুনোট বন, এবং এই ঘনবনে যখন একটি পাথর ছোঁড়া হল, রাগে পাগল হয়ে এক চীৎকারে ভাল্লুকটি উঠে দাঁড়াল এবং ছয়টি মানুষই, তাদের ডান-পা লম্বা লম্বা ফেলে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল সিধে।

এ জাতীয় ব্যায়ামের ট্রেনিং নিই নি আমি, এবং ভাল্লুকটি আমাদের ধরে ফেলছে না কি দেখার জন্যে পেছন ফিরে চেয়ে সুগভীর স্বস্তিতে দেখলাম আমরা যেমন তেড়েফুড়ে চড়াই উঠছি, ও তেমনি সমান বেগে নামছে উৎরাই। আমার সঙ্গীদের উদ্দেশে একটি চীৎকার, দ্রুত দিক-বদল, আমরা বেদম চেঁচিয়ে ছুটে চললাম, দ্রুত ধরে ফেলতে থাকলাম উদ্দিষ্ট শিকারকে। কয়েকটি ভাল মত আঘাত হানা হল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল লক্ষ্যভেদীদেব উল্লাস চিৎকার ও ভাল্লুকটির ক্রুদ্ধ গর্জন। সামনে গিরিখাতের মোড়টি বেজায় বেয়াড়া বলে সন্তর্পণে এগনো দরকার হল এবং আমরা ভাল্লুকটির হদিস হারিয়ে ফেললাম।

রক্ত-সংকেত অনুসরণ সহজ হত কিন্তু গিরিখাতটি এখানে বড় বড় পাথরে বোঝাই, তার যে-কোনোটির পেছনে ভাল্লুকটি ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই বোঝাভারাক্রান্ত লোকগুলি যখন জিরোবার জন্যে বসল, গিরিখাতের দুপাশ ধরে কেমন করে যাব তা আমরা ভাগাভাগি করে নিলাম। আমার সঙ্গী যখন গিরি-খাতের ভেতরপানে ঝুঁকে দেখতে এগিয়ে গেল, আমি গেলাম ডান দিকে একটি

পাথর ঢাকা চূড়া ঘুরে দেখতে, সেটি দুশো গজ সিধা নিচে নেমে গেছে। ভর সামলাতে একটি গাছ আঁকড়ে ধরে আমি ঝুঁকলাম ও আমার ঠিক চল্লিশ ফুট নিচে একটি সংকীর্ণ কার্নিসে ভাল্লুকটিকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। আন্দাজ ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের একটি পাথর তুলে নিলাম আমি এবং কিনারা অব্দি এগিয়ে, নিজে পড়ে যাবার বিপদ বেশি, তা জেনেই দুহাতে পাথরটি মাথার ওপর তুললাম আর ফেললাম।

ভাল্লুকের মাথার ক ইঞ্চি দূরে কার্নিসে পড়ল পাথরটি, হাঁচড়েপাঁচড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে উধাও হল চোখের সামনে থেকে, এক মিনিট বাদে পাহাড় যে দিকে, সেদিকে আবার বেরিয়ে এল। আবার শিকারের খোঁজ চলল। এখানে জমি আরো ফাঁকা, কম পাথর এখানে, আমরা চারজন যারা বিনাবোঝায় দৌড়চ্ছিলাম, আমাদের কোনো অসুবিধা হল না ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে। এক মাইল কি তারও বেশি পথ আমরা ওকে পুরো দমে ছুট করালাম—যতক্ষণ না ক্রমে আমরা জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে ধাপকাটা খেতে পড়ি। খেতগুলির এপার-ওপার দিয়ে বৃষ্টির জল অনেকগুলি গভীর ও সংকীর্ণ নালা কেটেছে এবং এরই একটি নালাতে গা ঢাকা দিল ভাল্লুকটি।

দলের একমাত্র সশস্ত্র সদস্য হল বিকৃত মুখ লোকটি এবং সকলে একমত হয়ে তাকেই জল্লাদ ঠিক করল। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ও খুব সাবধানে ভাল্লুকটির কাছে এগোল এবং তার সুন্দর পালিশ করা কুড়োলটি শূন্যে দুলিয়ে তার চৌকো ফলাটি নামিয়ে আনল ভাল্লুকের মাথার ওপরে। পরিণামটি হল যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আশঙ্কাজনক। যেন রবাবে ঘা হেনেছে অমনি করেই ভাল্লুকটির খুলি থেকে কুড়োলের ফলা লাফিয়ে উঠে এল এবং খ্যাপা রাগে চেঁচিয়ে জানোয়ারটি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল পেছনে সরে গিয়ে। আমাদের সৌভাগ্য, ও যে সুবিধে মত দাঁড়িয়ে আছে। তার সুযোগ কাজে লাগাল না—কেন না আমরা ছিলাম গায়ে গায়ে ঘেঁষে এবং দৌড়বার চেষ্টায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাধাই সৃষ্টি করছিলাম।

ভাল্লুকটি এই ফাঁকা জমি পছন্দ করছে বলে বোধ হল না এবং নালাতে অল্প নেমে গিয়ে আবার গা-ঢাকা দিল। এবার কুড়োল মারার পালা আমার। তবে একবার ঘা খাওয়ার ফলে ভাল্লুকটি আমার এগনোতে আপত্তি জানাল এবং একমাত্র বহু কৌশলের পরই ক্রমে আমি ওকে যেখান থেকে কোপ বসাতে পারব তেমন দূরত্বে পৌঁছলাম। যখন বালক, তখন উচ্চাশা ছিল কানাডায় আমি কাঠচেরাইয়ের কাঠুরে হব এবং একটি দেশলাই কাঠিকে দু-ফাঁক করার মত যথেষ্ট দক্ষতা আমি কুড়োল-মারায় অর্জন করেছিলাম। কুড়োলটি সরে গিয়ে পাথরে লেগে জখম হবে বলে কুড়োলের মালিকের যেমন ভয় ছিল,

আমার তা ছিল না এবং যে মুহূর্তে নাগালের আওতায় পেঁছিলাম, পুরো ফলাটি বসিয়ে দিলাম ভাল্লুকটির খুলিতে।

আমাদের পাহাড়ী মানুষদের কাছে হিমালয়ের ভাল্লুকের চামড়ার কদর খুব এবং কুড়োলের মালিককে যখন বললাম ঘুরালের মাংসের ডবল ভাগের ওপরে ও চামড়াটি পেতে পারে, ও খুবই গর্বিত হল, সবাই ওকে ঈর্ষা করতে থাকল। গ্রাম থেকে নতুন করে যারা এল, তারা লোকজনের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলল এবং আমার লোকজনকে শিকারের চামড়া ছাড়িয়ে বাঁটোয়ারা করার ভার দিয়ে ওদের রেখে আমি উৎরাই বেয়ে গ্রামে গেলাম। আগে যা বলেছি, আহত মেয়েটির সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করতে গেলাম। দিনটি খুবই হয়রানিতে গেল এবং সে রাতে যদি বাঘিনী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ধরতে পারত আমাকে।

ডালকানিয়াতে আসার সময়ে যে পথে আসি, তাতে গাছপালা শূন্য পাহাড়ে লম্বা লম্বা অনেকগুলো খাড়াই চড়াই-ভাঙার ব্যাপার ছিল। এ রাস্তার অসুবিধাগুলির কথা যখন গ্রামবাসীদের বলি, ওরা বলেছিল আমার হায়রাখান হয়ে ফিরে যাওয়া উচিত। গ্রামের ওপরের শৈলশিরা পর্যন্ত একবার মাত্র চড়াই ভাঙা প্রয়োজন হয় এ পথে। সেখান থেকে রানীবাগ অব্দি পুরো রাস্তাটাই পাহাড়ের উৎরাইয়ে। সেখান থেকে গাড়িতে নৈনিতাল অব্দি চলে যেতে পারব।

রাতেই লোকজনকে হুঁশিয়ারী জানিয়েছিলাম খুব ভোর ভোর রওনা হবার জন্য তৈরি থাকতে। মালপত্র বেঁধেছেঁদে আমার পেছন পথে ওদেরকে আসতে বলে সূর্যোদয়ের একটু আগে আমি আমার ডালকানিয়ার বন্ধুদের বিদায় জানালাম, এবং ওপরের শৈলশিরার জঙ্গুলে রাস্তায় পেঁছিবার জন্যে দু মাইল চড়াই ভাঙা শুরু করলাম। যে পথে প্রথমে আমার লোকজন, পরে আমি ডালকানিয়ায় পেঁছিই, এখন যে পায়ে চলা পথ ধরেছি এটা সে-পথ নয়। তবে পাহাড়তলির বাজারে যেতে-আসতে গ্রামবাসীরা এটি ব্যবহার করে।

ঘন ওক ও পাইনের জঙ্গল এবং নিবিড় ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গভীর গিরিখাতে পথটি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। এক সপ্তাহ বাঘিনীটির কোনো পাত্তা নেই। এই খবর-না-থাকা আমাকে আরো বেশি সতর্ক করে তুলল এবং ক্যাম্প ছাড়ার এক ঘণ্টা বাদে বিনা ক্ষতিতে আমি পেঁছিলাম জঙ্গুলে রাস্তার একশো গজের ভেতরে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটি উন্মুক্ত ভূ-খণ্ডে।

এই জায়গাটার আকার পীয়ার ফলের মত, প্রায় একশো গজ লম্বা এবং পঞ্চাশ গজ চওড়া, তার ঠিক মাঝখানে একটি বৃষ্টি জলের বদ্ধ ডোবা। জলপানের ও গা ডোবাবার স্থান হিসেবে সম্বর ও অন্য জানোয়ার এটি ব্যবহার

করে এবং এটি ঘিরে জানোয়ারের পা ও খুরের দাগ দেখার আগ্রহে আমি পথটি ছাড়লাম। বাঁয়ের যে পাহাড়টি রাস্তা অব্দি এগিয়ে চলে এসেছে, পথটি সেটি ঘুরে চলে গেছে। ডোবার কাছে এগোলাম যখন, জলের কিনারে নরম মাটিতে বাঘিনীটির থাবার ছাপ দেখলাম।

আমি যেদিক থেকে এগিয়েছি, ও সেদিক থেকেই ডোবাটির কাছে এগিয়েছে এবং স্পষ্টতই, আমার কারণে উত্ত্যক্ত হয়ে জল পেরিয়ে চলে গেছে ফাঁকা জমিনের ডান-হাতি নিবিড় গাছ ও ঝোপঝাড়ের জঙ্গলের মধ্যে। মস্ত একটা সুযোগ নষ্ট হল। কেন না পেছনে যেমন সতর্ক নজর রেখেছিলাম, সামনে তা রাখলে পরে ও আমাকে দেখার আগেই আমি ওকে দেখে ফেলতাম। যাই হ'ক, যদিও আমি একটি সুযোগ হারিয়েছি, তবু সুবিধাজনক সব কিছুই আমার সপক্ষে এবং অতি স্পষ্টভাবেই আমারই অনুকূলে।

বাঘিনী আমাকে দেখেছে, নইলে ও ডোবা পেরোত না এবং তাড়াতাড়ি আড়াল খুঁজতে যেত না। ওর নিশানা বলে দিচ্ছে ও তাই করেছে। ও আমাকে দেখেছে এবং আরো দেখেছে আমি একাকী, আর নিঃসন্দেহে ও যা করছে, আড়াল থেকে নজর করছে আমায়। ধরে নিচ্ছে ও যেমন ডোবায় জল খেতে গিয়েছিল, আমিও তাই যাচ্ছি। এ পর্যন্ত আমার চলাফেরা খুবই স্বাভাবিক থেকেছে। ওকে যদি বোঝাতে পারি যে আমি ওর উপস্থিতি টের পাইনি, ও হয়তো আমাকে এক দ্বিতীয় সুযোগ দেবে।

নুয়ে পড়ে, টুপির কানাচ থেকে অতি তীক্ষ্ন নজর রেখে আমি অনেকবার কাটলাম, জল ছেটালাম, তারপর খুব ধীর গতিতে চলতে চলতে শুকনো কাঠ কুড়োতে কুড়োতে আমি খাড়া পাথরটির নিচে গেল.- সেখানে ছোট্ট একটি আগুন জ্বাললাম এবং পাথরটিতে পিঠ ঠেস দিয়ে একটি সিগারেট ধরালাম। সিগারেট শেষ হতে হতে আগুনও নিভে গেল। তখন শুয়ে পড়লাম, বাঁ হাতটি বালিশ করে তাতে মাথা রাখলাম, ট্রিগারে আঙুল রেখে রাইফেলটি রাখলাম মাটিতে।

আমার ওপরের পাথরটি কোনো জানোয়ারের দাঁড়ানোর পক্ষে বড় বেশি খাড়াই। তাই শুধু সামনেটিই পাহারা দিতে হচ্ছিল আমাকে এবং ঘন জঙ্গলটি কোনোদিকেই আমার থেকে বিশ গজের কম দূরে নয় বলে আমি বেশ নিরাপদে। এতখানি সময়ে আমি কিছু দেখিও নি, শুনিও নি তবু আমি স্থির বিশ্বাস করি যে বাঘিনী আমাকে লক্ষ করে চলেছে। টুপির কানাটি আমার চোখকে আড়াল করে রাখলেও আমার চোখের দেখায় কোনো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। আমি জঙ্গলের যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তন্ন তন্ন করে দেখলাম। এক ফোঁটা বাতাস বইছে না, একটি পাতা বা ঘাসের ফলা নড়ছে না। আমার লোকজনকে পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে এবং ওরা

ক্যাম্প ছাড়া থেকে জঙ্গল পথে আমার সঙ্গে মিলিত না-হওয়া অব্দি গান গাইতে বলে দিয়েছি আমি। তারা দেড় ঘন্টার আগে এসে পেঁছচ্ছে না। সম্ভবের চেয়েও বেশি সম্ভব যে এই সময়ের মধ্যেই বাঘিনী আড়াল থেকে বেরোবে আর আমাকে তাক অথবা আক্রমণ করবে।

অনেক সময়ে সময় চলে পা টেনে টেনে, অন্য সময়ে উড়ে চলে যায়। আমার যে বাঁ হাতটিকে বালিশ করে মাথা রেখেছিলাম, বহুক্ষণ তার ঝিঝি ধরাও চলে গেছে, সে হাত একেবারে অসাড়, তবু নিচের উপত্যকা থেকে আমার লোকজনের গান যেন বড্ড তাড়াতাড়ি আমার কাছে পেঁছিল। গলাগুলি ক্রমে স্পষ্ট হল এবং ওরা যখন একটা বেয়াড়া বাঁক ঘুরছে, অচিরে ওদের দেখতে পেলাম। বাঘিনীটি যখন জলপান করে নিজের পায়ের ছাপ ধরে ফিরে যেতে পেছন ফেরে, বোধহয় এই বাঁকেই ও আমাকে দেখেছিল। আরেকটি ব্যর্থতা এবং এ যাত্রার শেষ সুযোগটিও চলে গেল।

আমার লোকজন জিরিয়ে নেবার পর আমরা চড়াইপথে রাস্তায় উঠলাম, হায়রাখানের ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রওনা হলাম। বিশ মাইল পথ যাব, সে মনে হল যেন বড় বেশি দীর্ঘ। ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে দুশো গজ গিয়ে পথটি ঢুকে গেল অতি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। এখানে আমি লোকজনদের সামনে চলতে বাধ্য করলাম, নিজে রইলাম পেছনে। এই ভাবে দু মাইল গেছি তখন মোড় ঘুরতে দেখলাম একটি লোক পথে বসে মোষ চরাচ্ছে। প্রাতরাশের জন্যে এখন একটু থামার সময় হয়েছে তাই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম জল পাব কোথায়। ও সিধা-সিধি ওর সমুখের পাহাড়টি দেখাল এবং বলল, ওর গ্রামটি পাহাড়ের ঢালের মোড় ঘুরেই, পাহাড়টির নিচেই এক ঝরনা আছে। ওর গ্রাম তা থেকে জলের যোগান নেয়। তবে জলের জন্যে পাহাড় বেয়ে নিচে নামার দরকার নেই। কেননা আমরা যদি আরেকটু এগোই পথের ওপরেই একটি ভাল ঝরনা পাওয়া যাবে।

লোহালির সে মেয়েটি গত সপ্তাহে যে উপত্যকায় নিহত হয়, তারই উঁচু দিকের কিনারে লোকটির গ্রাম এবং ও আমাকে বলল, তখন থেকে নরখাদক বাঘিনী বিষয়ে আর কিছু শোনা যায় নি। ও আরো বলল, জানোয়ারটি সম্ভবত এখন জেলার অপর প্রান্তে। ডোবায় আমি যে টাটকা থাবার ছাপ দেখেছি, সে কথা বলে আমি ওর ভুল শুধরে দিলাম এবং মোষগুলি জড়ো করে তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে যেতে বলে দিলাম। ওর মোষগুলি, সংখ্যায় গোটা দশ হবে। পথটির দিকে উঠে আসছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। লোকটি বলল, ও যেখানে বসে আছে, চরতে চরতে মোষগুলো সে পর্যন্ত এলেই ও চলে যাবে। ওকে একটি সিগারেট দিলাম, শেষবারের মত হুঁশিয়ারী জানিয়ে আমি ওকে রেখে রওনা হলাম। যখন কয়েক মাস বাদে দ্বিতীয় বারের মত ও জেলাতে যাই, তখন, গ্রামের পুরুষরা আমায় বলে আমি চলে আসার পর কি ঘটেছিল।

সেদিন লোকটি অবশেষে যখন বাড়ি পৌঁছয়, আমাদের যে দেখা হয়েছিল, আমি যে হুঁশিয়ার করেছিলাম ওকে, সে কথা সমবেত গ্রামবাসীদের ও বলে। বলে, একশো গজ দূরে পথের একটি বাঁকে আমাকে ঘুরে যেতে দেখে ও, আমার দেওয়া সিগারেটটি ধরাতে শুরু করে। জোর বাতাস বইছিল। দেশলাইয়ের আগুন বাঁচাতে ও সামনে নুয়েছিল এবং যখন ও ওই অবস্থাতেই, তখন ওকে পেছন থেকে ডান কাঁধে কামড়ে ধরা হয়, টানা হয় পেছনপানে। যে দলটি ওকে এখনি রেখে চলে গেল, ওর প্রথমেই মনে হয় তার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাহায্য চেয়ে ও যে চেঁচায় তা ওরা শুনতে পায় না।

তবে সাহায্যব্যবস্থা হাতের কাছেই ছিল, কেননা বাঘিনীর গর্জনের সঙ্গে মিশ্রিত ওর আর্তনাদ মোষগুলি যেই শুনল, ওরা তেড়ে উঠে এল রাস্তায় এবং বাঘিনীকে তাড়িয়ে দিল। লোকটির কাঁধ ও বাহু ভেঙে গিয়েছিল এবং অতি কষ্টে ও ওর এক সাহসী বন্ধুর পিঠে চড়তে সক্ষম হয় আর বাড়ি পৌঁছয়। দলের অন্য মোষগুলো আসে পেছন পেছন। গ্রামবাসীরা যতটা ভালভাবে পারে ওর জখমগুলো বেঁধে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে ত্রিশ মাইল পথ বয়ে নিয়ে যায় হলদোয়ানির হাসপাতালে, সেখানে ভর্তি করার অল্প পরেই ও মারা যায়।

দেবী অ্যাট্রোপস, যিনি জীবনের সূত্রগুলি কেটে দেন, তিনি একটি সূত্র হাত থেকে ফসকে ফেলেন আরেকটি কাটেন। আর আমরা, যাঁরা জানি না কেন একটি সূত্র ফসকে গেল, আরেকটি কেটে ফেলা হল। এটিকে কত কি বলি, ভাগ্য, কিসমৎ, আরো যা মনে হয়।

এক মাস ধরে নিকটতম মানুষটি থেকে দূরে বাস করেছি এক খোলা তাঁবুতে। ভোর থেকে সন্ধ্যা ঘুরেছি জঙ্গলে জঙ্গলে, বহু , রমণীর ছদ্মবেশে সাজিয়েছি নিজেকে আর স্থানীয় অধিবাসীরা যে সব জায়গায় যেতে সাহস করে না, সেখানে গিয়ে ঘাস কেটেছি। এই সময়কালের মধ্যে আমাকেও ওর শিকার-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবার বহু সুযোগই নিশ্চয় হারিয়েছে বাঘিনী। যখন শেষ চেষ্টা করল, তখন নেহাত দৈববশে এই হতভাগ্যের সঙ্গে ওর মোকাবিলা হল এবং তাকে ও শিকার হিসেবে হত্যা করল।

২

পরের ফেব্রুআরিতে আমি ডালকানিয়াতে ফিরলাম। গত গ্রীষ্মে এ জেলা থেকে আমার চলে যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ মারা পড়েছে। বহু বেশি মানুষ জখম হয়েছে এবং যেহেতু বাঘ কোথায় তা জানা নেই, আর বাঘিনীটির থাকার সম্ভাবনা এখানে যেমন, অন্যখানেও তেমন ; তাই যে জায়গার সঙ্গে আমি এখন পরিচিত, মন ঠিক করে সেখানেই ফিরলাম।

ডালকানিয়া পেঁছিতে আমাকে বলা হল. যে পাহাড়ে ভাল্লুক শিকারের ঘটনা ঘটে, সেখানে গত সন্ধ্যায় একটি গরু মারা পড়েছে। সে সময়ে যে লোকগুলি গরু চরাচ্ছিল, তারা জোর দিয়ে বলল যে তারা যে-জানোয়ারকে গরুটিকে মারতে দেখে, তা একটি বাঘ। একটা ছেড়ে আসা খেতের কিনারে কয়েকটি ঝোপের কাছে মড়িটি পড়েছিল এবং যেখানে আমার তাঁবু খাটানো হচ্ছিল সেখান থেকে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। মড়ির ওপর গোল হয়ে উড়ছিল শকুন। আমার ফিল্‌ডগ্লাসের ভেতর দিয়ে চেয়ে. মড়িটির বাঁ দিকে একটি গাছের ওপর অনেকগুলো পাখিকে বসে থাকতে দেখলাম। মড়িটি পড়ে আছে ফাঁকা জায়গায় এবং শকুনরা ওর ওপরে নামে নি. এ ঘটনা থেকে আমি সিন্ধান্ত করলাম (ক) যে গরুটি মারা পড়েছে এক চিতার হাতে. এবং (খ) চিতাটি মড়ির কাছেই গুড়ি মেরে আছে।

যে খেতে গরুটি পড়েছিল তার নিচের জমি অত্যন্ত খাড়াই এবং নিবিড় গুল্মে ঢাকা। বাঘিনীটি এখনো অবাধে বিচরণ করছে. সে জন্যে এই জমি দিয়ে এগনো মোটেই সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

ডানদিকে একটি ঘাসে-ঢাকা ঢালু জমি কিন্তু চোখের অলক্ষে আমার মড়িটির কাছে এগিয়ে যাবার পক্ষে জমিটি সেখানে খুবই ফাঁকা। পাহাড়ের চুড়োর প্রায় কাছে শুরু হয়ে এক নিবিড় বনাচ্ছাদিত গভীর গিরিখাৎ, মড়িটির স্বল্প দূর দিয়ে সোজা নেমে গেছে নন্‌ধাউর নদীতে। যে গাছটিতে শকুনগুলো বসেছিল তা উঠেছে এই গিরিখাতের কিনার দিয়ে। এই গিরিখাতটিই আমার এগোবার পথ বলে ঠিক করলাম। গ্রামবাসীরা এ জমির প্রতিটি ফুট জানে এবং ওদের সঙ্গে আমি যখন শিকারের উপায় আর পরিকল্পনা করছি. আমার লোকজন আমার জন্যে চা করে ফেলল। দিন শেষ হতে চলেছে কিন্তু খুব দ্রুত চললে পরে মড়িটি দেখার এবং রাত নামার আগে ক্যাম্পে ফেরার সময় পাওয়া যাবে কোনোমতে।

রওনা হবার আগে লোকজনকে নির্দেশ দিলাম নজর রাখতে। যদি একটি গুলির শব্দ শোনার পর ওরা আমাকে মড়ির কাছে ফাঁকা জায়গায় দেখে. ওদের মধ্যে তিন বা চারজন তৎক্ষণাৎ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জমি দিয়ে চলে আমার কাছে যাবে। ওদিকে, আমি যদি গুলি না করি এবং সকালে ফিরতে না পারি, একটি তল্লাসী দলের বন্দোবস্ত করতে হবে।

গিরিখাতটি র‍্যাস্‌পবেরি ঝোপ, আর বড় বড় শিলাখণ্ডে ঢাকা। পাহাড়ের নিচ থেকে ওপর পানে বইছে বাতাস। তাই আমি এগোচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। এক দুরারোহ চড়াই ভাঙার পর অবশেষে যেটির ওপরে শকুনগুলো বসেছিল, সেই গাছটির কাছে যখন পেঁছিলাম. শুধু তখনি দেখলাম এ জায়গাটি থেকে মড়িটি নজরে আসে না। আমার ফিলড-গ্লাস দিয়ে দেখে. যে ছেড়ে আসা

খেতটিকে দিব্যি সোজা মনে হয়েছিল, সেটি দেখলাম অর্ধচন্দ্রাকৃতি, চওড়াতম অংশটি আড়াআড়ি দশগজ, দুটি প্রান্ত সরু হয়ে গেছে দুই বিন্দুতে। বাইরের কিনারাটিতে নিবিড় ঝোপঝাড়ের বেড়া এবং ভেতরদিকের কিনারা থেকে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে খেতটির দুই তৃতীয়াংশ মাত্র নজরে আসে এবং যে এক-তৃতীয়াংশে মড়িটি পড়ে আছে তা দেখতে হলে হয় অনেকটা জায়গা ছেড়ে ঘুরে গিয়ে দূরের দিকের পাশ থেকে এগোতে হয়, নয়তো যে গাছে শকুনগুলো বসে আছে তাতে চড়তে হয়।

পরের পন্থাটি গ্রহণের সিদ্ধান্তই নিলাম। যতদূর বুঝতে পারলাম, গরুটি গাছটা থেকে আন্দাজ বিশ গজ দূরে এবং যে জানোয়ার ওটিকে মেরেছে সে আরো সম্ভবত কম দূরে আছে। খুনীটিকে বিরক্ত না-করে গাছে ওঠা এক অসাধ্য কাজ হত, এবং শকুনগুলি না থাকলে সে চেষ্টা করাই হত না। গাছের ওপর এখন প্রায় বিশটি পাখি, নতুন আগন্তুকরা আসছে বলে সে সংখ্যা বাড়ছে এবং ওপরের ডালগুলিতে জায়গা যেহেতু খুব কম, প্রচুর ডানা ঝাপটানি এবং ঝগড়া চলছিল। পাহাড়ের দিক থেকে বাইরের পানে গাছটি হেলে আছে এবং জমি থেকে আন্দাজ দশ ফুট ওপরে একটি সুবিশাল বড় ডাল খাড়াই পাহাড়ের গায়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে। রাইফেলের বোঝার ভার ছিল বলে এই বড় ডালে শাখায় পোঁছতে খুবই অসুবিধে হল। শকুনদের মধ্যে এক নতুন ঝগড়াঝগড়ি শুরু হওয়া অব্দি সবুর করে আমি শাখাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম—তাল সামলে হাঁটায় এক দুরূহ পরীক্ষা একবার পা পিছলালে বা পা ফসকালে পরিণাম হবে একশো বা তার বেশি ফুট নিচে তলের পাথরগুলিতে পতন—পোঁছিলাম দুটো ডাল যেখানে দু মুখো গেছে তার গোড়ায় এবং বসলাম।

মড়িটি এখন পুরো দেখা যাচ্ছে এবং ওটি থেকে মাত্র কয়েক পাউণ্ড মাংস খাওয়া হয়েছে। আন্দাজ দশ মিনিট এইভাবে বসে আছি, বসার দাঁড়টি তেমন আরামের মনে হচ্ছে না, তখন দুটি শকুন, গরুটি থেকে অল্প দূরে ওপরে নামল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে চক্করই দিচ্ছে। গাছের থেকে নামলে কেমন অভ্যর্থনা পাবে, তা তারা জানে না। নিচে বসেছে কি বসেনি, আবার ডানা মেলে ওপরে উঠল ওরা এবং সেই মুহূর্তেই মড়িটি আমার যে দিকে, সেদিকের ঝোপগুলি মৃদু আন্দোলিত হল। বাইরে বেরিয়ে এল একটি চমৎকার মদ্দা চিতা।

তার স্বভাব-পরিবেশ, অনুকূল পারিস্থিতিতে এক চিতাকে যাঁরা কখনো দেখেন নি, আমাদের ভারতের জঙ্গলের সকল প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে সলীল, সুন্দরতম এই প্রাণীটির গতিভঙ্গী যে কত লাবণ্যভরা, এর গায়ের রং যে কি চমৎকার, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো ধারণাই থাকতে পারে না। এর আকর্ষণ শুধু বাইরের চেহারাতেই সীমাবদ্ধ নয় কেননা পাউণ্ড বনাম পাউণ্ডে ওর বল

দ্বিতীয়-রহিত এবং সাহসেও অতুলন। এমন এক প্রাণীকে 'বিনষ্টেয়' আখ্যাভুক্ত করা, ভারতের কোনো কোনো অংশে যা করা হয়, তা অপরাধ—এ অপরাধ তারাই করতে পারে, অসহায়, স্বল্পাহারে শীর্ণ, ঘেয়ো যে সব চিতা বন্দী অবস্থায় দেখা যায় তাদের মধ্যেই যাদের চিতা সম্পর্কে সব জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আমার সামনে যে চিতাটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি যত সুন্দরই হক, ওর আয়ু এখন শেষ হয়ে এসেছে কেননা ও গৃহপালিত পশু মারতে শুরু করেছে এবং গতবার যখন আসি তখন ডালকানিয়া এবং অন্যান্য গ্রামের লোকজনকে কথা দিয়েছি, সুযোগ পেলে পরে এই ক্ষুদ্রতর শত্রুটির হাত থেকে ওদের রেহাই দেব। যে গুলিটি ওকে মারলাম, তার আওয়াজ চিতাটি শুনতে পেল বলে মনে হল না আমার।

জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সব চাইতে আশ্চর্য লাগে যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোটা একটা পরিবারকে দুষ্ট গ্রহের ফেরে পড়তে দেখা যায়। যে গরুটির সহায়তায় আমি চিতাটিকে মারলাম, সেটির মালিকের কথাই এক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যাক। সে একটি বালক, আট বছর তার বয়স, একমাত্র সন্তান। ওর মা যখন গরুর ঘাস কাটছিল দু'বছর আগে, বাঘিনী তাকে মারে ও খায়। বার মাস বাদে ওর বাবারও একই পরিণাম ঘটে। পরিবারটির যে সামান্য বাসনপাতি ছিল তা বাবার সামান্য ঋণ শোধ করতে বিক্রি করা হয় এবং একটি গরুর মালিক হিসেবে বালকটি জীবন শুরু করে। গ্রামের দুশো বা তিনশো গরুর পালের ভেতর থেকে চিতাটি বিশেষ করে ওর গরুটিই বাছল এবং মারল। (আমি স্বীকার করছি, এ ক্ষেত্রে একটি ভাঙা বুক জোড়া দেবার প্রচেষ্টাটি আমার খুব একটা সফল হয় নি। কেননা নতুন লাল গরুটি, যদিও গুণী জানোয়ার, বালকটির আজীবনের সঙ্গী সাদা গরুটি হারাবার ক্ষতি ও পুরোপুরি পূরণ করতে পারে নি)।

যে লোকটির দায়িত্বে ওদের রেখে গিয়েছিলাম, তার হাতে আমার বাচ্চা মোষগুলি বেশ যত্নেই ছিল। যদিও বাঘিনীটি ওদের টোপ হিসেবে পছন্দ করবে বলে আমার সামান্যই আশা ছিল তবুও পৌঁছবার পরদিন আমি ওদের বাইরে বাঁধতে শুরু করলাম।

নন্ধাউর উপত্যকায় পাঁচ মাইল গিয়ে প্রায় এক হাজার বা তারও বেশি ফুট উঁচু এক ভীষণ চড়াই পাহাড়ের পাশ। তার পায়ের কাছে কোল জুড়ে একটি ছোট্ট গ্রাম। গত কয়েক মাসে এই গ্রামটির বাইরের সীমানায় বাঘিনী চারজন মানুষকে মেরেছে। আমি চিতাটিকে মারবার অল্পদিন বাদেই, তাদের গ্রামের কাছে আমার জন্যে যে জায়গা ঠিক করে রাখা হয়েছে, ডালকানিয়া থেকে সেখানে আমার ক্যাম্প সরিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে ওই গ্রাম থেকে এক

প্রতিনিধিদল এল। আমাকে বলা হল, গ্রামটির উঁচুতে পাহাড়ের গায়ের ওপর বাঘটিকে ঘন ঘন দেখা গেছে। মনে হয় পাহাড়ের গায়ের বহু গুহার একটিতে ওর আবাস। আমাকে বলা হল সেদিন সকালেই কয়েকটি মেয়ে ঘাস কাটতে গিয়ে বাঘটিকে দেখেছে এবং গ্রামবাসীরা এখন ভয়ে জুজু। ঘর ছেড়ে বেরোবার পক্ষে তারা বড় বেশি ভয় পেয়েছে।

ওদের সাহায্য করার জন্য আমার সাধ্যমত সবই করব আমি, প্রতিনিধি দলটিকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরদিন সকালে খুব ভোর ভোর বেরোলাম। গ্রামটির উলটোদিকের পাহাড়টিতে উঠলাম এবং এক ঘণ্টা কি তারও বেশি সময় ফিল্ড-গ্লাসের মধ্যে দিয়ে পাশ পাহাড়টি চুলচিরে দেখলাম। তারপর পেরোলাম উপত্যকাটি, এক অতি গভীর গিরিখাতের পথে গ্রামের ওপরের পাশ পাহাড়ে চড়লাম। এখানে পথ চলা খুবই কঠিন এবং মোটেও আমার মনোমত নয়। কেননা পড়ে গেলে পরিণাম হবে ঘাড় ভেঙে যাওয়া। তার ওপর বিপদ হল যে, এ রকম জায়গায় বাঘের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচানো একেবারে অসম্ভব।

পাহাড়ের পার্শটির যতটা আমার দেখার ছিল ততটা আমার দেখা হয়ে গেল বেলা দুটোর মধ্যে। আর ক্যাম্প এবং প্রাতরাশের উদ্দেশে উপত্যকা ভেঙে ওপরপানে ফিরছি যখন, ডালকানিয়া যাবার খাড়াই চড়াইভাঙা শুরু করার আগে পেছন ফিরে দেখি, যে-দিক থেকে এখনি এলাম, সেদিক থেকে আমার পানে ছুটে আসছে দুটি লোক। আমার কাছে এসে ওরা খবর দিল, সকালের দিকে যে গভীর গিরিখাত ধরে আমি গিয়েছিলাম, তাতে একটি বাঘ একটি বলদকে এখনি মেরেছে। চড়াই ভেঙে আমার ক্যাম্পে গিয়ে আমার ভৃত্যকে চা এবং কিছু খাবার পাঠাতে বলার জন্যে ওদেরই একজনকে বলে আমি পেছন ফিরলাম এবং অপর লোকটির সঙ্গে, যে পথ ছেড়ে এলাম উপত্যকা ধরে সেই পথেই আবার ফিরে চললাম উপত্যকা ধরে।

যেখানে বলদটি মারা পড়েছে সে গিরিখাতটি আন্দাজ দুশো ফুট গভীর এবং একশো ফুট চওড়া। যেমন ওটার কাছে এগোলাম, দেখলাম কতকগুলো শকুন ওপরে উঠছে আর মড়ির কাছে এলাম যখন, দেখলাম শকুনরা ওটাকে সাফ করে খেয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু চামড়া আর হাড়। যেখানে বলদটির দেহাবশেষ পড়ে আছে, জায়গাটি গ্রাম থেকে মাত্র একশো গজ দূরে কিন্তু খাড়াই পাড় ধরে ওঠার কোনো পথ নেই তাই আমার গাইড আমাকে গিরিখাত ধরে সিকি মাইল নিয়ে গেল, সেখানে একটি গো-পথ খাতটি পেরিয়ে গেছে। এই পথটি ডাঙা জমিতে পৌঁছবার পর গ্রামে গিয়ে শেষ হবার আগে ঘন ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। গ্রামে পৌঁছে আমি গ্রাম-মোড়লকে বললাম শকুনে মড়ি খতম করেছে এবং আমাকে একটি বাচ্চা মোষ আর শক্ত একটি খাটো দড়ি দিতে অনুরোধ জানালাম। এগুলো যখন যোগাড়

করা হচ্ছে, তখন যে খাবার পাঠাতে বলেছিলাম তা নিয়ে আমার দুজন লোক এসে গেল ডালকানিয়া থেকে।

আমার জন্যে গ্রামমোড়ল এক প্রতিবেশী গ্রামে যে সতেজ নওল মদ্দা মোষ খরিদ করল সেটি নিয়ে বহু লোকজন সহ আমি যখন গিরিখাতে আবার ঢুকলাম, তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। যেখানে বলদটি মারা পড়ে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, ওপরের পাহাড় থেকে জলে ভেসে নেমে আসা একটি পাইন গাছের একটি প্রান্ত গিরিখাতটির অঙ্কে ভালমত গেথে গেছে। পাইন গাছটির যে দিকটা বেরিয়ে আছে তাতে মোষটিকে খুব শক্ত করে বেঁধে লোকগুলি ফিরে গেল গ্রামে। কাছে কোনো গাছ ছিল না এবং বসে অপেক্ষা করতে হলে গিরি-খাতটির যে পাশে গ্রাম সে দিকে একটি সরু কার্নিস একমাত্র জায়গা।

খুব কষ্ট করে এ কার্নিসে উঠলাম, এটি দু ফুট চওড়া, পাঁচ ফুট লম্বা এবং গিরিখাতের অঙ্ক থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। কার্নিসটির একটু নিচ থেকে পাহাড়টি ঢুকে গেছে ভেতর পানে। তাতে একটা ভেতরে ঢোকানো কুলুঙ্গি মত তৈরি হয়েছে। সেটি কার্নিস থেকে চোখে পড়ে না। কার্নিসটি বেয়াড়াভাবে কোনাচে হয়ে নিচে নেমে গেছে এবং যখন আমি তাতে বসলাম, যেদিক থেকে আসবে বলে আশা করছি সেদিকপানে পিঠ দিয়ে বসলাম, আমার থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ দূরে, বাঁদিকে, সমুখে, বাঁধা মোষটি রইল।

সূর্য ডুবেছে, মোষটি শুয়েছিল, এখন ও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে গিরিখাতের মুখোমুখি হল এবং এক মুহূর্ত বাদে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে। যেদিক থেকে শব্দ এল, সেদিকে গুলি করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না, অতএব ধরা-পড়া এড়াতে আমি একেবারে নিস্পন্দ বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে, যতক্ষণ না আমার দিকপানে মুখোমুখি হয়, ততক্ষণ ধরে মোষটি ধীরে বাঁয়ে ফিরল। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি ও ভয় পেয়েছে। এতে বোঝা গেল ও যাতেই ভয় পেয়ে থাকুক,—তা আছে আমার তলের কুলুঙ্গিতে। অচিরে আমার ঠিক নিচে দেখা দিল একটি বাঘের মাথা। বাঘের মাথায় গুলি তখনি করা ঠিক, যখন অবস্থাটি জরুরী। আমার তরফে কোনো নড়াচড়া আমার উপস্থিতির কথা ফাঁস করে দিতে পারে। লম্বা এক কি দু মিনিট মাথাটি একেবারে অনড় রইল। তারপর দ্রুত সামনে ছুটে এসে এক পেল্লায় লাফ মেরে বাঘটা পড়ল মোষটির ওপর। আমি আগেই বলেছি, মোষটি ছিল বাঘটির মুখোমুখি এবং মোষের শিং থেকে জখমের সম্ভাবনা আছে বলে সমুখ থেকে আক্রমণ এড়িয়ে বাঘটি লাফের জোরে চলে গেল মোষটির বাঁ পাশে এবং আক্রমণ করল সমকৌণিকভাবে। দাঁতে ধরতাই পেতে কোন হাতড়াহাতড়ি হল না, কোনো ধস্তাধস্তি নয়, দুটি ভারি শরীরের সংঘর্ষ ছাড়া কোনো শব্দ নয়। তারপর মোষটি পড়ে রইল একেবারে নিশ্চল। শরীরের খানিকটা মোষের ওপরে

রেখে বসে ওর গলা কামড়ে ধরে আছে বাঘটা। প্রচলিত বিশ্বাস, বাঘরা ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে হত্যা করে। এটি ভ্রান্ত। বাঘরা মারে দাঁত দিয়ে।

বাঘটির ডান পাশটি আমার দিকে এবং সকালে ক্যাম্প থেকে বেরোবার সময়ে যে ২৭৫ টিতে সশস্ত্র হয়ে বেরিয়েছি, তাতে সযত্ন তাক করে আমি গুলি ছুঁড়লাম। মোষের দখল ছেড়ে দিয়ে একটি আওয়াজ না করে বাঘটি পেছন ফিরল এবং লাফ মেরে গিরিখাত বেয়ে ওপরে উঠে চোখের আড়ালে চলে গেল। তাক ফস্‌কে গেছে পরিষ্কার, সে জন্য কোনো কারণ খাড়া করতে পারলাম না আমি। বাঘটি যদি আমাকে, অথবা রাইফেলের ঝল্‌কানি না দেখে থাকে, তবে ও ফিরবে সে সম্ভাবনা আছে। তাই রাইফেলে আবার গুলি ভরে আমি বসে রইলাম।

বাঘটি ওকে ছেড়ে চলে যাবার পর মোষটা পড়ে রইল নিস্পন্দ আর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকল, বাঘের বদলে ওকেই গুলি করেছি আমি। দশ বা পনের মিনিট চলে গেল ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে, তখন আমার নিচের কুলুঙ্গি থেকে দ্বিতীয় বার বাঘের মাথা বেরিয়ে এল। আবার এক দীর্ঘ বিরতি, তারপর অতি ধীরে বাঘটি বেরোল, চলে গেল মোষটির কাছে, ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিশানা করার জন্যে পুরো লম্বা পিঠটা পাচ্ছি, দ্বিতীয়বার আর ভুল করছি না আমি। অতি যত্নে সাইটগুলি মেলানো হল। ট্রিগার টেপা হল ধীর গতিতে। কিন্তু যেমনটি আশা করেছিলাম, সেভাবে মরে পড়ে যাওয়ার বদলে বাঘটি বাঁদিকে লাফিয়ে উঠল, ছোট একটি উপ-গিরিখাত ধরে ছিঁড়ে খুঁড়ে ওপরে উঠল এবং খাড়াই পাহাড় ধরে ওঠার সময়ে পাথর ঠাঁইনাড়া করে ফেলতে ফেলতে গেল।

ত্রিশ গজ পাল্লার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় দুটি গুলি ছোঁড়া হল। আশ-পাশের উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা তা শুনল। একটি তো বটেই, সম্ভবত দুটি বুলেটের গর্তই এক মরা মোষের গায়ে। হয় আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হচ্ছে নয়তো পাহাড়ে চড়াই ওঠার সময়ে আমি সামনের সাইটটি নড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু ছোট ছোট জিনিস লক্ষ্য করে দেখলাম দৃষ্টিশক্তিতে কোনো গণ্ডগোল ঘটে নি, এবং নলটির দৈর্ঘ্য বরাবর একবার তাকাতেই বোঝা গেল সাইটগুলি ঠিকই আছে। অতএব দুবার বাঘটি ফসকে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলতে পারি নিকৃষ্ট গুলি ছোঁড়া।

তৃতীয়বার বাঘটি ঘুরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যদিবা আসেও, তবু যখন আলো উজ্জ্বলতর ছিল, তখন ওকে যখন মারতে পারি নি, এই কম আলোতে ওকে শুধু জখম করাই যাবে হয়তো। তাতে কিছুই লাভ হবে না। এ পরিস্থিতিতে এ কার্নিসে বেশিক্ষণ থেকে লাভ কিছু নেই আমার।

সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে আমার জামাকাপড় তখনো স্যাঁৎসেঁতে।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল আর বোঝা যাচ্ছিল তা আরো ঠাণ্ডা হবে। আমার হাফ প্যাণ্ট পাতলা খাকির আর পাথরটি কঠিন ও শীতল, এবং গ্রামে আমার অপেক্ষায় আছে গরম এক পেয়ালা চা। এসব যুক্তি যত ভালই হ'ক. আমি যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাবার আরো শ্রেষ্ঠতর, আরো বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে—বাঘিনীটি।

এখন বেশ অন্ধকার। আমার এবং গ্রামের মধ্যিখানে নুড়ি বেছানো এক গিরিখাত ধরে সিকি মাইল হাঁটা পথ এবং নিবিড় ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিযে আঁকাবাঁকা পথ। গ্রামবাসীদের সন্দেহ, ওরা আগের দিন যে বাঘটিকে দেখেছে, পরিষ্কার যেটিকে আমি এখনই গুলি করেছি—সেটিই নরখাদক বাঘিনী। সেটি কোথায় আছে সে বিষযে আমি নির্দিষ্ট কিছুই জানি না। এই মুহূর্তে ও পঞ্চাশ মাইল দূরেও থাকতে পারে, আবার পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আমায় নজব করছে তাও হতে পারে। তাই আমার বসার জায়গাটি যত অসুবিধাবই হ'ক না কেন সাবধানী বুদ্ধি বাতলে দিল, যেখানে আছি সেখানেই থাকা উচিত হবে আমার।

দীর্ঘ ঘণ্টাগুলি ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যেতে থাকল, আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকল। যে রাতে মানুষখেকো শিকার এমন কোনো প্রমোদ নয় যাতে আমার মন নেচে ওঠে। দিনের আলোর সময়ে যদি জানোয়ারটিকে মারা না যায়, বুড়ো হয়ে মরার জন্যে ওকে ফেলে বেখে যেতে হবে। এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যখন গুলি ছোঁড়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় আলো ফুটতেই আমি ঠাণ্ডায় জমে আড়ষ্ট হয়ে উৎরাই ন্যমতে থাকলাম এবং শিশিরভেজা পাথরে পিছলে শূন্যে ঠ্যাং তুলে আমাব অবরোহণ সমাপ্ত করলাম। সৌভাগ্যক্রমে নিজেব বা রাইফেলের কোনো ক্ষতি না করে বালির ওপরে পড়েছিলাম।

তখন যদিও খুবই ভোর, তবু গ্রামটি জেগে উঠে চঞ্চল এবং অচিরে আমি একটি ছোট্ট জমায়েতের মধ্যে পড়লাম। চারপাশের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু বলতে পারলাম, বিনা গুলিতে আমি এক কল্পিত বাঘকে ফায়ার করছিলাম।

গনগনে আগুনের কাছে বসে এক পট চা-পান আমার ভেতরে ও বাইরে তাপ ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সহায়তা করল। তারপর, গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ ও সকল বালকসহ, আমাব নৈশ কীর্তিস্থলের সরাসরি উঁচুতে গিরিখাতের ওপর দিয়ে একটি পাথর যেখানে উঁচিয়ে এগিয়ে আছে সেখানে গেলাম আমি। জমায়েত ভিড়ের কাছে আমি সব খুলে বললাম। আমার নিচের কুলুঙ্গি থেকে বাঘটি বেরিয়েছিল, লাফিয়ে পড়েছিল মোষটির ওপর, আমি ওটাকে গুলি করার পর কেমন করে বাঘটা ও-ই দিকে পালায়, আর যেমন গিরিখাতটি দেখিয়েছি, এক উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল, 'দেখ সাহেব! ওই যে বাঘটা মরে পড়ে আছে!'

রাতভোর পাহারা দেওয়ার ফলে আমার চোখ ক্লান্ত কিন্তু এদিক থেকে ওদিকে বারবার চেয়ে দেখেও অস্বীকার করার উপায় রইল না যে বাঘটা মৃত অবস্থায় ওখানে পড়ে আছে। বিশ বা ত্রিশ মিনিট গেলে পরে কেন আমি দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়লাম এই অতি স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, ঠিক একই জায়গা থেকে বাঘটি দ্বিতীয়বারও বেরিয়েছিল এবং যখন ও মোষটির কাছে দাঁড়িয়ে. তখন আমি ওকে গুলি করি আর ও উঠে যায় গিরিখাতটির ও-ই দিকটা ধরে। আর তখনি আবার শোনা গেল চিৎকার, 'দেখ সাহেব ! ওই যে আরেকটা বাঘ মরে পড়ে আছে !' এখন তাতে যোগ দিল রমণী ও বালিকারা, ওরা এসে পড়েছিল। দুটি বাঘকে একই মাপের দেখাল এবং আমি যেখান থেকে গুলি করি, তা থেকে যাট গজ দূরে দুটিই পড়ে ছিল।

এই দ্বিতীয় বাঘটির প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে গ্রামবাসীরা বলল, যখন চারজন মানুষ মারা পড়ে আর আগের দিন যখন বলদটি মারা পড়ে, শুধু একটি বাঘই দেখা গিয়েছিল। বাঘদের মিলন-ঋতু নভেম্বর থেকে এপ্রিল অব্দি টেনে লম্বা করা যায়। চোখের সামনে যে বাঘ দুটো পড়ে আছে। তার একটা যদি নরখাদক বাঘিনী হয়, তবে সে স্পষ্টতই তার এক সঙ্গী জুটিয়েছে।

আমি যেখানে বসেছিলাম তার তলে পাহাড়ের খাড়াই গা দিয়ে নিচে নেমে গিরিখাতে ঢোকার একটি পথ পাওয়া গেল আর গ্রামের সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, যেখানে প্রথম বাঘটি পড়ে আছে সেখানে গেলাম মরা মোষটা পেরিয়ে। ওর কাছে যেতে আশা উচ্চে উঠল কেননা ও একটি বৃদ্ধা বাঘিনী। সবচেয়ে কাছের লোকটির হাতে রাইফেলটি দিয়ে আমি হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকলাম ওর পাগুলো লক্ষ করতে। যে মেয়েরা গম কাটছিল তাদের যেদিন আক্রমণ করতে চেষ্টা করে বাঘিনীটি, সেদিন খেতের কিনারে কয়েকটি চমৎকার থাবার ছাপ রেখে গিয়েছিল। বাঘিনীটির থাবার ছাপ সেই প্রথম দেখি আমি এবং খুব যত্ন করে দেখেছিলাম ওগুলো। ওগুলো জানিয়ে দিয়েছিল, বাঘিনীটি এক অতি বুড়ো জানোয়ার। বার্ধক্যের ফলে তার পায়ের তলাটা বাইরের দিকে ছেতরে গেছে। সামনের পায়ের থাবাগুলোয় ভীষণ ফাটল হয়েছে, সামনের ডান পায়ের থাবা আড়াআড়ি চিরে একটি ফাটল চলে গেছে এবং আঙুলগুলো এত দূর অব্দি লম্বা হয়ে গেছে, যা কখনো অন্য বাঘে দেখিনি আমি। এই বিশেষত্ব-যুক্ত পাগুলির জন্যে একশোটি মরা বাঘের মধ্যেও বাঘিনীটিকে বেছে নেওয়া সহজ হত।

গভীর খেদে লক্ষ করলাম, সামনের জানোয়ারটি নরখাদক নয়। জমা হওয়া লোকের জনতাকে যখন এ খবরটি সরবরাহ করলাম, চারদিক থেকে জোর মতদ্বৈধের গুঞ্জন উঠল। জোর দিয়ে বলা হল যে আমি গতবার আসার সময়ে বলেছিলাম, নরখাদকটি এক বৃদ্ধা বাঘিনী এবং যেখানে সামান্যকাল

আগে ওদের চারজন মারা পড়েছে, সেখান থেকে সামান্য ক' গজ দূরে অনুরূপ একটি প্রাণীকেই মেরেছি আমি। এই বিশ্বাস জাগানো নজীরের বিপক্ষে থাবার নজীরের মূল্য কি বা, কেননা সব বাঘের থাবাই একরকম।

এ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বাঘটি এক মদ্দাই হতে পারে, আর যখন বাঘিনীটির চামড়া ছাড়াবার বন্দোবস্ত করছি, ওটাকে আনার জন্যে কয়েকটি মানুষের একটি দল পাঠালাম। উপ-গিরিখাতটি খাড়াই এবং সংকীর্ণ আর প্রচুর চেঁচামেচি ও হাসির পর দ্বিতীয় বাঘটিকে, সে এক চমৎকার মদ্দা, তাকে বাঘিনীর পাশে শুইয়ে দেওয়া হল।

আমি যে সব অত্যন্ত অসন্তোষজনক কাজের ভার এ-জীবনে নিয়েছি তার মধ্যে, যে দুটি বাঘ চোদ্দ ঘণ্টা হল মরেছে তাদের ছাল ছাড়ানো হল অন্যতম— ক্রমবর্ধমান জনতার ভিড় চেপে ধরছে, পিঠ পুড়ে যাচ্ছে রোদে। দুপুর পেরিয়ে কাজটি শেষ হল এবং আমার লোকজনের নিয়ে যাবার জন্যে চামড়া-গুলি ভাল করে বেঁধেছেঁদে আমি ক্যাম্পে ফেরার জন্য পাঁচ মাইল হাঁটতে-প্রস্তুত হলাম।

সকালে আশপাশের গ্রামগুলি থেকে গ্রামমোড়লরা ও অন্যরা এসেছিল। চলে আসার আগে আমি ওদের দৃঢ় বিশ্বাসে বললাম, চৌগড়ের নরখাদক বাঘিনী মরে নি। ওদের হুঁশিয়ারী জানালাম, বাঘিনীটি যে সুযোগের অপেক্ষায় আছে, সতর্কতা-ব্যবস্থায় ঢিলে দিলে পরে ওর হাতে সেই সুযোগই তুলে দেওয়া হবে। আমার হুঁশিয়ারীতে যদি কান দেওয়া হত, তাহলে পরবর্তী মাসগুলিতে বাঘিনী যতগুলি শিকার ধরে, তা সে ধরত না।

বাঘিনীর আর কোনো খবর ছিল না এবং ডালকানিয়ায় কয়েক সপ্তাহ থাকার পর, তরাইয়ে জেলা-অফিসারদের সঙ্গে দেখা করার কথা রাখার জন্য আমি বিদায় নিলাম।

৩

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে আমাদের জেলা কমিশনার ভিভিয়ান নরখাদক বাঘিনী অধিরাজ্যে ট্যুর করছিলেন এবং সে মাসের ২২শে আমি তাঁর কাছ থেকে, কালাআগারে যাবার জরুরী তলব পেলাম। তিনি জানালেন সেখানে তিনি আমার যাবার জন্য অপেক্ষা করবেন। নৈনিতাল থেকে কালাআগার আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল এবং ভিভিয়ানের চিঠি পাবার দুদিন বাদে আমি প্রাতরাশের সময় থাকতে কালাআগার ফরেস্ট বাংলোয় হাজির হলাম, সেখানে তিনি ও মিসেস ভিভিয়ান উঠেছিলেন।

প্রাতরাশ খেতে খেতে ভিভিয়ানরা আমাকে বললেন, তাঁরা ২১শের বিকেলে বাংলোতে পৌঁছন এবং যখন তাঁরা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন, বাংলোর

উঠনে যে ছয়টি মেয়ে ঘাস কাটছিল, তাদের মধ্যে একজনকে বাঘিনী মারে ও নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করে রাইফেলটা আর ওঁর সঙ্গীদের কয়েকজনকে নিয়ে ভিভিয়ান ছেঁচড়ে টেনে নেবার দাগটি অনুসরণ করেন ও একটি ওক গাছের পায়ের কাছে মৃতা মেয়েটিকে পান। তাকে একটি ঝোপের নিচে গুঁজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সে জমি পরে পরখ করে আমি দেখি, যে ভিভিয়ানের দলটি পেঁছিতে বাঘিনী পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে পালায় ও তখন যা যা করা হয়, সে সময়ের আগাগোড়াটা মড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি র‍্যাস্‌পবেরি ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাঘিনীটি বসে থাকে। ওক গাছে ভিভিয়ানের জন্যে একটি মাচা বাঁধা হয়, ওঁর কর্মীদলের সদস্যদের জন্যে আরো দুটি মাচা বাঁধা হয় যে জঙ্গুলে পথ মড়িটির ত্রিশ গজ উপর দিয়ে গেছে তার কাছাকাছি গাছ-গুলিতে। মাচান তৈরি হতেই তাতে বসে পড়া হয় এবং দলটি সারারাত বসে থাকে। কিন্তু বাঘিনীর আর দেখা মেলে না।

পরদিন মেয়েটির দেহ সৎকারের জন্য সরিয়ে নেওয়া হল। বাংলো থেকে আধ মাইল দূরে জঙ্গুলে রাস্তার ওপর একটি মোষ বেঁধে রাখা হল এবং সেই রাতেই সেটা মারা পড়ল বাঘিনীর হাতে। পরের সন্ধ্যায় ভিভিয়ানরা মোষটি রেখে মাচায় বসলেন। চাঁদ ছিল না, আর দিনের আলো যেই ক্ষীণ হতে থাকল, কাছের সব কিছু আবছা দেখাল। ওঁরা প্রথমে শুনলেন, পরে দেখলেন একটি জানোয়ার মড়ির কাছে আসছে। সে অনিশ্চিত আলোতে তাঁরা সেটিকে এক ভালুক বলে ভুল করলেন। এই শোচনীয় ভুল না হলে তাঁদের এই অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য চেষ্টার ফল হত বাঘিনীর মরণ। কেননা ভিভিয়ানরা দুজনেই ভাল রাইফেলশিকারী।

২৫ তারিখে ভিভিয়ানরা কালাআগার ছেড়ে চলে গেলেন। দিনমানের মধ্যে ডালকানিয়া থেকে আমার চারটি মোষ চলে এল। যেহেতু মনে হচ্ছে এখন বাঘিনীটি এ ধরনের টোপ খেতে রাজী আছে। জঙ্গল পথে কয়েকশো গজ তফাতে তফাতে আমি মোষগুলোকে বেঁধে দিলাম। পরপর তিন রাত্তির মোষগুলিকে স্পর্শও না করে বাঘিনীটি ওদের কয়েক ফুটের মধ্য দিয়ে চলে গেল কিন্তু চতুর্থ রাতে বাংলোর সবচেয়ে কাছের মোষটি মারা পড়ল।

সকালে মড়িটি পরীক্ষা করে দেখে নিরাশ হলাম। আগের রাতে বাংলোর উঁচুতে যে এক জোড়া চিতাকে ডাকতে শুনেছি, তাদের হাতেই মারা পড়েছে মোষটি। পাছে বাঘিনীটি দূরে চলে যায় এই ভয়ে, এ অঞ্চলে গুলি ছোঁড়ার চিন্তাও আমার পছন্দ নয় তবে এও পরিষ্কার, যদি চিতাগুলোকে গুলি না করি, ওরা বাকি তিনটি মোষকেও মেরে ফেলবে। তাই, মড়ির উপরের কয়েকটি বড় বড় পাথরে ওরা যখন রোদ পোহাচ্ছিল তখন ওদের তাক করে দুটোকেই মেরে ফেললাম।

কালাআগার বাংলো থেকে জঙ্গলে পথটি বহু মাইল চলে গেছে পশ্চিমপানে পাইন, ওক ও রোডোড্রেনডনের অতি অপূর্ব জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবং এই সব বনে, কুমায়ুনের বাকিটুকুর তুলনায় পাখির জগতের এক বিপুল সম্পদ তো আছেই ; তাছাড়াও সম্বর, কাকার ও শুয়োর জাতীয় প্রচুর আহার্য পশু আছে। দুবার এ জঙ্গলে বাঘিনীটি সম্বর মেরেছে বলে আমার সন্দেহ কিন্তু যদিও দুবারই যেখানে জানোয়ারটি মারা পড়েছে সেই রক্তাক্ত জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু দুটি মড়ির একটিও খুঁজে পাই নি। ব্যর্থ হয়েছি।

পরের চোদ্দদিন ধরে দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, তার প্রতিটি ঘণ্টা কাটালাম জঙ্গলে পথে। তাতে আমি ছাড়া কেউ কোনোদিন পা দেয় নি। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করার পর মাত্র দুবার আমি বাঘিনীর কাছে যেতে পেরেছিলাম। প্রথমবার কালাআগার শৈলশিরার দক্ষিণ গায়ে অনেক দূরের একটা একটেরে গ্রামে গিয়েছিলাম আমি। নরখাদক বাঘিনীর অত্যাচারে গত বছর গ্রামটি পরিত্যাগ করা হয়। ফিরতি পথে ধরেছিলাম একটি গো-পথ। সেটি শৈলশিরা টপকে নেমে গেছে নিচের দিকে জঙ্গলে পথটির দূরের দিক ধরে। তখন এক পাথরের স্তূপের কাছে এসে আমার এক আকস্মিক অনুভূতি হল— সামনে বিপদ।

শৈলশিরা থেকে জঙ্গলে পথের দূরত্ব প্রায় তিনশো গজ। গো-পথটি শৈলশিরা ছাড়ার পর কয়েক গজ খাড়াই নেমে গেছে এবং তারপর ডাইনে ঘুরেছে ও একশো গজ ধরে পাহাড়ের ওপর কোনাকুনি গেছে। পথটির এই জায়গায় লম্বালম্বি ডান দিকে মাঝামাঝি জায়গায় পাথরের স্তূপ। পাথরগুলির ওপারে চুলের কাঁটার মত এক মোড় পথটিকে নিয়ে গেছে বাঁয়ে এবং আরো একশো গজ এগিয়ে আরেকটি বেয়াড়া মোড় এটিকে নামিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে জঙ্গলে পথের সঙ্গে এ পথটি মিশেছে সেই জায়গায়।

এ পথ ধরে বহুবার গেছি আমি এবং এই প্রথম পাথরগুলো পেরোতে ইতস্তত করছি। ওগুলি এড়াতে হলে হয় আমাকে বহুশত গজ পথ গভীর ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, নয়তো ওগুলি ঘুরে, ওগুলির ওপরের জমি দিয়ে অনেক জায়গা ছেড়ে ঘুরে যেতে হয়। প্রথমটি দিয়ে যেতে হলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় বেশী আর পরেরটির কোনো সময় পাচ্ছি না, কেননা সূর্য ডোবে ডোবে, আমাকে আরো দু মাইল যেতে হবে।

তাই, আমি এ কাজ করতে চাই, বা না চাই, পাথরগুলির সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পাহাড়ের চড়াই পানে বইছে বাতাস, অতএব পথের বাঁ ধারের ঘন ঝোপ উপেক্ষা করে চলে যেতে পারলাম। আমার ডানদিকের পাথরের স্তূপের ওপর আমার সমস্ত মনোযোগ দিলাম। একশো ফুট গেলেই আমি বিপদ-এলাকা মুক্ত হই আর এ দূরত্ব আমি পেরোলাম পাথরগুলির

দিকে মুখ করে কাঁধে রাইফেল রেখে, পাশের দিকে এক পা এক পা করে হেঁটে। এগোবার এক আশ্চর্য রীতি। কেউ যদি দেখত!

পাথরগুলি পেরিয়ে ত্রিশ গজ গিয়ে এক ফাঁকা ঘেসো জমি। গো-পথের ডানদিক থেকে সেটির শুরু। তা পাহাড় পর্যন্ত পঞ্চাশ বা ষাট গজ অব্দি উঠে গেছে। পাথরগুলি থেকে ঝোপের বেড়ায় তা আড়াল করা। এই ঘেসো জমিতে চরছিল এক কাকার। ও আমায় দেখার আগেই ওকে দেখলাম আমি আর চোখের কোণ থেকে লক্ষ করলাম ওকে। আমাকে দেখে ও মাথা পেছনে ঠেলে ওঠাল এবং যেহেতু আমি ওর দিকে চাইছি না, চলছি ধীর গতিতে, ও দাঁড়িয়ে গেল চুপ-চাপ। এই জানোয়ারগুলির যখন ধারণা হয় কেউ ওদের দেখতে পায়নি, এই রকম করাই ওদের অভ্যাস। সেই চুলের কাঁটা সদৃশ তীক্ষ্ন মোড়ে এসে আমি ঘাড়ের পেছন দিয়ে চাইলাম। দেখি কাকারটি মাথা নামিয়েছে, আবার ঘাস খাচ্ছে।

মোড়টি পেরোবার পর পথ ধরে আমি সামান্য দূর এগিয়েছি, তখন উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ে ডাকতে ডাকতে কাকারটি পাহাড় ধরে ছুটে উঠে গেল। সামান্য কটি লম্বা পা ফেলে আমি মোড়টিতে চলে এলাম আবার। গো-পথের নিচের দিকে পাশের ঝোপে একটুখানি নড়াচড়া মাত্র দেখতে পেলাম। কাকারটি যে বাঘিনীকে দেখেছে, তা সুস্পষ্ট এবং পথের ওপরটি হল একমাত্র জায়গা যেখানে ও তাকে দেখতে পারে। যে নড়াচড়া দেখেছি আমি তা এক পাখির চলে যাবার কারণে হতে পারে, অপরপক্ষে ওটি বাঘিনীটির কারণেও হতে পারে। যা হ'ক নিজের গন্তব্যে এগনোর আগে একটু তদন্ত করা দরকার।

যে লাল মাটিতে পথটি রচিত, তা স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে পাথরগুলির তলা থেকে চুঁইয়ে বেরুনো একটি ক্ষীণ জলের সুতো। ফলে মাটিটা থাবার ছাপ পড়ার পক্ষে একেবারে আদর্শ। এই ভিজে মাটিতে আমি পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে গেছি। এখন দেখলাম, যতক্ষণ না কাকারটি ওকে দেখে বিপদ জানাতে ডাকতে থাকে, ততক্ষণ ধরে ও পাথর থেকে লাফিয়ে নেমে আমাকে অনুসরণ করেছে। আমার পায়ের দাগের ওপর দিয়ে বাঘিনীর ছেত্‌রে পড়া থাবার ছাপ। তখন বাঘিনীটি পথটা ছেড়ে ঝোপে ঢুকে পড়ে ও সেখানেই আমি তার নড়াচড়া দেখি। এ জায়গার প্রতি ফুট জমির সঙ্গে বাঘিনীটি নিঃসন্দেহে পরিচিত এবং পাথরের স্তূপের কাছে আমাকে মারবার সুযোগ না পেয়ে—প্রথম চুলের কাঁটার মত মোড়ে আমাকে পাকড়াবার সুযোগ কাকারটি নষ্ট করে দেওয়াতে সম্ভবত—ও এখন চলেছে সেই নিবিড় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মোড়ে আমাকে বাধা দেবার জন্যে।

পথ দিয়ে আরো এগনো এখন বুদ্ধিসম্মত নয়, তাই ফাঁকা ঘেসো জমি ধরে চড়াই অব্দি গেলাম কাকারটির পেছন পেছন। বাঁয়ে মোড় নিয়ে ফাঁকা জমি ধরে

পথ করে নামলাম নিচে, তলার জঙ্গলে পথে। আমার বিশ্বাস, যথেষ্ট দিনের আলো থাকলে সে সন্ধ্যাতেই আমি বাঘিনীর ভাগ্যের পাশা উল্টে দিতে পারতাম। কেননা পাথরের স্তূপের আড়াল ছেড়ে ও বেরোবার পর থেকে সকল অবস্থাই ছিল আমার অনুকূলে। এ জায়গাটি ও যত ভাল চেনে, আমিও তা চিনি। আর ওর বিষয়ে আমার উদ্দেশ্য কি তা সন্দেহ করার ওর কোনো কারণ নেই। আমার সুবিধে হল, আমার বিষয়ে ওর কি উদ্দেশ্য তা খুব পরিষ্কার জানি। যাইহ'ক, যদিও অবস্থা আমার অনুকূলে, সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে বলে আমি সে অবস্থার সুযোগ নিতে পারলাম না।

যে ইন্দ্রিয়ানুভব আমাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, তার উল্লেখ আমি অন্যত্র করেছি। এই অনুভব খুবই বাস্তব। আর কিসে যে এটাকে কার্যকরী করে তা আমি জানি না বলেই ব্যাখ্যা দিতে পারব না। এটুকু বলার বাইরে এ বিষয় নিয়ে আর কথা বাড়াব না। এইবারটিতে, বাঘিনীকে আমি দেখি নি বা শুনি নি ; কোনো পাখি বা পশুর কাছে ওর উপস্থিতি বিষয়ে কোনো জানানও পাই নি। তবু, নিঃসংশয়ে আমি জেনেছিলাম ও আমার জন্যে পাথরের স্তূপে ওৎ পেতে বসে আছে। সেদিন অনেক ঘণ্টা আমি বাইরে ছিলাম, সাবধানতায় ঢিলে দিয়ে জঙ্গলের বহু মাইল পার করেছিলাম। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যেও অস্বস্তি হয় নি। তারপর, শৈলশিরার চূড়া পেরিয়ে পাথরগুলি নজরে আসতেই আমি জেনেছিলাম ওখানে আমার বিপদ আছে এবং কয়েক মিনিট বাদে জঙ্গলের জানোয়ারদের উদ্দেশে কাকারটির সতর্কতাজ্ঞাপক ডাক ও আমার পায়ের দাগের ওপর দিয়ে বাঘিনীর থাবার ছাপ আবিষ্কারের ফলে, আমার অনুভব যে সত্যি, তাই প্রমাণ হল।

৪

এই কাহিনীতে এতদূর অবধি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসার ধৈর্য যেসব পাঠকের আছে বলে দেখা গেল, তাঁদের আমি বাঘিনীটির সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকারের পরিষ্কার এক বিশদ বর্ণনা দিতে চাই।

কালাআগারে আমি পৌঁছবার উনিশ দিন বাদে, ১৯৩০ সালের ১১ই এপ্রিল সে সাক্ষাৎকার ঘটে।

জঙ্গলে পথে জায়গা বেছে বেছে আমার তিনটি মোষকে বাঁধার উদ্দেশ্যে সেদিন আমি দুপুর দুটোয় বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বাংলো থেকে এক মাইল দূরে এক জায়গায়, যেখানে পথটি একটি শৈলশিরা পার হয় ও কালাআগার শৈল-মালার উত্তর থেকে পশ্চিম পানে যায়, সেখানে আমি বড় একদল মানুষকে দেখলাম। ওরা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে এসেছে। সে দলে একটি বৃদ্ধ ছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তা থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে,

পাহাড়ের নিচে, তরুণ ওক গাছের এক ঘন সন্নিবেশ দেখিয়ে সে বলল, ওই সন্নিবেশে এক মাস আগে বাঘিনী ওর একমাত্র ছেলে, এক আঠার বছরের তরুণকে মেরেছে।

ওর ছেলের হত্যা বিষয়ে বাপের বক্তব্য আমি শুনি নি, তাই আমরা যখন পথের কিনারে বসে ধূমপান করছি, ও তার কাহিনী বলল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোথায় ছেলেটি মারা পড়ে, কোথায় পরদিন ওর যা কিছু দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেদিন যে পঁচিশ জন লোক জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করছিল, তাদেরই ও ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী করল ও গভীর ক্ষোভে বলল, ওরা পালিয়ে যায়, বাঘের হাতে মারা পড়বার জন্যে ওর ছেলেকে ওরা ফেলে রেখে যায়।

আমার কাছে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন সেই পঁচিশ জনের দলের মধ্যে ছিল। তারা ছেলেটির মৃত্যুর দায়িত্ব উত্তপ্ত কণ্ঠে অস্বীকার করল। বাঘকে গর্জাতে শুনেছে বলে আর্ত চীৎকার করে সকলকে জান বাঁচাতে পালাতে বলে উন্মত্ত হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দেবার জন্য ওরা বুড়োকেই দায়ী করল। এ কথা বুড়োর মনোমত হল না। ও মাথা নাড়ল, বলল, 'তোমরা বয়স্ক পুরুষ, ও ছিল বালকমাত্র, তোমরা পালিয়ে গেলে আর মারা পড়বার জন্যে ফেলে গেলে ওকে।' যে সব প্রশ্ন থেকে এই উত্তপ্ত তর্ক শুরু হল সেগুলি জিজ্ঞাসা করেছি বলে আমি দুঃখিত হলাম। এতে যা ফল হবে, তার চেয়ে বেশি ওই বুড়োকে ঠাণ্ডা করা যাবে বলে আমি বললাম, যেখানে ওর ছেলে মারা পড়েছে বলে বলছে ও, সে জায়গাটির কাছে আমার একটা মোষ বেঁধে দেব। তাই, বাংলোতে ফিরিয়ে নেবার জন্যে দুটি মোষকে ওই দলটির হাতে দিয়ে বাকি মোষটি সহ আমার দুজন লোককে পেছন নিয়ে রওনা হলাম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার কাছাকাছি জায়গা থেকে একটি পায়ে-চলা পথ পাহাড় বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে। দুমাইল সামনের জঙ্গলে পথে গিয়ে পড়বার জন্যে উলটো দিকের পাইন ঢাকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সে পথ একেবেঁকে উঠে গেছে। যে ওক ঝাড়ে ছেলেটি মারা পড়েছে, তা ঘিরে এক খণ্ড ফাঁকা জমি। পথটি সে জমির কাছ দিয়ে গেছে। এই খোলা জমিটি প্রায় ত্রিশ বর্গগজ, তাতে একটি মাত্র পাইন চারা। গাছটিকে কেটে ফেললাম। মোষটাকে বাঁধলাম কাটা গোড়ায়; একটি লোককে লাগিয়ে দিলাম ওর জন্যে ঘাস কাটতে। আরেকজন হল মাধো সিং। তাকে তুলে দিলাম একটি ওক গাছে। বলে দিলাম, ও কুড়োলের মাথা দিয়ে একটা শুকনো ডালে ঘা মারবে আর পাহাড়ের মানুষ পালিত পশুর জন্যে পাতা কাটার সময়ে যেমন গলা ছেড়ে চেঁচায় তেমন করে চেঁচাবে। এই মাধো সিং মহাযুদ্ধে গাড়োয়ালী ফৌজে কাজ করেছে, ও এখন য়ুনাইটেড প্রভিন্‌স্‌ সিভিল পায়োনীয়র ফোর্সে কাজ করছে।

তারপর ফাঁকা জমির নিচের দিকের কিনারে আন্দাজ চার ফুট উঁচু একটি পাথরে জায়গা করে নিয়ে বসলাম আমি। ওই পাথরের ওপারে পাহাড়টি খাড়াই নেমে গেছে নিচের উপত্যকায় এবং গাছ ও গুল্ম জঙ্গলে তা ঘন করে ঢাকা। যে লোকটি নিচে ছিল, সে যে ঘাস কেটেছে তা নিয়ে বহুবার যাওয়া আসা করল। গাছের ওপর বসে মাধো সিং একবার চেঁচাচ্ছিল, একবার গাইছিল গলা ছেড়ে। আমি পাথরটিতে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিলাম, রাইফেলটি ছিল আমার বাম বাহুর কোলে, হঠাৎ জানতে পারলাম নরখাদক বাঘিনীটা এসে গেছে। নিচে যে লোকটি ছিল তাকে হাতছানি দিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে বলে শিস দিয়ে মাধো সিংয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করলাম এবং ওকে চুপ করে থাকার জন্য ইশারা জানালাম। তিন দিকের জমি তুলনামূলকভাবে খোলা। আমার সামনে বাঁ দিকে গাছের ওপরে মাধো সিং, যে ঘাস কাটছিল সে লোকটি আমার সামনে ডান দিকে, আব মোষটি আমার সামনে বাঁ দিকে—এখন ও অস্বস্তির লক্ষণ দেখাচ্ছে। আমার অদেখায় বাঘিনীটি এ জায়গায় এগোতে পারে না। আর যেহেতু সে এসে হাজির হয়েছে, একটি মাত্র জায়গায় এখন থাকতে পারে ও, তা হল আমার ঠিক নিচে, পেছনে।

যখন বসি, লক্ষ করেছিলাম, পাথরটি দূরের দিকে পাশে খাড়াই এবং মসৃণ। ওটি পাহাড়ের ঢালে আট বা দশ ফুট বিস্তৃত হয়ে গেছে, আর জায়গাটির নিচের অংশটি নিবিড় ঝোপ-জঙ্গল ও ছোট পাইন চারায় আড়াল করা। পাথরটিতে উঠে পড়া বাঘিনীটির পক্ষে সামান্য কঠিন হবে তবে তা ওর সাধ্যের মধ্যে। ও যদি সে চেষ্টা করে তাহলে ঝোপ-জঙ্গলে ওর আওয়াজ পাওয়ার ওপর আমাব নিরাপত্তার জন্যে নিভর করলাম।

মাধো সিং যে চেঁচামেচি করছিল তাতেই আকৃষ্ট হয় বাঘিনী। ও তাই হ'ক এই আমি চেয়েওছিলাম। এতে আমাব কোনো সন্দেহ নেই। ও এসেছিল পাথরটির কাছে আর যখন আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল এবং পরের চাল ভাঁজছিল, তখন আমি ওর উপস্থিতির কথা আঁচ করি। লোকগুলির নীরবতা আর আমার যুদ্ধ ফ্রণ্ট পালটে ফেলায় ওর হয়তো সন্দেহ হয়েছে। যাই হ'ক, কয়েক মিনিটের বিরতি গেলে পবে পাহাড়ের উৎরাইয়ে একটু নিচে একটা শুকনো ডাল ভাঙতে শুনলাম। তারপর অস্বস্তির বোধ চলে গেল আমার, উত্তেজনায় টান টান ভাবটা ঢিলে হল।

একটি সুযোগ নষ্ট হল, তবে এখনো একটি গুলি মারার খুব ভাল সুযোগ আছে আমার। কেন না নিঃসন্দেহে ও শীঘ্রই ফিরে আসবে আর যখন দেখবে আমরা নেই তখন হয়তো মোষটিকে মেরেই সন্তুষ্ট থাকবে। এখনো দিনের আলো চার বা পাঁচ ঘন্টা আছে আর উপত্যকাটি পেরিয়ে গিয়ে উলটো দিকের ঢাল ধরে উঠলে পরে যে পাহাড়ের গায়ে মোষটি খুঁটিতে বাঁধা আছে তার সবটা

দেখতে পাব আমি। যদি ছুঁড়তে পারি তবে গুলি ছোঁড়া হবে দুই থেকে তিনশো গজ লম্বা পাল্লায়, কিন্তু যে ·২৭৫ রাইফেল বইছিলাম, সেটি নির্ভুল নিশানী এবং যদি আমি বাঘিনীটিকে শুধু জখমই করি, অনুসরণ করতে রক্তের নিশানা পাব। এই এতগুলো মাস ধরে যা করছি, সেই শত শত বর্গ মাইল জঙ্গল হাঁটকে ওর খোঁজ করার চেয়ে তা বরং ভালই হবে।

লোকগুলিকে নিয়ে মুশকিল। ওদের একা বাংলোয় ফেরত পাঠানো খুন করার চেয়ে কিছু কমতি হত না, তাই বাধ্য হয়েই ওদের আমার সঙ্গেই রাখলাম।

খোঁটার সঙ্গে মোষটিকে এমন করে বাঁধলাম যাতে বাঘিনীর পক্ষে ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়. আমি ফাঁকা জমিটি ত্যাগ করলাম এবং উলটোদিকের পাহাড় থেকে গুলি করতে চেষ্টা করবার যে পরিকল্পনা ছকেছি, তা কার্যকরী করবার জন্য আবার গেলাম পথটিতে।

পথটি দিয়ে আন্দাজ একশো গজ চলে আমি এলাম একটি গিরিখাতে। এটির দূরের দিকে পথটি ঢুকে গেছে অতি নিবিড় ঝোপজঙ্গলে। যেহেতু পেছনে দুজন লোক নিয়ে আমার ঘন ঝোপে ঢোকা বুদ্ধিসম্মত নয়. গিরিখাতটি ধরা, উপত্যকার সঙ্গে গিরিখাতের সন্ধি অবধি এটি ধরে চলা, বেয়ে উপত্যকায় ওঠা, এবং ঝোপ-জঙ্গলের দূরের দিকের পথটি আবার ধরা এই সিদ্ধান্তই করলাম।

গিরিখাতটি আন্দাজ দশ গজ চওড়া এবং চার বা পাঁচ ফুট গভীর। যেমন এটিতে নেমেছি, যে পাথরে আমি হাত রেখেছিলাম তা থেকে উড়ে গেল একটি পাহাড়ী-রাতচরা পাখি ডানা ঝটপটিয়ে। যেখান থেকে পাখিটি উড়ে গেল, সেখানে চেয়ে দেখি দুটো ডিম। এই গাঢ় বাদামী রঙের দাগ দেওয়া খড় রঙা ডিম গুলির আকার যেমন, তা সচরাচর দেখা যায় না। একটি লম্বা ও বেজায় সূচলো অন্যটি মার্বেলের মত নিটোল গোল। যেহেতু আমার সংগ্রহে পাহাড়ী রাতচরার ডিম নেই, এই বেখাপ্পা ডিম দুটো তাতে যোগ করা মনস্থ করলাম। ডিম নেবার মত কোনো জিনিসই ছিল না আমার, তাই বাঁ হাত আধমুঠো করে তাতে ডিম দুটি রাখলাম, একটু শ্যাওলা দিয়ে দুটিকে মুড়লাম।

আমি যেমন গিরিখাতে নামতে লাগলাম, পাড়গুলো উঁচু হতে থাকল। যেখানে আমি গিরিখাতে প্রবেশ করেছি সেখান থেকে ষাট গজ দূরে বার থেকে চোদ্দ ফুট গভীরে এক উৎরাইয়ের মুখে এলাম আমি। বৃষ্টির সময়ে এই সব পার্বত্য গিরিখাত দিয়ে যে জলের তোড় নামে, তা পাথরগুলিকে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে কাচের মত মসৃণ করে ফেলেছে এবং যেহেতু তা পা রাখার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক, তাই একজনকে রাইফেলটি দিলাম এবং কিনারে বসে ঘষটে-ঘষটে নামতে শুরু করলাম।

আমার পা তলার বালি ছুঁয়েছে সবে, তখন দুটি লোকই উড়ন্ত লাফ মেরে একেকজন আমার একেক পাশে এসে পড়ল ও আমার হাতে রাইফেল গুঁজে দিয়ে পরম উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করল, আমি বাঘের কিছু শুনেছি কি না। সত্যি বলতে কি, সম্ভবত পাথরের ওপরে আমার পোশাকের ঘষড়ানির কারণেই শুনি নি আমি কিছুই। আর যখন প্রশ্ন করলাম, ওরা বলল খুব কাছে কোথাও বাঘের চাপা গর্জন শুনেছে ওরা। কিন্তু সঠিক কোন দিক থেকে আওয়াজটি এল, তা তারা বলতে পারল না।

যখন শিকারের খোঁজ করছে তখন গর্জন করে বাঘরা তাদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেয় না। এর একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি তা হল, আমরা ফাঁকা জমিটি ত্যাগের পরই বাঘিনী আমাদের পেছু নেয়, আর আমরা গিরিখাত ধরে যাচ্ছি দেখে, যেখানে খাতটি যতটা চওড়া, তা থেকে সরু হয়ে গেছে আধাআধি, সেখানে দাঁড়ায়। আর যখন ও আমার ওপর লাফ মারতে যাবে, তখনি আমি পিছলে নামার ফলে চোখের আড়াল হয়ে যাই এবং বাঘিনী অনিচ্ছাতেই ওর আশাভঙ্গ প্রকাশ করে ফেলে একটি নিচু গর্জনে। খুব সন্তোষজনক যুক্তি নয়, বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, তবু যদি কেউ ধরে নেয়, যে শিকারের জন্যে ও আমাকেই বেছেছিল অতএব ঐ দুটি মানুষে কোনো আগ্রহ দেখায় নি।

আমরা তিনজন দল বেঁধে যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের পেছনে আছে সেই মসৃণ ও খাড়াই পাথর। আমাদের ডানদিকে পনের ফুট উঁচু একটি পাথরের দেওয়াল গিরিখাতের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে, এবং আমাদের বাঁ দিকে আছে ত্রিশ বা চল্লিশ ফুট উঁচু ছড়িয়ে থাকা বড় বড় পাথরের এক পাড়। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা, গিরিখাতের সেই বালি ঢাকা বুকটি আন্দাজ চল্লিশ ফুট লম্বা এবং দশ ফুট চওড়া। বালি-ঢাকা বুকের নিচের কিনারে একটি অতিকায় পাইন গাছ আড়াআড়ি পড়ে বাঁধ রচনা করেছে খাতটিতে এবং এই বাঁধের কারণেই প্রচুর বালি জমেছে। পড়ে থাকা গাছটি থেকে আন্দাজ বার বা পনের ফুট দূরে সেই হেলে থাকা পাথরের দেওয়ালটি শেষ হয়েছে এবং আমি যেমন বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দ চরণে, দেওয়ালটির শেষটায় পৌছিলাম অতীব সৌভাগ্যবশে লক্ষ করলাম, পাথরটির পেছন অব্দি চলে গেছে বালির বুক।

এই যে পাথরটির কথা এত করে বলছি, এটিকে আমি এক অতিকায় স্কুল-স্লেট বললে সব চেয়ে ভাল বর্ণনা দেওয়া হয়। নিচের দিকে এটি দু ফুট পুরু এবং এটি দাঁড়িয়ে আছে একটি লম্বা হয়ে যাওয়া পাশের ওপর ভর রেখে। দাঁড়ানোটি যে একেবারে সোজা, তা নয়।

এই অতিকায় স্লেট পেরিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন পানে তাকালাম আমি এবং তাকাতেই সিধে বাঘিনীর সঙ্গে মুখোমুখি।

আপনারা পরিস্থিতিটির পরিষ্কার ধারণা পান, তাই চাই আমি।

পাথরটির পেছনে বালুর বুকটি বেশ সমান সমান। তার ডানদিকে সেই বাইরের দিকে ঈষৎ হেলে থাকা পনের ফুট উঁচু মসৃণ স্লেট, বাঁদিকে এক ঘষা লেগে ক্ষয়ে যাওয়া খাড়াই পাড়। এটিও পনের ফুট উঁচু এবং এর গা দিয়ে ঝুলে পড়েছে কাঁটা ঝোপের এক সুনিবিড় জাল। এর দূরের দিকে আমি যে পাথর ধরে পিছলে নেমেছিলাম তারই মত আরেকটি মসৃণ পাথর তবে এটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। প্রকৃতিদেবীর তৈরি এই তিনটি দেওয়ালে ঘেরা বালির বুকটি প্রায় বিশ ফুট লম্বা এবং তার অর্ধেক চওড়া। আর সামনের থাবা দুটি সামনে এগিয়ে রেখে, পেছনের পা দুটি ভেতরে গুটিয়ে বসে আছে বাঘিনীটি তারই উপরে। ওর মাথা থাবা থেকে কয়েক ইঞ্চি ওঠানো এবং আমার থেকে আট ফুট দূরে (পরে মাপা হয়) এবং ওর মুখে এক হাসি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোনো কুকুর তার প্রভুকে বাড়িতে স্বাগত জানালে তার মুখে যেমন হাসি দেখা যায়, এ যেন তেমনি এক হাসি।

দুটি চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেল আমার মনে; একটি—প্রথম 'মার' আমি মারব। সে ব্যাপারে এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অপরটি—সে 'মার' মারতে হবে এমন পন্থায় যাতে বাঘিনী চমকে ভয় না পায় অথবা নার্ভাস না হয়।

রাইফেল আমার ডান হাতে, আমার বুকের পরে কোনাকুনি করে ধরা। তার সেফটি ক্যাচ খোলা এবং বাঘিনীর ওপর তাক করতে গেলে নলটিকে এক বৃত্তের তিন-চতুর্থাংশ ঘোরাতে হবে।

এক হাতে রাইফেল ঘোরাবার ব্যাপারটি শুরু করা হল অত্যন্ত একটু একটু করে, চোখে যেন পড়ে না প্রায় এইভাবে, এবং যখন বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ ঘোরানো হল, রাইফেলের বাঁট ঠেকল আমার শরীরের ডাইনে। এখন বাহু ছড়ানো দরকার এবং যেমন বাঁটটি আমার গা থেকে সরল, সরানোর কাজটি চলতে থাকল খুব তিলে তিলে। আমার বাহু এখন পুরো মেলে রেখেছি আর রাইফেলটির ওজনের ভার এখন টের পাচ্ছি। নলটি আর সামান্য ঘুরতে বাকি এবং বাঘিনীটি—ও একবারও আমার চোখ থেকে চোখ সরায় নি—ও এখনো মুখ তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে, এখনো ওর মুখে সেই খুশির অভিব্যক্তি।

বৃত্তের তিন-চতুর্থাংশ ঘুরতে কত সময় লাগল রাইফেলের তা সঠিক বলার মত অবস্থা আমার নয়। বাঘিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে আছি বলে নলের গতিবিধি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হল, আমার হাতটা অসাড় হয়ে গেছে, এই বৃত্ত ঘোরা কোনদিন সম্পূর্ণ হবে না। যাই হ'ক, বৃত্ত ঘোরা সম্পূর্ণ হল অবশেষে, আর যেই রাইফেলটি বাঘিনীর শরীর তাক করল, আমি ট্রিগার টিপলাম।

জায়গাটি চাপা, তাই গুলির আওয়াজ অনেক বেশি জোরে হতে শুনলাম আমি। রাইফেলের পিছু ধাক্কার ঝাঁকানি টের পেলাম, এবং রাইফেল যে ফায়ার করেছে, সে ঘটনার এইসব বাস্তব প্রমাণ না থাকলে পরে—সে গুলির ফল যদিও হাতে হাতে দেখা গেল তবু আমি সেই এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কবলেই থেকে যেতাম। যে দুঃস্বপ্নে সংকটের মুহূর্তে ট্রিগার বৃথাই টেপা হয়, রাইফেল গুলি ছুঁড়তে নারাজ হয়।

খুব সামান্য সময় বাঘিনী নিস্পন্দ রইল। সময়ের সে খণ্ড অংশটি যেন টের পাওয়া গেল। তারপর, অতি ধীরে ওর মাথা ডুবে গেল ওর সামনে মেলে রাখা থাবার ওপরে—একই সঙ্গে বুলেটের গর্ত থেকে বেরিয়ে এল রক্তের একটি ফিনকি। বুলেটটি ওর শিরদাঁড়া জখম করে এবং ওর হৃৎপিণ্ডের উপরাংশ ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

যে দুটি লোক কয়েক গজ তফাতে আমার পেছু পেছু আসছিল, পাথরটি শুরু হয়েছে বলে বাঘিনী থেকে তফাত হয়ে পড়েছিল, তারা যখন দেখে আমি থামলাম, মাথা ফেরালাম, ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা টের পেয়ে যায় যে আমি বাঘিনীটিকে দেখেছি এবং আমার আচরণ দেখে বোঝে বাঘিনী কাছেই আছে। মাধো সিং পরে বলে ও চেঁচাতে চেয়েছিল। আমাকে বলতে চেয়েছিল ডিমগুলো ফেলে দিয়ে দুহাতে রাইফেল ধরতে।

যখন গুলি ছুঁড়লাম এবং রাইফেলের মাথা নামিয়ে রাখলাম আমার পায়ের আঙুলে, আমার ইঙ্গিতে মাধো সিং এগিয়ে এল আমার হাত থেকে ওটা নিতে। কেননা হঠাৎ আমার পাগুলো যেন আমার শরীরের ভার বইতে পারছে না বলে মনে হল। তাই আমি পড়ে থাকা গাছটির কাছে গেলাম ও বসলাম। ওর পায়ের নিচের নরম অংশের দিকে চেয়ে দেখার আগেই আমি জেনে গিয়েছিলাম এ সেই চৌগড়ের বাঘিনী। আমি ওকে পাঠিয়েছি আনন্দ মৃগয়া কাননে। চৌষট্টিটি মানুষের জীবনের সূত্র কাটতে—যে কাঁচি ওকে সহায়তা করেছিল, জিতের খেলা ওর হাতে থাকতে থাকতেই সে কাঁচি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কেটে দিয়েছে ওরই জীবনের সূত্র। জেলার লোকরা অবশ্য সংখ্যাটিকে ওর দ্বিগুণ করে ধরে।

তিনটি ব্যাপার আসলে আমার অনুকূলে ছিল, তার প্রত্যেকটিকে আমার প্রতিকূল বলে আপনাদের মনে হবে। তা হল, (ক) আমার বাঁ হাতের ডিমগুলো, (খ) যে হালকা রাইফেল বইছিলাম আমি, এবং (গ) বাঘিনীটি হল এক নরখাদক।

আমার হাতে যদি ডিমগুলো না থাকত, তবে আমার দু হাতই থাকত রাইফেলে আর যখন আমি পেছনে ফিরতাম ও অত কাছে বাঘিনীকে দেখতাম, সহজাত প্রবৃত্তি বশেই ওর মুখোমুখি হবার জন্যে বোঁ করে ঘুরে যেতাম আমি।

আর আমার তরফে নড়াচড়া ছিল না বলে ওর তরফে যে লাফিয়ে-পড়া রুখে যায়, তা তখন কার্যকরী করা হতই হত।

আবার, রাইফেলটি যদি হাল্‌কা না হত, তাহলে ওটি যেভাবে ঘোরানো অবশ্য দরকার ছিল, সেভাবে ঘোরানো, এবং আমার হাত সম্পূর্ণ মেলে রেখে ওটি ছোঁড়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

সর্বশেষে, বাঘিনীটি যদি নরখাদক না হয়ে সাধারণ এক বাঘিনী হত, যেই দেখত নিজে কোণঠাসা, অমনি ফাঁকায় পালাবার জন্যে ঝাঁপ দিত, আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে যেত। এবং বাঘ পথ থেকে সরিয়ে দিলে পরে সাধারণত তার ফল প্রাণঘাতী হয়।

লোকগুলি যখন অনেকখানি জায়গা ছেড়ে ঘুরে গিয়ে মোষটিকে খুলে দড়িটি যোগাড় করতে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল, আমি পাথরগুলি টপকে উঠে গিরিখাতের ভাটি ধরে গেলাম ন্যায্য মালিকের কাছে ডিমগুলো ফেরত দিতে। দড়িটি এখন আরো আনন্দজনক আরেকটি কাজেব জন্যে দরকার। আমার শিকারী ভায়েরা যেমন, আমিও তেমনই কুসংস্কাবে বিশ্বাসী বলে দোষ মানছি। এক বছরের চেয়েও বেশি সময় তিনবার দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করেছি। কঠিন চেষ্টা করেছি বাঘিনীটিকে একটি গুলি মারার সুযোগ পেতে এবং ব্যর্থ হয়েছি। আর এখন, ডিমগুলি তুলে নেবার অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল।

এতক্ষণ ধরে আমার হাতের মুঠোতেই নিরাপদে ছিল ডিমগুলি। যখন আমি ওগুলিকে পাথরের সেই ছোট্ট গর্তে ফিরিয়ে রাখলাম, ওগুলো তখনো গরম। গর্তটি নীড়ের কাজ করছিল। আব যখন আধঘণ্টা [illegible] আবার ও পথটি পেরোলাম, ডিমগুলি তখন অদৃশ্য হয়েছে তা-দান নিরত মায়ের নিচে। ওর গায়ের রং ছিটছিটে পাথরটির সঙ্গে এমন মিলে গেছে, যে আমি তো সঠিক জানি নীড়টি কোথায় আছে, আমার পক্ষেও চাবপাশে থেকে পাখিটিকে তফাত করা কঠিন হয়েছিল।

এত মাস যত্নে থাকার ফলে মোষটি এখন এমন পোষা হয়েছে যে ওটি অনুসরণ করতে থাকল কুকুরের মত। লোকদের পিছু পিছু ও পাহাড় বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নেমে এল, বাঘিনীটিকে শুঁকল এবং অতীব সন্তোষজনক জাবর কাটতে শুয়ে পড়ল বালিতে—তখন, লোকদুটি যে পোক্ত খুটি কেটেছে, আমরা বাঘিনীকে তার সঙ্গে বাঁধলাম।

বাংলোয় ফিরে গিয়ে আরও লোক আনার জন্যে আমি মাধো সিংকে পাওয়াতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে তা করবার কোন আগ্রহ-ই দেখাল না। ও এবং ওর সঙ্গী নরখাদকটাকে বইবার সম্মান আর কারো সঙ্গে ভাগ করে নেবে না। ও বলল, আমি যদি হাত লাগাই তবে জিরোবার জন্যে ঘন ঘন থেমে চললে এ কাজ খুব

কঠিন হবে না। আমরা তিনজনই বলিষ্ঠকায়—দুজন শৈশব থেকে ভারি বোঝা বইতে অভ্যস্ত—তিনজনই রোদে পুড়ে জলে ভিজে শক্তপোক্ত। তবুও যে কাজ করলাম তা শুধু হারকিউলিসের সাধ্য এক কাজ।

যে লম্বা খুঁটিতে বাঘিনীকে বাঁধা হল, তা বইবার পক্ষে যে পথে আমরা উৎরাই নেমেছিলাম তা বড় বেশি সংকীর্ণ, বড় বেশি পেঁচানো পেঁচানো। তাই, দম ফিরে পেতে এবং খুঁটিটি ঘাড়ের মাংসপেশীতে বড় বেশি কেটে-বসা বাঁচাবার জন্যে রাখা পুরু কাপড়টি বারবার সামলাবার কারণে ঘনঘন থেমে থেমে, র‍্যাস্পবেরি এবং বন-গোলাপের কাঁটাঝোপের এক জড়াজড়ি জঙ্গল দিয়ে আমরা সিধে পাহাড়ের ওপরপানে চললাম। ওগুলোর কাঁটায় আমাদের পোশাক এবং চামড়ার বেশ খানিকটা রেখে গেলাম—ফলে বহুদিন ধরে স্নান করা এক যন্ত্রণার ব্যাপাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চারদিকের পাহাড়ের ওপরে সূর্য তখনো জ্বলছে, তখন তিনজন বিস্রস্ত বেশ অতীব সুখী মানুষ একটি মোষকে পেছনে নিয়ে বাঘিনীটিকে বয়ে নিয়ে এল কালাআগাব ফরেস্ট বাংলোয়। আর সেই সন্ধ্যা থেকে আজ অবধি, যে শত শত বর্গ মাইল ব্যাপী পাহাড় ও উপত্যকাব ওপর পাঁচ বছর সময়কাল ধরে চৌগড়ের বাঘিনী জবরদখল রেখেছিল, সেখানে কোনো মানুষ নিহত বা জখম হয় নি।

আমার সামনের দেওয়ালে যে পূর্ব কুমায়ুনের ম্যাপ ঝুলছে তাতে আমি আরেকটি ক্রসচিহ্ন ও দিনাঙ্ক যোগ করেছি। ওই ক্রসচিহ্ন ও দিনাঙ্ক নরখাদক বাঘিনীটির অর্জিত। ক্রসচিহ্নটি কালাআগারের দু মাইল পশ্চিমে, এবং ওর নিচের দিনাঙ্ক হল ১১ই এপ্রিল, ১৯৩০।

বাঘিনীর নখগুলো ভেঙে ক্ষয়ে গিয়েছিল, ওর একটি কুকুর-দাঁত ভাঙা ছিল, সামনের দাতগুলো হাড় অব্দি ক্ষয়ে গিয়েছিল। এই সকল অঙ্গহানিই ওকে নরখাদকে পরিণত করেছিল। আমার প্রথম যাত্রায় ভুল করে আমি ওর যে শাবককে মারি, যেদিন থেকে তার সহায়তা লাভে ও বঞ্চিত হয়, সেদিন থেকে ও যে মানুষদের আক্রমণ করত তাদের অধিকাংশকেই ও তখনি নিজের সামর্থ্যে মেরে ফেলতে পারে নি—এই অঙ্গহানিগুলি তারও কারণ বটে।

পাওয়ালগড়ের কুঁয়ারসাব

১

আমাদের শীতাবাসের তিন মাইল দূরে, জঙ্গলের গভীরে, প্রায় চারশো গজ লম্বা ও তার প্রায় অর্ধেক চওড়া এক মুক্ত প্রান্তর। তা পান্না সবুজ ঘাসে ঢাকা এবং বেতসলতার জালে জড়ানো বিচ্ছিন্ন গাছে ঘেরা। সৌন্দর্যে এর জোড়া নেই আর এই ঘাসজমিতে আমি প্রথম দেখি সেই বাঘকে, যে সমগ্র যুক্তপ্রদেশে 'পাওয়ালগড়ের কুঁয়ারসাব' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি বাঘটাকে মেরে নাম কেনার জন্যে শিকারীরা হন্যে হয়ে ঘুরছে।

এক শীতের সকালে সূর্য সবে উঠেছে, তখন আমি ঘেসো জমির মুখোমুখি ভাঙা জমিটা টপকে পেরোলাম। দূরের দিকে এক স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর দু তীরের শুকনো পাতার মধ্যে কুড়িটা লাল বনমোরগ আঁচড়াচ্ছিল এবং শিশিরে ঝলমল মরকত-সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পঞ্চাশটা কি তারও বেশি চিতল ঘাস খাচ্ছিল। একটি গাছের কাটা গোড়ায় বসে ধূমপান করতে করতে আমি এ দৃশ্য কিছুক্ষণ ধরে দেখছি, এমন সময়ে আমার সবচেয়ে কাছের হরিণীটা মাথা তুলল, আমার পানে ফিরল ও ডেকে উঠল। এক মুহূর্ত বাদে আমার নিচের ঘন ঝোপ থেকে ফাঁকায় বেরিয়ে এল কুঁয়ারসাব।

দীর্ঘ এক মিনিট কাল ও এ দৃশ্য দেখতে থাকল দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচুতে তুলে তারপর, আস্তে, ধীর পা ফেলে ঘেসোজমিটা পার হতে শুরু করল। শীতঋতুতে জাঁকালো চামড়া ওর, নবোদিত সূর্য তা দীপ্তোজ্জ্বল করে তুলছে, মাথা এখন ডাইনে ঘুরিয়ে, বাঁয়ে ঘুরিয়ে, হরিণরা ওকে যে চওড়া পথ ছেড়ে দিল তা ধরে ও যখন হাঁটছিল, তখন সে এক রাজকীয় দৃশ্য। নদীর কাছে গিয়ে বাঘটা

গুড়ি মেরে বসল, পিপাসা মেটাল, লাফিয়ে পেরোল নদীটি এবং ওপারের ঘন গাছ-জঙ্গলে ঢুকতে ঢুকতে, জঙ্গলের প্রাণীরা ওকে যে কুর্নিশ পেশ করল তার স্বীকৃতিতে ডেকে উঠল তিনবার। কেন না যখন থেকে ও ঘেসো জমিতে পা রেখেছে, প্রতিটি চিতল ডেকেছিল, প্রতিটি বনমোরগ কোঁক্‌র-কোঁ করেছিল এবং গাছের একদল বানরের প্রত্যেকে কিচিরমিচির করেছিল। সে সকালে বড় দূরে চলে এসেছিল কুঁয়ারসাব, কেন না ওর বাসা ছ মাইল দূরে এক গিরিখাতে। যে অঞ্চলে হাতির সহায়তায় অধিকাংশ বাঘ শিকার করা হয়, সেখানে বাস করে ও বাসা বেছেছিল বুদ্ধিমানের মত। নিচের গিরিমালা অবধি চলে যাওয়া গিরিখাতটি আধ মাইল লম্বা, তার দু দিকে খাড়াই পাহাড় হাজার ফুট অব্দি উঠে গেছে। গিরিখাতটির উঁচু দিকের কিনারে প্রায় বিশ ফুট উচু এক জলপ্রপাত এবং লালমাটি কেটে যেখান দিয়ে জল বয়ে গেছে, সেই নিচের কিনারে গিরিখাতটি সরু হয়ে চার ফুট হয়েছে। তাই, কুঁয়ারসাব যখন নিজের মহলে থাকে তার সঙ্গে হিসেব-মেটাতে ইচ্ছুক যে কোনো শিকারীকেই বাধ্য হয়ে সে কাজ করতে হবে পায়ে হেঁটে। একদিকে এই নিরাপদ আশ্রয়, অন্যদিকে রাত্রিতে শিকার করা সরকারী আইন বিরুদ্ধ—এর ফলই শিকারীর কবল থেকে কুঁয়ার সাহেবের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল।

মোষের জ্যান্তটোপের সহায়তায় ওকে শিকার করবার বহু চেষ্টা বারবার করা হয়। তা সত্ত্বেও কুঁয়ারসাব কখনো গুলি খায় নি। যদিও, আমি জানি বাঘটা দু বার কোনোমতে মৃত্যুর হাত এড়িয়ে বেঁচেছে। প্রথমবার, নিখুঁত এক জঙ্গল হাঁকানির পর, যে মোটা রশিতে মাচানটি টাঙানো ছিল, তা দরকারের সময় ফ্রেড অ্যান্ডারসনের রাইফেলের গতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয়বার, হাঁকানি শুরু হবার আগেই কুঁয়ারসাব মাচানের কাছে পৌছে যায় এবং হুইশ এডিকে পাইপে তামাক ভরতে দেখে। দুবারই মাত্র কয়েক ফুট পাল্লার মধ্যে ওকে দেখা যায়। অ্যান্ডারসন ওকে এক শেটল্যান্ড টাট্টুর মত বড় বলে বর্ণনা করেন, এডি বলেছেন ও একটা গাধার মত বড়।

এই সকল, এবং অন্যান্য বিফল প্রচেষ্টার পরের শীতে—আমাদের কমিশনার, উইন্ডহ্যাম, ভারতের যে কোনো লোকের চেয়ে তিনি বাঘের বিষয় বেশি জানেন —তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম, যে গিরিখাতে কুঁয়ারসাব বাস করে, তার উঁচু দিকের কিনার ঘেরা এক ঝুম্‌ রাস্তায় (ঝুম্‌ রাস্তা ; জঙ্গলে আগুন লাগার ফলে জঙ্গল জ্বলে সৃষ্ট রাস্তা)। ওই পথে সেদিন সকালে বাঘটির থাবার যে টাটকা ছাপ দেখেছি, তাই ওঁকে দেখাতে। উইন্ডহ্যামের সঙ্গে ছিলেন ওঁর অভিজ্ঞতম শিকারীদের দুজন, এবং ওঁরা তিনজন থাবার ছাপগুলি সযত্নে পরিমাপ ও পরীক্ষা করার পর উইন্ডহ্যাম বলেন, তাঁর মতে, বাঘটির 'বিটুইন দ্য পেগস' (মৃত বাঘকে চিত করে শুইয়ে লেজটি টান করে নাকের ডগা ও লেজের ডগায়

কাঠি পুঁতে বাঘ সরিয়ে নিয়ে কাঠি দুটির মধ্যবর্তী মাপ হল বিটুইন দ্য পেগ্‌স মাপ, এটিই বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি।—সম্পাদিকা) মাপ হল দশ ফুট ; এবং এক শিকারী বলেন বাঘটির 'ওভার দ্য কার্ভ্‌স্‌' (একই ভাবে বাঘটি রেখে, নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অব্দি মাপের ফিতেয় মাপলে তা হয় ওভার দ্য কার্ভ্‌স্‌ পদ্ধতিতে মাপ।—সম্পাদিকা) মাপ ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি, অপর জন বলেন তা ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি বা বেশি হবে। তিনজনই স্বীকার করেন, এর চেয়ে বড় কোনো বাঘের থাবার ছাপ ওঁরা কখনো দেখেন নি।

কুয়ার সাবের ঘর ঘিরে যে অঞ্চল, সেখানে বন-বিভাগ ব্যাপকভাবে গাছ কাটতে শুরু করে ১৯৩০ সালে এবং এই গণ্ডগোলে বিরক্ত হয়ে সে বাসস্থান বদল করে। বাঘটিকে শিকারের উদ্দেশ্যে যে দুজন শিকারী শিকার-পাস নেন তাঁদের কাছে আমি এ কথা শুনি। প্রতি মাসে পনের দিনের জন্যে শিকার পাস দেওয়া হয় এবং সে শীতকালে একটির পর একটি শিকারী দল বাঘটির হদিস করতে অসমর্থ হয়।

এক বুড়ো ডাক-রানার, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাত মাইল দৌড় পথে এক পাহাড়ী গ্রামে যেতে প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় আমাদের গেট পেরিয়ে যায়। এক সন্ধ্যায় ও আমার কাছে এসে বলল, সে-সকালে উজান পথে ও ওর ত্রিশ বছরের চাকরি জীবনের দেখার মধ্যে সব চেয়ে বড় একটি বাঘের থাবার ছাপ দেখেছে। ও বলল, বাঘটি এসেছে পশ্চিম থেকে এবং রাস্তা ধরে দুশো গজ এগোবার পর, একটি বাদাম গাছের কাছে শুরু হওয়া এক পথ ধরে পুবে গেছে। আমাদের বাড়ি থেকে আন্দাজ দু মাইল দূরে গাছটি। এটি একটি সুবিদিত জমিন্‌-নিশানী। বাঘটি যে পথ ধরেছে একটি চওড়া নালা পেরোবার আগে তা গিয়েছে অতি নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, তারপর মিলেছে একটি গো-পথে। বাঘের প্রিয় জায়গা একটি বনে ঢাকা গভীর উপত্যকা। সেটিতে ঢোকার আগে গো-পথটি পাহাড়ের পায়ের কাছটা ঘিরে চলে গেছে।

পরদিন সকালে ভোর ভোর রবিনকে পেছন পেছন নিয়ে আমি খোঁজে বেরোলাম। যেখানে গো-পথটি ঢুকছে উপত্যকায় আমার উদ্দেশ্য সেই জায়গাটি। কেন না উপত্যকায় যত জানোয়ার ঢোকে ও বেরোয়, তাদের পদরেখা দেখা যায় ওইখানটিতে। যখন থেকে আমরা বেরোই মনে হল রবিন বুঝেছে আমাদের হাতে এখন বিশেষ এক কাজ আছে। এবং যে বনমোরগকে আমরা ব্যাঘাত ঘটালাম, যে কাকার (কুত্তা-হরিণ) তার কাছে আমাদের যেতে দিল, এবং যে দুটি সম্বর দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের উদ্দেশে ডাকল, তাদের দিকে ও বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিল না।

যেখানে গো-পথটি উপত্যকায় ঢুকেছে, জমিটি কঠিন ও পাথুরে এবং এখানে যখন পৌঁছলাম, রবিন মাথা নামাল, অতি সন্তর্পণে শুঁকল পাথরগুলো,

আমার কাছ থেকে চালিয়ে যাবার ইঙ্গিত পেয়ে ও ঘুরে গেল। ভাটি পথে চলল আমার এক গজ আগে আগে। ওর আচরণ থেকেই আমি বুঝতে পারলাম ও বাঘের গন্ধ পেয়ে চলছে এবং সে গন্ধ খুবই টাটকা। নাবুতে আরো একশো গজ গেলাম. সেখানে পথটি সমতল হয়ে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ ধরে চলে গেছে. মাটিটা নরম। এখানে আমি একটি বাঘের থাবার ছাপ দেখলাম. এবং এক পলক দেখেই খুশি হলাম যে আমরা কুঁয়ার সাবের পেছু পেছু যাচ্ছি। ও আমাদের থেকে মাত্র এক বা দু মিনিটের পথ এগিয়ে আছে।

নরম মাটি পেরিয়ে খাড়া উৎরাইয়ে এক উন্মুক্ত সমতলে নেমে যাবার আগে পথটি তিনশো গজ গেছে পাথরের ওপর দিয়ে। বাঘটি যদি পথ ধরে চলে. ওকে হয়তো ওই ফাঁকা সমতলে দেখতে পাব। আমরা আরো পঞ্চাশ গজ গেছি. তখন রবিন থামল আর পথের বাঁ ধারে একটি ঘাসের ফলার ওপর থেকে নিচ অব্দি নাক ঘষে ও ঘুরে দাঁড়াল. ঢুকে গেল ঘাসের মধ্যে. এখানে ঘাস দু ফুট আন্দাজ উঁচু। ঘাসের দূরের দিকে আন্দাজ চল্লিশ ফুট চওড়া কেরোডেনড্রন গাছের এক বন-খণ্ড। নিবিড় বন রচনা করে এ গাছটি. পাঁচ ফুট অবধি উচ্চতা হয় এর. এর পাতা বিস্তৃত হয়ে ছড়ায়. ফুলগুলির সঙ্গে ঘোড়াবাদাম ফুলের অমিল নেই. বড় বড় থোকায় ফোটে। যে ছায়া দেয়. তার জন্য গাছটি বাঘ, সম্বর ও শুয়োরের খুবই প্রিয়। যখন কেরোডেনড্রনগুলির কাছে পৌঁছল. রবিন থেমে গেল. পিছিয়ে এল আমার দিকে. অমনি করেই বলল আমাকে. ও সামনের ঝোপের মধ্যেটা দেখতে পাচ্ছে না এবং আমি ওকে তুলে বয়ে নিয়ে চলি তাই ওর ইচ্ছে।

ওকে তুলে নিয়ে ওর পেছনের পা দুটি ঢুকিয়ে দিলাম আমার বাঁ-হাতি পকেটে এবং যখন সামনের পা-দুটি আমার বাম বাহুতে বাধিয়ে নিল. ও তখন নিরাপদ, নির্ভয় এবং আমিও দু হাতেই রাইফেল ধরতে পারি। এই সব সময়ে রবিন সর্বদাই উদগ্র আগ্রহী থাকে এবং ও যাই দেখুক. আমরা যে শিকার খুঁজছি তার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ার আগে বা পরে শিকারটি যেমন আচরণই করুক. এসে যায় না কিছু। রবিন কখনো নড়ে না, আমার গুলি ছোঁড়া বিফল করে দেয় না, আমার দেখার কাজে ব্যাঘাত করে না।

খুব ধীরে এগিয়ে আমরা কেরোডেনড্রনগুলির আধা পথ গেছি. এমন সময়ে আমার ঠিক সমুখ বরাবর ঝোপগুলো নড়তে দেখলাম। বাঘটি ঝোপগুলো থেকে না-বেরনো অব্দি অপেক্ষা করলাম, তারপর, ওকে মোটামুটি খোলা জঙ্গলে দেখব আশায় আমি এগিয়ে গেলাম কিন্তু কোথাও দেখলাম না ওকে। আর রবিনকে যখন নামিয়ে দিলাম, ও বাঁয়ে ঘুরল, বুঝিয়ে দিল, বাঘটি কাছের এক গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতের ভেতরে ঢুকেছে। একটা একলা পাহাড়, যার ওপারকার গুহাগুলিতে বাঘেরা প্রায়ই যায়, তার কাছাকাছি পাহাড়ের

পা অব্দি চলে গেছে গিরিখাতটি। যেহেতু অত কাছাকাছি কোনো বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নেই, আরো কি, যেহেতু এখন প্রাতরাশের সময়, রবিন ও আমি ফিরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

প্রাতরাশের পর একটি ভারি ৪৫০ রাইফেলে হাতিয়ারবন্দী হয়ে আমি ফিরে এলাম একা, এবং যেমন পাহাড়টির কাছে এলাম, মোষের গলার বড় ঘণ্টার ঢং ঢং এবং একটি লোকের চীৎকার শুনলাম। সুদূর অতীতের দিনে এ পাহাড়টি গুর্খা আক্রমণকারীদের বিপক্ষে যুদ্ধস্থান হিসেবে আঞ্চলিক অধিবাসীরা ব্যবহার করত। পাহাড়টির চূড়া চ্যাটালো, দেড় বিঘা মত পরিসর তার এবং আওয়াজ আসছিল ওখান থেকেই। তাই আমি পাহাড়ে উঠলাম ও দেখলাম একটি লোক একটা গাছে বসে কুড়োলের মাথা দিয়ে একটা শুকনো ডালে ঘা মারতে মারতে চেঁচাচ্ছে আর গাছের নিচে জড়ো হয়েছে এক পাল মোষ।

আমাকে যখন দেখল, লোকটি জোরে ডাকল, বলল, উটের মত বড় শয়তান একটা বাঘ ওদের বহু ঘণ্টা যাবৎ ত্রাসাচ্ছে এবং ওকে আর ওর মোষদের তার হাত থেকে বাঁচাতে ঠিক সময়েই এসেছি। ওর কাহিনী থেকে বুঝলাম, আমি আর রবিন বাড়ির উদ্দেশে রওনা হবার অল্প পরেই ও পাহাড়ের ওপারে এসে যায় আর ওর মোষদের জন্যে ও যেমন বাঁশপাতা কাটতে লেগেছে, একটি বাঘকে ওর দিকে আসতে দেখে আগে বহুবার অন্য বাঘদের বেলা যেমন করেছে, এবারও বাঘটিকে তাড়াবার জন্যে ও চেঁচায়, কিন্তু চলে যাবার বদলে এ বাঘটা গজরাতে থাকে। ওর মোষগুলির অনুসরণে ও তখনি ছুট লাগায় আর সবচেয়ে কাছের গাছটায় উঠে পড়ে। ওর চেঁচামিচিতে তোয়াক্কাটি না করে বাঘটা তখন ফিরে ফিরে পায়চারি শুরু করে মোষগুলো মাথাটা ওর দিকে করে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো আমার আসার শব্দ শুনে পালিয়ে বাঘটা, কেননা আমার আসার মাত্র একমুহূর্ত আগে ও চলে গেছে।

এ লোকটি এক পুরনো দোস্ত। ওর গ্রামের গ্রামমোড়লের সঙ্গে ঝগড়া হবার আগে মোড়লের বন্দুক দিয়ে এসব জঙ্গলে ও প্রচুর চোরাশিকার করেছে। ওকে এবং ওর মোষদের জঙ্গল থেকে নিরাপদে পার করে দেবার জন্যে ও আমাকে মিনতি জানাল। অতএব ওকে পথ দেখাতে বলে, কোনো মোষ দলছুট না পড়ে থাকে দেখার জন্যে আমি চললাম পেছন পেছন। প্রথমে মোষগুলো তাদের ঠাস-জমায়েত ভাঙতে অনিচ্ছুক ছিল তবে খানিক খোঁচাবার পর ওদের নড়াতে পারলাম এবং উন্মুক্ত সমতল পেরিয়ে আধাআধি গিয়েছি, তখন আমাদের ডাইনের জঙ্গলে বাঘটা ডাকল। লোকটা জলদি পা চালাল আর আমি তাড়া মারলাম মোষগুলোকে। কেননা এক চওড়া, উন্মুক্ত নদীর ওপারে আমার বন্ধুর গ্রাম, ওর মোষরা সেখানে নিরাপদ। নদী এবং আমাদের মধ্যিখানে এক মাইল অতি দুর্ভেদ্য জঙ্গল।

জানোয়াবদের মারার চেয়ে তাদের ছবি তোলায় আমাব আগ্রহ বেশী, এ খ্যাতি অর্জন করেছি এবং আমার বন্ধুকে ছেড়ে দেবার আগে ও অনুনয় জানাল যেন এবারকার মত আমি ফোটোগ্রাফি তুলে রেখে বাঘটিকে মারি। কেননা, ও বলল, বাঘটা প্রত্যহ একটি করে মোষ খাবার মত যথেষ্ট বড় এবং ওকে পচিশ দিনে ফতুর করে দেবে। যথাসাধ্য করব বলে কথা দিলাম এবং ফাঁকা সমতলে যাবার জন্য নিজের পায়ের ছাপ ধবে ফিরে চললাম। সেখানে এক অভিজ্ঞতা হল। যার প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার স্মৃতিতে গভীর দাগে দেগে বসে আছে।

বাঘটি কোথায় আছে সে পাত্তা ও নিজেই দেবে বলে, নইলে জঙ্গলের জানোয়াবরা ওর খবর আমাকে দেবে বলে, সমতলে পৌছেই অপেক্ষা করব বলে বসে পড়লাম। তখন বেলা আন্দাজ তিনটে হবে এবং যেহেতু রোদটা বেশ তপ্ত আর আবাম-ধরানো, আমার ভাঁজ করা হাঁটুতে মাথা রাখলাম আর কয়েক মিনিট ঝিমিয়েছি, বাঘটির ডাকে জেগে উঠলাম। তারপব একটু থেমে থেমে ঘন ঘন ও ডেকেই চলল।

আশপাশেব একশো মাইলের মধ্যে সবচেয়ে ঘন গুল্মজঙ্গলের এক আধ মাইল আন্দাজ চওড়া বলয় আছে সমভূমি ও পাহাড়গুলির মধ্যে। আমার থেকে আন্দাজ তিন শো মাইল দূরে, গুল্মবনের দূরের দিকে পাহাড়ের ওপর বাঘটি আছে বলে আমি স্থির করলাম—যে ভাবে ও ডাকছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ও সঙ্গিনী তল্লাস করছে।

আমি যেখানে বসে আছি তার কাছে সমভূমের উঁচুতে বাঁ হাতি কোনা থেকে শুরু হয়েছে একটি পুরনো গরুর গাড চলার পথ, কয়েক বছর আগে তা কাঠ চালানের কাজে ব্যবহার হত। বাঘটি যেখানে ডাকছে, পথটি প্রায় সিধে লাইনে সেখানে ঢুকে গেছে। এ পথটি আমাকে ডাকন্ত জানোয়ারটির কাছে নিয়ে যাবে কিন্তু পাহাড়ে আছে লম্বা লম্বা ঘাস এবং আমার সহায়তায় রবিন না থাকায় আমার ওকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা সামান্যই। তাই আমি গিয়ে বাঘটির খোঁজ করার বদলে স্থিব করলাম, ও এসে আমার খোঁজ করুক।

ও শুনতে পাবার পক্ষে আমি বড়ই দূরে আছি তাই কয়েকশো গজ গরুব গাড়ি চলার পথ ধরে ছুটে গেলাম, মাটিতে শুইয়ে রাখলাম রাইফেল, একটি উঁচু গাছের মগ ডালে চড়লাম, এবং তিন বার বাঘের ডাক ডাকলাম। তখনি জবাব পেলাম বাঘটির। গাছ থেকে নেমে আমি ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ফিবে এলাম এবং যেখানে বসে বাঘের অপেক্ষা করা যায় তেমন উপযোগী একটিও জায়গা না পেয়েই পৌছে গেলাম সমভূমে। কিছু একটা করতে হয়, করতে হয় তাড়াতাড়ি, কেননা বাঘটি খুব জলদি কাছে এসে পড়ছে তাই, একটি ছোট নাবাল জায়গা দেখলাম কালো দুর্গন্ধ জলে বোঝাই। সেটি বাতিল করে দিয়ে —যেখানে পথটি গুল্মবনে ঢুকেছে সেখান থেকে বিশ গজ তফাতে ফাঁকায় লম্বা

পাওয়ালগড়ের কুঁয়ার সাব

হয়ে শুয়ে পড়লাম উপুড় হয়ে। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ অব্দি পথটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তারপর পথের ওপর ঝুঁকে পড়া একটি ঝোপ আমার চোখ আটকে দিচ্ছে। আমি যা আশা করছি, সেইমত যদি ও পথটি ধরে আসে, ও ওই আড়ালটা পেরোলেই গুলি করব বলে ঠিক করলাম।

রাইফেলটিতে গুলি আছে নিশ্চিত হবার জন্যে ওটাকে খুললাম, তারপর সেফটি-ক্যাচ ঠেলে দিলাম এবং নরম মাটিতে আরাম করে কনুই ঠেস রেখে বাঘ আবির্ভাব হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খোলা জমিতে যখন পৌছেছি, তখন থেকে আর ডাকি নি, তাই ওকে দিক নির্দেশ জানাবার জন্যে নিচু গলায় ডাকলাম একবার, একশো গজ দূর থেকে তৎক্ষণাৎ ও সে ডাকের সাড়া দিল। আমি বিচার করে বুঝলাম, ও যদি ওর স্বাভাবিক গতিবেগে আসে, তাহলে আড়ালটি পেরিয়ে আসবে ত্রিশ সেকেণ্ড। এই 'ত্রিশ' সংখ্যাটি গুনলাম অতি ধীরে ধীরে, গুনে গুনে 'আশি' অব্দি গুনেছি, তখন চোখের কোনাচ দিয়ে আমার সামনে ডান দিকে একটা নড়াচড়া দেখলাম, সেখানে ঝোপগুলো আমার দশ গজের মধ্যে।

ওদিক পানে চোখ ফিরিয়ে ঝোপগুলোর ওপর দিয়ে একটা পেল্লায় মাথাকে উঁকি মারতে দেখলাম, এখানে ঝোপগুলো চার ফুট উঁচু। ঝোপগুলোর মাত্র এক কি দু ফুট পেরিয়ে আছে বাঘটা কিন্তু আমি ও-বনতে ওর মাথাটুকুই দেখতে পেলাম। যখন অতি ধীরে রাইফেলের পয়েন্ট ঘোরাচ্ছি এবং সাইট বরাবর চেয়ে দেখছি, দেখলাম মাথাটা আমার পানে সবটা ফেরানো নেই। আর আমি যেহেতু ওপরপানে গুলি ছুঁড়ছি, ও চেয়ে আছে নিচের দিকে, ওর ডান চোখের এক ইঞ্চি নিচে নিশানা করলাম। ট্রিগার টিপলাম আর পরের আধঘণ্টা ধরে ভয়ে মারা গেলাম প্রায়।

যেমনটি ভেবেছিলাম, তেমন মরে পড়ে না-গিয়ে বাঘটি পুরো লম্বা শরীরটি নিয়ে ঝোপগুলোর ওপরের শূন্যে সিধে উঠে গেল, চিত হয়ে পড়ল এক ফুট পুরু একটি গাছের ওপর, সেটি ঝড়ে উপড়ে ফেলেছিল। গাছটি তখনো কাঁচা। বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, এমন প্রচণ্ড রাগে ও এই গাছটি আক্রমণ করল। কামড়ে টুকরো টুকরো করল ওটাকে, করতে করতে গর্জনের পর গর্জন করতে থাকল আর তার চেয়েও ভয়ংকর যা, একটা ভয়াল রক্ত জমিয়ে দেওয়া আওয়াজ করতে থাকল, যেন ওর চরমতম শত্রুকে ও ফালা ফালা করছে দাঁতে। যেন তুফান এসে পড়েছে ওপরে, তেমনিভাবে গাছটির ডালপালা আছড়াতে থাকল আর আমার পাশের ঝোপগুলো ঝাঁকতে থাকল, ফুলে ফুলে উঠল, প্রতি মুহূর্তে আমি ভাবলাম ও এসে আমার ওপর পড়ল, কেননা যখন গুলি ছুঁড়ি, ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, এবং জানত আমি কোথায় আছি।

রাইফেলটিতে ফিরে গুলি ভরার পক্ষেও ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে গেছি ভয়ে।

ভয়—যে সামান্য নড়াচড়া ও আওয়াজে বাঘটার মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। আঙুল বাঁ ঘোড়ার ট্রিগারে রেখে আধঘণ্টা ধরে আমি শুয়ে শুয়ে ঘামলাম। অবশেষে গাছের ডালপালা ও ঝোপগুলোর আছাড়িপিছাড়ি বন্ধ হল, গর্জনটা কম ঘন-ঘন হল, অবশেষে বন্ধ হল আমাকে নিশ্চিন্ত করে। আরো আধঘণ্টা আমি একেবারে নিস্পন্দ পড়ে থাকলাম, ভারি রাইফেলের ওজনে হাতগুলোতে খিল-ধরা, তারপর পায়ের আঙুলের টানে পেছনপানে সরতে থাকলাম। এভাবে ত্রিশ গজ চলে পায়ের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম ও নিচু হয়ে দুমড়ে সবচেয়ে কাছের গাছটিতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য দৌড়লাম। সেখানেই থেকে গেলাম কয়েক মিনিট, তারপর যখন সব শান্ত, তখন বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

২

পরদিন সকালে একজন পাকা গাছে-চড়িয়ে লোককে সঙ্গে নিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলাম। যেখানে বাঘটি পড়ে যায় সেখান থেকে আন্দাজ চল্লিশ গজ দূরে, ফাঁকা জমিটির কিনারে উঠেছে একটি গাছ, তা আগের সন্ধ্যাতেই লক্ষ করেছিলাম। খুব সন্তর্পণে আমরা এ গাছের কাছে এগোলাম আর আমি যখন গাছের পেছনে দাঁড়ালাম, লোকটি মগডালে উঠে গেল। বহুক্ষণ সযত্ন নিরীক্ষণের পর ও নিচের দিকে চাইল আর মাথা নাড়ল। যখন মাটিতে নেমে আমার কাছে এল, ও আমাকে বলল যে একটি বড় এলাকা জুড়ে ঝোপ-গুলি ধরাসাৎ হয়েছে তবে বাঘটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে এবং ঝোপে কোনো নড়াচড়া দেখলে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে নির্দেশ দিয়ে আমি ওকে গাছের উঁচুতে পাঠিয়ে দিলাম ফের, আর যেখানে বাঘটি তাণ্ডব করেছে সে জায়গাটি দেখতে গেলাম। যেন এমনটি করবে সংকল্প করেই তাণ্ডবটি করেছে ও, কেননা গাছটি থেকে ডালপালা আর বড় বড় কাঠের চাঙ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার ওপরে, বহু ঝোপ উপড়ে ফেলেছে শেকড় সুদ্ধ। অন্যগুলো কামড়ে শেষ করেছে। চারিদিকে প্রচুর রক্ত ছেটানো, মাটিতে দুটো জমাটবাঁধা রক্তের চাপ। একটির কাছে দু ইঞ্চ সমচতুষ্কোণ এক টুকরো হাড়, পরীক্ষা করে দেখলাম সেটি বাঘের খুলির অংশ।

যখন আমি চলে যাই বাঘ এখানেই ছিল, তার প্রমাণ হল দুটি রক্তের চাপ, আর আরেকটি তথ্য—এ জায়গা থেকে কোনো রক্ত-নিশানা রওনা হয় নি। গত সন্ধ্যায় যে সব সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম, তা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কেননা যখন পালাবার ব্যাপারটি শুরু করি আমি ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ারের দশ গজের মধ্যে—একটি সদ্য জখম বাঘ।

জায়গাটি বেড় দিয়ে চলে গিয়ে, যে পাতাগুলো ওর মুখে ঘষটে গেছে তাতে এখানে-সেখানে রক্তের ছোট ছোট দাগ পেলাম। বাঘের গতিপথের এই সকল

নিশানী দুশো গজ দূরে এক মহাকায় শিমুল গাছের দিকে সিধে চলে গেছে লক্ষ করে আমি ফিরে গেলাম। যে জমি আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তা পরিষ্কার পাখির চোখে দেখা ছবির মত দেখার জন্যে আমার লোকটি যে গাছে ছিল সেটিতেই উঠে পড়লাম। কেননা, প্রবল অস্বস্তিতে আমার বোধ হচ্ছিল ওকে জ্যান্তই দেখব আমি। মাথায় গুলি খেয়ে বাঘ দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে পারে, এমন কি সে জখম থেকে সেরে উঠতেও পারে।

এ বাঘটির খুলির এক টুকরো খোয়া গেছে তা সত্যি। এর আগে যেহেতু ঠিক ওর মত জখমওয়ালা কোনো জানোয়ারের সঙ্গে আমি কখনো মোকাবিলা করি নি, আমি জানি না ও কি করবে- কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন বাঁচবে, না বুড়ো হয়ে মরা অব্দি বেঁচে থাকবে। এই কারণে ঠিক করলাম, অন্যান্য জখম বাঘের মতই আচরণ করব ওর সঙ্গে, ওকে অনুসরণ করার সময়ে যে ঝুঁকি এড়ানো চলে সে ঝুঁকি নেব না।

গাছের মগডালের আসন থেকে দেখলাম, শিমুল গাছ বরাবর লাইনটির সামান্য বাঁয়ে দুটি গাছ। যেখানে রক্ত, সেখান থেকে কাছের গাছটি ত্রিশ গজ দূরে, অপরটি পঞ্চাশ গজ এগিয়ে। আমার লোকটিকে গাছের ওপরে রেখে আমি নিচে নামলাম, আমার রাইফেল, একটি শটগান ও একশো কার্তুজের একটি থলি নিলাম। অতি সন্তর্পণে কাছের গাছটির কাছে গেলাম, ওটি বেয়ে ত্রিশ গজ উঁচু অব্দি চড়লাম, একটি মজবুত দড়ির প্রান্তে যে রাইফেল ও শটগান বেঁধেছিলাম, তা টেনে তুললাম আমি ওঠার পর। যদি দরকার পড়ে তবে যেখানে চট করে ওটি পাব, গাছের তেমন এক ফাঁকে রাইফেলটি ঠিক-ভাবে বসিয়ে দিয়ে আমি দু দিকে ছোটগুলি বর্ষণ করতে থাকলাম ঝোপগুলোর ওপর। গজের পর গজ ধরে ধরে দ্বিতীয় গাছের তলা [illegible]। বাঘটি বেঁচে আছে, আর ওই এলাকাতেই আছে ধরে নিয়ে, ওর ঠাহরমালুম পাবার উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করতে থাকলাম। কেন না জখমী বাঘ, কাছাকাছি গুলির আওয়াজ শুনলে বা গায়ে একটি বিঁধলে হয় গর্জাবে নয় আক্রমণ করতে তেড়ে বেরোবে। বাঘটির উপস্থিতির কোনো জানান না পেয়ে আমি দ্বিতীয় গাছটিতে গেলাম ও শিমুল গাছটির কয়েক গজ ভেতর পর্যন্ত ঝোপগুলিতে গুলি ছুড়তে লাগলাম। শেষ গুলিটি ছুঁড়লাম শিমুল গাছটিতেই। মনে হল ওই শেষ গুলিটি ছোঁড়ার পর চাপা গর্জন শুনলাম একটা, কিন্তু দ্বিতীয়বার কোনো সাড়া না পেয়ে ভাবলাম ওটি আমার মনেরই ভুল। আমার কার্তুজের থলে এখন শূন্য অতএব আমার লোকটিকে ডেকে নিয়ে আজকের মত ক্ষান্ত দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

পরদিন সকালে ফিরে এলাম যখন, দেখলাম আমার বন্ধু সেই মোষওয়ালা খোলা জমিতে মোষ চরাচ্ছে। আমাকে দেখে ও গভীর স্বস্তি পেল বলে মনে হল

এবং এর কারণ জানলাম পরে। ঘাস তখনো শিশিরে ভিজে রয়েছে তারই মধ্যে আমরা একটি শুকনো জায়গা খুঁজে বের করলাম আর সেখানে বসে ধূমপান করতে করতে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলাম। আমি আপনাদের আগেই বলেছি, আমার বন্ধুটি প্রচুর চোরা-শিকার করেছে এবং সারাটি জীবন বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গলে মোষ চরাবার বা শিকার করার ফলে ওর অরণ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট।

সেদিন সেই চওড়া, উন্মুক্ত নদীর কাছে ওকে রেখে চলে যাই, তারপর ও পেরিয়ে চলে যায় আরো দূরে এবং যে-দিকে আমি গেলাম সেদিক থেকে আসা শব্দটব্দ শুনতে বসে পড়ে। দুটো বাঘকে ডাকতে শোনে। আমার গুলির পর একটি বাঘের ক্রমান্বয় গর্জন শোনে। আর অতি স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করে, আমি একটি বাঘকে জখম করেছি, সেটি আমাকে মেরে ফেলেছে।

পরদিন সকালে একই জায়গায় ফিরে এসে একশোটা গুলি ছোঁড়ার শব্দে ও বেজায় অবাক হয় আর আজ সকালে, কৌতূহল আর চাপতে না পেরে ও দেখতে এসেছে ব্যাপারখানা হল কি। রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ওর মোষরা দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় পড়ে যায় বাঘটি। ও শুকনো রক্তের ছোপ দেখেছে, হাড়ের টুকরোটিও। ওর মতে, খুলির একাংশ উড়ে যাবার পর কোনো জানোয়ারেরই কয়েক ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং বাঘটি মৃত বলে ও এমনই সুনিশ্চিত যে মোষগুলো নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আমার হয়ে মরা বাঘটি খুঁজে বের করতে চাইল। মোষের সহায়তায় মরা বাঘ উদ্ধার করবার এ পন্হার কথা শুনেছি আমি, কিন্তু নিজে কখনো এটি চেষ্টা করে দেখি নি। ওর মোষগুলির কোনো ক্ষতি হলে ওকেই ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে হবে, এই শর্তে আমি ওর প্রস্তাবে রাজী হলাম।

গুনতিতে পঁচিশটি মোষকে জড়ো করে নিয়ে, আগের দিন যে লাইনটি বরাবর গুলি বর্ষণ করেছি, তা ধরে ধরে মোষগুলির অনুসরণে শিমুল গাছটির উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা খুব আস্তে এগোচ্ছি, কেননা কোথায় পা ফেলব তা দেখতে শুধু চিবুক-সমান উঁচু ঝোপই সরাতে হচ্ছে না হাত দিয়ে দিয়ে, মোষদের তরফে দলছুট হয়ে চলার অতি স্বাভাবিক প্রবণতাও দমন করতে হচ্ছে ঘন ঘন। সেখানে ঝোপগুলি পাতলা, সেই শিমুল গাছের কাছে যখন এগিয়েছি, দেখলাম একটি ছোট নাবাল গর্ত—সেটি শুকনো পাতায় ভর্তি আর পাতাগুলো চেপ্টে আছে, তার ওপর অনেকগুলো রক্তের ছোপ, কতকগুলো শুকনো, কতকগুলো জমাট বাঁধার অবস্থায়, একটি একেবারে টাটকা। যখন মাটিতে হাত রাখলাম, দেখলাম জমিটি উষ্ণ।

আগের দিন আমি যখন একশোটি কার্তুজ বর্ষণ করি—এই নাবালেই শুয়েছিল বাঘটি, এ যত অবিশ্বাস্যই মনে হ'ক, এবং আজ আমাদের ও মোষ-

গুলোকে যখন কাছে আসতে দেখে, শুধু তখনি সরে গেছে ও। মোষগুলো ইতিমধ্যে রক্ত দেখে মাটি আঁচড়ে ভোঁস ভোঁস করতে আরম্ভ করেছে। তাই তেড়ে আসা বাঘ আর খ্যাপা মোষের পালের মধ্যে আটকে পড়ার সম্ভাবনা আমার পছন্দ হল না, আমার বন্ধুর হাত ধরে ওকে পেছনে ঘোরালাম এবং মোষগুলির অনুসরণে ফাঁকা জমির উদ্দেশে রওনা হলাম। যখন নিরাপদ জায়গায় পেঁছিলাম, লোকটিকে বাড়ি যেতে বললাম আর বললাম, পরদিন আবার আসব এবং বাঘটির সঙ্গে একা মোকাবিলা করব।

বাড়ি থেকে আসতে ও যেতে প্রত্যেকদিন জঙ্গলের যে পথে এসেছি-গেছি তা কিছুদূর গেছে নরম মাটি দিয়ে আর এই চতুর্থ দিনে এই নরম মাটিতে একটি বড় মদ্দা বাঘের থাবার ছাপ দেখলাম। থাবার ছাপ ধরে গিয়ে দেখলাম, শিমুল গাছের একশো গজ ডাইনে গিয়ে বাঘটি এক দুর্ভেদ্য গুল্ম বনে ঢুকেছে। এই এক গোলমেলে ব্যাপার। এখন যদি এ জঙ্গলে কোনো বাঘ দেখি তাহলে খুব কাছ থেকে তাকে না দেখা অব্দি জানব না এটা আহত বাঘটা, না অনাহত অন্য একটা। যাহ'ক, যখন দেখা দেবে তখন এ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে, দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ হবে না, তাই ঢুকে পড়লাম ঝোপে আর শিমুল গাছটির গোড়ার সেই নাবালের উদ্দেশে রওনা হলাম।

অনুসরণ করার জন্যে কোনো রক্তের নিশানা নেই, তাই এঁকেবেঁকে চলতে থাকলাম এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময়কাল ধরে। ঘন ঝোপে কয়েক ইঞ্চির বেশি চোখ চলছিল না। অবশেষে পেঁছিলাম একটি দশ-ফুট চওড়া শুকনো নদীতে। নদীতে নামার আগে চোখ তুলে চাইলাম, দেখলাম একটি বাঘের পেছনের বাঁ পা আর লেজটুকু। ওর শরীর আর মাথা গাছের আড়ালে গোপন রেখে বাঘটি একেবারে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে শুধু এই পা-খানা। কাঁধে রাইফেল তুললাম, আবার নামালাম। পা ভেঙে দেওয়া সোজা হত কেননা বাঘ আছে মাত্র দশ গজ দূরে। পায়ের মালিক যদি আহত বাঘটি হত তবে সে ঠিক কাজ হত। কিন্তু এ এলাকায় আছে দুটি বাঘ এবং ভুল বাঘটির ঠ্যাং ভেঙে দিলে আমার কষ্ট দ্বিগুণ বাড়বে। এ জমিতে এমনিতেই আমার যথেষ্ট কষ্ট। অচিরে পা সরিয়ে নেওয়া হ'ল, বাঘটি সরে চলে যাচ্ছে শুনলাম, আর যেখানে ও দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখলাম—ওই পা ভেঙে দিই নি বলে অনুশোচনা করার পক্ষে এখন খুবই দেরি হয়ে গেছে।

আরো এগিয়ে সিকি মাইল গিয়ে একটি ছোট নদী, এবং এখন জখম সামলে বাঘটি ওই নদীর উদ্দেশ্যে চলছে এটাই সম্ভব। ওকে মাঝপথে ধরা অথবা তাতে ব্যর্থ হলে ওর জন্যে সে জলের কাছে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি একটি সুঁড়িপথ ধরলাম। জানতাম সেটি ওই নদীতে গেছে আর ওটি ধরে কিছু দূর এগিয়েছি, বাঁ দিকে ঘণ্টার আওয়াজের মত সম্বরের ডাক শুনলাম, সম্বরটি জঙ্গল

ধরে ছুটে পালাল। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল. আমি বাঘটি থেকে এগিয়ে আছি এবং আর কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি. তখন শুকনো কাঠ ভাঙার জোর শব্দ শুনলাম যেন কোনো ভারি জানোয়ার ওর ওপরে পড়ল। শব্দটি এল পঞ্চাশ গজ দূর থেকে, যেখান থেকে সম্বরটি ডাকে, ঠিক সেই জায়গাটি থেকে। সম্বরটি আরণ্য প্রাণীদের এক বাঘের উপস্থিতি বিষয়ে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে ভুল নেই তাতে, অতএব কাঠটি শুধু ভাঙতে পারে বাঘটিই। তাই যেদিক থেকে আওয়াজ এল সেদিক পানে গুড়ি মেরে চলতে শুরু করলাম হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ে।

এখানে ঝোপগুলি ছ থেকে আট ফুট উচু, উপরদিকের ডালপালায় ঘন পত্র সন্নিবেশ, বোঁটায় পাতা খুব কম, তাই দশ থেকে পনের ফুট দূর আন্দ দেখতে পাচ্ছিলাম তার ফাঁক দিয়ে। যদি বাঘ আক্রমণ করে সে আসবে সামনের জায়গাটি থেকে (কেননা অন্য কোনো দিকে আমি গুলি করতে পারব না) এই উৎকণ্ঠাভরা আশায় আমি তিরিশ গজ গিয়েছি, তখন চোখে পড়ল ওপরের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া রোদ ঝলমল করছে লাল কোনো কিছুর ওপর। হতে পারে ওটা শুধু একগুচ্ছ শুকনো পাতা, আবার, হতে পারে ওটা বাঘটি। ডানদিকে দু'গজ সরে গেলে বস্তুটি আরো ভালভাবে আমার নজরের মধ্যে আসে, তাই চিবুক মাটি ছোঁয়া অবধি মাথা নিচু করে, মাটিতে পেট ঘষটে এই দূরত্ব পেরোলাম হামাগুড়ি দিয়ে এবং মাথা তুলে দেখলাম. বাঘ আমার সামনে। আমার দিকে চেয়ে গুড়ি মেরে বসেছিল ও, রোদ ঝলকাচ্ছিল ওর বাঁ কাঁধে এবং আমার দুটি বুলেট খেয়ে একটি শব্দও না করে কাত হয়ে গড়িয়ে গেল ও।

সামনে দাঁড়িয়ে ওর মহিমময় আকারটি চোখ বুলিয়ে দেখলাম যখন, তখন আমার সামনে পড়ে আছে পাওয়ালগড়ের কুঁয়ারসাব তা নিশ্চিত জানবার জন্য পায়ের নিচের নরম অংশ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হল না।

চারদিন আগে ছোঁড়া বুলেটের প্রবেশ স্থানটি চামড়ার এক ভাঁজে চাপা পড়েছিল এবং ওর মাথার পেছনে ছিল একটি বড় গর্ত, সেটি বিস্ময়জনকভাবে একেবারে পরিষ্কার ও সেরে ওঠা।

আমি জানতাম আমার রাইফেলের গুলির শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, তাই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিতে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলাম এবং যখন এক পট চা পান করছি এবং এই শিকার কাহিনীর শেষ অধ্যায় শোনাচ্ছি আমার লোকেরা জড় হতে থাকল।

কুড়িটি মানুষের এক বাহক-দল নিয়ে আমার বোন এবং রবিনের সঙ্গে, যেখানে বাঘটি পড়ে আছে সেখানে ফিরে এলাম এবং রশি দিয়ে ওকে খুঁটিতে বাঁধার আগে আমার বোন এবং আমি ওকে মাপলাম নাক থেকে লেজের ডগা এবং লেজের ডগা থেকে নাক অবধি। প্রথমবার কোনো ভুল করি নি সে-বিষয়ে

নিশ্চিত হবার জন্য বাড়িতে এসে আবার মাপলাম ওকে। এই পরিমাপগুলির কোনো দাম নেই, কেননা সেগুলিকে সার্টিফিকেট দিতে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষী হাজির ছিল না। তবু বাঘের থাবার ছাপ দেখে জঙ্গল সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরা যে রকম নির্ভুলভাবে বাঘের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করতে পারেন, তা বোঝাবার পক্ষে মাপগুলি আগ্রহোদ্দীপক। আপনাদের মনে থাকবে উইণ্ডহ্যাম বলেছিলেন, বাঘটি 'বিটুইন পেগ্স' দশ ফুট, তা 'ওভার কার্ভস্' মোটামুটি দাঁড়ায় দশ ফুট ছয় ইঞ্চি। একজন শিকারী বলেছিলেন 'ওভার কার্ভস্' বাঘটি দশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, আরেকজন বলেছিলেন ও দশ ফুট ছ' ইঞ্চি অথবা কিছু বেশি হবে! এই সব আন্দাজী হিসেব করার সাত বছর বাদে গুলি খাওয়ার পর আমার বোন এবং আমি বাঘটিকে 'ওভার কার্ভস্' দশ ফুট সাত ইঞ্চি এইমত মেপে দেখি।

গল্পটি আমি কিছু বিস্তারিত করেই বললাম, আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে যাঁরা বাঘটির পেছনে ফেরেন, তাঁরা জেনে কুতূহলী হবেন কিভাবে পাওয়ালগড়ের কুঁয়ারসাহেবের অন্তিম ঘনিয়েছিল।

মোহনের মানুষখেকো

১

হিমালয়ে আমাদের গ্রীষ্মাবাস থেকে আঠার মাইল দূরে একটি দীর্ঘ শৈলশিরা পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে, উচ্চতায় প্রায় ৯,০০০ ফুট। এই শৈলশিরার উঁচু দিকের ঢালের পূর্ব প্রান্তে জই ঘাসের এক সতেজ-উর্বর ফলন। এই ঘাসগুলির নিচে পাহাড়টি খাড়াই নেমে এসে রচনা করেছে হেলানো শৈল প্রাচীরের এক সারি এবং বিলীন হয়েছে নিচের কোশী নদীতে।

শৈলশিরার উত্তর দিকের গ্রামের একদল রমণী ও বালিকা একদিন জই ঘাস কাটছিল, তখন আকস্মিক তাদের মধ্যে এসে পড়ে একটি বাঘ। বাঘ দেখে ছুটোছুটি লেগে যায়, তাতে এক বয়স্কা রমণীর পা পিছলে যায়, খাড়াই ঢাল ধরে গড়িয়ে পড়ে ও, হেলানো শৈল প্রাচীর টপকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েদের আর্তনাদে শুনেই ভড়কে গিয়ে বাঘটি যেমন রহস্যে আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি রহস্যজনকভাবেই অদৃশ্য হয় এবং মেয়েরা যখন আবার একজোট হয় ও ভয় কাটিয়ে ওঠে, ওরা ঘাসের ঢাল ধরে নেমে যায় এবং শৈল প্রাচীরের ওপর দিয়ে ঝুঁকে, ওদের থেকে কিছু নিচে এক সরু কার্নিসে ওদের সঙ্গিনীকে পড়ে থাকতে দেখে।

রমণীটি বলে ও জোর জখম হয়েছে—পরে দেখা গিয়েছিল তার একটি পা এবং অনেকগুলি পাঁজরা ভেঙেছে—এবং সে নড়তে পারছে না। ওকে উদ্ধার করবার উপায় ও পন্থা আলোচনা হয় ও অবশেষে স্থির হয়,—এ হল পুরুষমানুষের কাজ। যেহেতু সেখানে থেকে যেতে কেউ রাজী বলে বোধ হল না, ওরা আহত

রমণীটিকে জানাল সাহায্য আনতে ওরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। ওকে একলা যেন রেখে যাওয়া না হয় বলে রমণীটি মিনতি জানাল এবং ওর অনুনয়ে ষোল বছরের একটি মেয়ে ওর সঙ্গে থাকতে স্বেচ্ছায় রাজী হল। তাই, যখন দলের বাকি সবাই গ্রামের উদ্দেশে রওনা হল, মেয়েটি পথ করে নিয়ে ডাইনে নেমে এল, সেখানে পাহাড়ের পাঁচিলের গায়ের একটি ফাটল ওকে কার্নিসটিতে পা-রাখার সুযোগ করে দেয়।

পাহাড়ের পাঁচিলের গা বরাবর মাত্র আধা-পথ বেরিয়ে গেছে কার্নিসটি এবং যেখানে রমণীটি পড়েছিল সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে একটি অগভীর নাবালে শেষ হয়েছে। কার্নিস থেকে পড়ে গিয়ে শত শত ফুট নিচের পাথরের ওপর পড়ে মারা পড়বে ভয়ে রমণীটি, মেয়েটিকে ওকে এই নাবালে সরিয়ে দিতে বলল এবং এই কঠিন ও বিপজ্জনক কাজটি মেয়েটি সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করল। সে নাবালে শুধু একজনেরই জায়গা হয় তাই যে-ভাবে শুধু এক ভারতীয় উবু হয়ে বসতে পারে, সে ভাবে—রমণীর দিকে মুখ করে বসল মেয়েটি। গ্রাম চার মাইল দূরে, এবং কার্নিসের উপরে ওরা দুজন বারবার আলোচনা করল ওদের সঙ্গিনীদের গ্রামে ফিরতে কত সময় লাগবে; দিনের এ সময়ে গ্রামে কোন্ পুরুষদের ওরা খুঁজে পেতে পারে; কি ঘটেছে তা বুঝিয়ে বলতে কতটা সময় যাবে; সব শেষে, পুরুষেরা এসে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে।

বাঘটি কাছেই ওৎ পেতে আছে এবং ওদের কথা শুনতে পাবে এই ভয়ে কথাবার্তা চালানো হচ্ছিল ফিসফিস করে। হঠাৎ রমণীটি আঁতকে ওঠার শব্দ করল এবং তার মুখের আতংক আর যেদিকপানে ও তাকাল তা দেখে মেয়েটি মাথা ফেরাল আর কাঁধের ওপর দিয়ে পাহাড়ের পাঁচিলের ফাটল থেকে বাঘটিকে কার্নিসে পা রাখতে দেখল।

আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে কম জনই সেই ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নটির হাত এড়াতে পেরেছেন; যে দুঃস্বপ্নে আমাদের সকল অঙ্গ ও স্বরনালী ভয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, যখন দানবিক চেহারার কোনো ভয়ংকর জানোয়ার আমাদের ধ্বংস করতে এগোয়; প্রতি রন্ধ্র থেকে ভয়ের কালঘাম ফেলতে ফেলতে 'এ শুধু স্বপ্ন' বলে ঈশ্বরকে সোচ্চার ধন্যবাদ জানিয়ে সে দুঃস্বপ্ন থেকে, জেগে উঠি আমরা। ওই হতভাগিনী মেয়েটির দুঃস্বপ্ন থেকে তেমন কোনো সুখ-স্বস্তি জাগরণ ঘটে নি এবং সে দৃশ্যটির ছবি মনে এঁকে নিতে সামান্যই কল্পনাশক্তি প্রয়োজন। একটি পাহাড়ের পাঁচিল; একটি সরু কার্নিস চলে গেছে তার একাংশ ধরে; শেষ হয়েছে ছোট এক নাবালে; তাতে পড়ে আছে এক জখম রমণী; একটি অল্পবয়সী মেয়ে ভয়ে পাথর হয়ে উবু হয়ে বসে আছে সে কার্নিসে; একটি বাঘ আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে তার দিকে; পালাবার পথ বন্ধ চারদিকে; কোনো সাহায্যের ভরসা নেই হাতের কাছে।

মেয়েরা যখন পৌঁছয় তখন আমার এক পুরনো বন্ধু মোতি সিং ওর এক অসুস্থ মেয়েকে দেখতে গ্রামে এসেছিল এবং ওই ত্রাণদলের নেতা হল। এই দলটি যখন ঘাসের ঢাল ধরে নেমে পাহাড়ের পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখল, ওরা দেখল রমণীটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কার্নিসের ওপরে বড় বড় রক্তের ছাপ।

যখন রমণীটিকে নিয়ে আসা হল গ্রামে, যখন ওর জ্ঞান হল এবং ও নিজের কাহিনী বলল, মোতি সিং আমার কাছে রওনা হল আঠার মাইল হেঁটে। ও এক বুড়ো মানুষ, বয়েস ষাটের ওপারে, কিন্তু ও ক্লান্ত আর ওর জিরনো দরকার এ প্রস্তাব ও উড়িয়ে দিল। তাই আমরা দুজন তখনি রওনা হলাম তদন্ত করতে। তবে আমার করবার কিছুই ছিল না কেননা চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে আর যে সাহসী ছোট্ট মেয়েটি তার আহত সঙ্গীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় থেকেছিল, বাঘ তার অবশিষ্ট বলতে রেখে গেছে কয়েক টুকরো হাড় আর ওর ছেঁড়া, রক্তমাখা জামাকাপড়।

যে বাঘ পরবর্তীকালে সরকারী নথিতে 'মোহনের মানুষখেকো' আখ্যা লাভ করে, এ তার হাতে নিহত মানুষদের মধ্যে প্রথম।

মেয়েটিকে মারার পর বাঘটি শীতকালের মত নেমে যায় কোশী উপত্যকা ধরে, পথে অন্য লোকদের মধ্যে হত্যা করতে করতে যায় পি, ডব্লু, ডি, বিভাগের দুটি লোককে এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আমাদের সদস্যের পুত্রবধূকে। গ্রীষ্ম এগিয়ে আসে যেমন, প্রথম নরহত্যার ঘটনাস্থলে ফিরে আসে ও। তারপর কয়েক বছর ধরে কোশী উপত্যকার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত কাকারিঘাট থেকে গর্গিয়া অব্দি প্রায় চল্লিশ মাইল জুড়ে—তার তাণ্ডব নৃত্য চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে মোহনের ওপরে পাহাড়ের কোলে কার্তকানৌলা নামে এক গ্রামের কাছাকাছি আস্তানা ঠিক করে।

এক পূর্ববর্তী গল্পে যে জেলা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সে সময়ে কুমায়ুন ডিভিশনে কার্যচালানকারী তিনটি মানুষখেকো বাঘকে তাদের গুরুত্বের পর্যায় মত এই ক্রমে ভাগ করা হয়েছিল:

প্রথম—চৌগড়, নৈনিতাল জেলা।

দ্বিতীয়—মোহন, আলমোড়া জেলা।

তৃতীয়—কান্দা, গাড়োয়াল জেলা।

চৌগড়ের বাঘটির সঙ্গে হিসেব চুকনো হয়ে গেলে পরে আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার বেইন্‌স আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, সে সম্মেলনে আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতিটি আংশিক মাত্র পালন করা হয়েছে এবং মোহনের বাঘটি তালিকায় পরবর্তী। তিনি বললেন প্রত্যেক দিন বাঘটি বেশি করে সক্রিয় এবং এক বৃহত্তর উপদ্রব হয়ে উঠছে আর আগের সপ্তাহে কার্তকানৌলা গ্রামের বাসিন্দা তিনটি মানুষকে মেরেছে। বেইন্‌স প্রস্তাব করলেন ওই গ্রামেই আমার যাওয়া উচিত।

আমি যখন চৌগড়ের বাঘকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, বেইন্স কয়েকজন শিকারীকে কার্তকানোলা যেতে রাজী করিয়েছিলেন। তবে যদিও তাঁরা মানুষ ও জানোয়ারের মড়ি রেখে বসেন, তবু মানুষখেকোটির নাগাল পেতে বিফল হন ও তাঁদের ঘাঁটিতে, রানীখেতে ফিরে যান। বেইন্স জানালেন, এখন আমার এলাকায় রইল শিকারের জায়গাটি -এ সতর্কতা-ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষখেকো শিকার করার সময়ে স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় আর দুই বা ততোধিক জন যখন একই জানোয়ারকে খুঁজে ফিরছে, দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২

মে মাসের এক ফোস্কা ফেলা গরম দিনে আমি, আমার দুই চাকর এবং নৈনিতাল থেকে যে দুজন গাড়োয়ালীকে এনেছিলাম তারা, রামনগর থেকে দুপুর একটার ট্রেনে নামলাম এবং কার্তকানোলার উদ্দেশে পঁচিশ মাইল পদযাত্রার পথে রওনা হলাম। প্রথম দফায় শুধু সাত মাইল যাব কিন্তু আমরা গার্গিয়া পৌঁছবার আগে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেইন্সের চিঠি পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তাড়াহুড়ো করে এবং গার্গিয়া ফরেস্ট বাংলো দখলের অনুমতি চাইবার সময় ছিল না, তাই ফাঁকায় ঘুমোলাম।

গার্গিয়াতে কোশী নদীর দূরের দিকে বহু শত ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের পাঁচিল আছে, আর আমি যখন ঘুমোতে চেষ্টা করছিলাম, মনে হল পাহাড়ের পাঁচিল থেকে নিচের শিলায় পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। দুটো পাথর প্রবল বেগে ঠোকাঠুকি করলে যে রকম শব্দ হয়, এ শব্দ ঠিক তারই মত। কিছুক্ষণ বাদে, গরমের রাতে কোনো শব্দ যেমন উদ্বেগ সঞ্চার করে, এ শব্দ ও তাই করল আর যেহেতু চাঁদ উঠেছিল, সাপের গায়ে পা ফেলা এড়বার পক্ষে জ্যোৎস্না যথেষ্ট উজ্জ্বল, আমি ক্যাম্প-বেড ছেড়ে তদন্ত করতে রওনা হলাম। দেখলাম, পথের পাশে এক জলায় এক দল ব্যাং শব্দটা করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমি জমি, জল ও গাছের ব্যাংদের অদ্ভুত সব শব্দ করতে শুনেছি, কিন্তু সেই মে মাসে গার্গিয়াতে ব্যাঙের যে শব্দ, তার মত বিদঘুটে শব্দ শুনি নি কখনো।

পরদিন খুব সকালে রওনা হয়ে সূর্যের তেজ বাড়ার আগেই আমরা বার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে মোহনে পৌঁছলাম এবং আমার লোকজন যখন তাদের খাবার রান্না করছিল আর আমার চাকরেরা যখন আমার প্রাতরাশ তৈরি করছিল তখন বাংলোর চৌকিদার, দুজন বনরক্ষী আর মোহন বাজারের বেশ কয়েকজন লোক আমাকে মানুষখেকোটার গল্প শুনিয়ে আনন্দ দিচ্ছিল। তার সর্বশেষ ঘটনাটি কোশী নদীতে মাছ ধরছিল এমন এক জেলেকে কেন্দ্র করে। বনরক্ষীদের

মধ্যে একজন দাবি করল সেই ছিল এই ঘটনার গর্বিত নায়ক আর সে খুব নিখুঁতভাবে বর্ণনা করল কেমনভাবে সে একদিন জেলেটার সঙ্গে বেরিয়েছিল এবং নদীর একটা বাঁক নিতেই তারা পড়েছিল মানুষখেকোটার মুখোমুখি ; কেমনভাবে জেলেটা ছিপ ফেলে দিয়ে তার অর্থাৎ বনরক্ষীর কাঁধ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল ; কেমনভাবে তারা বাঘের তাড়া খেয়ে প্রাণ হাতে করে দৌড়েছিল। 'তুমি কি পেছনে তাকিয়েছিলে' ? আমি প্রশ্ন করলাম। 'না সাহেব' সে বলল আমার অজ্ঞতায় একটু তাচ্ছিল্যভরেই। 'যে মানুষখেকোর হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে সে কেমনভাবে পেছন দিকে তাকাবে। সে আরও বর্ণনা করল কেমনভাবে জেলেটা, যে এক পা আগে দৌড়চ্ছিল এক ফালি ঘন ঘাসের মধ্যে পড়েছিল এক ঘুমন্ত ভাল্লুকের ওপর, যার পর একটা ভয়ানক গন্ডগোল চিৎকার চেঁচামিচির সৃষ্টি হয় এবং ভাল্লুকটি সুদ্ধ প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে দৌড়য় এবং জেলেটি হারিয়ে যায় ; এবং কেমনভাবে বহুক্ষণ পরে জেলেটি অবশেষে পথ খুঁজে বাংলোয় ফিরে আসে এবং তাকে অর্থাৎ বনরক্ষীকে তার রাইফেল নিয়ে পালিয়ে এসে জেলেকে একা শুধু হাতে একটা মানুষখেকো বাঘ আর একটা ক্রুদ্ধ ভাল্লুকের মহড়া নেওয়ার জন্যে ফেলে রেখে আসার বিষয়ে অনেক কথা শোনায়। বনরক্ষী তার বর্ণনা শেষ করল এই বলে যে জেলেটি মোহন ছেড়ে তার পরদিন চলে যায় এবং যাওয়ার সময় বলে যায় যে ভাল্লুকটার ওপর পড়ার সময় তার পায়ে চোট লেগেছে আর তাছাড়া কোশী নদীতে ধরার মত মাছ একটাও নেই।

বেলা দুপুর নাগাদ আমরা আবার যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম এবং আমাদের বিদায় জানানোর জন্যে যে ছোটখাট জনতার সমাবেশ হয়েছিল তাদের কাছ থেকে সামনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষখেকোটাব দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে নানারকম সাবধান বাণী শুনে আমরা কার্তকানোলার চারহাজার ফুট চড়াইয়ের পথে রওনা হলাম।

আমাদের গতি ছিল মন্থর কারণ আমার লোকজনের মোটের বোঝা ছিল বেশি, পথটা ছিল অত্যন্ত খাড়াইয়ের পথ আর গরম ছিল অসহ্য। অল্প কিছুদিন আগেই ওপরের গ্রামগুলিতে কোনো ঝঞ্ঝাট হয়েছিল যার জন্যে নৈনিতাল থেকে একটা ছোটখাট পুলিস বাহিনী পাঠাতে হয় এবং আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল আমার এবং আমার লোকজনদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস সঙ্গে নিতে কারণ এই অস্বাভাবিক অবস্থায় স্থানীয়ভাবে কোনো জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে না। আমার লোকজনদের মোটের বোঝা ভারি হওয়ার সেইটাই কারণ।

বহুবার থেমে থেমে অপরাহ্ণে আমরা পেঁছিলাম চষা জমির প্রান্তে এবং এখন মানুষখেকোটির দরুন আমার লোকজনদের আর কোনো আশঙ্কা না থাকায় আমি তাদের রেখে একাই এগোলাম ফরেস্টার্স হাট্-এর দিকে যেটি দেখা যায়

মোহন থেকে এবং বনরক্ষীদের মতে কার্তিকানোলায় থাকাকালীন এইটিই আমার থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা।

কুঁড়েঘরটি মোহনমুখী পাহাড়ের ঢালের ওপর এবং আমি যখন পাহাড়ের গা বেয়ে সমতল রাস্তাটি দিয়ে কুঁড়েঘরটির দিকে এগোচ্ছি তখন ঘন ঝোপঝাড়পূর্ণ একটা খাতে মোড় নিতে আমার সঙ্গে দেখা হল একটি স্ত্রীলোকের, সে কাঠের চোঙের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা ক্ষীণ জলধারা থেকে একটা মাটির কলসী ভরছিল। আমি রবার সোলের জুতো পরে এগোলে ও ভয় পেয়ে যেতে পারে ভেবে আমি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একটু কাশলাম, লক্ষ করলাম আমার কাশির আওয়াজ শুনে ও ভয়ানক চমকে উঠল তারপর ওর কয়েকগজ দূরে একটা সিগারেট ধরানোর জন্যে দাঁড়ালাম। মিনিটখানেক কি মিনিট দুয়েক পরে মাথা না ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরকম জনবিরল জায়গায় থাকা কি কারো পক্ষে নিরাপদ, একটু ইতস্তত করে স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল নিরাপদ নয় তবে জল নিয়ে যেতেই হবে আর বাড়িতে তার সঙ্গে আসার মত কেউ না থাকায় সে একাই এসেছে। বাড়িতে কি কোনো পুরুষমানুষ নেই? হ্যাঁ, একজন পুরুষমানুষ আছে কিন্তু সে খেতে জমি চষছে আর তাছাড়া জল আনাটা তো মেয়েদেরই কাজ। কলসীটা ভরতে কতক্ষণ সময় লাগবে? আর একটুক্ষণ। স্ত্রীলোকটির ভয় আর আড়ষ্টতা চলে গিয়েছিল এবং এবার আমাকে পড়তে হল তার প্রশ্নবানের সামনে! আমি কি পুলিস? না। আমি কি বনবিভাগের কোনো অফিসার? না। তাহলে আমি কে? নেহাতই একজন মানুষ। আমি কেন এসেছি? কার্তিকানোলার লোকজনকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে। কিভাবে? মানুষখেকোটাকে গুলি করে। মানুষখেকোটার সম্বন্ধে কোথায় আমি শুনেছি?—আমি কেন একলা এসেছি?—আমার লোক·· কোথায়?—কতজন আমার সঙ্গে আছে?—কতদিন আমি থাকব? এইরকম আরো কত কি।

স্ত্রীলোকটির কৌতূহল সম্পূর্ণ নিরসন না হওয়া পর্যন্ত কলসী ভরে যাওয়াটা সে গ্রাহ্যই করল না এবং আমার পেছন পেছন আসতে আসতে সে পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে নেমে আসা অনেকগুলি ঢালের মধ্যে একটা আমায় দেখাল এবং সেখানে ঘেসো ঢালের ওপর একটা বড় গাছ দেখিয়ে বলল তিনদিন আগে মানুষখেকোটা ওই গাছটার নিচে একটি মেয়েকে মেরেছে; আমি আগ্রহভরে লক্ষ করলাম গাছটি আমার লক্ষস্থল ফরেস্ট-হাট্ থেকে মাত্র দু তিন'শ গজ দূরে। আমরা এখন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া একটা পায়ে চলার পথে এসেছি, সেই পথটি ধরার সময় স্ত্রীলোকটি বলল সে যে গ্রামে থাকে সেটা পাহাড়ের গায়ে ঠিক ওদিকটায় আর যোগ করে দিল এখন সে যথেষ্ট নিরাপদ।

ভারতীয় মহিলাদের সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝবেন আমার কৃতিত্ব কতখানি বিশেষ করে যদি স্মরণ করা যায় যে এই অঞ্চলে কিছুদিন আগেই

পুলিসের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। স্ত্রীলোকটিকে ভয় পাইয়ে পুরো গ্রামাঞ্চলের বিরূপ মনোভাব অর্জন করার পরিবর্তে তার কলসী ভরার সময় দাঁড়িয়ে থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি এমন একজন বন্ধু পেয়েছি যে যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে পুরো গ্রামবাসীদের আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে জানাবে; জানাবে যে আমি কোনো শ্রেণীর অফিসার নই এবং আমার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষখেকোর সন্ত্রাস থেকে তাদের মুক্ত করা।

ফরেস্টার্স-হাট্ রাস্তার বাঁ দিকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটা ছোট ঢিবির ওপর এবং দরজাটা শুধুমাত্র একটা শেকল দিয়ে বন্ধ থাকায় আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঘরটি প্রায় দশ বর্গফুট এবং মোটামুটি পরিষ্কার কিন্তু ঘরটার মধ্যে অব্যবহারজনিত একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আমি জেনেছিলাম আঠার মাস আগে মানুষখেকোর আবির্ভাবের পর ঘরটিতে আর কেউ বাস করে নি। প্রধান ঘরটির দুপাশে দুটি ছোট ছোট ঘরের মতন, একটি রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অন্যটিতে রাখা হয় জ্বালানি। কুঁড়েঘরটি আমার লোকজনের পক্ষে বেশ ভাল নিরাপদ আশ্রয় হবে এবং পেছনের দরজা খুলে ঘরে এক ঝলক হাওয়া বইতে দিয়ে আমি বাইরে গিয়ে রাস্তা এবং কুঁড়েঘরটির মাঝামাঝি আমার ৪০ পাউণ্ড তাঁবুটা ফেলার একটা জায়গা বেছে নিলাম। কুঁড়েঘরটিতে কোনো আসবাবপত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না, সুতরাং আমি রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে আমার লোকজন পেঁছনোর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পাহাড়ের ঢালটা এই জায়গাটায় প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া এবং যেহেতু কুঁড়ে ঘরটি ঢালের দক্ষিণ দিকে আর গ্রামটা পাহাড়ের উত্তর দিকে. কুঁড়েঘর থেকে গ্রামটা দেখা যায় না। আমি পাথরটার ওপর প্রায় মিনিট দশেক বসে থাকার পরে গ্রামের দিক থেকে চুড়োর ওপর দিয়ে একটি মাথা দেখা গেল তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি। আমার জলের কলসী বহনকারী বন্ধু আমার পেঁছনোর সংবাদ গ্রামে পেঁছে দিতে মোটেই কালক্ষেপ করে নি।

ভারতবর্ষে যখন আগন্তুকেরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং যখন পরস্পরের কাছ থেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের ইচ্ছে তাদের থাকে, তখন এখানকার প্রচলিত রীতি হচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বিষয়টির উল্লেখ না করে, পরস্পরের পারিবারিক সুখদুঃখের আদানপ্রদান করা, যেমন বিবাহিত কিনা, বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ে কটি, তাদের বয়স কত, বিবাহিত না হলে কেন নয়; কি কাজ করা হয় এবং উপার্জন কত ইত্যাদি, এটা ইচ্ছাকৃত হতে পারে আবার ঘটনাচক্রেও হতে পারে। যে সব প্রশ্ন পৃথিবীর অন্য যে-কোনো জায়গায় মানুষ শুনেও শুনবে না, তা ভারতে—বিশেষ আমাদের পাহাড়ে—সর্বত্র এমন অকৃত্রিম সারল্যে করা হয় যে, যে মানুষ সাধারণ মানুষজনের মধ্যে বাস করছে,

সে তাতে দোষ দেখার কথা স্বপ্নেও ভাববে না। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথপোকথনের সময় আমি রীতি অনুযায়ী অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, এবং যখন আমার লোকজন এসে পেঁছিল তখন আমাকে রীতিমত অমহিলা জনোচিত একান্ত পারিবারিক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ওরা ছোট্ট ঝরনাটি থেকে একটা কেটলি ভরে এনেছিল এবং অবিশ্বাস্যরকম কম সময়ের মধ্যে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা হল, আগুন জ্বালানো হল, জল ফোটানো হল এবং চা ও বিস্কুট পরিবেশন করা হল। যখন আমি এক টিন জমানো দুধ খুলছিলাম তখন শুনলাম লোকগুলি আমার চাকরদের জিজ্ঞাসা করছে টাটকা দুধের বদলে জমানো দুধ ব্যবহার করা হচ্ছে কেন তার উত্তরে তাদের বলা হচ্ছে টাটকা দুধ নেই বলে এবং যেহেতু আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল গত কিছুদিন আগেকার ঝঞ্ঝাটের দরুন এ অঞ্চলে টাটকা দুধ পাওয়া যাবে না সেইজন্যে প্রচুর পরিমানে টিনের দুধ সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। লোকগুলি এই কথা শুনে ভয়ানক দুঃখিত হয়েছে মনে হল এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনার পর ওদের মধ্যে একজন, যেটা আমি পরে জেনেছিলাম কার্তিকানৌলার মোড়ল, আমাকে সম্বোধন করে বলল যখন গ্রামের সব কিছুই আমার সেবার্থে, তখন টিনের দুধ নিয়ে আসায় তাদের অপমান করা হয়েছে। আমি নিজের ভুল স্বীকার করে নিলাম ; বললাম ভুলটা হয়েছে কারণ আমি এ অঞ্চলে নবাগত এবং মোড়লকে আরও বললাম তাদের যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ থাকে আমি সানন্দে আমার প্রতিদিনের প্রয়োজন মত সামান্য দুধ কিনে নিতে পারি কিন্তু দুধ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের আমার প্রয়োজন নেই।

এতক্ষণে আমার জিনিসপত্রের বাঁধনছাদন খোলা হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে আরো লোক এসেছে গ্রাম থেকে এবং আমি যখন আমার চাকরদের বললাম কোথায় আমার তাঁবুটা খাটাতে হবে তখন সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত কলরব উঠল। তাঁবুতে বাস—বাঃ বেশ বলেছেন ' আমি কি জানি না এই অঞ্চলে একটা মানুষখেকো বাঘ আছে আর সেটা প্রতি রাতে নিয়মিত এই রাস্তা ব্যবহার করে ? যদি তাদের কথায় আমার সন্দেহ থাকে তাহলে রাস্তাটা যেখানে গ্রামের ওপর দিক দিয়ে গিয়েছে সেখানে এসে আমি বাড়ির দরজায় নখের আঁচড়ের দাগ দেখে যেতে পারি। তাছাড়া বাঘটা যদি আমাকে তাঁবুতে নাও খায় তাহলেও আমি রক্ষা করার জন্যে না থাকলে কুঁড়েঘরের মধ্যে আমার লোকজনদের বাঘটা নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে। শেষের উক্তিটি আমার লোকজন কান খাড়া করে শুনল এবং গ্রামবাসীদের উপদেশের সঙ্গে মিলল তাদের কাকুতি মিনতি, তাই সবশেষে আমি বড় ঘরটিতে থাকতে রাজী হলাম, আমার চাকর দুজন দখল করল রান্নাঘর আর ছ'জন গাড়োয়ালী ঠাঁই নিল জ্বালানি রাখার ঘরে।

মানুষখেকোর বিষয়ে আলোচনা একবার চালু হয়ে যাওয়ায় আমার পক্ষেও সম্ভব হল তাতে যোগ দেওয়া, অবশ্য একথা না জানিয়ে যে ঢালুর ওপর প্রথম মাথাটি যখন দেখি তখন থেকেই এই একটি মাত্র বিষয়ে আলোচনা করাই আমার ইচ্ছে ছিল। বাঘটা যেখানে তার শেষ শিকারটি মারে সেই গাছটার দিকে যাওয়ার রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দেওয়া হল, বিশদভাবে বলা হল দিনের কোন সময়ে কোন অবস্থায় মেয়েটি মারা পড়েছিল। আমাকে জানানো হল যে—যে রাস্তা দিয়ে বাঘটি প্রতি রাত্রে আসে সেটি পূবমুখী হয়ে বৈতাল ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে, তারই একটি শাখা গিয়েছে মোহনে আর রাস্তাটি পশ্চিম দিকে রামগঙ্গা নদীর ওপর চাকনাকল পর্যন্ত গিয়েছে। পশ্চিমের রাস্তাটা গ্রামের ওপরাংশের এবং চষা জমির মধ্যে দিয়ে আধ মাইলটাক গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে তারপর যে ঢালটার ওপর কুঁড়েঘরটা অবস্থিত সেটার সঙ্গে মিলে ঢাল বরাবর চাকনাকল পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কার্তকানোলা এবং চাকনাকলের মধ্যে রাস্তার ছয় মাইল লম্বা এই অংশটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে পরিগণিত এবং মানুষখেকোর আবির্ভাবের পর আর ব্যবহার করা হয় নি; আমি পরে দেখেছিলাম যে চষা খেত ছাড়ার পর রাস্তাটা গিয়ে ঢোকে ঘন গাছ আর ঝোপের জঙ্গলের মধ্যে আর সেটার বিস্তার একেবার নদী পর্যন্ত।

কার্তকানোলা গ্রামের প্রধান চাষবাস সবই পাহাড়ের উত্তর কোলে এবং এই খেতগুলির পরে অনেকগুলি ছোট ছোট ঢাল মতন আর তার মধ্যে মধ্যে গভীর গিরিখাত, ফরেস্টার্স-হাট্ থেকে প্রায় হাজার গজ মত দূরে সব চেয়ে কাছের ঢালটিতে একটা বড় পাইন গাছ আছে। এই গাছটির কাছে প্রায় দশদিন আগে বাঘটা একটি মেয়েকে মেরে, আংশিকভাবে খেয়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল এবং যে তিনজন শিকারী চারমাইল দূরে একটা ফরেস্ট বাংলোতে ছিলেন তাঁরা পাইন গাছটাতে উঠতে না পারায় গ্রামের লোকেরা তিনটে আলাদা গাছে তিনটে মাচা বেঁধে দিয়েছিল—মড়ি থেকে গাছগুলির দূরত্ব ছিল একশো দেড়শো গজের মধ্যে আর সন্ধের একটু আগেই শিকারীরা চাকরদের নিয়ে মাচায় উঠে বসেন। প্রথম সন্ধের চাঁদ তখন ছিল আকাশে, চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা বেশ কিছু বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ পায় এবং পরদিন সকালে চাকরদের জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তর দেয় তারা জানে না কিসের দিকে গুলি ছোঁড়া হয় কারণ তারা নিজেরা কিছুই দেখে নি। দুদিন পরে একটি গরু মারা পড়াতে শিকারীরা তার মড়ির ওপর বসেন এবং আবার গতবারের মতনই চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর গুলি চালানো হয়। মানুষখেকো মারার এই নিঃসন্দেহে শিকারীসুলভ কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টাগুলিই মানুষখেকোদের অসম্ভব সতর্ক করে দেয়, আর ওরা আরও যতদিন বাঁচে ওদের গুলি করাও ততই কঠিন হয়ে ওঠে।

গ্রামবাসীরা আমাকে বাঘটি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষী খবর দিল। ওরা

পাঁচটা বাঘ দেখছে, ছ'নম্বর বাঘটি কেমন করে মড়ির উপর নামছে।
(সিনে ফটোগ্রাফির নমুনা)

সাদা বাঘিনী দেখছে নবাগতটি কি রকম। (সিনে ফটোগ্রাফির নমুনা)

বলল বাঘটা যখনই গ্রামে আসে তখনই ওরা বাঘটার উপস্থিতি সম্বন্ধে টের পেয়ে যায় একটা চাপা বিলাপের গোঙানি থেকে। ওদের আরো প্রশ্ন করে আমি জানলাম বাঘটা যখন বাড়িঘরের পাশ দিয়ে যায় তখন গোঙানিটা হয় একটানা কিন্তু অন্যান্য সময়ে গোঙানিটা কোনো সময় কম বা কোনো সময় বেশি ক্ষণের জন্যে থেমে থাকে।

ব্যাপারটি থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে (ক) বাঘটি কোনো জখম থেকে ভুগছে (খ) যে জখমটি এমনই যে একমাত্র চলার সময়েই এর ব্যথা টের পাওয়া যায় সুতরাং (গ) জখমটা ওর কোনো একটা পায়ে। আমাকে জানানো হল যে কোনো স্থানীয় শিকারী বা রানীখেত থেকে যে শিকারীরা বাঘটার জন্যে বসেছিল তাদের দ্বারা বাঘটা জখম হয় নি। যাই হ'ক এর কোনো গুরুত্বই নেই কারণ বাঘটা বহু বছর ধরেই মানুষখেকো এবং যে জখমে ও ভুগছে বলে আমার বিশ্বাস সেটাই হয়তো ওর মানুষখেকো হয়ে ওঠার মূল কারণ। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় কিন্তু কৌতূহল নিরসন করা যাবে একমাত্র বাঘটাকে পরখ করে—এবং মারা যাওয়ার পর।

বাঘটার গোঙানি সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের কারণ জানতে লোকগুলি উৎসুক হল এবং যখন আমি বললাম যে এই ধরনের গোঙানির মানে বাঘটার একটা পায়ে জখম আছে আর সে জখমটা হয়েছে হয় বুলেটে নয় শজারুর কাঁটায়। তারা আমার যুক্তির সঙ্গে একমত হল না, বলল তারা বাঘটার যেটুকু দেখেছে তাতে বাঘটা সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মনে হয়, তাছাড়া যেরকম অনায়াসে সে শিকার মেরে বয়ে নিয়ে যায় তাতেই প্রমাণ হয় যে বাঘটা কোনোভাবেই পঙ্গু নয়। যাই হ'ক আমি ওদের যা বলেছিলাম তা তারা স্মরণে রেখেছিল এবং পরে এক দিব্য দৃষ্টির অধিকারী হিসাবে আমার সুনাম অর্জনের সহায়ক হয়েছিল।

রামনগর দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তহশীলদারকে আমার জন্যে দুটো বাচ্চা মদ্দা মোষ কিনে মোহনে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম যেখানে আমার লোকজন সেগুলির জিম্মা নিয়ে নেবে।

আমি গ্রামের লোকজনদের বললাম যে গাছটার নিচে তিনদিন আগে মেয়েটি মারা পড়েছে তার কাছে একটা ও চাকনাকলের রাস্তায় একটা মোষ আমি বাঁধতে চাই— তারা বলল এর থেকে ভাল জায়গা তাদের চোখে পড়ছে না কিন্তু ব্যাপারটা ওরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নেবে এবং সকালে আমাকে জানাবে এ সম্বন্ধে ওদের অন্য কোনো পরামর্শ আছে কিনা। এখন রাত ঘনিয়ে আসছে এবং যাওয়ার আগে মোড়ল আমায় কথা দিয়ে গেল যে সকালে আশ-পাশের সব গ্রামে আমার পৌঁছনোর খবর পাঠিয়ে দেবে, আমার আসার কারণ জানিয়ে দেবে এবং কোনো সময় নষ্ট না করে তাদের এলাকায় বাঘের কোনো শিকার বা আক্রমণের সংবাদ আমাকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবে।

ঘরের ভ্যাপসা গন্ধটা এখনও বোঝা গেলেও অনেক কমে গিয়েছিল। যাই-হ'ক আমি আর ওদিকে নজর না দিয়ে স্নান, রাতের খাওয়া সেরে দরজায় দুটো পাথর চাপা দিলাম এছাড়া দরজা দুটো বন্ধ রাখার কোনো উপায় ছিল না—তারপর সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে গেলাম। আমার ঘুম হাল্কা এবং দুতিন ঘণ্টা পরে জঙ্গলে একটা জানোয়ারের ঘোরাফেরার আওয়াজে জেগে উঠলাম। জানোয়ারটা এসেছে একেবারে পেছনের দরজা পর্যন্ত। রাইফেল আর টর্চ নিয়ে পা দিয়ে পাথর সরিয়ে দিয়ে যখন বাইরে এলাম তখন একটা জানোয়ারের সরে যাওয়ার শব্দ পেলাম—যে ধরনের আওয়াজ করছিল তাতে ওটা বাঘটাও হতে পারে অবশ্য কোনো চিতা বা শজারু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যাই হ'ক ওটা কি তা দেখার পক্ষে জঙ্গলটা বেশি ঘন ছিল। ঘরে ফিরে এসে পাথরটা যথাস্থানে আবার লাগিয়ে লক্ষ করলাম গলাটা খুসখুস করছে—ভাবলাম মোহন থেকে ঘেমে নেয়ে হেঁটে এসে হাওয়ায় বসার ফলেই এটা হয়েছে ; কিন্তু আমার চাকর যখন দরজা ঠেলে খুলে আমার ভোরের চায়ের কাপ নিয়ে এল আমি বুঝলাম আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যারিনজাইটিস—হয়তো বাদুড়ভর্তি ছাদওয়ালা বহুদিনের অব্যবহৃত একটা কুঁড়েঘরে শোওয়ার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার চাকর জানাল সে এবং তার সঙ্গী এই সংক্রমণের হাত থেকে বে চে গিয়েছে কিন্তু জ্বালানির ঘরে ছ'জন গাড়োয়ালীও আমারই মত একই অসুখে ভুগছে। আমার ওষুধের মধ্যে ছিল আইডিনের একটা দু আউন্সের বোতল আর কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট এবং আমার বন্দুকের খাপ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেরোল এক প্যাকেট পারমাংগানেট যেটি আমার বোন আমার আগের কোনো অভিযানেব সময় আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। প্যাকেটটা বন্দুকের তেলে একেবারে ভিজে গিয়েছিল কিন্তু গুঁড়োগুলো এখনও গলবার মত আছে এবং আমি একটা টিনে গরম জলের মধ্যে বেশ কিছু গুঁড়ো কিছুটা আইডিনের সঙ্গে ঢেলে দিলাম। পরের কুলকুচিটা খুব কাজের হয়েছিল এবং আমাদের দাঁত কালো হয়ে গেলেও এর দরুনই আমাদের গলা খুসখুসি ভাল হয়ে গিয়েছিল।

সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নেওয়ার পর আমি চারজন লোককে মোহনে পাঠালাম মোষ দুটি নিয়ে আসতে এবং নিজে বেরিয়ে গেলাম যে জমিতে মেয়েটি মারা পড়েছিল সেই জমিটি সরেজমিনে তল্লাসী করার জন্যে। গতরাতে আমি যে নির্দেশ পেয়েছিলাম তাতে কাটা ঘাস বেঁধে আঁটি করার সময় মেয়েটিকে যেখানে বাঘটা আক্রমণ করে ও মেরে ফেলে সে জায়গাটা খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ঘাস ও যে দড়িটা সে ব্যবহার করছিল সেগুলি যেমন ছিল তেমনিভাবেই পড়ে আছে। আরও আছে ওর সঙ্গীরা ভয়ে গ্রামের দিকে দৌড়ে পালানোর সময় যে দু বোঝা ঘাস ফেলে যায় সেই দুটি। লোকেরা

আমায় বলেছিল যে মেয়েটির দেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি কিন্তু যেহেতু তিনটি ভাল মাপের দড়ি এবং মেয়েটির কাস্তে জঙ্গলে পড়েছিল, আমার মনে হয় মেয়েটিকে খুঁজে বার করার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি।

মেয়েটি মারা পড়েছিল একটা ছোট মাটির ধসের ওপরের দিকটায় এবং বাঘটা ওকে ঢাল দিয়ে নিচে নিয়ে গিয়েছিল একটা ঘন ঝোপের মধ্যে। এখানে বাঘটা অপেক্ষা করেছিল সম্ভবত অন্য দুটি স্ত্রীলোককে দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার সময় দেওয়ার জন্যে এবং তারপর কুঁড়েঘর থেকে যে ঢালটা দেখা যায় সেটা পেরিয়ে মড়ি নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা মাইলখানেক কি তারও বেশি নেমে যায় ঘন ঝোপঝাড় বৃক্ষ সমাকীর্ণ জঙ্গলে। ছাপগুলো এখন প্রায় চারদিনের পুরনো তাই সেগুলো অনুসরণ করে কোনো লাভ নেই বলে আমি কুঁড়েঘরের দিকে ফিরলাম।

ঢালের ওপরে ওঠার চড়াইটা খুব খাড়া এবং আমি যখন বেলা দুপুর নাগাদ কুঁড়েঘরে পৌছিলাম তখন দেখলাম বারান্দায় বিভিন্ন আকার ও মাপের সারি সারি নানাধরনের পাত্র—সব কিছুর মধ্যেই দুধ। আগের দিনের দুর্ভিক্ষের তুলনায় আজ প্রাচুর্য, সত্যি বলতে কি দুধ যা ছিল তাতে আমি স্নান করতে পারি। আমার চাকরেরা জানাল তারা বারণ করেছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নি, প্রতিটি লোক বারান্দায় পাত্র রাখার সময় বলেছে যে সে দেখবে ওদের মধ্যে থাকার সময়ে আমায় জমানো দুধ যেন না খেতে হয়।

মোহন থেকে মোষগুলি নিয়ে লোকেরা রাতের আগে ফিরে আসতে পারবে বলে মনে হয় না তাই মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি চাকনাকলের রাস্তাটা একবার দেখার জন্যে বেরোলাম।

কুঁড়েঘর থেকে পাহাড়ের ঢালটা প্রায় পাঁচশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে এবং আকারে এটা মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতি। রাস্তাটা, চষা জমির মধ্য দিয়ে আধ মাইলটাক গিয়ে তির্যকভাবে বাঁদিকে ঘুরে গেছে, তারপর একটা খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার মিলেছে ঢালটার সঙ্গে এবং পরে ডান দিকে মোড় নিয়ে ঢালবরাবর চলে গেছে চাকনাকল পর্যন্ত। ঢাল থেকে বেরনোর পর রাস্তাটা কিছুটা সমতল তারপর খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে, চুলের কাঁটার মত কিছু বাঁক ঢালের খাড়াইটি কিছুটা সহজ করে দিয়েছে।

সারা বিকেলটাই আমার হাতে. তাই রাস্তাটার তিন মাইল অংশ খুব ভালভাবেই পরীক্ষা করে দেখলাম। যখন কোনো বাঘ কোনো একটা রাস্তা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে তখন রাস্তার ধারে আঁচড়ের দাগে সে তার যাতায়াতের নিশানা রেখে যেতে বাধ্য। এই আঁচড়ের দাগগুলি যে কারণে পোষা বেড়াল বা বেড়াল বংশজাত সব জীবই করে সেই একই কারণে করা, এবং শিকারীদের কাছে অত্যন্ত জরুরী কারণ; এর থেকে নিম্নলিখিত মূল্যবান

তথ্যগুলি জানা যায় · (১) যে জানোয়ারটি আঁচড়ের দাগগুলি কেটেছে সে স্ত্রী না পুরুষ, (২) কোন দিকে ছিল তার গতি, (৩) ও চলে যাওয়ার পর কতটা সময় কেটেছে (৪) ওর আবাসস্থলের দিক এবং দূরত্ব (৫) ও যা শিকার করে তাদের প্রকৃতি এবং সর্বশেষে (৬) অল্পদিনের মধ্যে জানোয়ারটি নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে কিনা। এমন একজন যে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় একটা মানুষখেকোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কাছে এই সহজলভ্য তথ্যের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। বাঘেরা যে রাস্তা ব্যবহার করে তার ওপর থাবার ছাপও রেখে যায়। এই থাবার ছাপগুলিও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে যেমন জানোয়ারটা কোনদিকে যাচ্ছিল এবং তার গতি কি ছিল, ও পুরুষ না নারী, ওর বয়েস, ওর চারটে পা-ই সুস্থ কিনা, নাহলে কোন বিশেষ পা-টিতে খুঁত আছে।

যে পথটার ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেই পথটা দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে ছোট ছোট শক্ত ঘাস জন্মিয়েছিল সেইজন্যে দু একটি স্যাঁতসেঁতে জায়গা ছাড়া পথটি থাবার ছাপ ফেলার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। পথটা যেখানে ঢাল থেকে বেরিয়েছে তার কয়েক গজের মধ্যেই এরকম একটা ভিজে জায়গা ছিল আর ঠিক সেই জায়গাটির নিচে একটা খুব সবুজ বন্ধ জলের ডোবা ছিল; সম্বরদের নিয়মিত জল খাওয়ার জায়গা এটা।

চষা জমি ছেড়ে পথটা যেখানে বাঁদিকে ঘুরছে সেই মোড়ে আমি বেশ কয়েকটা আঁচড়ের দাগ দেখলাম, তার মধ্যে সবচেয়ে টাটকা যেটা সেটা প্রায় তিন দিনের পুরনো। এই আঁচড়ের দাগগুলি থেকে দুশো গজ দূরে পথটা তার চওড়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা একটা পাথরের নিচে দিয়ে গিয়েছে। পাথরটা দশ ফুটটাক উঁচু হবে এবং এর ওপরে দু তিন গজ চওড়া একটা চ্যাটাল জায়গা, যেটা দেখা যায় একমাত্র গ্রামের দিক থেকে পথটা দিয়ে পাথরটার দিকে এগোলে। আমি ঢালের ওপর আরও আঁচড়ের দাগ দেখলাম কিন্তু থাবার ছাপ দেখলাম প্রথম চুলের কাঁটা সদৃশ বাঁকের কাছে আসার পর। এখানে বাঁকটা কাটানোর জন্যে বাঘটা লাফ দিয়ে নরম মাটিতে পড়ে সেখানে কিছু ছাপ রেখে যায়। ছাপগুলো একদিনের পুরনো আর কিছুটা বিকৃত হয়ে গেলেও বোঝা কঠিন নয় যে ছাপগুলো করেছে একটা বিরাট, বয়স্ক, পুরুষ বাঘ।

একটা মানুষখেকো সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এরকম অঞ্চলে যখন কেউ ঘোরাফেরা করেন তখন গতি স্বভাবতই হয় খুব মন্থর কারণ চলার পথে যে কোনো বাধার দিকে, সে একটা ঝোপই হ'ক, গাছই হ'ক আর পাথরই হ'ক বা যার আড়ালে মৃত্যু আত্মগোপন করে থাকতে পারে এমন অসমতল জমিই হ'ক, খুব সতর্কভাবে এগোতে হয়, সেই একই সঙ্গে যদি হাওয়া না থাকে—যেমন সে সন্ধেবেলায় ছিল না—প্রতি মুহূর্তে পেছনে ও দুপাশে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি

রাখতে হয়। এছাড়া, দেখার জিনিসও সেখানে ছিল প্রচুর, কারণ সময়টা মে মাস, যখন এই উচ্চতায় অথাৎ ৪০০০ থেকে ৫০০০ ফুটের মধ্যে অর্কিড ফোটার সবচেয়ে ভাল সময় এবং অর্কিডের বৈচিত্র্যে, সমারোহে সেদিন পাহাড়ের ওপর যা দেখেছিলাম ঠিক তেমনটি আর আমি কখনও দেখি নি। সবচেয়ে বেশি প্রাচুর্য ছিল অপূর্ব সাদা প্রজাপতি অর্কিডের—যে কোনো আকারের প্রতি দ্বিতীয় গাছটি মনে হচ্ছিল যেন এই ফুলের সাজে সেজে এসেছে।

এইখানেই আমি প্রথম সেই পাখিটি দেখি যেটা পরে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির প্রেটার মাউণ্টেন 'ক্র্যাগমার্টিন পাখি' বলে পরিচয় করিয়ে দেন। পাখিটির গায়ের রং ধূসর আর ঠিক বুকের কাছটায় একটু গোলাপীর ছোঁয়া, আকারে গোলাপী শালিক পাখির থেকে একটু ছোট। এই পাখিগুলির সঙ্গে ছিল তাদের বাচ্চা, আর বাচ্চারা—প্রতি পাখির চারটে করে বাচ্চা সার দিয়ে বসে ছিল একটা খুব উঁচু গাছের ওপর শুকনো একটা ডালে আর মা পাখিগুলো পোকামাকড় ধরার জন্যে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, কখনও কখনও দু তিনশো গজ দূর পর্যন্ত। আশ্চর্য গতিতে ওরা উড়ে যাচ্ছিল আর পাখার রং ? আমি নিশ্চিত যে উত্তর ভারতের কোনো পাখির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, ওরা আমাদের শীতকালীন অতিথি তিব্বতী সোয়ালোকে বাদ না দিলেও। এই পাখিগুলির সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে এদের অদ্ভূত দৃষ্টিশক্তি। কোনো কোনো সময়ে ওরা একেবারে সোজা কয়েকশো গজ উড়ে গিয়ে মোড় নিয়ে ফিরে আসছিল। যে গতিতে ওরা যাচ্ছিল তাতে কোনো উড়ন্ত পোকাকে তাড়া করা অসম্ভব কিন্তু প্রতিবার ফেরার পরেই পাখিটি নিশ্চিতভাবে কোনো একটা হাঁ করা মুখে ছোট্ট কিছু একটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল- -আমার বিশ্বাস যে-দূরত্ব থেকে ওরা পোকামাকড় পরিষ্কার দেখতে পায় সে-দূরত্ব থেকে মানুষের চোখ সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যেও কিছুই দেখতে পাবেনা।

প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে চলতে, থাবার ছাপ খুঁজতে খুঁজতে, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য উপভোগ করতে করতে, আর জঙ্গলের নানারকম বিচিত্র শব্দ শুনতে শুনতে— একটা সম্বর মোহনের দিকে পাহাড়ের প্রায় এক মাইল নিচে একটা বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে জঙ্গলবাসীদের হুঁশিয়ারী জানাচ্ছিল এবং চাকনাকলের রাস্তার ওপর একটা কাকার আর একটা হনুমান অন্যান্য জঙ্গলবাসীদের একটা চিতার উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছিল—সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল এবং আমি যখন সেই ঝুলে থাকা পাথরটার কাছে ফিরে এলাম তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাথরটার দিকে এগোতে এগোতে এটাকেই, এ পর্যন্ত যত জমি আমি পরখ করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করলাম। পাথরের ওপর ঘাসে ঢাকা জমির ফালিটুকুর ওপর একটা বাঘ শুয়ে থাকলে তাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে কতক্ষণে কেউ পথের ওপর দিকে বা নিচের দিকে যাওয়া আসার পথে

পাথরটার নিচে আসে বা পেরিয়ে যায়, কারণ সে তখন থাকবে বাঘটার সম্পূর্ণ এক্তিয়ারের মধ্যে—সত্যিই জায়গাটা বিপজ্জনক এবং এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার।

কুঁড়েঘরে ফিরে গিয়ে দেখলাম মোষ দুটো পেঁাছে গেছে কিন্তু তাদের নিয়ে কিছু করার পক্ষে সে সন্ধ্যেবেলা একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে।

আমার চাকরেরা কুঁড়েঘরের মধ্যে সারাদিন আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, তাই ভেতরের হাওয়াটা পরিষ্কার. মধুর কিন্তু আমি আর বন্ধ ঘরে শোয়ার ঝুঁকি নিতে রাজী নই; সেইজন্যে আমি শুতে যাওয়ার আগে তাদের দিয়ে দুটো কাঁটা ঝোপ কাটিয়ে দরজায় বেড়ার মত বসিয়ে দিলাম। সে রাতে পেছনের দরজার কাছে জঙ্গলে কোনো চলাফেরার শব্দ ছিল না, এবং গাঢ় ঘুমের পর সকালে যখন উঠলাম তখন গলা অনেকটা ভাল।

সকালের বেশির ভাগ সময়টা আমার কাটল গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, মানুষখেকোটা সম্বন্ধে তাদের নানারকমের গল্প শুনে আর সেটাকে গুলি করার কতরকমের চেষ্টা হয়েছে সেই কথা শুনে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি বাঘটা স্ত্রীলোকটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় যে ঢালটার ওপর দিয়ে গিয়েছিল সেখানে একটা মোষ বেঁধে দিলাম আর অন্যটা বাঁধলাম সেই চুলের কাঁটার মত বাঁকের কাছে যেখানে আমি বাঘটার থাবার ছাপ দেখি।

পরদিন সকালে দেখি যে প্রচুর ঘাস ওদের দেওয়া হয়েছিল তার অধিকাংশই শেষ করে দুটি মোষই শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। আমি দুটো জন্তুর গলাতেই ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিলাম তাই যখন আমি এগোতেও ঘণ্টার কোনো আওয়াজ হল না তখন আমাকে হতাশ হতে হল দুবার—কারণ আগেই বলেছি দুটি মোষই ছিল শান্তিতে নিদ্রামগ্ন। সেই সন্ধেবেলা আমি দ্বিতীয় মোষটিকে চুলের কাঁটার মত বাঁকটি থেকে সরিয়ে পথটা যেখানে ঢাল থেকে বেরিয়েছে সেই বন্ধ জলের ডোবাটার কাছে বাঁধলাম।

বাঘ শিকারের সময় যে পন্থাগুলি সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয় সেগুলি সংক্ষেপে বলা যায় (ক) বসে থাকা এবং (খ) জঙ্গল-হাঁকানো এবং এই দুটি ক্ষেত্রেই পুরুষ মোষ টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে উপায়ে এগুলি করা হয় সেগুলি হচ্ছে বসার বা হাঁকানোর সবচেয়ে সুবিধাজনক একটা জায়গা বেছে নেওয়া, সন্ধে গভীর হলে টোপটাকে এমন একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া যেটা টোপটা ছিঁড়তে পারবে না কিন্তু বাঘ পারবে, টোপটা একবার নেওয়া হয়ে গেলে গাছের ওপর মাচায় মড়িটার ওপর চোখ রেখে বসে থাকা কিংবা যে গোপন জায়গায় মড়িটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই জায়গাটা হাঁকানো।

বর্তমান ক্ষেত্রে এ দুটো পন্থার কোনটিই প্রযোজ্য নয়। আমার গলা, যদিও আগের চেয়ে অনেকটা ভাল, তবে এখনও খুসখুস করছে তাই আমার পক্ষে না

কেশে চুপ করে বেশিক্ষণ বসে থাকা অসম্ভব আর ওইরকম বৃক্ষ সমাকীর্ণ, ভাঙাচোরা জমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হাঁকাই করে কোনো লাভই হত না আমি একহাজার লোক যোগাড় করতে পারলেও,. সেইজন্যে আমি বাঘটার পিছু নেওয়াই স্থির করলাম আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মোষ দুটোকে বাঁধার জায়গা বাছলাম এবং তাদের চারটে এক ইঞ্চি মোটা পাটের দড়ি দিয়ে মজবুত চারা গাছের সঙ্গে বাঁধলাম আর পুরো চব্বিশ ঘন্টার জন্যে তাদের ছেড়ে এলাম জঙ্গলে।

আমি এবার প্রতি সকালে, গুলি করার মত যথেষ্ট আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পালা করে মোষ দুটোর কাছে যেতে থাকলাম—সেই একই ব্যাপার আবার সন্ধেবেলা ; কারণ বাঘেরা, সে মানুষখেকো হ'ক বা নাই হ'ক, যে সব অঞ্চলে বাধা পায় না সেসব জায়গায় রাতে যেমন শিকার মারে দিনেও তেমনি, দিনের বেলা আমি যখন আশপাশের গ্রাম থেকে খবরের জন্যে অপেক্ষা করতাম, গলার চিকিৎসা করতাম আর বিশ্রাম নিতাম তখন আমার ছ'জন গাড়োয়ালী মোষগুলোকে খাইয়ে, জল খাইয়ে আসত।

চতুর্থ সন্ধেবেলা সূর্যাস্তের সময়ে আমি যখন ঢালের ওপরকার মোষটাকে দেখে ফিরছি তখন ঝুলে থাকা পাথরটার তিরিশ গজ দূরে একটা বাঁকের মুখে এসেই হঠাৎ, কার্তকানোলাতে আসার পর এই প্রথম, আমি অনুভব করলাম আমি বিপদের মধ্যে আর যে বিপদ আমার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে তা আমার সামনে ওই পাথরটার ওপর। পাঁচ মিনিট আমি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার দৃষ্টি পাথরটার ওপর দিকে, কোনো নড়াচড়া যদি ওখানে দেখা যায়। এত কাছ থেকে চোখের পলক পড়লেও তা আমি দেখতে পেতাম কিন্তু সামান্যতম নড়াচড়ার কোনো আভাসও আমি সেখানে পেলাম না ; দশ পা এগিয়ে আবার আমি বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম। কোনো নড়াচড়া না দেখে আমি মোটেই আশ্বস্ত হলাম না—মানুষখেকোটা যে ওই পাথরের ওপরেই আছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার কর্তব্য কি ? পাহাড়টা, আমি আগেই আপনাদের বলেছি, ভীষণ খাড়া, বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে তার গা থেকে আর বড় বড় ঘাস, গাছ আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে ভর্তি। রাস্তা যত কঠিনই হ'ক এটা যদি দিনের আরো আগে হ'ত তাহলে আমি ফিরে গিয়ে ঘুরে বাঘটার ওপরে গিয়ে গুলি করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু যখন দিনের আলো আছে মাত্র আর আধ ঘন্টা আর আমাকে যেতে হবে প্রায় এক মাইল রাস্তা তখন পথটা ছাড়া পাগলামিরই সামিল হ'ত। তাই সেফটি ক্যাচটা তুলে রাইফেলটা কাঁধে রেখে আমি পাথরটা পেরোতে আরম্ভ করলাম।

এখানে রাস্তাটা প্রায় আট ফুট চওড়া এবং আমি রাস্তাটার একেবারে বাইরের ধার দিয়ে কাঁকড়ার মতন হাঁটতে শুরু করলাম শরীরের ভার দেওয়ার

আগে পা দিয়ে অনুভব করে করে এক পা এক পা এগোতে হচ্ছিল আমাকে, কারণ তা না হলেই পা হড়কে একেবারে শূন্যে। এগোনো খুব কষ্টসাধ্য ছিল আর স্বভাবতই আমার গতি ছিল খুব ধীরে কিন্তু আমি যখন ঝুলন্ত পাথরটার নিচে, যখন আমি ওটা পেরিয়ে এলাম তখন আমার আশা হল যে, যেখানে বাঘটা শুয়ে আছে. পাথরের ওপরকার সেই সমতল জায়গাটা যেখান থেকে দেখা যায়. পথের সেই অংশটায় যাওয়া অব্দি বাঘটা সেখানেই থাকবে। বাঘটা অবশ্য আমার অসতর্ক অবস্থায় না পেয়ে কোনো অকারণ ঝুঁকি নিচ্ছিল না এবং আমি পাথরটা পেরনো মাত্রই ওপরে একটা চাপা গর্জন শুনতে পেলাম তার একটু পরেই একটা কাকার ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ডান দিকে চলে গেল, তারপর দুটো সম্বর ত্রিভুজাকৃতি পাহাড়টার চূড়ার কাছে ডাকতে শুরু করল।

বাঘটা সুস্থ শরীরেই চলে গেল। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমিও ফিরেছিলাম বহাল তবিয়তেই, তাই আক্ষেপের কিছু নেই আর সম্বরের ডাক অনুযায়ী পাহাড়ের যে জায়গাটায় ও আছে সেখান থেকে বন্ধ জলের ডোবার কাছে ঢালটার ওপর বাঁধা আমার মোষের গলায় বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ ও শুনতে পাবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

চষা জমির কাছে পৌঁছে দেখলাম আমার জন্যে একদল লোক অপেক্ষা করছে। ওরা কাকার ও সম্বরের ডাক শুনেছিল এবং আমি বাঘটা দেখি নি শুনে ওরা খুব হতাশ হল কিন্তু ওরা আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল যখন শুনল কাল সকালে আমার বিরাট আশা আছে।

রাত্রে একটা ধুলোর ঝড় উঠল, তারপরেই জোর বৃষ্টি. গায়ে বৃষ্টিজল পড়তে টের পেলাম কুঁড়েঘরের ছাদে অনেকগুলো ফুটো আছে। যাই হ'ক শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা খুঁজে বার করলাম যেখান দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে কম, সেখানেই ক্যাম্প খাটটা টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুমোতে লাগলাম। আমার ঘুম ভাঙল একটা ঝকঝকে সুন্দর সকালে ; বৃষ্টিতে গরমের ভ্যাপসাভাব, ধুলো সব ধুয়ে মুছে গেছে চারিদিক থেকে, প্রতিটি পাতা, প্রতিটি ঘাস চিকচিক করছে নতুন ওঠা সূর্যের আলোয়।

এর আগে আমি প্রথমে যেতাম কাছের মোষটিকে দেখতে কিন্তু আজ সকালে আমার প্রাত্যহিকের পরিবর্তন করতে ইচ্ছে হ'ল তাই আমার লোকজনদের নির্দেশ দিলাম তারা যেন সূর্য ভালভাবে ওটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপরে যায় কাছের মোষটিকে খাবার ও জল দিতে—তারপর আমার বহু বছরের ভাল এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী ও চমৎকার অস্ত্র ৪৫০।৪০০ রাইফেলটি প্রথমে ভালভাবে পরিষ্কার করে ও তেল দিয়ে নিয়ে চাকনাকলের রাস্তায় অনেক আশা নিয়ে বেরোলাম।

গত সন্ধেবেলা যে ঝুলন্ত পাথরটা পেরোতে আমার এত কষ্ট হয়েছিল সেটা

কিন্তু আজ মুহূর্তের জন্যেও আমার অস্বস্তির কারণ হল না এবং সেটা পেরিয়ে আমি থাবার ছাপ খুঁজতে লাগলাম কারণ বৃষ্টিতে রাস্তার ওপরটা নরম ছিল। পথের সেই স্যাঁৎসেঁতে জায়গাটা, যেটা আমি বলেছি, ঢালের এদিকটায়, আর সেই বন্ধ জলের ডোবা যার কাছে মোষটা বাঁধা আছে, তারই কাছে—সেখানে আসা পর্যন্ত আমি কিছুই দেখতে পাই নি। এখানে নরম মাটির ওপর আমি বাঘটার থাবার ছাপ দেখতে পেলাম—ছাপগুলো পড়েছে ঝড় ওটার আগেই আর গিয়েছে ঢালের দিকে। এই জায়গাটার কাছাকাছি পথের খাদের দিকে একটা ফুট তিনেক উঁচু পাথর আছে। এর আগে এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি লক্ষ করে দেখেছি এই পাথরটার ওপরে দাঁড়িয়ে পথের উঁচু জায়গাটার ওপারে চল্লিশ গজ দূরে বাঁধা আমার মোষটা দেখা যায়। এবার যখন পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মাথা তুললাম তখন দেখলাম মোষটা অদৃশ্য হয়েছে। আবিষ্কারটা যেমন চমকপ্রদ তেমনিই ব্যাখ্যার অতীত। বাঘটা যাতে মোষটাকে জঙ্গলের কোনো দূরান্তে না নিয়ে যেতে পারে, যেখানে বাঘটাকে আমার গুলি করতে হবে হয় মাটিতে নয় গাছে বসে—যেটা আমার বর্তমান গলার অবস্থায় একেবারেই অসম্ভব আমি ব্যবহার করেছিলাম চারটে এক ইঞ্চি মোটা পাকানো পাটের দড়ি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঘটা মড়ি নিয়ে চলে গেছে।

আমি খুব পাতলা রবার সোলের জুতো পরেছিলাম এবং খুব নিঃশব্দে আমি যে চারা গাছটির সঙ্গে মোষটা বাঁধা ছিল সেটার দিকে এগোলাম আর জমিটা পরখ করে দেখলাম। মোষটা মারা পড়েছে ঝড় ওঠার আগেই কিন্তু ওটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বৃষ্টি থামার পরে ওটার কোনো অংশই খাওয়া হয় নি। আমি যে চারটে দড়ি একসঙ্গে পাকিয়েছিলাম তার তিনটে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে আর চতুর্থটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

বাঘেরা সাধারণত দাঁত দিয়ে কামড়ে দড়ি ছেঁড়ে না; যাই হ'ক এটা তাই করেছে এবং মোহনের মুখোমুখি পাহাড়টা দিয়ে মড়ি নিয়ে নিচে চলে গেছে। আমার সব প্ল্যান একেবারে ভেস্তে গেল কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল যে বৃষ্টিটা আমার কাজের সহায়ক হল। মরা পাতার পুরু কার্পেট যেটা আগের দিন পর্যন্ত একটা স্ফুলিংগ পড়লেই জ্বলে ওটার মত শুকনো ছিল আজ ভিজে আর নরম এবং আমি যদি কোনো ভুল না করি বাঘটা মড়ি নিয়ে যেতে যে কষ্ট করেছে সেটাই ওর সর্বনাশের কারণ হবে।

যে কোনো মুহূর্তে গুলি করার প্রয়োজন হতে পারে এরকম কোনো জঙ্গলে ঢোকার আগে আমি সব সময় নিশ্চিত হয়ে নিই যে আমার রাইফেলে গুলি ভরা আছে—তা না হলে আমার শান্তি হয় না। এক জরুরী অবস্থায় ট্রিগার টেপা এবং বন্দুকে গুলি ভরতে ভুল হয়ে গিয়েছিল বলে স্বর্গীয় মৃগয়া কানন বা অন্য কোথাও জেগে ওঠা, এ এমন একটা অসাবধানতার পরিচায়ক যার কোনো মার্জনা

নেই ; সুতরাং যদিও আমি জানতাম যে ঝুলন্ত পাথরটার কাছে আসার আগে রাইফেলে গুলি ভরেছিলাম, আমি এখন রাইফেলটা খুলে গুলিগুলো বার করে নিলাম। যে গুলিটা বিবর্ণ ও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল সেটা আমি বদলে নিলাম তারপর সেফটি ক্যাচটা কয়েকবার ওপর-নিচ করে দেখে নিলাম সেটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা—আমি কখনও সেফটি ক্যাচ তোলা অবস্থায় অস্ত্র নিয়ে যাই না,—তারপরে মড়ি ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ অনুসরণ করে রওনা হলাম।

এই ছেঁচড়ানো কথাটা, বাঘ মড়ি টেনে নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় মাটিতে যে দাগ হয় সেটা বর্ণনা করার জন্যে যখন ব্যবহার করা হয় তখন তাতে ভুল বোঝার সুযোগ থাকে কারণ বাঘ যখন তার মড়িকে কোনো দূরত্বে নিয়ে যায় (আমি একটা বাঘকে একটা পূর্ণ বয়স্ক গরু নিয়ে চারমাইল যেতে দেখেছি) তখন সেটা টেনে নিয়ে যায় না, বয়ে নিয়ে যায় ; আর যদি মড়িটা বেশি ভারি হয় তাহলে সেটা ফেলে যাওয়া হয়। মড়ি নিয়ে যাওয়ার সময়ে দাগ হাল্কা হবে কি গভীর হবে তা নির্ভর করে যে জানোয়ারটি বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার আকারের ওপর এবং কি ভাবে জানোয়ারটিকে ধরা হয়েছে তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেওয়া যাক মড়িটা একটা সম্বরের আর বাঘটা সেটাকে ধরেছে ঘাড়ে তাহলে তার পেছনের অংশটা মাটির সঙ্গে ঘেঁষটে যাবে আর পরিষ্কার একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ থাকবে। কিন্তু অপর পক্ষে সম্বরটাকে যদি পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় ধরা হয়ে থাকে তাহলে আবছা একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ থাকতেও পারে আবার একেবারেই কোনো দাগ নাও থাকতে পারে।

বর্তমান ক্ষেত্রে বাঘটা মোষটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঘাড়ে ধরে এবং তার পেছনের অংশটা মাটি ঘেঁষটে যাচ্ছিল বলে একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ ছিল যেটা অনুসরণ করা সহজ। প্রায় একশো গজ বাঘটা পাহাড়ের গা বেয়ে যাচ্ছিল কোনাকুনিভাবে তারপর সামনে দেখেছিল একটা খাড়া মাটির পাড়। এই পাড়টা পেরনোর চেষ্টায় সে পিছলে যায় এবং মড়িটার ওপর কামড় ছেড়ে দেয়—সেটা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে তিরিশ চল্লিশ গজ নেমে একটা গাছের গায়ে আটকিয়ে যায়। মড়িটা আবার উদ্ধার করে বাঘটা এবার সেটা ধরে পিঠে এবং এখান থেকে শুধু একটা পা কখনও কখনও মাটিতে লেগে একটা আবছা ঘেষটানোর দাগ দেখা যায়—পাহাড়ের দিকটা ঢেঁকিশাকে ঢাকা থাকায় এ দাগটা অনুসরণ করা খুব কঠিন হল না। পড়ে যাওয়ার সময়ে বাঘটার দিক গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তাই ঠিক স্থির করতে পারছিল না কোনদিকে নিয়ে যাবে মড়িটাকে। প্রথমে সে ডানদিকে কয়েকশো গজ গিয়েছিল তারপর একটা রিঙ্গালের ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা একশো গজ নেমে যায়। রিঙ্গালের মধ্যে দিয়ে বহু কষ্টে রাস্তা করে নিয়ে বাঘটা

বাঁ দিকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে কোনাকুনি কয়েকশো গজ এগিয়ে একটা বিশাল পাথরের সামনে পড়ে, এবং সেটার ডান দিকে ঘুরে যায়। এগনোর দিক থেকে পাথরটা মাটির সঙ্গে সমান, তারপর ঢাল হয়ে পাথরটা প্রায় কুড়ি ফুট উঠে গিয়ে ঢাকনার মত ছড়িয়ে পড়েছে একটা বিরাট গর্তের ওপর। যদি পাথরটার নিচে কোনো গুহা বা গর্ত থাকে তাহলে বাঘের পক্ষে মড়িটা নিয়ে যাওয়ার সেটাই সব চেয়ে সম্ভাব্য জায়গা, সেইজন্যে আমি মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ ছেড়ে পাথরটার ওপর উঠে খুব ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম এবং সেখান থেকে যতটুকু দেখা যায় আমার নিচের আর দুপাশের প্রতিগজ জমি তন্ন তন্ন করে পরখ করে চললাম। পাথরটার শেষ প্রান্তে এসে তাকিয়ে দেখে হতাশ হলাম যে পাহাড়টা খাড়াভাবে এসে মিলেছে পাথরটার সঙ্গে আর আমার আশামত কোনো গুহা বা গর্ত পাথরটার নিচে নেই।

পাথরটার প্রান্ত থেকে ছোট উপত্যকাটা এবং আশপাশের জঙ্গলের দৃশ্য বেশ ভাল দেখা যায়—এবং জায়গাটা মানুষখেকোর আক্রমণের আশংকা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ—সেইজন্যে আমি বসলাম, বসা মাত্রই আমার সোজাসুজি চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ নিচে একফালি ঘন ঝোপের মধ্যে একটা লাল-সাদা মত জিনিস আমার নজরে পড়ল। যখন গভীর জঙ্গলে কেউ বাঘের খোঁজ করে তখন লাল কিছু চোখে পড়লেই সেটা তক্ষুনি বাঘ বলে মনে হয় আর এখানে তো আমি শুধু লালটাই নয় বাঘের সাদা ডোরাটাও, দেখতে পাচ্ছিলাম। দীর্ঘ এক মিনিট ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা আমি লক্ষ করলাম তারপর ফ্লিক-সিনেমায় আপনাকে যে মুখটা লক্ষ করতে বলা হয়েছে সেটা যেমন হঠাৎ সম্পূর্ণ বেঁকেচুরে বদলে যায় তেমনি আমি দেখলাম যেটা এতক্ষণ আমি লক্ষ করছিলাম সেটা হচ্ছে মড়িটা, বাঘ নয়; লালটা হচ্ছে যেখানে ও সদা সদ্য খাচ্ছিল সেখানকার রক্ত আর সাদা ডোরাগুলো হচ্ছে চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে ও যেখানে পাঁজরার হাড় বার করে দিয়েছে সেই জায়গাগুলো। সেই দীর্ঘ একমিনিট গুলি না চালানোর জন্যে আমি আমার ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ মোটামুটি এই ধরনেরই এক ক্ষেত্রে আমার এক বন্ধু একটা চমৎকার বাঘ মারার সুযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়; যে-মড়িটার ওপর তার বসার কথা সেটাকে সে দুটো গুলি করে; ভাগ্যক্রমে তার হাতের নিশানা ভাল ছিল—যে দুজন লোককে ও আগে পাঠিয়েছিল মড়িটার সন্ধানে. আর মড়িটার ওপর একটা মাচা বাঁধার জন্যে, যখন সে গুলি করে, তারা মড়িটার কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে ছিল তা সত্ত্বেও তাদের কোনো চোট লাগে নি।

কোনো বাঘ যে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় নি সে যখন খোলা জায়গায় মড়ি ফেলে রেখে যায় তখন বুঝতে হবে সে কাছেই কোথাও শুয়ে শকুন এবং অন্যান্য মাংসভুক পশুপাখির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে মড়িটাকে পাহারা

দিচ্ছে আর আমি বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছি না তার মানেই এ নয় যে বাঘটা ঘন ঝোপের মধ্যে খুব কাছাকাছি কোথাও শুয়ে নেই।

মাছির উৎপাত বাঘদের বিব্রত করে তাই বাঘেরা এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকে না, সেইজন্যে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে থাকাই স্থির করলাম যদি কোথাও কোনো নড়াচড়া দেখা যায়; কিন্তু সিদ্ধান্তটি নেওয়ার মুহূর্তেই গলায় একটা খুসখুসি অনুভব করলাম। আমি ল্যারিনজাইটিস থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠি নি এবং খুসখুসিটা বেড়েই চলল, শেষে এমন একটা পর্যায়ে এল যে আমার না কেশে কোনো উপায় নেই। চার্চে বা জঙ্গলে সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে যেমন নিঃশ্বাস চেপে থাকা বা জোরে ঢোক গেলা তার কোনোটাই আমাকে আরাম দিতে পারল না এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়াল হয় আমাকে কাশতে হবে নয় ফেটে যেতে হবে. মারিয়া হয়ে গলা পরিষ্কার করার জন্যে আমি হনুমানের হুঁশিয়ারীর ডাক ডাকলাম। শব্দ ভাষায় রূপান্তরিত করা কঠিন এবং আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমাদের জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের জন্যেই এই হুঁশিয়ারী ডাকের বর্ণনা—এটা শোনা যায় আধমাইলের মধ্যে—আওয়াজটা খোক্-খোক্-খোক্—অল্প অল্প বিরতির পর পরই আওয়াজটার পুনরাবৃত্তি হয় বারে বারে আর আওয়াজটা শেষ হয় খোক্ররররর শব্দে। সব হনুমানই বাঘ দেখলে ডাকে না কিন্তু আমাদের পাহাড়ের হনুমানরা নিশ্চয়ই ডাকে এবং যেহেতু এই বাঘটি সম্ভবত জীবনের প্রতিটি দিন এই ডাক শুনতে অভ্যস্ত, এই একটি ডাকের আওয়াজই আমি করতে পারতাম যার দিকে ও কোনো মনোযোগই দেবে না। এই বিপৎকালীন জরুরী অবস্থায় আমার ডাকটি খুব বিশ্বাসযোগ্য শোনায় নি কিন্তু আমার গলা খুসখুসি দূর করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

তারপরেও আধঘণ্টা আমি সেই পাথরটার ওপর বসে রইলাম—উদ্দেশ্য নড়াচড়া লক্ষ করা এবং জঙ্গলের প্রাণীরা যদি কোনো বার্তা পাঠায় তা শোনা এবং যখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে বাঘটা আমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোথাও নেই তখন পাথরটার থেকে নেমে খুব সতর্কতার সঙ্গে মড়িটার কাছে নেমে গেলাম।

একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবারে কত ওজনের মাংস খেতে পারে সে কথা আপনাদের জানাতে না পেরে দুঃখিত কিন্তু তার খাওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ধারণা আপনার হবে যদি আমি বলি যে সে একটা সম্বর খেতে পারে দুদিনে, একটা মোষ তিনদিনে—চতুর্থ দিনের জলখাবারের জন্যে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকতেও পারে।

যে মোষটা আমি বেঁধেছিলাম সেটা পূর্ণবয়স্ক না হলেও কোনো মতেই ছোট আকারের প্রাণী নয় এবং বাঘটা তার প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। আমি

ধরেই নিলাম পেটের মধ্যে ওই পরিমাণ খাদ্য নিয়ে ওর পক্ষে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয় এবং যেহেতু মাটি এখনও ভিজে আর আগামী দু-এক ঘণ্টা ভিজেই থাকবে আমি স্থির করলাম খুঁজে বার করব ও কোনদিকে গিয়েছে এবং যদি সম্ভব হয় পিছু নেব।

মড়িটার কাছে থাবার ছাপ জড়াজড়ি হয়ে আছে কিন্তু ক্রমে বৃহত্তর বৃত্তাকারে ঘুরে আমি বাঘটা চলে যাওয়ার সময় যে থাবার ছাপটি ফেলেছে সেটি খুঁজে পেলাম। শক্ত পায়ের জানোয়ারের চেয়ে নরম থাবাওয়ালা জানোয়ারের পায়ের দাগ অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু বছরের অভিজ্ঞতার দরুন থাবার ছাপ অনুসরণ করতে কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন করে না—অনেকটা শিকারী কুকুর যেমন অনায়াসে গন্ধ অনুসরণ করে, সেইরকম ছায়ার মত ধীরে এবং নিঃশব্দে আমি দাগটা ধরলাম, জানতাম বাঘটা খুব কাছেই কোথাও আছে। প্রায় একশো গজ যাওয়ার পরে আমি এসে পড়লাম প্রায় কুড়ি বর্গগজ আয়তন বিশিষ্ট একফালি সমতল ভূমিতে—জমিটা ছোট মোলায়েম নানা ধরনের ঘাসের গালিচায় ঢাকা—ঘাসগুলি সুগন্ধি; ঘাসের ওপর পরিষ্কার দাগ দেখেই বুঝতে পারলাম বাঘটা এখানেই শুয়েছিল।

আমি দাগটার দিকে তাকিয়ে যে জানোয়ার শোয়ার ফলে দাগটা হয়েছে তার আকার সম্বন্ধে অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ দেখলাম নিষ্পিষ্ট কয়েকটা ঘাস আবার স্প্রিং-এর মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। এর মানেই হচ্ছে বাঘটা এখান থেকে গিয়েছে মাত্র মিনিট খানেক কি তার কিছু বেশি সময় আগে।

জায়গাটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আপনাদের হবে যদি আমি বলি যে বাঘটা মড়িটাকে উত্তরদিক থেকে নামিয়ে এনেছিল, তারপর মড়িটা রেখে চলে গিয়েছিল পশ্চিমে এবং আমি যে পাথরটার ওপর বসে ছিলাম সেটা, মড়িটা, এবং আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে জায়গাটা, তিনে মিলে একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণ—ত্রিভুজের একটা বাহু চল্লিশ গজ এবং অন্য দুটি বাহু একশো গজ মত লম্বা।

ঘাসটা সোজা হয়ে উঠতেই আমার প্রথম চিন্তা হল বাঘটা আমায় দেখতে পেয়ে সরে গেছে কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম সেটা সম্ভব নয় কারণ পাথর বা মড়ি কোনোটাই ঘেসো জমিটার থেকে দেখা যায় না এবং আমি অনুসরণ শুরু করার পর ও যে আমাকে দেখে সরে যায় নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাহলে ও এরকম আরামের বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেল কেন? আমার ঘাড়ের পেছনে অগ্নিবর্ষী সূর্যই উত্তরটা আমায় দিয়ে দিল। এখন ন-টা বাজে আর সময়টা মে মাসের এক অসহ্য গরম সকাল এবং সূর্য, আর যে গাছগুলির ওপর দিয়ে সূর্য চলে এসেছে সেগুলির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ঘাসের ফালির ওপর রোদ পড়েছে অন্তত দশ মিনিট। বাঘটার নিশ্চয়ই রোদে খুব গরম

লাগছিল তাই আমি আসার কয়েক মিনিট আগেই ও উঠে গিয়েছে কোনো ছায়াঘন জায়গার সন্ধানে।

আমি আপনাদের বলেছি যে ঘেসো জমিটার আয়তন হবে বিশ বর্গ ফুট। আমি যে দিক থেকে এসেছিলাম তার উল্টোদিকে একটা কাটা গাছ উত্তর দক্ষিণ-মুখী হয়ে পড়েছিল। এই গাছটার ব্যাস হবে চার ফুট মত এবং যেহেতু গাছটা পড়েছিল ঘেসো জমিটার প্রান্তে আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম জমিটার মাঝামাঝি জায়গায়, গাছটার দূরত্ব আমার থেকে হবে দশ ফুট মত। গাছের শেকড়ের দিকটা পাহাড়ের গায়ে—এখান থেকেই ঘন ঝোপঝাড়ের জঙ্গল নিয়ে খাড়াভাবে উঠেছে পাহাড়টা—এবং মাথার দিকটা (যেটা গাছটা পড়ার সময় ভেঙে গিয়েছিল) পাহাড়ের ধার দিয়ে বেরিয়ে আছে। গাছটার পরেই পাহাড়টা প্রায় দেয়ালের মত খাড়া আর এর গা বেয়ে পাথরের সরু কার্নিস প্রায় তিরিশ গজ উঠে মিলিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলে।

বাঘটা রোদের তেজের দরুনই স্থান পরিবর্তন করেছে আমার এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে ওই গাছটার সুরক্ষিত দিকের মত বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা আর নেই এবং আমার কৌতূহল নিরসনের একমাত্র উপায় হচ্ছে গাছটা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া—আর দেখা। এখানে বহুদিন আগে 'পাঞ্চ' পত্রিকায় দেখা একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছবিটা ছিল এক নিঃসঙ্গ শিকারীর, সে সিংহ শিকার করতে বেরিয়েছিল এবং যে পাথরটার ওপর দিয়ে সে যাচ্ছিল, তার ওপরে তাকাতেই তার দৃষ্টি সোজা গিয়ে পড়েছিল আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সাইজের এক সিংহের হাসিহাসি মুখের ওপর। ছবিটার নিচে লেখা ছিল 'আপনি যখন সিংহ খুঁজতে যাবেন তখন নিশ্চিত হয়ে নিন আপনি সত্যিই তাকে দেখতে চান।' তবে তফাত এইটুকু যে আমার আফ্রিকার বন্ধু তাকিয়েছিল ওপর দিকে—একেবারে সিংহের মুখে, আমি তাকাব নিচে—বাঘের মুখে; তা নাহলে, বাঘটা যদি সত্যিই গাছটার ওদিকে থাকে, ঘটনা দুটো প্রায় একই রকমের হবে।

নরম ঘাসের ওপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে পা ঘষটে ঘষটে আমি গাছটার দিকে এগোতে শুরু করলাম এবং গাছ ও আমার মধ্যে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করেছি এমন সময়ে পাথরের তাকটার ওপর একটা তিন ইঞ্চি কাল-হলুদ জিনিস আমার চোখে পড়ল—এতক্ষণে লক্ষ করলাম যে ওটা একটা বহু ব্যবহৃত জানোয়ারদের চলাচলের পথ। দীর্ঘ এক মিনিট ধরে অর্থাৎ যতক্ষণ না নিশ্চিত হলাম যে ওটা বাঘটার ল্যাজের ডগার অংশটুকু, আমি এই নিশ্চল জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ল্যাজটা যদি আমার বিপরীত দিকে থাকে তাহলে মাথাটা নিশ্চয়ই আমার দিকে এবং পাথরের কার্নিসটা মাত্র দু ফুট চওড়া, বাঘটা নিশ্চয়ই ওঁত পেতে আছে গাছের গুঁড়িটা পেরিয়ে আমার মাথাটা দেখা গেলে সেই মুহূর্তে

ঝাঁপ দেবে। ল্যাজের ডগাটা আমার থেকে কুড়ি ফুট দূরে—ওঁৎ পাতা অবস্থায় বাঘটা যদি আট ফুটও লম্বা হয় তাহলেও ওর মাথাটা আমার থেকে বার ফুট দূরে। আমাকে আরো অনেক কাছে যেতে হবে কারণ ওকে পঙ্গু করে দেওয়ার মত একটা গুলি করতে হলে ওর শরীরটা আমার যথেষ্ট দেখতে পাওয়া দরকার—আর পায়ে হেঁটে ফিরে যাওয়ার যদি কোনো বাসনা আমার থাকে তাহলে একগুলিতে বাঘটাকে পঙ্গু করতেই হবে। আর এই সময়, জীবনে প্রথম সেফটি ক্যাচ না তুলে রাইফেল নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের জন্যে আমার নিজের ওপর ধিক্কার এল। আমার ৪৫০।৭০০ রাইফেলের সেফটি ক্যাচ তোলার সময় বেশ পরিষ্কার একটা খট্ করে আওয়াজ হয় আর এখন যে কোনো আওয়াজ করার মানেই হয় বাঘটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে নয় আমাকে গুলি করার কোনো সুযোগ না দিয়েই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাবে।

আবাব ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে থাকলাম যতক্ষণ না পুরো ল্যাজ আর পেছনের অংশটা আমার নজরে এল। পেছনের অংশটা দেখে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠতে পারতাম কারণ এতে বোঝ গেল বাঘটা ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে নেই, শুয়ে আছে। দুফুট চওড়া পাথরের কার্নিসটার ওপর শুধু-মাত্র তার শরীরটা রাখারই জায়গা থাকায় ও পেছনের পা-গুলো ছড়িয়ে রেখেছে একটা ওক চারার ওপরের ডালপালার ওপর—গাছটা উঠেছে খাড়া পাহাড়ের একেবারে গা বেয়ে। আর এক পা এগোতে দেখতে পেলাম ওব পেটটা—যেভাবে ওটা ওঠানামা করছে তাতে বুঝলাম ও ঘুমিয়ে আছে। এবার আমি সামনে এগোতে লাগলাম আরও ধীরে—এবার ওর কাঁধ তাবপরে ওর পুরো শরীরটা আমার নজরে এল। ওর মাথার পেছন দিকটা শাখা ছিল ঘেসো জমিটার প্রান্তে যেটা কাটা গাছটা ছাড়িয়ে তিন চার ফুট বেরিয়ে আছে; ওর চোখ বোজা, নাক আকাশের দিকে।

আমার রাইফেলের সাইট ওর কপালের সঙ্গে এক সাইজে এনে আমি ট্রিগার টিপলাম আর ট্রিগারের ওপর চাপ সমান রেখে সেফটি ক্যাচটা তুলে দিলাম। আমি জানতাম না রাইফেল চালানোর প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীত এই পন্থা কেমন কাজ দেবে—কিন্তু কাজ দিয়েছিল; ওই সামান্য দূরত্ব থেকে ভারি বুলেটটা যখন ওর কপালে ঢুকে গেল তখন ওর শরীরটা কেঁপে পর্যন্ত ওঠে নি। ওর ল্যাজটা আগের মতনই ছড়ানো রইল; ওব পেছনের পা দুটো চারাগাছের ডালপালার ওপরে সেইরকমই ছড়ানো; আব ওর নাক তেমনিই আকাশের দিকে। আমি যখন প্রথমটিকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় নেহাতই অপ্রয়োজনীয় বুলেটটি পাঠালাম ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গীর বিন্দুমাত্র তারতম্য হল না। একমাত্র পরিবর্তন যেটা লক্ষ করা গেল সেটা হচ্ছে ওর পেটের ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেল আর দুটো আশ্চর্যরকম ছোট ফুটো দিয়ে ওর কপাল গড়িয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

আমি জানি না বাঘের খুব কাছাকাছি এলে অন্যদের কি মনে হয়, তবে আমার সব সময়ে একটা রুদ্ধশ্বাস অনুভূতি হয়—সেটা সম্ভবত যেমন ভয়ে তেমনি উত্তেজনায়—একটু বিশ্রামের ইচ্ছেও তার মধ্যে থাকে। যেদিন থেকে আমার গলা খারাপ হয় সেদিন থেকে যে সিগারেটের লোভ থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম এখন কাটা গাছটার ওপর বসে সেই সিগারেটটা আমি ধরালাম আর ভাবনা-চিন্তার রাশ ছেড়ে দিলাম। যে কোনো কাজ ভালভাবে করলে একটা তৃপ্তি আসে এবং আমি এখনই যেটা করেছি সেটাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। মানুষখেকোটাকে মারাই আমার এখানে থাকার কারণ এবং আমি দু ঘণ্টা আগে রাস্তাটা ছেড়ে আসার পর থেকে সেফটি ক্যাচ তোলা পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা, এমনকি হনুমানের ডাক পর্যন্ত নিখুঁত নির্ভুলভাবে কাজ করে গেছে। এতে একটা অদ্ভুত পরিতৃপ্তি আছে যে ধরনের পরিতৃপ্তি কোনো নাট্যকার অনুভব করেন যখন তাঁর নাটক দৃশ্যের পর দৃশ্যে উন্মোচিত হতে হতে ঠিক তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনিভাবেই শেষ হয়। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য শেষটা সুখপ্রদ হয় নি কারণ আমি যে জানোয়ারটি মেরেছি তার দূরত্ব ছিল আমার থেকে পাঁচ ফুট—আর সে ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়।

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির দাম অন্যদের কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যদি ভেবে থাকেন ব্যাপারটা মোটেই সমাচীন হয়নি তাহলে আমি নিজের কাছে যে যুক্তি দিয়েছি সেটাই উপস্থাপন করব আপনার কাছে, হয়তো আমার থেকে আপনাকে সে যুক্তি বেশি সন্তুষ্ট করবে। এই যুক্তিগুলি হচ্ছে (ক) বাঘটা ছিল একটা মানুষখেকো—জীবন্ত থাকার চেয়ে ওটার মরাই ভাল, (খ) সেইজন্যে ও ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর এবং (গ) ওর পেটের ওঠানামা দেখেও আমি যদি চলে আসতাম তাহলে পরে হত-লোককে ও মারত তাদের জীবনের নৈতিক দায়িত্ব প্রকারান্তরে আমার হত। আমি যা করেছিলাম তার সপক্ষে যুক্তিগুলি খুব ভাল এবং অকাট্য একথা আপনাকে মানতেই হবে; কিন্তু দুঃখ থেকেই যায় যে নিজের প্রাণের ভয়ে অথবা গুলি করার এই একমাত্র সুবর্ণ সুযোগটি হারানোর ভয়ে অথবা দুয়ে মিলে এমন একটা মনের অবস্থা আমার হয়েছিল যে আমি ঘুমন্ত জানোয়ারটাকে জাগাই নি—তার নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগ তাকে আমি দিই নি।

বাঘটা মৃত এবং আমি যদি না চাই যে আমার ট্রফি নিচের উপত্যকায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাক তবে ওকে পাথরের কার্নিসটার ওপর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামিয়ে আনতে হবে। রাইফেলটা, যেটার আর কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না, গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে আমি রাস্তার ওপরে উঠলাম আর চষা খেতের কাছে বাঁকটার মুখে এসে আমি দুহাত মুখের কাছে তুলে একটা 'কু' আওয়াজ করলাম, সেটা পাহাড় উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল। আমার

দ্বিতীয়বার আওয়াজ করার কোনো প্রয়োজন হল না কারণ আমার লোকজন প্রথম মোষটার তদ্বির করে ফেরার পথেই আমার ছোঁড়া দুটো গুলির আওয়াজ পায় আর তারা দৌড়ে কুঁড়েঘরে ফিরে হাঁকডাক করে যত গ্রামের লোক সংগ্রহ করতে পারে তাদের জড়ো করে। এখন আমার 'কু' ডাক শুনে পুরো ভিড়টা রাস্তা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

যখন মোটা মোটা দড়ি আর কুড়োল যোগাড় হল আমি জনতাকে নিয়ে ফিরলাম আমার সঙ্গে এবং যখন বাঘটার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বেঁধে দিলাম তখন অনেক উৎসুক হাত বাঘটাকে কিছুটা তুলে, কিছুটা ছেঁচড়ে নামিয়ে আনল পাথরের কার্নিশটা থেকে, কাটা গাছটার ওপর দিয়ে ঘেসো জমিটার ওপর। এখানেই আমি বাঘটার ছাল ছাড়াতাম, কিন্তু গ্রামের লোকেরা আমাকে কাতর অনুরোধ জানাল তা না করতে কারণ কার্তকানোলা এবং তার আশপাশের স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েরা ভয়ানক হতাশ হবে বাঘটাকে চোখে না দেখলে এবং আশ্বস্ত না হলে, যে মানুষখেকোর ভয়ে তারা এত বছর কাটিয়েছে আর যে পুরো জেলাটার ওপর একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সে সত্যি সত্যিই মৃত।

বাঘটাকে কুঁড়েঘর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহায্যের জন্যে যখন কয়েকটা চারাগাছ কাটা হচ্ছিল তখন আমি দেখলাম কয়েকটি লোক বাঘটার পায়ের ওপর দিয়ে হাত বুলোচ্ছে—বুঝলাম তারা যে বলেছিল বাঘটার কোনো পুরনো ঘা নেই তাদের সে কথাটা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে তারা নিজেরাই নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে। কুঁড়েঘরের কাছে বাঘটাকে একটা ছড়ানো গাছের ছায়ায় শুইয়ে দেওয়া হল এবং গ্রামবাসীদের বলা হল বেলা দুটো পর্যন্ত বাঘটা তাদের জিম্মায়—এর থেকে বেশি সময় তাদের দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ দিনটা ছিল অত্যধিক গরম আর চামড়া থেকে লোম ঝরে গিয়ে চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

আমি নিজেই বাঘটাকে ভাল করে দেখি নি কিন্তু বেলা দুটোর সময় যখন আমি চামড়া ছাড়াবার জন্যে ওটাকে চিত করে শুইয়ে দিলাম তখন লক্ষ করলাম ওর সামনের বাঁ পায়ের ভেতর দিককার বেশির ভাগ লোম নেই—তাছাড়া চামড়ায় ছোট ছোট ফুটো আছে যার থেকে হলদে একটা রস গড়িয়ে পড়ছে। আমি এই ফুটোগুলোর দিকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম না, এই পা-টা ডান পায়ের থেকে অনেক সরু এবং এই পায়ের ছাল ছাড়ানো আমি শেষকালের জন্যে স্থগিত রাখলাম। যখন জানোয়ারটার শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে ছাল ছাড়ানো হয়ে গেছে তখন আমি বাঘটার বুক থেকে ঘা-পচা বাঁ পা-টার থাবা পর্যন্ত লম্বাভাবে চিরে দিলাম, তারপর চামড়া ওঠানোর সময় মাংস থেকে একটার পর একটা শজারুর কাঁটা টেনে বার করতে লাগলাম যেগুলি ভিড় করে থাকা

লোকেরা স্মারকচিহ্ন হিসেবে পরমোৎসাহে নিয়ে নিল ; সবচেয়ে লম্বা কাঁটাটি প্রায় পাঁচ ইঞ্চি এবং কাঁটার মোট সংখ্যা ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ। বুক থেকে পায়ের থাবা পর্যন্ত চামড়ার নিচে মাংস হয়ে গিয়েছিল গলা-সাবানের মত তলতলে, গাঢ় হলুদ রঙের ; জানোয়ারটার চলার সময়ে কাতরোক্তি করার এটাই যথেষ্ট কারণ—আর ওকে মানুষখেকো করার এবং মানুষখেকো করে রেখে দেবার মূলেও ওই একই কারণ—শজারুর কাঁটা যতদিনই মাংসের মধ্যে ঢুকে থাকুক না কেন, কখনও গলে যায় না।

আমি যে মানুষখেকো বাঘগুলো মেরেছি তাদের শরীর থেকে আমি সম্ভবত কয়েকশো শজারুর কাঁটা বার করেছি। এর মধ্যে অনেকগুলি কাঁটা ন ইঞ্চিরও বেশি লম্বা আর প্রায় পেনসিলের মত মোটা। বেশীর ভাগ কাঁটাই কঠিন মাংস পেশীর মধ্যে ফুটেছে, কিছু শক্তভাবে আটকে আছে দুটো হাড়ের মধ্যে, আর সবগুলোই চামড়ার ঠিক নিচে ঢুকে ভেঙে ছোট হয়ে গেছে।

এই কাঁটাগুলো নিঃসন্দেহে লেগেছে খাদ্যের জন্যে বাঘগুলো শজারু মারতে যাওয়ার সময়, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—যার কোনো সদুত্তর দিতে না পারার জন্যে আমিও দুঃখিত—বাঘের মত এত বুদ্ধিমান, ক্ষিপ্রগতি জানোয়ার শজারু কাঁটা গায়ের গভীরে ঢোকার মত অসাবধান হয় কি করে অথবা এত ধীরগতি হয় কি ভাবে যে শজারুর মত জীব—যাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে পেছন দিকে হাঁটা—তাদের গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিতে পারে ; তাছাড়া কাঁটাগুলো চামড়ার ঠিক নিচেই ভেঙে যায় কিভাবে কারণ শজারুর কাঁটা তো ভঙ্গুর নয়।

আমাদের পার্বত্য ব্যঘের মতনই চিতাদেরও শজারুর দিকে পক্ষপাতিত্ব বেশি কিন্তু তাদের গায়ে কাঁটা ফোটে না কারণ আমি নিজে দেখেছি তারা শজারু মারে মাথায় ধরে ; বাঘেরা কেন চিতার নিরাপদ এবং অব্যর্থ কৌশলে শজারু মেরে আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচায় না সেটা আমার কাছে একটা রহস্য।

সেই বহুকাল আগের জেলা-সম্মেলনে উল্লিখিত তিনটি মানুষখেকো বাঘের মধ্যে দ্বিতীয়টির গল্প আপনাদের বলা হল, এরপর যখন সুযোগ পাব, আমি আপনাদের বলব কিভাবে তৃতীয় বাঘটি, কান্দার মানুষখেকো মারা পড়ে।

আমার স্বপ্নের মাছ

আমি বিশ্বাস করি, মনোমত পরিবেশ না হলে, যে মাছটি ধরা আমার চিরকালের স্বপ্ন সে মাছটি ধরলেও তা অনেকটা হয় কোনো টেনিস খেলোয়াড়ের পক্ষে সাহারা মরুভূমিতে ডেভিস কাপ জেতার মত।

আমি যে নদীটাতে ইদানীং মাছ ধরছি সেটা লম্বালম্বি প্রায় চল্লিশ মাইল মত বয়ে চলেছে একটা অপূর্ব গাছপালায় ঢাকা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে—সেখানে জন্তু জানোয়ারও যেমন পাওয়া যায় তেমনিই দেখা যায় বিচিত্র সব নানা ধরনের পাখির ভিড়। আমার একদিন কৌতূহল হয়েছিল সারা দিনে কত ধরনের জন্তু জানোয়ার আর পাখি দেখা যায় গুনে দেখার। সেদিন সন্ধের মধ্যে জানোয়ারের মধ্যে আমি দেখলাম সম্বর, চিতল, কাকার, ঘুরাল, শুয়োর, হনুমান আর লাল বাঁদর; আর চোখে পড়ল প্রায় পঁচাত্তর রকমের বিভিন্ন ধরনের পাখি যার মধ্যে আছে ময়ূর, লাল জংলী মোরগ, শালিক, কালো তিতির আর ঝোপের কোকিল।

এ ছাড়াও নদীতে দেখলাম পাঁচটা ভোঁদড়ের একটা ঝাঁক, অনেকগুলো ছোট মেছো কুমির আর একটা অজগর সাপ। অজগরটা শুয়ে ছিল একটা বড় ধরনের জলাশয়ের স্থির, কাকচক্ষু জলের নিচে গা এলিয়ে দিয়ে—ওর শুধু চ্যাপ্টা মাথাটা আর চোখ জোড়া ছিল জলের ওপরে। এই ধরনের একটা ছবি তোলার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। কিন্তু ছবি তুলতে হলে জলাশয়ের ওপর নদীটা পেরিয়ে বিপরীত দিকের পাহাড়টার কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওর ভেসে থাকা চোখ জোড়া আমায় দেখতে পেয়েছিল—আমি

যেই আস্তে আস্তে পেছ্নতে আরম্ভ করেছি, সাপটা মনে হল প্রায় আঠার ফুট লম্বা, ডুব মারল, চলে গেল জলের তলায় ঢিবি করা পাথরের মধ্যে ওর আশ্রয়ে।

নদীটা যে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেটা কোনো কোনো জায়গায় এত সর্ যে একটা পাথর ছ্ঁড়লে সহজেই ওপারে চলে যায় আবার কোনো কোনো জায়গায় এক মাইল বা তারও বেশি চওড়া। এই খোলা জায়গাগ্লোয় জন্মায় দ্ফুট লম্বা বোঁটার ওপর সোনালী ফুল নিয়ে অমলতাস, সাদা তারার মত ফুলস্ন্ধ করমচা আর অন্য নানারকমের ঝোপঝাড়। এই ফুলগ্লোর স্গন্ধ বসন্তকালে বিচিত্র ধরনের সব পাখির কলকাকলীর সঙ্গে মিশে একটা অপ্র্ব পরিবেশের স্ষ্টি করে। প্রকৃতির এই অবারিত দাক্ষিণ্যের মধ্যে মহাশোল মাছ মারা একটা রাজকীয় আনন্দের ব্যাপার। আমি কিন্তু মহাশোল মাছ ধরতে এই শিকারীদের স্বর্গে আসি নি, আমার উদ্দেশ্য ছিল দিনের আলোয় একটা বাঘের ছবি তোলা। যখন ছবি তোলার পক্ষে যথেষ্ট আলো থাকত না তখনই আমি আমার ম্ভি ক্যামেরা সরিয়ে রেখে ছিপ তুলে নিতাম।

আমি একদিন খ্ব ভোরে বেরিয়ে ছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেছিলাম একটা বাঘিনী আর তার দ্টো বাচ্চার ছবি তোলার। বাঘিনটার বয়েস কম আর যে কোনো তর্ণী মায়ের মতনই ওর সব সময় একটা সন্ত্রস্তভাব —আমি যতবারই তার পিছ্ নিলাম সে বাচ্চা দ্টিকে নিয়ে কোনো ঘন ঝোপের আড়ালে সরে গেল। কম বয়সী হ'ক বা বয়স্কাই হ'ক সব বাঘিনীরই বিরক্তি সহ্য করার একটা সীমা আছে, বিশেষ করে যখন তাদের সঙ্গে বাচ্চা থাকে। সহ্যের শেষ সীমায় প্রায় পেঁাছেছে ব্ঝতে পেরে আমি আমার কৌশল বদলে ফেললাম। খোলা জায়গায় গাছের ওপর বসে বা যে বন্ধ জলাশয়ে বাঘিনীটা বাচ্চাদের নিয়ে জল খেতে আসে তারই পাশে উচু ঘাসের মধ্যে শ্য়ে আমি বহ্ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো লাভই হল না।

পড়ন্ত স্যের আলোয় যখন খোলা জায়গাটায় ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে তখন আমি হাল ছেড়ে দিলাম। প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঘের ছবি তোলার চেষ্টা আরও যে কয়েকশো দিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এ দিনটিকেও তারই সঙ্গে যোগ করলাম। ক্যাম্প থেকে যে দ্টি লোককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম তারা নদীর ওপারে একটা গাছের ছায়ায় বসে দিনটা কাটিয়েছে। আমি তাদের জঙ্গলের রাস্তা ধরে ক্যাম্পে ফিরে যেতে বললাম আর ক্যামেরা বদলে একটা ছিপ নিয়ে রাতে খাবার মত একটা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে নদীর ধার দিয়ে রওনা দিলাম।

ইদানীং কালে, ছিপ বঁড়শির ফ্যাশানও মেয়েদের ফ্যাশানের সঙ্গে তাল রেখে বদলেছে। কোথায় গেল আগেকার সেই ১৮ ফুট শক্ত ছিপ আর শক্ত

মজবুত তার সব সাজসরঞ্জাম—সেই ছিপগুলি অবলীলাক্রমে টান মারতে পারবে সে গায়ের জোরই বা কোথায়। সে জায়গায় এসেছে এক হাতে ধরার সব হাল্কা ধরনের ছিপ।

আমার সঙ্গে ছিল একটা ১১ ফুট প্রতিযোগিতা মডেলের ট্রাউট মাছ ধরার ছিপ, রিলে জড়ানো পঞ্চাশ গজ ছিপ ফেলার সুতো আর দুশো গজ মাছ খেলানোর সিল্কের সুতো, একটা নাড়িভুঁড়ির টোপ আর ঘরে তৈরি একটা পেতলের বঁড়শি।

সামনে মাছ ধরার মত প্রচুর স্থির জল থাকলে লোকে মাছ ধরার জায়গা সম্বন্ধে একটু খুঁতখুঁতে হবেই। কোনো পুকুর বাতিল হয়ে যায় কারণ পুকুরটায় পৌঁছনোর রাস্তাটা ভাল নয়, কোথাও চোরাগর্ত আছে বলে জায়গাটা ঠিক মনঃপূত হয় না। এ যাত্রায় প্রায় আধ মাইলটাক ঘোরার পরে আমি মনোমত একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। প্রায় আশি গজ একটা খাঁড়ি, সেখানে সাদা ফেনা তুলে জল ভেঙে পড়ছে পাথরের ওপর—সেই খাঁড়ির শেষে দুশো গজ লম্বা আর সত্তর গজ চওড়া একটা গভীর স্থির জলের সঞ্চয়। এইখানেই রাতে খাওয়ার মাছটা ধরতে হবে।

সেই গভীর নিস্তরঙ্গ জলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বঁড়শি ফেললাম, রিল থেকে কয়েক গজ সুতো ছেড়ে দিলাম—তারপর ছিপটা তুলে ধরলাম যাতে সুতোটা ভালভাবে জলের নিচে যায়। তৎক্ষণাৎ পাড়ের খুব কাছে একটা মাছ বঁড়শিটা গিলে ফেলল। ভাগ্যক্রমে ছাড়া সুতোটাই ছিপের রিলের কাছে টানটান হয়ে গেল—ছিপের গোড়া বা রিলের হ্যাণ্ডেলে হঠাৎ কোনো আচমকা টান পড়ল না যা এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে।

বিদ্যুতের মত মাছটা স্রোতের মুখে পালাবার চেষ্টা করল—আর আমার মজবুত, তেল দেওয়া রিল যেন সুতো ছাড়তে ছাড়তে আনন্দে গান করে উঠল। পঞ্চাশ গজ ছিপ ফেলার সুতোর সঙ্গে একশো গজ মাছ খেলানোর সুতো বেরিয়ে গেল, আমার বাঁ হাতের আঙুলে জ্বলুনি ধরিয়ে গভীর দাগ কেটে। কিন্তু হঠাৎ মাছটার সেই পাগলের মত দৌড় থেমে গেল, সুতোর গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই রকমের পরিস্থিতিতে সাধারণত লোকে যা ভাবে আমার মনেও সেই সব চিন্তারই উদয় হল, তবে মনের ভাব দমন করার জন্যে কিছুটা কড়া কথাও ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই। মাছটা নিশ্চয়ই ভালভাবেই আটকেছে। নাড়িভুঁড়ির টোপটাও কয়েকদিন আগে পাইলট গাট কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা—সেটা পরীক্ষা করে বেশ ভালভাবেই বঁড়শির সঙ্গে লাগানো হয়েছে। শুধু ফাটা রিংটা সম্বন্ধেই যা দুশ্চিন্তা; আগে কোনো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফাটা রিংটা হয়তো আলগা হয়ে জলের তলায় চলে গেছে।

প্রায় ষাট গজ সুতো রিলে ফিরে এলো। হঠাৎ সুতোটা বাঁ দিকে মোড়

নিয়ে জলের ওপর গভীর দাগ কেটে বিপরীত দিকে এগোতে থাকল—তার মানে মাছটা এখনও আছে আর ফেনায় সাদা জলের দিকে এগনোর চেষ্টা করছে। একবার ওখানে চলে যাওয়ার পর, স্রোতের মুখ থেকে, বিপরীত দিক থেকে বহু টানাটানি করেও মাছটাকে নড়াতে পারলাম না। সময় বয়ে চলল। আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে লাগল যে মাছটা নিশ্চয়ই সুতোটা কোনো পাথরের গর্তে আটকিয়ে নিজে পালিয়েছে। আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি—এমন সময় সুতোটা একবার ঢিল হয়ে আবার টান হয়ে গেল—মাছটা আবার বিদ্যুৎগতিতে স্রোতের মুখে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। মনে হল মাছটা যেন এ পুকুর ছেড়ে নিচের তরঙ্গসঙ্কুল জলের মধ্যে চলে যেতে চায়। একটানা লম্বা দৌড়িয়ে মাছটা প্রায় পুকুরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। এখানে পুকুরের জল এদিক সেদিক ছড়িয়ে কয়েকটা বদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি করেছে। এখানে মাছটা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আবার পুকুরের মধ্যে ফিরে এল। একটু পরে প্রথম তাকে জলের ওপর দেখতে পেলাম। ওপারের আবছা দেখা জীবটির সঙ্গে আমার ছিপের সুতোর টানাটানি চলছে, তা নাহলে বিশ্বাস করা কঠিন হত ওই পাঁচ ইঞ্চি পাখনা ওয়ালা বিশাল মাছটা আমারই কয়েকগজের মধ্যে বঁড়শির টোপ গিলেছে।

মাছটা গভীর জলে ফিরে আসার পরে আস্তে আস্তে তাকে পাড়ের অগভীর জলের দিকে টানতে থাকলাম। একা একটা ছোট মাছ ধরার ছিপে একটা বিশাল মাছ ধরা খুব সহজ কাজ নয়। চারবার মাছটা মাঝপথে আটকে রইল —ওর বিরাট পিঠের একাংশ জলের ওপর দেখা যাচ্ছিল। আমার সাবধানতাকে ব্যঙ্গ করে মাছটা চারবার দৌড়ে পালিয়েছিল গভীর জলে. আবার এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে টেনে টেনে তাকে আনতে হল। আমার পঞ্চম বারের চেষ্টায়, ছিপের গোড়াটা বুড়ো আঙুলের ফাঁকে ধরে, রিং তুলে দিয়ে যাতে রিলের হ্যাণ্ডেলটা মাছটার গায়ে না লাগে, মাছটার গায়ে প্রথমে একটা হাত, তারপরে আরেকটা খুব সাবধানে রাখলাম। তারপর স্রোতহীন জল থেকে মাছটাকে আস্তে আস্তে ডাঙায় তুললাম।

আমি একটা মাছ ধরতে বেরিয়েছিলাম—মাছ ধরেওছি একটা। কিন্তু আমার নৈশ ভোজনে মাছটা কোনো কাজে লাগবে না কারণ আমার আর ক্যাম্পের মধ্যে সাড়ে তিন মাইল বন্ধুর রাস্তা যার অর্ধেকটাই আমাকে পার হতে হবে রাতের অন্ধকারে।

আমি আমার ১১ পাউণ্ডের ক্যামেরাটা ফেরত পাঠানোর সময়, গাছে উঠতে ক্যামেরা বেঁধে তোলার জন্যে যে মোটা সুতোটা ব্যবহার করি সেটা রেখে দিয়েছিলাম। সেই সুতোটার এক প্রান্ত মাছটার কানকোর মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিলাম—সেটা মুখ দিয়ে বার করে একটা ফাঁস তৈরি করলাম। সুতোর অন্য প্রান্তটা টাঙিয়ে দিলাম গাছের ডালে। সুতোটা ভাল করে বাঁধা হয়ে গেলে

মাছটা অপেক্ষাকৃত স্থির জলে বেশ আরামে একটা বিরাট পাথরের গায়ে রইল। একমাত্র ভয় ছিল ভোঁদড়ের। তাদের ভয় দেখানোর জন্যে আমি আমার রুমাল দিয়ে একটা নিশান তৈরি করলাম আর নিশানটা মাছটা যেখানে ছিল তার একটু নিচে নদীর মধ্যে পুঁতে দিলাম।

পরদিন সকালে আমি যখন জলাশয়ের কাছে ফিরে এলাম তখন সূর্য পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সোনা মাখাচ্ছে। দেখলাম মাছটা ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই আছে। সুতোর ফাঁসটা গাছ থেকে খুলে হাতে জড়িয়ে নিয়ে আমি পাথরটা বেয়ে মাছটার কাছে নেমে গেলাম। আমার এগনো দেখে ভয় পেয়েই হ'ক বা সুতোর কম্পন অনুভব করেই হ'ক মাছটা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। হঠাৎ জল তোলপাড় করে মাছটা ওপর দিকে পালাবার চেষ্টা করল। আচমকা টান খেয়ে আমি ঢালু পেছল পাথরের ওপর টাল সামলাতে পারলাম না। একেবারে সোজাসুজি গিয়ে পড়লাম জলের ভেতর।

এই সমস্ত পার্বত্য নদীর গভীর জলে যাওয়া সম্বন্ধে আমার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে কারণ কোনো ক্ষুধার্ত অজগর জড়িয়ে ধরা ব্যাপারটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। তাই ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি কি ভাবে টেনে হেঁচড়ে জল থেকে উঠেছিলাম তা দেখার জন্যে কোনো সাক্ষী সেখানে ছিল না। আমি কোনোরকমে ওপারে উঠেছি, মাছটা তখনও আমার ডান হাতে জড়ানো—সেই সময় আমি যাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম সেই লোকজন এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে মাছটা দিয়ে নদীর ধারে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বলে আমি জামাকাপড় ছাড়তে ও ক্যামেরাটা নিতে এগিয়ে গেলাম।

মাছটাকে ওজন করার কোনো উপায় আমার ছিল না কিন্তু আন্দাজে আমার এবং আমার লোকজনদের হিসেব মত মাছটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের কম হবে না।

মাছটা সম্বন্ধে ওজনটাই বড় কথা নয় কারণ ওজনের কথা লোকে সহজেই ভুলে যায়। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকে মাছ ধরা হয়েছে লোকে তা বড় একটা ভোলে না। ফার্নে ঘেরা পুকুরের ইস্পাত নীল জল—যেখানে একটু দম নিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে জল পড়ছে আরও সুন্দর একটা পুকুরের জলের ওপর। রোদ্দুরের আলোয় ঝলসে ওঠা রংচঙে একটা মাছরাঙা, তার আনন্দ যেন হীরে হয়ে ঝরে পড়ছে তার ডানা দিয়ে, তার সিঁদুর রঙের ঠোঁটে ধরা রুপোর মত ঝকঝকে একটা মাছের পোনা—দূরে সম্বরের ডাক আর ভেসে আসা চিতলের সুরেলা গলার হুঁশিয়ারী, যে নদীটার বালির পাড়ে কয়েক মিনিট আগে যে-বাঘটার থাবার ছাপ দেখা গেছে সে বেরিয়েছে তার রাতের খাবার খুঁজতে। এই অপূর্ব পারিপার্শ্বিকের কথা চিরদিন তোলা থাকবে আমার স্মৃতির মণিকোঠায়—চিরদিন আমাকে টানবে সেই উপত্যকাটির দিকে মানুষের স্পর্শ যাকে এখনও মলিন করতে পারে নি।

কান্দার মানুষখেকো

যে কুসংস্কারগুলি অন্য পাঁচজনের সঙ্গে আমরা খুব সহজভাবে মেনে চলি সেগুলির ওপর আমাদের বিশ্বাস থাকে না। যেমন তেরজন এক টেবিলে বসা, ডিনারের সময় মদ এগিয়ে দেওয়া, মইয়ের নিচ দিয়ে হাঁটা—এই রকম আরো কত আছে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত কুসংস্কারগুলি, আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যতই হাসি ঠাট্টার ব্যাপার হ'ক না কেন, আমাদের কাছে তাদের গুরুত্ব অনেক।

শিকারীরা অন্য পাঁচজনের থেকে বেশি কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন কিনা আমার জানা নেই, তবে যেগুলি তাঁরা বিশ্বাস করেন, সেগুলি তাঁরা বিশ্বাস করেন খুব গভীরভাবেই। আমার একজন বন্ধু বাঘ শিকারে যাওয়ার সময় পাঁচটির একটিও বেশি কার্তুজ সঙ্গে নেন না। অপর একজন নেবেন সাতটি কার্তুজ—একটি বেশি নয়, একটি কম নয়। আমার অন্য একজন বন্ধু, বাঘ শিকারে যাঁর সারা উত্তর ভারত জুড়ে নামডাক কখনো একটি মহাশোল মাছ না মেরে তাঁর শীতকালীন শিকারের মরসুম আরম্ভ করতেন না। আমার নিজের ব্যক্তিগত কুসংস্কার সাপ নিয়ে। আমার একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে যে আমি যখন মানুষখেকো বাঘের সন্ধানে ঘুরি, আমার সব চেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে যতক্ষণ না আমি একটা সাপ মারতে পারছি।

একবারে মে মাসের সবচেয়ে গরম দিনগুলিতে একটা ভয়ানক ধূর্ত মানুষখেকোর খোঁজে আমাকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছিল—। সে রাস্তা ছিল শুধু খাড়া কাঁটা ঝোপে ভরা পাহাড়ে

বিরামহীন চড়াই আর উৎরাই। আমার হাত, হাঁটু সব কাঁটার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই পনেরই সন্ধেবেলা যখন আমার দুকামরাওয়ালা জঙ্গল ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম তখন ক্লান্তিতে অবসাদে আমার সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছে। পৌছে দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে একদল গ্রামের লোক। তারা আমাকে সুসংবাদ দিল যে একটা মানুষখেকো বাঘকে সেইদিনই তাদের গ্রামের আশপাশে দেখা গিয়েছে। সে রাতে কিছু করার পক্ষে বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের হাতে লণ্ঠন দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল আর তাদের খুব কড়া নির্দেশ দেওয়া হল যে পরদিন কেউ যেন গ্রাম ছেড়ে কোথাও না যায়।

আমার বাংলোটি যে পাহাড়ের কোলে তারই একপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামটি। গ্রামটি একেবারে একান্তে ও গভীর জঙ্গলে ঢাকা হওয়ায় এই গ্রামটিতেই জেলার অন্যান্য গ্রামের তুলনায় বাঘটির উপদ্রব বেশি। এখানে সদ্য সদ্য বাঘটির হাতে মারা পড়েছে দুটি স্ত্রীলোক এবং একটি পুরুষ।

পরদিন সকালে আমি পুরো গ্রামটা একটা চক্কর দিয়ে দেখলাম। দ্বিতীয়-বার ঘোরা শুরু করলাম প্রথম পথটার সিকি মাইলটাক নিচ দিয়ে. যখন চক্কর প্রায় শেষ করে এনেছি তখন একটা পাথরে ঢাকা বেশ দুর্গম জায়গা পেরিয়ে দেখি একটা ছোট নালা। পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে তোড়ে বৃষ্টির জল নেমে এসে নালাটা তৈরি হয়েছে। নালাটার এদিক থেকে ওদিক একবার তাকিয়েই বুঝলাম বাঘটা ওর মধ্যে নেই। হঠাৎ আমার সামনে গজ পঁচিশেক দূরে একটা কিছু নড়াচড়া করে উঠল। এখানে একটা ছোট জায়গায় প্রায় স্নানের টবের মত কিছুটা জল জমেছিল তারই ওদিকে একটা সাপ জল ..চ্ছে। সাপটা মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়েছে। ওটা যখন মাথা মাটি থেকে প্রায় দুতিন ফুট তুলে ফণা ছড়াচ্ছে তখনই আমি বুঝতে পারলাম ওটা একটা শঙ্খচূড় সাপ। এত অপূর্ব সুন্দর সাপ আমি আর কখনো দেখি নি। সাপটা যখন আমার মুখোমুখি তখন দেখলাম গলার কাছের রঙ গাঢ় কমলা, যেখানে সাপের শরীরটা মাটি ছেড়ে উঠছে সেখানে মিশেছে সোনালী হলদে রঙের সঙ্গে। পিঠটায় গাঢ় সবুজের ওপর হাতির দাঁতের রঙের ছোপ ছোপ দাগ—ল্যাজের ডগা থেকে শরীরের প্রায় চার ফুট পর্যন্ত চকচকে কালো আর তার ওপর সাদা সাদা ছোপ। সাপটা লম্বায় প্রায় তেরো থেকে চোদ্দ ফুট।

শঙ্খচূড় সাপ সম্বন্ধে নানারকম গল্প শোনা যায়। বাধা পেলে এই সাপটি কি রকম হিংস্র হয়ে ওঠে, কি অসম্ভব জোরে ওরা ছুটতে পারে। সাপটার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল আমায় তেড়ে আসতে পারে। যদি সত্যিই আক্রমণ করে তাহলে পাহাড়ের খাড়াই বা উৎরাই বেয়ে দৌড়ে খুব একটা সুবিধে করতে পারব না কিন্তু পাথরের ঢিবি বরাবর যদি দৌড়ই তাহলে হয়তো সাপটাকে

বেকাদায় ফেলতে পারব। ওর উদ্যত ফণাটা একটা ছোটখাট প্লেটের সাইজের। সেটা লক্ষ করে একটা গুলি করলে হয়তো ঝামেলা চুকে যায় কিন্তু আমার সঙ্গের রাইফেলটা খুব জোরাল তাই গুলি করলে. যে বাঘটার জন্য এত দীর্ঘ দিনের অপেক্ষা, পরিশ্রমের পর নাগালের মধ্যে পেয়েছি সেটা হয়তো আবার বেপাত্তা হয়ে যাবে। বেশ দীর্ঘ একটা মিনিট কেটে গেল। এর মধ্যে সাপটা শুধু লম্বা চেরা জিবটা ঢোকাচ্ছিল আর বার করছিল। তারপর সাপটা ফণাটা ছোট করে মাথাটা মাটিতে নামিয়ে উল্টোদিকের ঢালু জায়গাটার ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল। আমি সাপটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে হাত দিয়ে পাহাড়ের গা হাতড়ে হাতড়ে একটা পাথর হাতে নিলাম—পাথটার সাইজ প্রায় একটা ক্রিকেট বলের মত। সাপটা যখন একটা শক্ত মাটির ঢিবির কোনা বরাবর পৌছেছে তখন আমি গায়ের জোরে পাথরটা ছুঁড়ে মারলাম সাপটার মাথার পেছন দিকে। অন্য কোনো সাপ হলে ওই পাথরের চোট খেয়ে আর বাঁচতে হত না কিন্তু এ সাপটার বেলায় ফল হল ঠিক উল্টো। সাপটা বিদ্যুতের মত ঘুরে আমার দিকে সোজাসুজি দৌড়ে এল। ভাগ্যক্রম সাপটা রাস্তার মাঝামাঝি আসার পরই আমার দ্বিতীয় পাথরটা গিয়ে লাগল সাপটার গলায়। তার পরের ব্যাপার খুবই সহজ। আমি মনে বেশ একটা আনন্দ নিয়ে গ্রামটা দ্বিতীয়বার চক্কর মারলাম। যদিও প্রথমবারের মতই এবারো আমার ঘোরাটা নিষ্ফলই হল কিন্তু আমার মনে মনে একটা ফুর্তি ছিল—সাপটাকে তো মেরেছি। অনেকদিন পরে আজ আমার প্রথম মনে হল যে বাঘটার পেছনে দৌড়োদৌড়ি. পরিশ্রম সার্থক হবেই হবে।

পরদিন আবার আমি যে জঙ্গলটি গ্রামটিকে ঘিরে রয়েছে সেই জঙ্গলটি খুঁজে দেখলাম। সন্ধের দিকে, গ্রাম থেকে দেখা যায় একরম একটা চষা জমির প্রান্তে বাঘটার থাবার ছাপ পেলাম। এই গ্রামটির অধিবাসীর সংখ্যা শ খানেক মতন হবে। তারা তো ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে। পরদিন সকালে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আমার জঙ্গলের বাংলোর চার মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্যে একাই রওনা হলাম।

যে জঙ্গলে কোনো মানুষখেকোর ভয় আছে সে জঙ্গলে বা নির্জন পথে খুব সতর্কতাব সঙ্গে চলতে হয় আর কয়েকটি নিয়ম খুব কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। শিকারীর জীবনে যদি অভিজ্ঞতা থাকে যে সে যাকে অনুসরণ করতে বেরিয়েছে, সেই নিঃশব্দে তার পিছু নিয়েছে তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা আপনিই খুব সজাগ থাকে, আর নিয়মগুলি পালন করার জন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয় না। কারণ নিয়ম ঠিকমত না মেনে চললে যে কোনো মুহূর্তে মানুষখেকোর হাতে প্রাণটা যেতে পারে।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন—"একা পথ চলার দরকার কি ?"—বিশেষ

করে যেখানে ক্যাম্পে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মত লোকজন রয়েছে। এই খুব স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব প্রথমত, সঙ্গে লোকজন থাকলে মানুষ সতর্কতা হারিয়ে ফেলে, লোকজনের ওপরই নির্ভর করে বেশি ; আর দ্বিতীয়ত, বাঘের সঙ্গে মোলাকাত হলে একা একজন রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

পরদিন সকালে গ্রামের কাছাকাছি এসে দেখি একদল লোক উদগ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই ওরা চিৎকার করে সমস্বরে একটা ভাল খবর আমায় দিল। গতরাত্রে একটা মোষ বাঘের হাতে মারা পড়েছে। মোষটাকে মারা হয়েছে গ্রামের মধ্যেই তারপর উঁচু ঢিবি মতন জায়গাটা দিয়ে ওটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাহাড়ের উত্তরদিকে সরু গভীর একটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকায়। ঢিবিটার ওপর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উপত্যকাটা ভাল করে দেখে নিয়ে আমার মনে হল পাহাড়ের খাড়াইয়ের ওপর যে পথ দিয়ে বাঘটা মোষটাকে টেনে নিয়ে গেছে সে পথ দিয়ে নামা সমীচীন হবে না। একমাত্র পথ হচ্ছে পুরো রাস্তাটা ঘুরে নিচ দিক দিয়ে উপত্যকাটায় ঢোকা তারপর মড়িটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে যাওয়া। ওপরের পাথরটার ওপর দাঁড়িয়েই জায়গাটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমার হয়েছিল। তবুও পুরো পথটা ঘুরে সেখানে পেঁছিতে পেঁছিতে বেলা প্রায় দুপুর হয়ে এল। উপত্যকাটা একটা জায়গায় প্রায় একশো গজ সমতল তারপরেই খাড়া প্রায় তিনশো গজ উঠে গেছে পাহাড়টার গায়ে। সেই সমতল জমিটার ওপর দিকেই আমি মড়িটা পাব আশা করেছিলাম—আর ভাগ্য যদি ভাল হয় তাহলে বাঘটাও সেখানে থাকা বিচিত্র নয়। উপত্যকাটার খাড়া গা বেয়ে ঘন কাঁটা ঝোপ আর ছোট ছোট বাঁশ বনের মধ্যে দিয়ে বহু পথ হেঁটে আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন আমি ঘামে প্রায় নেয়ে উঠেছি। যেখানে মুহূর্তের মধ্যে গুলি চালাতে হতে পারে সেখানে হাতের চেটো ঘামা কোনো কাজের কথা নয়। তাই আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বসলাম।

আমার সামনের জায়গাটা বড় বড় মসৃণ পাথরে ভরা--তার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে ছোট একটা ঝরনা। জায়গায় জায়গায় ঝরনার স্ফটিক স্বচ্ছ জল জমে আছে। আমার পাতলা রবার সোলের জুতো যেন এই ধরনের পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার জন্যেই তৈরি। একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর আমি রওনা দিলাম মড়িটার কাছাকাছি যাব বলে। আমার ধারণা ছিল বাঘটাও নিশ্চয়ই মড়িটার আশেপাশেই কোথাও ঘুমিয়ে আছে। রাস্তাটার প্রায় তিন পো টাক এগিয়ে যাওয়ার পর মড়িটাকে দেখলাম—ফার্নে ঢাকা পাথরের ওপর পড়ে আছে। পাহাড়টা যেখান থেকে খাড়া উঠে গেছে সেখান থেকে জায়গাটার দূরত্ব গজ পঁচিশেক হবে। বাঘটাকে দেখা যাচ্ছে না। খুব সাবধানে মড়িটার

কাছাকাছি এগিয়ে আমি একটা বড় সমতল পাথরের ওপর জায়গা নিলাম যাতে আমি আশপাশের জমির প্রতিটা ইঞ্চি ভালভাবে দেখতে পাই।

মানুষ যে আসন্ন বিপদের আভাস পায়, এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। তিন চার মিনিট আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম—কোনো বিপদের আশঙ্কা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে নি। হঠাৎ আমার মনে হল বাঘটা খুব কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে আমায় লক্ষ করছে। যে ধরনের বিপদের আশঙ্কা হঠাৎ আমায় সতর্ক করে দিয়েছিল সেইরকমই একটা কিছু নিশ্চয়ই বাঘটারও ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। আমার সামনে বাঁ দিকে এক টুকরো সমতল জমির ওপর কিছু ঘন ঝোপঝাড়। ঝোপগুলির দূরত্ব আমার থেকে পনের কুড়ি ফুট—মড়িটার থেকেও দূরত্ব একই রকম হবে। আমার সমস্ত লক্ষ তখন কেন্দ্রীভূত ওই ঝোপগুলির ওপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝোপগুলি খুব আস্তে নড়ে উঠল আর পরমুহূর্তেই আমি বাঘটাকে দেখলাম খুব দ্রুত বেগে উঠে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। আমি রাইফেল তোলার আগেই বাঘটা একটা লতাপাতায় ঢাকা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে আমি বাঘটাকে আবার দেখতে পেলাম যখন আমাদের মধ্যে দূরত্ব ষাট গজের কাছা-কাছি—বাঘটা তখন একটা বড় পাথরের ওপর থেকে লাফ দিচ্ছে। আমার গুলি খেয়ে বাঘটা পেছন দিকে পড়ে গেল তারপরেই গর্জন করতে করতে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে লাগল—সেই সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল স্রোতের মত পাথর। আমি ভাবলাম বাঘটার নিশ্চয়ই পিঠ ভেঙে গেছে। পিঠ ভাঙা অবস্থায় বাঘটা আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়লে কি করা যাবে ভাবছিলাম এমন সময় বাঘটার গর্জন থেমে গেল। পরমুহূর্তে দেখলাম বাঘটা বিদ্যুৎগতিতে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে—আহত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলাম না ওর মধ্যে। আমার মনে তখন স্বস্তি আর হতাশা মেশানো এক অদ্ভুত অনুভূতি। যে একঝলক আমি বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিলাম তাতে গুলি করে কোনো ফল হত না। একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লাফ মেরে, পাহাড়টা পাক খেয়ে বাঘটা পরের উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরে আমি দেখেছিলাম, পঁচাত্তর ডিগ্রী কোনাকুনি থেকে ছোঁড়া আমার বুলেটটি বাঘটার বাঁ হাঁটুতে লেগে কিছুটা হাড় উড়ে গিয়েছিল। এই হাড়টিকে কোন্ হাস্যরসিক 'মজার হাড়' নাম দিয়েছেন জানি না। হাঁটুতে লেগে বুলেটটি সামনের পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে আবার বাঘটিকে চোয়ালের জোড়ের কাছে প্রচণ্ড আঘাত করে। এই আঘাতগুলি যতই যন্ত্রণাদায়ক হ'ক না কেন এর কোনোটির দরুনই বাঘটার প্রাণের আশঙ্কা নেই। হাল্কা রক্তের ছিটে অনুসরণ করে করে পাশের উপত্যকাটা পর্যন্ত গেলাম। একটা ঘন কাঁটা ঝোপের

মধ্যে থেকে ক্রুদ্ধ বাঘের গোঙরানি শুনতে পেলাম। ঢুকলাম না, কারণ সেটা আত্মহত্যারই সামিল হত।

আমার গুলির আওয়াজ গ্রাম থেকে শোনা গিয়েছিল। তাই আমি যখন ফিরে এলাম তখন পাহাড়ের ওপর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এক উৎসুক জনতা। আমার এত যত্নের সব আয়োজন ভেস্তে যাওয়াতে ওরা যেন আমার থেকেও বেশি হতাশ হয়েছে।

পরদিন সকালে আমি মড়িটার কাছে গিয়ে দেখে খুশি হলাম. আর একটু অবাকও হলাম যে বাঘটা রাতেই ফিরে এসে আরো অল্প কিছুটা খেয়ে তার নৈশভোজন সেরেছে। বাঘটাকে দ্বিতীয়বার গুলি করার একমাত্র সুযোগ মিলতে পারে মড়িটা পাহারা দিয়ে বসে থাকলে। কিন্তু তাতে একটা সমস্যা আছে। মড়টার ধারে কাছে বসার মত কোনো গাছ নেই। আমার বিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আর কখনো কোনো মানুষখেকোর জন্যে মাটিতে বসে রাত কাটাতে রাজী নই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোথায় বসা যায় ভাবছি এমন সময় শুনলাম বাঘটির ডাক। ডাকটি আসছে উপত্যকার ওদিক থেকে যেখান দিয়ে গতকাল আমি উঠেছিলাম। এই ডাকটিই আমার সামনে এনে দিল মানুষখেকো জানোয়ারটাকে সুষ্ঠুভাবে মারার এক সুবর্ণ সুযোগ। বাঘকে ডাকা যায় এই দুই অবস্থায় (ক) যখন বাঘ একটি সঙ্গিনীর সন্ধানে সারা জঙ্গল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে এবং (খ) যখন বাঘটি সামান্য আহত। অবশ্য শিকারীকে এমনভাবে ডাকতে হবে যাতে ডাকটি যে নকল তা যেন বাঘটি বুঝতে না পারে আর এমন জায়গা থেকে ডাকতে হবে যেখানে আসতে বাঘটি কোনো ইতস্তত না করে-- যেমন ঘন ঝোপঝাড় বা ঘাসভরা জমি। এ ছাড়াও, শিকারীকে খুব কাছ থেকে গুলি করবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। সামান্য আহত বাঘ যে মানুষের ডাক শুনলে আসে একথা শুনে অনেক শিকারীই হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু নিজেরা পরখ না করা পর্যন্ত তাঁরা যেন কোনো রায় না দেন। আজকের ঘটনায় ফিরে আসা যাক।

বাঘটি যদিও আমার প্রতিটি ডাকের উত্তর দিয়েছিল কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাঘটি আমার একটুও কাছে এগলো না। আমার ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আমি ধরে নিলাম যে আমি এমন একটা জায়গা থেকে ডাকছি যেখানে বাঘটির গতকালই একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত যে গাছটি আমি বেছে নিলাম সেটা দেওয়ালের মতন একটা খাড়া পাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। এই গাছে আমার বসার মত মাটি থেকে প্রায় আট ফুট উঁচু একটা বেশ সুবিধাজনক ডাল ছিল। এই ডালটিতে বসলে আমি পাথর ভর্তি নালাটার থেকে প্রায় তিরিশ ফুট ওপরে থাকব—তাছাড়াও আমি থাকব নালাটার সোজাসুজি ওপরে। আমি আশা করছিলাম বাঘটা নালাটার

পথ ধরেই আসবে। মনোমত একটা গাছের ব্যবস্থা করে এবার আমি ফিরলাম ঢিবিটার দিকে যেখানে আমার লোকজনদের প্রাতরাশ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।

বিকেল চারটার মধ্যেই আমি বেশ জুত করে ডালটার ওপর বসলাম—আর বসেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমার লোকজনেরা চলে যাওয়ার আগে তাদের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢিবিটাব ওপর থেকে আমাকে 'কু' শব্দ করে ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম। যদি আমি চিতার ডাকে তাদের উত্তর দিই তাহলে তারা চুপচাপ থাকবে কিন্তু যদি তারা কোনো উত্তর না পায় তাহলে তারা যতজন সম্ভব গ্রামবাসীকে সংগ্রহ করে, দুটো দলে ভাগ হয়ে উপত্যকার দুদিক থেকে চিৎকার করতে করতে আর পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে আসবে।

আমি গাছের ওপর যে কোনো ভঙ্গীতে ঘুমনোর কায়দাটা ভালই রপ্ত করেছি, আর ছিলামও ভীষণ ক্লান্ত তাই গোধূলিটা আমার নেহাত মন্দ কাটল না। বেলা শেষের সূর্য যখন পাহাড়ের চুড়োগুলো সোনা রঙে রাঙিয়ে অস্ত যাচ্ছিল তখন হঠাৎ আমার সমস্ত চেতনা সজাগ হয়ে উঠল একটা হনুমানের বিপদ সংকেতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি হনুমানটিকে দেখতে পেলাম উপত্যকার ওদিকে একটা গাছের মগডালে। ওটা আমার দিকেই তাকিয়েছিল। আমার মনে হল আমাকে বোধহয় চিতা বলে ভুল করেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তার বিপদ সংকেতের ডাক কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে তার ডাকও আস্তে আস্তে থেমে গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ কান সতর্ক সজাগ করে রাখার পর হঠাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে একটা পাথর গড়িয়ে আমার গাছে লাগার শব্দে আমি চমকে উঠলাম। পাথরটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম নরম থাবাওয়ালা কোনো ভারি একটা জানোয়ারের সতর্ক খসখস পায়ে চলার আওয়াজ। এটি যে বাঘটির, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমটায় আমি নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলাম এই ভেবে যে নেহাতই ঘটনাচক্রে বাঘটা উপত্যকার ওপর দিকে না উঠে এদিকে আসছে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙতে দেরি হল না, যখন আমার ঠিক পেছন থেকেই বাঘটার ক্রুদ্ধ গম্ভীর গলার চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনতে পেলাম। স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে যে আমি যখন প্রাতরাশ সারছিলাম তখনই বাঘটা উপত্যকার মধ্যে ঢুকেছে আর পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আমার গাছে ওঠা লক্ষ করেছে। হনুমানটা পাহাড়ের ওপর বাঘটাকে দেখতে পেয়েই হুঁশিয়ারীর ডাক ডেকেছিল। ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতি যে দাঁড়াতে পারে তা আমি ভাবি নি—এখন খুব সাবধানে আমায় এগোতে হবে। গাছের ডালটা দিনের আলো থাকতে বসার বেশ ভাল জায়গা ছিল, কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ওখানে বসে নড়াচড়া করা মুশকিল। আমি অবশ্য শূন্যে রাইফেল ছুঁড়তে পারতাম কিন্তু খুব কাছ থেকে

ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে বাঘ তাড়ানোর চেষ্টা যে কত মারাত্মক হতে পারে তা আমার নিজের চোখে দেখা। তাছাড়া আমায় আক্রমণ না করলেও আমার রাইফেলের (একটি ৪৫০।৪০০) আওয়াজ শুনে বাঘটা হয়তো এ তল্লাটই ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে আমার সব পরিশ্রমই বৃথা হয়ে যাবে। তাই সেদিক দিয়ে আমি গেলাম না।

আমি জানতাম বাঘটা লাফাবে না কারণ লাফালেই ও পড়বে প্রায় তিরিশ ফুট খাড়া পাড়ের নিচে পাথরের ওপর। কিন্তু তার লাফ দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। পেছনের দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেই ও অনায়াসে আমার নাগাল পেয়ে যাবে। কোল থেকে তুলে রাইফেলের মুখটা ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় নলটা চালিয়ে দিলাম বাঁ বগলের তলা দিয়ে, সেই সঙ্গে নলটা নিচু করে সেফটিক্যাচটা তুলে দিলাম। এই একটু নড়াচড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার ক্রুদ্ধ গলার গর্জন শুনতে পেলাম। এবার আওয়াজটা অন্যান্য বারের তুলনায় আরো ভয়াবহ। এবার যদি বাঘটা আমায় ধরার জন্যে ওঠে তাহলে রাইফেলটাই প্রথমে ওর গায়ে লাগবে, আর রাইফেলের ঘোড়ার ওপর আমার আঙুল বেঁকানো রয়েছে। আমার গুলিতে বাঘটা যদি নাও মরে তাহলেও গুলির আওয়াজে যে গণ্ডগোল, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তার ফাঁকেই হয়তো আমি গাছটার আরো ওপরে উঠে যেতে পারব। সময়টা যেন আর কাটতেই চায় না। অবশেষে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়চারি আর গর্জন করতে করতে ক্লান্ত হয়েই যেন বাঘটা আমার বাঁ দিকের একটা নালা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম যে মড়িটার কাছ থেকে হাড় চিবোনার শব্দ আসছে। এরপর সারারাত যা কিছু আওয়াজ পেলাম সবই এল মড়িটার দিক থেকেই।

তখন মাত্র কয়েক মিনিট হল সূর্য উঠেছে—উপত্যকাটা তখনও গভীর ছায়ায় ঢাকা। এমন সময় শুনলাম ঢিবিটার কাছ থেকে আমার লোকজনদের সেই 'কু' সংকেত। ঠিক পরমুহূর্তেই দেখলাম বাঘটা খুব দ্রুতগতিতে দৌড়ে আমার বাঁ পাশের পাহাড়টার ওপর উঠে পেরিয়ে যাচ্ছে। তখনও আলোটা ভাল করে ফোটে নি—সবই আবছা, অনিশ্চিত। আর সারা রাত চোখ বিঁধিয়ে তাকিয়ে দেখার ফলে আমার চোখও ক্লান্ত। তাই তাক করে গুলি চালানো খুব কঠিন। কিন্তু গুলি আমি চালালাম এবং দেখে খুশি হলাম যে গুলিটা যথাস্থানেই গিয়ে লেগেছে। প্রচণ্ড গর্জন করে ঘুরে গিয়ে বাঘটা সোজা আমার গাছের দিকে এগিয়ে এল। ও যখন লাফ দিতে উদ্যত তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার দ্বিতীয় বুলেটটা লাগল ওর বুকে। ভারি বুলেটের ধাক্কায় বাঘটার আর লাফ দেওয়া হল না, ছটকে গিয়ে পড়ল আমারই কাছে একটা গাছের গায়ে। তারপরেই ধাক্কার জোর সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ল সোজা

নিচের উপত্যকাটার ওপর। সেখানে পাথরের ফাঁকে ঝরনার জমা জলের ওপর পড়ার আঘাতটা অনেকটা সামলে নিল। তারপর কোনোরকমে জল থেকে উঠে উপত্যকাটার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে ও আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। দেখি ঝরনার জমা জল রক্তে লাল হয়ে রয়েছে।

পনের ঘণ্টা একনাগাড়ে গাছের শক্ত ডালটির ওপর বসে থাকায় আমার শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই গাছ থেকে নেমে হাত পা একটু মালিশ না করে নিয়ে আমি বাঘটার পিছু নিতে পারলাম না। বাঘটার চাপ চাপ রক্ত লেগে ছিল গাছটার গায়ে, নামার সময়ে আমার জামাকাপড়েও রক্তের ছাপ লেগে গেল। বাঘটা বেশি দূরে যেতে পারে নি। আমি ওর মৃতদেহ দেখলাম আরেকটা ঝরনার জল জমা জলাশয়ের কাছে, একটা পাথরের নিচে।

লোকজন, যারা ঢিবিটার ওপর জড়ো হয়েছিল, তারা আমার প্রথম গুলির আওয়াজ আর বাঘের গর্জন তারপরে দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ শুনে আমার নির্দেশ অমান্য করেই দঙ্গল বেঁধে পাহাড় বেয়ে নেমে এল। রক্ত মাখা গাছটার কাছে এসে নিচে আমার টুপিটা পড়ে থাকতে দেখে ওরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিল যে বাঘটা নিশ্চয়ই আমায় তুলে নিয়ে গেছে। ওদের ভয়ার্ত চিৎকার চেঁচামিচি শুনে আমি ওদের ডাকলাম। উপত্যকাটার গা বেয়ে আবার দৌড়ে নেমে এসেই আমার রক্তমাখা জামাকাপড় দেখে ওরা ভয়ে থমকে দাঁড়াল। ওদের যখন আশ্বস্ত করলাম যে আমি আহত হই নি, জামাকাপড়ে রক্ত আমার নিজের নয় তখন মুহূর্তের মধ্যে ওরা বাঘটার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মজবুত চারা গাছ কেটে লতাপাতা দিয়ে বাঘটাকে তার সঙ্গে বাঁধা হল। তারপর বহু কষ্ট করে চিৎকার করতে করতে ওরা পাহাড়ের সোজা খাড়াই বেয়ে বাঘটাকে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

সুদূর প্রত্যন্ত সব জায়গায় যেখানে দীর্ঘদিন ধরে মানুষখেকো অত্যাচার চালাচ্ছে সেখানে নানা ধরনের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য-স্থানীয় লোকজন এধরনের বীরত্বমূলক কাজের কোনো গুরুত্ব দেয় না, দৈনন্দিন জীবনের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই ধরে নেয় আর বাইরের পৃথিবীও এ ধরনের কাজের কথা শোনার কোনো সুযোগই পায় না। কান্দার মানুষখেকোর শেষ মানুষ শিকারটি সম্বন্ধে এই ধরনের একটি ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করতে চাই। ঘটনাটি ঘটার অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ঘটনাস্থলে পেঁছিই। গ্রামের লোকজনদের বর্ণনা শুনে আর মাটিটা ভাল করে পরখ করে আমি আপনাদের এমন একটা কাহিনী শোনাতে পারি যার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে আমি ঘটনাস্থলে পেঁছিনো পর্যন্ত জমিটায় কারো কোনো হাত পড়ে নি—কিছু এদিক সেদিক হয় নি।
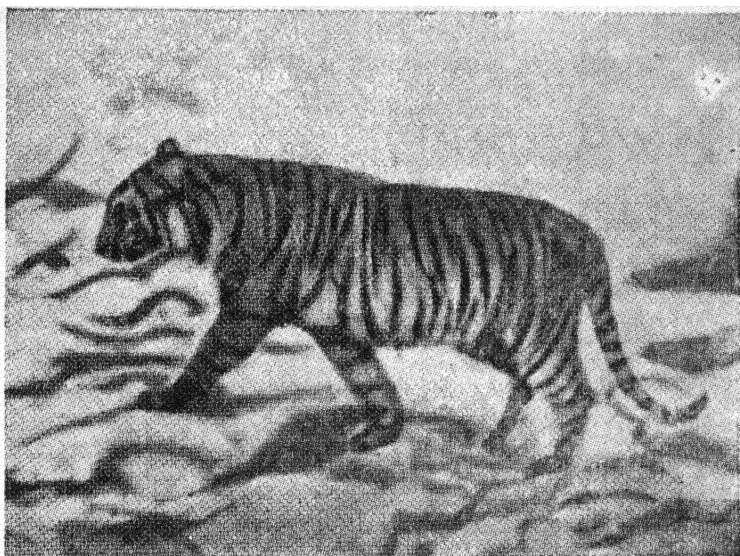
ক্যামেরার দশ গজের ভেতর দিয়ে যে বাঘের দল যাচ্ছিল, এটি বৃহত্বে তাদের মধ্যে দু নম্বর। (সিনে ফটোগ্রাফির নমুনা)

সবচেয়ে বড় বাঘটি মড়ি নিয়ে যাবার আগে তার এক দিক ধরে তুলছে। মড়িটা একটা বুড়ো গাড়ি টানা মোষ। (সিনে ফটোগ্রাফির নমুনা)

আমি যে গ্রামটার কাছে কান্দা মানুষখেকোকে গুলি করি সেই গ্রামে তার একমাত্র ছেলের সঙ্গে বাস করত এক বৃদ্ধ। পিতা ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এবং তার সর্বোচ্চ অভিলাষ ছিল ছেলেকে রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেল্‌স এ ভর্তি করে দেওয়া। শান্তির সময়ে, যখন আজকালকার মত কাজের সংখ্যা কম কিন্তু আবেদনকারী বহু তখন এ কাজ নেহাত সহজসাধ্য ছিল না। ছেলেটি আঠার বছর পূর্ণ হওয়ার পরেই কিছু লোক গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ল্যান্সডাউন বাজারের দিকে। ছেলেটি এই দলটির সঙ্গে যোগ দিল আর ল্যান্সডাউনে পৌছেই রিক্রুটিং আপিসে হাজির হল। ওর বাবা ওকে নিখুঁত মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করতে আর নিয়োগকর্তা অফিসারের সামনে কি রকমভাবে কেতাদুরস্তভাবে চলতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিল। তাই বিনা বিপত্তিতে ওর কাজ হয়ে গেল। নাম লেখানো হয়ে গেলে ওকে ছুটি দেওয়া হল ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বাড়িতে জমা দিয়ে আসার জন্যে কারণ এর পরেই শুরু হবে ওর সেনাদলে শিক্ষানবিশী।

পাঁচদিন পরে ও বেলা দুপুর নাগাদ বাড়ি পৌছল। ওর বন্ধুবান্ধব যারা ওর খবরাখবর নেওয়ার জন্যে ভিড় করে এল তারাই ওকে বলল যে ওর বাবা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে ওদের ছোট একফালি জমিটায় লাঙল দিতে গেছে এবং ওর ফিরতে রাত হয়ে যাবে। (আমি যেদিন শংখচূড় সাপটি মারি সেদিন এই জমিটার ওপরেই আমি বাঘটার থাবার ছাপ দেখি।)।

ছেলেটির একটি কাজ ছিল বাড়ির গরু মোষদের খাওয়ানো। সে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে জনা কুড়ি লোকের সঙ্গে বেরোল পাতা সংগ্রহ করতে।

আমি আগেই বলেছি যে গ্রামটি একটি ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আর চারিদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই জঙ্গলে ঘাস কাটার সময় দুটি স্ত্রীলোক মানুষখেকোটার হাতে মারা পড়েছে, তাই বেশ কয়েকমাস ধরেই গ্রামের আশপাশের গাছগুলি থেকে কাটা পাতা খাইয়েই গরু ছাগলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিল। প্রতিদিনই পাতা সংগ্রহের জন্যে গ্রামের লোকজনদের একটু একটু করে দূরে যেতে হচ্ছিল। এই বিশেষ দিনটিতে একুশ জনের দলটি চষা জমি পেরিয়ে একটা খুব খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে উপত্যকাটির মাথায় এসে পৌছল। এই উপত্যকাটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় আট মাইল বিস্তৃত —শেষে উপত্যকাটি চিকালা ফরেস্ট বাংলোর উল্টো দিকে রামগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশেছে।

উপত্যকাটি মাথার দিকে মোটামুটি সমতল আর বড় বড় গাছে ঢাকা। এইখানে লোকগুলি সব ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল—প্রত্যেকেই উঠল নিজেদের পছন্দ

মত এক একটি গাছে। প্রয়োজনমত পাতা কেটে, সঙ্গে নিয়ে আসা দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা দুজন তিনজন করে গ্রামে ফিরে গেল।

পাহাড়ের গা বেয়ে—হয় সাহস বাড়াবার জন্যে আর নয় মানুষখেকোটাকে ভয় খাইয়ে দেওয়ার জন্যে তারা যখন খুব চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে নামছিল, অথবা যখন একগাছের মাথা থেকে চিৎকার করে তারা অন্য গাছে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল তখন উপত্যকাটার আধমাইলটাক দূরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে মানুষখেকোটা শুয়ে ছিল। সে ওদের চিৎকার শুনতে পায়।

এই ঝোপটাতেই বাঘটা দিন চারেক আগে একটা সম্বর মেরে খেয়েছিল। এখন ওদের চিৎকার শুনে বাঘটা উঠে একটা ছোট ঝরনা পেরিয়ে সরু একটা গরু মোষের পায়ে চলার পথ ধরে ওদের দিকে এগিয়ে চলল। এই পায়ে চলার পথটা রয়েছে পুরো উপত্যকাটার বিস্তার জুড়ে। যে জমির ওপর বাঘের থাবার ছাপ রয়েছে সেখানে বাঘটার সামনের আর পেছনের পায়ের তুলনামূলক অবস্থান লক্ষ করলেই বাঘটার গতি কি ছিল তা বোঝা যায়।

আমার কাহিনীর ছেলেটি গরুর পাতা কাটার জন্যে উঠেছিল একটা কাঞ্চন গাছে। গাছটা, গরু মোষ চলার রাস্তাটির প্রায় কুড়ি গজ ওপরে আর গাছটার ওপরের ডালপালা ঝুঁকে ছিল একটা ছোট নালার ওপর। এই নালাটার ওপর ছিল দুটি বিশাল পাথর। পথটার একটা বাঁক থেকেই বাঘটা গাছের ওপর ছেলেটিকে দেখতে পায়। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ছেলেটিকে লক্ষ করার পর বাঘটা পড়ে থাওয়া শিমুল গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ে। গাছটার দূরত্ব নালার থেকে প্রায় তিরিশ গজ। ছেলেটার পাতা কাটা হয়ে গেলে ও গাছ থেকে নেমে এসে পাতাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে। এর পরেই বাণ্ডিল বেঁধে ফেলবে ও। যতক্ষণ ছেলেটি খোলা জায়গার ওপরে এইসব কাজ করছিল ততক্ষণ ও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ও লক্ষ করেছিল ওর কাটা দুটো ডাল গিয়ে পড়েছে নালাটায়, দুটো পাথরের মধ্যে। ও যে মুহূর্তে ডাল দুটো তোলার জন্যে নালাটার মধ্যে নামল ওর নিজের জীবনের ছেদ নিজেই টেনে দিল সেই মুহূর্তে। ও চোখের আড়াল হতেই বাঘটা পড়া গাছটার পেছন থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল নালাটার পাড়ে। ছেলেটা ডালগুলো তোলার জন্যে যেই ঝুঁকছে অমনি বাঘটা ওর ওপর লাফিয়ে পড়ে ওকে মেরে ফেলল। অন্য লোকজন গাছে থাকার সময়েই এই ঘটনা ঘটেছে না তারা চলে যাওয়ার পর; তা আমি স্থির করতে পারি নি।

ছেলেটির বাবা সূর্যাস্তের পর গ্রামে ফিরে এসেই সুসংবাদ শুনল যে তার ছেলে সেনাবাহিনীতে কাজ পেয়েছে আর ল্যান্সডাউন থেকে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তাকে বলা হল সে বেশ

বেলা থাকতেই গরু ছাগলের খাবার আনতে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে বাড়িতে ছেলের দেখা হয় নি শুনে অনেকেই খুব অবাক হয়ে গেল। গরুগুলোকে বেধে রেখে সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াল তার ছেলের সন্ধানে। সেদিন যারা বেরিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করা হল কিন্তু প্রত্যেকের সেই একই কথা তারা উপত্যকার মাথার কাছটাই সবাই আলাদা হয়ে যায় তারপরে ওর ছেলেকে দেখার কথা কারো স্মরণে নেই।

সেই ধাপকাটা চাষের ক্ষেত পেরিয়ে ওর বাবা খাড়া পাহাড়টার ধারে এসে ছেলের নাম ধরে বারে বারে ডাকল কিন্তু কোনো উত্তর পেল না।

তখন রাত ঘনিয়ে আসছে। লোকটা বাড়ি ফিরে এসে একটা ধোঁয়া মলিন লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। সে যখন গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন গ্রামবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, সে যাচ্ছে তার ছেলেকে খুঁজতে। ওর উত্তর শুনে গ্রামবাসীরা ঘাবড়ে গেল। ওকে জিজ্ঞাসা করা হল ওকি মানুষখেকোটার কথা ভুলে গেছে? উত্তরে লোকটি বলল মানুষখেকোটা আছে বলেই ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে তার এত দুশ্চিন্তা। এমনও হতে পারে, ছেলেটা গাছ থেকে পড়ে আঘাত পেয়েছে কিন্তু মানুষখেকোটা শুনতে পাবে ভেবে ওর ডাকে সাড়া দেয় নি।

কাউকে সে ওর সঙ্গে যেতে বলল না—কেউ অবশ্য নিজে থেকে যাওয়ার কথাও বলল না। সারা রাত ধরে সে উপত্যকাটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছেলেকে খুঁজে বেড়াল। অথচ মানুষখেকোটা আসার পর আর কেউ ওখানে পা বাড়াবার সাহস পায়নি। পরে ওর পায়ের ছাপ দেখে আমি বুঝেছিলাম সে রাতে অন্তত চারবার সেই গরু ছাগলদের পায়ে চলা পথ ধরে যাওয়ার সময়ে যেখানে বাঘটা বসে তার ছেলেকে খাচ্ছিল তার দশ ফুটের মধ্যে দিয়ে সে গিয়েছে।

যখন ভোরের আলো সবে ফুটছে তখন সে ক্লান্ত হয়ে পাথুরে পাহাড়টার গা বেয়ে কিছুটা উঠে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসেছিল কিছুটা বিশ্রামের জন্যে। এই উঁচু জায়গাটা থেকে ও নালার মধ্যেটা দেখতে পাচ্ছিল। সূর্য উঠলে পর ও দেখল বিশাল পাথর দুইটির ওপর কিছুটা রক্ত চকচক করছে—তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখতে পেল ওর ছেলের দেহাবশিষ্ট, বাঘটা যেটুকু রেখে গিয়েছিল। দেহের এ অবশিষ্ট অংশটুকু ও সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এল। শব ঢাকার মত এক টুকরো কাপড় যোগাড় হলে ও বন্ধুদের সাহায্যে শরীরের অংশটুকু নিয়ে এল মণ্ডল নদীর শ্মশান ঘাটে।

আমার মনে হয় একথা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের কল্পনাশক্তি কম—এ ধরনের কাজে বিপদের ঝুঁকি তারা নিচ্ছে সে বিষয়ে তারা সজাগ নয়। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা তাদের

পরিবেশ সম্বন্ধে খুবই সচেতন। এছাড়াও তাদের মধ্যে আছে নানাধরনের কুসংস্কার—যেমন, প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায়, উপত্যকায়, খাদে আছে কোনো না কোনো অশরীরী আত্মা, তাদের মধ্যে যারা অশুভ, ক্ষতিকর, সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এই পরিবেশে যে লোকটি বড় হয়েছে আর যে গত এক বছরেরও ওপর কাটাচ্ছে এক মানুষখেকোর সন্ত্রাসের মধ্যে তার পক্ষে বিনা অস্ত্রে সম্পূর্ণ একা সূর্যাস্ত থেকে সর্যোদয় পর্যন্ত গভীর জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে গুণ এবং সাহসের পরিচয় মেলে তা আমার ধারণা খুব কম লোকের মধ্যেই আছে,—বিশেষ করে যখন ওর দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জঙ্গলের মধ্যে আছে ক্ষতিকর অশরীরী আত্মা আর ওত পেতে আছে এক মানুষখেকো বাঘ। ওকে আরোও বেশি কৃতিত্ব আমি দিই এই জন্যে যে, নিজে যে কত বড় সাহসের কাজ করেছে এ সম্বন্ধে লোকটি মোটেই সচেতন নয়—যেন সে বলার বা লক্ষ করার মত এমন কিছুই করে নি। আমার অনুরোধে যখন সে মানুষখেকোটার কাছে ছবি তোলার জন্যে বসল তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত, সংযত গলায় বলল—"আমার কোনো দুঃখ নেই সাহেব, আপনি আমার ছেলের মৃত্যুর বদলা নিয়েছেন।"

আমি কুমায়ুনের জেলা অফিসারদের এবং পরে গাড়োয়ালের জনসাধারণকে যে তিনটি মানুষখেকো মারার চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এইটিই তার মধ্যে শেষটি।

আবেদন পত্রের প্রতিলিপি

গাড়োয়ালের জনগণ কর্তৃক লেখককে প্রেরিত ২৬৬ পাতায় উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি এই আবেদন পত্রটি পাওয়ার পর দেওয়া হয়েছিল,

প্রেরিত—

পইনোম, বুংগি এবং বিকলা বাদলপুর পট্টি, জেলা গাড়োয়ালের জনসাধারণ

প্রাপক

ক্যাপ্টেন জে. ই কারবিট, সমীপেষু, আই. এ. আর. ও, কালাধুঙ্গী

জেলা নৈনিতাল

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমরা সর্বসাধারণ (উপরোক্ত তিনটি পট্টির) অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং

শ্রদ্ধার সঙ্গে নিম্নলিখিত লাইন কটিতে আমাদের বক্তব্য জানাচ্ছি আপনার বিবেচনা এবং যথা কর্তব্য করার জন্যে।

বক্তব্য এই যে এর নিকটবর্তী অঞ্চলে গত ডিসেম্বর থেকে একটি বাঘ নরখাদক হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত সে পাঁচটি মানুষ মেরেছে এবং দুটিকে জখম করেছে। সেইজন্যে আমরা, জনসাধারণ, অত্যন্ত এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। বাঘের ভয়ে আমরা রাত্রে আমাদের গম শস্য পাহারা দিতে পারি না। ফলে হরিণেরা প্রায় সব শস্য নষ্ট করেছে। আমরা গরু-ছাগলের ঘাস আনার জন্যে জঙ্গলে যেতে পারি না, আমাদের গবাদি পশুকে জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যেতে পারি না কারণ তাতে বহু পশু প্রাণ হারাবে। এই অবস্থায় আমরা প্রায় শেষ হতে বসেছি। বনবিভাগের অফিসাররা বাঘটিকে মারার যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন কিন্তু সাফল্যের কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। দুজন শিকারী ভদ্রলোকও বাঘটিকে গুলি করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরাও বাঘটিকে মারতে পারেন নি। আমাদের সহৃদয় জেলাশাসক এই বাঘটি মারার জন্যে ১৫০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সেইজন্যে সবাই বাঘটিকে মারার চেষ্টা করছে কিন্তু কেউই সফল হয় নি। আমরা শুনেছি দয়াবান আপনি অনেক নরখাদক বাঘ এবং চিতা মেরেছেন। এর জন্যে আপনি সুনাম অর্জন করেছেন বিশেষ করে কুমায়ুন রাজস্ব বিভাগে। বিখ্যাত নাগপুরের নরখাদক চিতা আপনার হাতেই মারা পড়ে। এখানে সর্বসাধারণ একমত যে বাঘটিকে একমাত্র আপনিই মারবেন। সুতরাং আমরা, জনসাধারণ আপনাকে সাহস করে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করে বাঘটিকে (আমাদের শত্রু) মারুন এবং জনগণকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন: এই দয়ার কাজটির জন্যে, আমরা, জনসাধারণ খুবই উপকৃত বোধ করব এবং আপনার দীর্ঘ জীবন ও সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করব। আশা করি আপনি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের বিপদমুক্ত করতে এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করবেন। এখানে আসার রাস্তা এইরকম; রামনগব থেকে সুলতান, সুলতান থেকে লাহাচৌর, লাহাচৌর থেকে কান্দা। মাননীয় মহাশয়, যদি আমাদের রামনগরে পেঁছনোর তারিখটি জানান তাহলে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে এবং আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্যে রামনগরে আমাদের লোকজন এবং গরুর গাড়ি পাঠাব।

তারিখ, ঝারাট আপনার চরণপ্রার্থী
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ মহাশয়

আপনার সর্বাধিক বিশ্বস্ত স্বাক্ষর
গোবিন্দ সিং নেগি মোড়ল, গ্রাম—ঝারাট

এর সঙ্গে আছে পইনৌম, ব্ংগ এবং বিক্লা বাদলপ্রে পট্টিগ্লির ৪০ জন অধিবাসীর স্বাক্ষর এবং ৪ জনের ব্দ্ধাঙ্গ্ঠের ছাপ

ঠিকানা :
গোবিন্দ সিং নেগি
গ্রাম—ঝারাট পট্টি
পো. আ.—পইনৌম
বাদিয়ালগাঁও জেলা, গাড়োয়াল, ইউ. পি.

('পাওয়ালগড়ের কুঁয়ারসাব' কাহিনীতে জনৈক ভূতপূর্ব চোরাশিকারীকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তা এই আবেদনপত্র লাভের পরে—করবেট বলেছেন। তবে আবেদনপত্রটি কান্দার মান্ষখেকো সম্পর্কিত এবং মূল বইয়ে 'কান্দার মান্ষখেকো' কাহিনীর সঙ্গেই এটি আছে। —সম্পাদিকা)

পিপলপানির বাঘ

ও জন্মেছে পাহাড়ের পাদদেশের গভীরে. চলে যাওয়া এক নালার মধ্যে আর তিনজনের এক পরিবারের ও অন্যতম—এর বাইরে ওর ছোটবেলার কথা আর কিছুই আমার জানা নেই।

এক নভেম্বরের সকালে একটা চিতলের ডাকে আকৃষ্ট হয়ে বেরিয়ে একটি ছোট্ট ঝরনা, যার স্থানীয় নাম পিপলপানি তারই ধারে বালির চড়ার ওপর ওর থাবার ছাপ দেখি। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো মার যত্নের আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের চলার পথে ওর একারই থাবার ছাপ দেখতে লাগলাম তখন সিদ্ধান্তে এলাম যে সঙ্গমের সময় এগিয়ে আসছে, আর সেইটাই বাঘটির একা থাকার কারণ।

জঙ্গলের জীবদের জীবনটাই এইরকম। একদিন কঠিন পাহারায় সুরক্ষিত—দরকার হলে মা হয়তো প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে বাচ্চাকে আবার পরদিনই সে সম্পূর্ণ একা। বংশরক্ষার ব্যাপারটা যাতে পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সেইজন্যেই বোধহয় প্রকৃতির এই বিধান।

সে শীতটা ও কাটাল ময়ূর, কাকার, ছোট শুয়োর আর কখনও কখনও চিতল খেয়ে। ও বাসা বানিয়েছিল জঙ্গলে এক দৈত্যের মত বিশাল পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ির মধ্যে। গুঁড়িটার ভেতরটা গময় এবং শজারুর দৌলতে ছিল সম্পূর্ণ ফাঁপা। গাছটা কেন যে পড়েছে তা বোঝা কঠিন। ওর অধিকাংশ শিকারই ও নিয়ে আসত এখানে। শীতকালে গাছটার মসৃণ গুঁড়ির ওপর বসে

ও রোদ পোয়াত—ওর আগে অনেক চিতাই ওই একই জায়গায় বসে আরাম করে রোদ পুইয়েছে।

বাঘটাকে আমি কাছাকাছি থেকে দেখেছিলাম জানুআরি মাস বেশ খানিকটা গড়িয়ে যাওয়ার পর। একদিন সন্ধেবেলা এমনিই বেরিয়েছিলাম, আমার নির্দিষ্ট কিছুই করার ছিল না। হঠাৎ আমি দেখলাম একটা কাক মাটি থেকে উঠে ঠোঁট মুছতে মুছতে একটা গাছের ডালে বসল। জঙ্গলে কাক, শকুন আর ম্যাগপাই সম্বন্ধে আমার চিরদিনই খুব উৎসাহ কারণ এই পাখিগুলির সাহায্যে আমি ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাতে বহু মড়ির সন্ধান পেয়েছি। এখন কাকটি আমাকে নিয়ে গেল গতরাতের এক বিয়োগান্ত ঘটনার দৃশ্যে। একটা চিতলকে মেরে কিছুটা অংশ খাওয়া হয়েছে। একদল লোক প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরেব একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তারাও বোধহয় আমারই মতন কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে জায়গাটিতে আসে এবং চিতলের বাকি অংশটুকু কেটে নিয়ে যায়। সেখানে পড়েছিল শুধু চিতলের কয়েকটা হাড় আর কিছুটা জমাট রক্ত। কাকটা কিছুক্ষণ আগে এই রক্ত দিয়েই তার খাওয়া সেরেছে। আশপাশে কোনো ঘন ঝোপঝাড় নেই, রাস্তাটাও বেশ কাছে। বোঝা গেল, চিতল মেরেছে যে জানোয়ারটি, সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সে লক্ষ করে নি। তাব মানেই জানোয়ারটি যথা সময়ে ফিরে আসবে। আমি বসে অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। একটা কাঁটাভরা কুল গাছের ডালে যতটা সম্ভব আরামে বসা যায় বসলাম।

মড়ির ওপর বসে শিকার দেখা নীতিসম্মত কিনা এটা বহু বিতর্কিত বিষয়। এটা নিয়ে পাঠকের সঙ্গে যদি আমার মতানৈক্য থাকে তাহলে আমার দিক থেকে কিছু করার নেই। আমার সবচেয়ে মধুর শিকার স্মৃতিগুলি জড়িয়ে আছে সূর্যাস্তের ঠিক দুএক ঘণ্টা আগের সময়টির সঙ্গে যখন আমি নিচে মড়ি রেখে গাছের ওপর সময় কাটিয়েছি। এ অভিজ্ঞতা আমার আজকের নয়। যখন আমি গাদা বন্দুক, যার ফাটা নলটি ভেঙে যাতে না যায় সেইজন্যে তামার তাব দিয়ে জড়ানো নিয়ে চিতায় খাওয়া হনুমানের মড়ির ওপর বসেছি তখন থেকে আরম্ভ করে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত যখন হাঁটুর ওপর সর্বাধুনিক রাইফেলটি রেখে আমি বাঘিনী আর তার দুই পূর্ণ বয়স্ক বাচ্চাকে, তাদের মারা একটা সম্বর খেতে দেখেছি—এই দীর্ঘলব্ধ অভিজ্ঞতার দরুনই একথা আমি বলছি। আমি যেগুলি চালিয়ে বিজয়ীর পুরস্কার পাই নি তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদ নেই।

এটা ঠিকই যে এই মুহূর্তে আমার নিচে কোনো মড়ি নেই। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্যে সেটা আমার গুলি চালানোর কোনো প্রতিবন্ধক হবে না। রক্তে ভেজা মাটির গন্ধ জঙ্গলের জানোয়ারদের আকর্ষণ করে। প্রমাণস্বরূপ দেখাতে পারি ধূসর গোঁফওয়ালা বুনো শুয়োরটিকে। শুয়োরটা প্রায় দশ মিনিট

ধরে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল হঠাৎ হাওয়ায় রক্তের গন্ধ নাকে আসতেই শুয়োরটা থমকে দাঁড়াল। শুধু নাকটা শূন্যে তুলে ও যা বুঝল আমি পদচিহ্নহীন জমি পরখ করেও তা বুঝতে পারি নি। নাকের এরকম সদ্ব্যবহারে করা শুয়োরদেরই সম্ভব। ও একটু ডান দিকে বেঁকে গেল তারপরেই ফিরে এল হাওয়া বরাবর তারপর বাঁ দিকে ঘুরে আবার হাওয়ার লাইনে। এর থেকেই বোঝা যায় চিতলটাকে বাঘে মেরেছে। শুয়োরটা শেষবারের মত আর একবার দেখে নিল খাওয়ার মত আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা তারপর দৌড়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এরপর দেখা গেল দুটো চিতল হরিণ, দুটোরই শিং যেন মখমলে মোড়া। হাওয়ার দিক থেকে যেভাবে তারা সোজা রক্তে ভেজা জায়গাটার দিকে এগোচ্ছিল তাতে বোঝা গেল গতরাতের মর্মান্তিক ঘটনার তারা সাক্ষী ছিল। তারা পালা করে মাটির গন্ধ শুঁকছিল অথবা থমকে দাঁড়াচ্ছিল। তাদের প্রতিটি মাংসপেশী তখন নিমেষের মধ্যে দৌড়ে পালাবার জন্যে তৈরি। এইভাবে কৌতূহল চরিতার্থ করে তারা যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে গেল।

কৌতূহল জিনিসটা মানুষের একচেটিয়া নয়। কৌতূহলের দরুন বহু জন্তু জানোয়ারকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কুকুরটা বারান্দা থেকে ছুটল একটা ছায়ার দিকে ঘেউঘেউ করে অথবা হরিণটা দল ছেড়ে দেখতে গেল ঘাসের ঝোপটা হাওয়ায় নড়ছে না কেন—ব্যস্ ঘাপটি মেরে থাকা চিতাটার খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। হঠাৎ সামনে ডান দিকে একটা নড়াচড়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার গাছ থেকে প্রায় তিরিশ গজ দূরে, আগাছার ঝোপটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুটো ঝোপের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়েছে একটা জানোয়ার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার দিকের ঝোপটি ফাঁক করে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল বাঘের বাচ্চাটা। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে ও সোজা চলে গেল ওর শিকার যেখানে পড়ে আছে সেখানে। গিয়ে যখন দেখল ওর এত কষ্ট করে শিকার করা চিতলটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তখন ওর সব আসা হতাশায় পর্যবসিত হল। হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে হয়েছে হরিণটাকে। হাড়ের টুকরো, জমা রক্ত কিছুই ওর মনঃপূত হল না, ও আকৃষ্ট হল একটা কসাইয়ের ব্যবহার করা কাঠের দিকে যার ওপর তখনও কয়েক টুকরো মাংস লেগে রয়েছে। এ জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে শুধু আমিই আসি না, আরো অনেকেই আসে। বাচ্চাটাকে যদি পূর্ণবয়স্ক বাঘ হয়ে বেড়ে উঠতে হয় তাহলে ওকে শিখিয়ে দিতে হবে দিনের আলোয় অসতর্কভাবে মড়ির কাছে এগনো কত বিপজ্জনক। একটা ছররা বন্দুক আর ধুলো ওড়ানো একটা

গুলিতেই আমার কাজ ভাল হত কিন্তু এ যাত্রায় উপায় নেই। রাইফেল দিয়েই কাজ সারতে হবে। ও যেই কসাইয়ের কাঠটা শোঁকার জন্যে মাথা তুলেছে আমার বুলেট গিয়ে লাগল কাঠটার গায়ে—ঠিক ওর নাকের এক ইঞ্চি ওপরে। এরপরে যে বছরগুলি এল গেল তার মধ্যে বাঘটি শুধু একবারই আজকের এই শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল।

এর পরের শীতে আমি বাচ্চাটিকে কয়েকবার দেখেছিলাম। ওর কানগুলো এখন আর অত বড় বড় দেখাচ্ছে না, শিশুবয়সের লোমগুলির জায়গায় এখন সোনালী লাল লোমের ওপর পরিষ্কার ডোরা কাটা দাগ। ফাঁপা গাছের গুঁড়িটা ফিরে গেছে ওটার আসল মালিক এক জোড়া চিতার কাছে—বাঘটা এখন আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের সানুদেশ জোড়া এক ঘন আগাছার জঙ্গলে আর এখন সম্বর হরিণও ওর খাদ্যেব তালিকাভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবছরের মত পরের শীতেও পাহাড় থেকে নেমে এলাম। এবার জন্তু-জানোয়ারদের চলার পথে বা জল খাওয়ার জায়গাগুলোর আশপাশে আমার বহু পরিচিত পায়ের দাগগুলি সপ্তাহের পর সপ্তাহ না দেখতে পেয়ে আমি ভাবলাম বাচ্চাটা নিশ্চয়ই পুরনো ঘাঁটিগুলি ছেড়ে আরও দূরে চলে গেছে। তারপর একদিন সকালে ওর অনুপস্থিতির কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কারণ ওর থাবার ছাপের পাশাপাশিই দেখলাম আরেকটি আকারে ছোট, লম্বাটে থাবার ছাপ। যে সঙ্গিনীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল তারই থাবার ছাপ ওটা। আমি একবারই মাত্র বাঘদুটিকে একসঙ্গে দেখেছিলাম—বাচ্চাটা এতদিনে পুরোপুরি বাঘ হয়ে উঠেছে। আমি একটা সেরাও (পাহাড়ী ছাগল) মারতে বেরিয়েছিলাম ভোরের আলো ফোটার আগেই। সেটা থাকত পাহাড়ের পাদদেশে। ঘাস পোড়া পথ দিয়ে ফেরার সময় শাল গাছের ওপর বসা একটা শকুন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

পাখিটা আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে তাকিয়েছিল একটা ছোট্ট আগাছার ঝোপের দিকে। ঝোপটার পরেই ঘন জঙ্গলের বিস্তার। তখনও ঘাসে শিশির জমে আছে, আমি নিঃশব্দে গাছটার কাছে গিয়ে উঁকি মারলাম। একটা মৃত সম্বর হরিণের লতানো পাতানো শিং নিচু ঝোপগুলোর ওপর দিয়ে উঠে আছে। মৃত বললাম কারণ কোনো জীবিত হরিণ ঠিক ওইভাবে শুয়ে থাকতে পারে না। আমার রবার সোলের জুতো পরা পা নিঃশব্দে ও নিরাপদে রাখার মত একটা শ্যাওলা ঢাকা পাথর কাছেই ছিল। তারই ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সম্বর হরিণটা পুরোপুরি আমার নজরে এল। ওটার পেছন দিকটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আর হরিণটার দুপাশে শুয়ে আছে বাঘ আর বাঘিনী। বাঘটা হরিণটার ওপাশে—ওর শুধু পেছনের পা দুটোই দেখা যাচ্ছে। দুটি বাঘই এখন ঘুমোচ্ছে। একটা শুকনো ডাল এড়াবার জন্যে আমাকে যেতে হবে

সোজা দশ ফুট এগিয়ে—তারপর বাঁ দিকে ফুট তিরিশেক গেলেই আমি বাঘটার গলায় গুলি করতে পারব। কিন্তু এত সব চিন্তা করার সময় আমি আমার নীরব দর্শকের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে শকুনটা আমায় দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু প্রথম দশ ফুট পেরনোর আগেই আমি পুরো ওর নজরে এসে গেলাম। আমায় অত কাছাকাছি দেখে ভয় পেয়ে ও ডাল থেকে উড়ে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু ওর ওপরের ডাল থেকে ঝুলন্ত একটা লতা ও খেয়াল করে নি। তারই সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে শকুনটা পড়ল মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যে বাঘিনীটা মড়ি আর ওর সঙ্গীকে একলাফে পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—বাঘটাও কালবিলম্ব না করে ওর সঙ্গিনীর পথ ধরল। গুলি হয়তো করা যেত কিন্তু আহত হয়ে বাঘ সামনের গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিলে ওবই সুবিধে হত বেশি। যাঁরা কখনও চেষ্টা করেন নি তাঁদের আমি অনুরোধ করব মড়ির কাছ বরাবর চিতা বা বাঘের গতিবিধি অনুসরণ করতে। এর থেকে আনন্দের শিকার খুব কমই আছে। কিন্তু এ ধরনের শিকারে গুলিটা করা দরকার খুব সতর্কতা আব সাবধানতার সঙ্গে কারণ জানোয়ারটা এক গুলিতেই মারা না গেলে বা চলচ্ছক্তিহীন না হলে বিপদ আসতে বাধ্য।

এক সপ্তাহ পরেই বাঘটা আবার ফিরে গেল তার একক জীবনে। ওর স্বভাবেও এল কিছু পরিবর্তন। এর আগে আমি যখন ওর মড়ির কাছে গিয়েছি ওর দিক থেকে কোনো বাধা আসে নি কিন্তু ওর সঙ্গিনী চলে যাওয়ার পরে প্রথমবার ওকে অনুসরণ করার সময়েই ও আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ভবিষ্যতে আর ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা আমি যেন না করি। খুব কাছ থেকে কোনো ক্রুদ্ধ বাঘের চাপা গর্জনের মত ভয়াবহ আওয়াজ জঙ্গলে খুব কমই আছে। না শুনলে এটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না।

মার্চের গোড়ার দিকেই বাঘটা ওর প্রথম পূর্ণ বয়স্ক মোষ মারল। একদিন সন্ধেবেলা আমি আছি পাহাড়টার পাদদেশে। হঠাৎ একটা মোষের ভয়ার্ত হাম্বা হাম্বা আওয়াজ একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে মিশে সারা জঙ্গলটা কাঁপিয়ে তুলল। আমি একটা আন্দাজ করে নিলাম—আওয়াজটা আসছে প্রায় ছশো গজ দূরের একটা নালার দিক থেকে। ওদিকে যাওয়ার পথটা বন্ধুর, আলগা পাথর আর কাঁটাঝোপে ভর্তি। আমি একটা খাড়া পাথরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠলাম যেখান থেকে নালাটা পরিষ্কার দেখা যায়। ততক্ষণে মোষটার সব প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেছে আর কোথাও বাঘটার চিহ্নমাত্র নেই। আমি প্রায় এক ঘণ্টা রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রেখে উপুড় হয়ে অপেক্ষা করলাম কিন্তু বাঘটার দেখা পেলাম না। পরদিন সকালে আবার আমি পাথরটা বেয়ে উঠলাম। দেখলাম যেভাবে মোষটাকে কাল দেখে গেছি সেইভাবেই সেটা পড়ে আছে। নরম জমিতে খুরের দাগ আর নখের আঁচড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি ভয়ানক

লড়াই হয়ে গেছে জায়গাটায়। একমাত্র মোষটার ঘাড় ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় বাঘটা ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারে। লড়াইটা চলেছিল অন্তত দশ থেকে পনের মিনিট। বাঘটার থাবার ছাপ নালা পার হয়ে গিয়েছে—সেই ছাপ ধরে এগোতে দেখি একটা পাথরের ওপর একছোপ রক্তের দাগ—তার প্রায় একশো গজ দূরে একটা পড়ে থাকা গাছের ওপরেও কিছুটা রক্ত লেগে রয়েছে। মোষের শিংএ বাঘটা এত জোর চোট খেয়েছে মাথায় যে ওর আর মড়ি সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ নেই। ও মড়ির কাছে আর ফিরেই এল না।

তিন বছর বাদে বাঘটা ওর বাচ্চা অবস্থার শিক্ষা অগ্রাহ্য করে (ওর যুক্তি হতে পারে যে সে সময়টা বাঘ মারার মরসুম শেষ হয়ে আসছিল), অসতর্কভাবে একটা মড়ির কাছে ফিরে যায়। সে মড়ির ওপর বসেছিল এক জমিদার তার প্রজাদের নিয়ে। তাদের গুলিতে বাঘের কাঁধের হাড় ভেঙে যায়। ওকে অনুসরণ করার কোনো চেষ্টা করা হয় নি। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পরে ঘাড় ভর্তি ভনভনে মাছি নিয়ে ও ইন্‌সপেকশন বাংলোর হাতা হয়ে একটা সাঁকো পেরোয়। সাঁকোটার ওধারে দুই সারি ভাড়া বাড়ি। সেসব বাড়ির বাসিন্দারা দরজায় দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখে। বাঘটা পাঁচিল ঘেরা একটা হাতার মধ্যে ঢুকে একটা খালি গুদামে আশ্রয় নেয়। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আসে ওকে দেখার জন্যে। সম্ভবত তাদের দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে বাঘটা যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই হাতাটা পেরিয়ে, আমাদের গেটের সামনে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গ্রামের নিচু অংশটার দিকে চলে যায়। আমাদের এক প্রজার একটা ষাঁড় তার আগের রাতে মারা গিয়েছিল আর সেটার মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রামেরই প্রান্তে একটা ঝোপের মধ্যে। বাঘটা এটা খুঁজে পায় আর কিছুদিন কাটায় ওই ঝোপের মধ্যেই। তেষ্টা পেলে ও জল খেতে যেত একটা জলসেচের খালে।

আমরা যখন দুমাস বাদে পাহাড় থেকে নেমে আসি তখন বাঘটা গ্রামের আশপাশ থেকে ধরা ছোটখাট জন্তু জানোয়ার (বাছুর, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি) খেয়েই বাঁচত। মার্চ নাগাদ ওর কাঁধের ঘাটা সেরে গিয়েছিল কিন্তু ওর ডান পাটা ঘুরে ভেতর দিকে চলে গিয়েছিল। যে জঙ্গলে বাঘটা গুলি খায় পরে সেই জঙ্গলেই সে ফিরে গিয়েছিল আর তার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছিল পাশের গ্রামের গরু মোষের ওপর। নিরাপত্তার জন্যে ও একবারে একটা জানোয়ার মেরে খাওয়ার জন্যে নিয়ে যেতো—তার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ও যা গরু মোষ মারত, এখন মারছিল তার পাঁচগুণ বেশি। যে জমিদার ওকে গুলি করেছিল তারই দুর্ভোগ ছিল সব থেকে বেশি কারণ তার গরু মোষও ছিল প্রায় চারশো।

এর পরের কয়েক বছর ও আকারেও যেমন বাড়ল ওর খ্যাতিও বাড়ল সেই অনুপাতে। বহু শিকারী ওকে মারার নানারকম চেষ্টা করেছিলেন।

নভেম্বর মাসের এক সন্ধেবেলা একজন গ্রামের লোক একটা একনলা গাদা বন্দুক নিয়ে শুয়োর শিকারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। ভাঙাচোরা জমিতে একটা বিশগজ মত চওড়া রোখার মধ্যে (শুকিয়ে যাওয়া ঝরনা) একটা আলগা ঝোপে সে তার মাচা বেঁধেছিল। এই জমিটা ছিল চতুর্ভুজাকার তার চওড়া দিকটায় চাষের ক্ষেত, অন্যদিকে একটা পায়ে চলার পথ। এইদিকে একটা দশ ফুট চওড়া নালা আমাদের চাষের জমি আর জঙ্গলের মধ্যে সীমারেখা ছিল। লোকটার সামনে একটা চারফুট উঁচু আল, তার ওপর দিয়ে গরু ছাগলের পায়ে চলার পথ —আর পেছন দিকে ঘন ঝোপঝাড়। রাত ৮টা নাগাদ ওই পথটার ওপর এসে দাঁড়াল একটা জানোয়ার। লোকটা সাধ্যমত তাক করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি খেয়ে জানোয়ারটা আল থেকে পড়ে গেল তারপর লোকটার কয়েক ফুটের মধ্যে দিয়েই গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল পেছনের ঝোপের মধ্যে। পায়ের কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা দুশোগজ দূরে তার কুঁড়েঘরের দিকে দৌড় দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল। লোকটার বর্ণনা শুনে ওরা ধরে নিল যে শুয়োরটা বেশ ভালই জখম হয়েছে। ওরা স্থির করল শুয়োরটাকে হায়না আর শেয়ালের খাওয়ার জন্যে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। একটা লণ্ঠন জ্বালানো হল তারপর ছজন সাহসী লোকের একটা দল যখন শিকার উঠিয়ে নিয়ে আসার জন্যে তৈরি তখন আমারই এক প্রজা বলল একটা বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই প্রজাটি নৈশ অভিযানে যোগ দিতে রাজী হয় নি কারণ সে আমাকে পরে বলেছিল যে, রাতে ঘন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে আহত শুয়োর খুঁজে বেড়ানোটা ওর খুব মনঃপূত নয়।

অভিযাত্রী দল ওর পরামর্শ মেনে নিল। প্রচুর বারুদের গুঁড়ো ভরা হল বন্দুকের নলে—তারপর কাঠ দিয়ে খুঁচিয়ে বারুদ ভরার সময় কাঠের টুকরোটা ভেতরে আটকে ভেঙে গেল। ঘটনা হিসেবে এটা কিছুই নয় কিন্তু এর জন্যেই ওই ছয় জনের প্রাণ বেঁচেছিল। ভাঙা কাঠের টুকরোটা বহু কষ্টে বার করে বন্দুকে বারুদ ভরে দলটি বেরিয়ে পড়ল।

জানোয়ারটা যেখানে ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিল সে জায়গাটা খুব ভালভাবে খোঁজা হল। রক্তের দাগ দেখার পর শুয়োরটাকে খুঁজে বার করার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা অন্নতন্ন করে খোঁজার পরে ওরা সে রাতের মত ক্ষান্ত দিল। পরদিন সকালে আবার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। এবার দলের সঙ্গে যোগ দিল আমার সেই সংবাদদাতা প্রজাটি। জঙ্গলের ঘোঁচ-ঘাঁচ সে অন্য সকলের থেকে ভাল জানে। একটা ঝোপের নিচে জমিতে অনেকটা রক্ত জমেছিল—ওই মাটিটা পরখ করে ও কয়েকটা রক্তমাখা লোম আমার কাছে নিয়ে এল। আমি দেখেই বুঝলাম লোমগুলি বাঘের। আমার একজন শিকারী সঙ্গী সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, তাকে নিয়ে জমিটা দেখতে বেরোলাম।

মাটির চিহ্ন দেখে জঙ্গলের কোনো ঘটনা মনে মনে পুনর্গঠনের কাজটা আমার চিরদিনই খুব ভাল লাগে। একথা ঠিকই এ কাজে কোনো কোনো অনুমান পরে ভুল প্রমাণিত হয় কিন্তু কিছু কিছু অনুমান ঠিকও হয়। এবারে আমি ঠিকই ধরেছিলাম যে বাঘটা চোট খেয়েছে সামনের ডান পায়ের ভেতর দিকটায় কিন্তু বাঘটার পা ভেঙে গেছে বা বাঘটার বয়েস কম আর এ অঞ্চলে নবাগত—আমার এ ধারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

যেখানে লোমগুলি পাওয়া গিয়েছে তার বাইরে আর রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। কঠিন জমির ওপর অনুসরণ করা অসম্ভব সেই জন্যে আমি নালাটা পেরিয়ে ওপারে গেলাম যেখানে গরু ছাগলের পায়ে চলার পথটা বালির চড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এর ওপর থাবার ছাপ দেখে আমি বুঝলাম বাঘটা মোটেই কম বয়েসী নয়—এ আমার সেই বহু পরিচিত পিপলপানির বাঘ। ঘুব পথ এড়াবার জন্যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসার সময় অন্ধকারে লোকটি ওকে শুয়োর বলে ভুল করে।

এর আগেও একবার জখম হওয়ার পর বাঘটা জনবসতির মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু কোনো মানুষ বা জন্তুর কোনো ক্ষতি করে নি। কিন্তু এখন বাঘটার বয়েস অনেক বেড়েছে। ব্যথায় বা ক্ষিধেতে মরিয়া হয়ে অনেক ক্ষতিই করতে পারে ও। দুশ্চিন্তার কথাই বটে, কারণ এ অঞ্চলটায় জনবসতি খুব ঘন। আমাকেও চলে যেতে হবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কারণ এমন একটা কাজ আছে যেটা পেছিয়ে দেওয়া যাবে না।

তিনদিন ধবে জঙ্গলটাব প্রায চার বর্গমাইল জায়গা, নালাটার থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু বাঘটার কোনো চিহ্ন পেলাম না। চতুর্থ দিন বিকেলবেলা আবার যখন আমি খুঁজতে বেরোচ্ছি তখন দেখা হল একটি বৃদ্ধা ও তাব ছেলের সঙ্গে। ওরা তাড়াতাড়ি জঙ্গল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের কাছেই শুনলাম যে পাহাড়ের পাদদেশের কাছে বাঘটার গর্জন শোনা যাচ্ছে আর জঙ্গলের গরু মোষদের মধ্যে পালাবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। রাইফেল সঙ্গে থাকলে সব সময় আমি একা বেরোই কারণ কোনো জানোয়ারের সঙ্গে আচমকা মোলাকাত হলে রাইফেলই নিরাপদ---আর রাইফেল নিয়ে জঙ্গলেব মধ্যে দিয়ে বেশ নিঃশব্দে চলাও যায়। যাইহ'ক এ যাত্রায় কিন্তু আমি নিয়মের ব্যতিক্রম করলাম। ছেলেটিকেও সঙ্গে নিলাম কারণ ও কোথায় বাঘের ডাক শুনেছে সে জায়গাটা আমাকে দেখাতে খুব উৎসুক।

পাদদেশে পৌছে ছেলেটা আঙুল তুলে একটা ঘন ঝোপ দেখিয়ে দিল। ঝোপটার ওপাশে সেই ঘাস পোড়া পথ যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি আর এদিকে পিপলপানি ঝরনা। ঝরনাটার সমান্তরালভাবে প্রায় একশো গজ দূরে একটা কুড়ি ফুট মত চওড়া গর্ত। গর্তটার এদিকটা খোলামেলা শুধু ঝরনার

কাছাকাছি জায়গাটায় কিছু ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। ঝরনাটার ওদিকটায় বহু ব্যবহৃত একটা পায়ে চলার পথ। পথটার কুড়ি গজ মত দূরে গর্তটার খোলা দিকটায় একটা ছোট গাছ। বাঘটা যদি এই পথ দিয়ে আসে তাহলে ঝোপঝাড়গুলো পেরিয়ে নিশ্চয়ই একবার দাঁড়াবে। তখন আমি গুলি করার সুযোগ পাব। আমি ঠিক করলাম এখানেই দাঁড়াব। ছেলেটাকে গাছে তুলে দিলাম, ওর পাটা ঝুলতে লাগল ঠিক আমার মাথার ওপর। ওকে বলে দিলাম ওপর থেকে বাঘটাকে ও যদি আগে দেখতে পায় তাহলে যেন গোড়ালি দিয়ে সংকেত করে। তারপর গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বাঘের ডাক নকল করে ডাকলাম। আপনি যদি আমারই মত দীর্ঘকাল জঙ্গলে কাটিয়ে থাকেন, তাহলে বাঘিনী যখন তার সঙ্গিনীকে ডাকে, সে ডাকের বর্ণনা আপনাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর যাঁদের অভিজ্ঞতা কম তাঁরা জেনে রাখুন এ ডাক ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এ ডাক শেখার জন্যে খুব লক্ষ করে শুনতে হয় আর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে হয় পুরো মাত্রায়।

আমার সব উৎকণ্ঠা শেষ করে দিয়ে প্রায় পাঁচশো গজ মত দূর থেকে বাঘটার সাড়া এল। আমার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন—তিনদিন রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রেখে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এরপরে প্রায় আধঘণ্টা—একটু কমও হতে পারে তবে সময়টা তখন খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল, আমার ডাক আর তার সাড়া চলতে থাকল। একদিকে রাজার গুরুগম্ভীর আদেশ, অন্যদিকে তার প্রণয়িনীর সলজ্জ উত্তর। ছেলেটি এর মধ্যে বার দুয়েক সংকেত করেছিল কিন্তু তখনও আমি বাঘটিকে দেখতে পাই নি। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো যখন জঙ্গলটাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে তখন সেই পথ ধরে বাঘটা খুব দ্রুতগতিতে এল। ঝোপটা পেরনোর পরেও কিন্তু একমুহূর্তও দাঁড়ায় নি ও। ও যখন গর্তটা আধাআধি পেরিয়েছে আর আমিও রাইফেল তুলছি তখন ও হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমি যখন দাঁড়াবার জায়গাটা বেছে নিই তখন এ সম্ভাবনার কথা আমার খেয়াল ছিল না, বাঘটাকে এত কাছে আসতে দিতে আমি চাই নি। এখন বাঘটাকে গুলি করা চলে একমাত্র মাথায় কিন্তু এত কাছ থেকে তা করতে আমি রাজী নই। বহুদিন আগে শেখা আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ দেয় এমন একটা কৌশল করে বাঘটাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম—কোনো বিপদের আভাস ও পায় নি। একটা থাবা তুলে ও আস্তে আস্তে মাথাটা ওঠাল—ওর বুক আর গলা তখন খোলা। ভারি বুলেটের ধাক্কায় ও কোনোরকমে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল, অন্ধের মত জঙ্গল ভেদ করে তীব্রগতিতে কিছুটা ছুটে গেল তারপর আছড়ে পড়ল সেই জায়গাটারই কয়েক গজ দূরে যেখানে কোন এক নভেম্বরের সকালে একটা চিতল হরিণের ডাক শুনে গিয়ে আমি প্রথম তার থাবার ছাপ দেখি।

তারপরেই আমি বুঝতে পারলাম বাঘটাকে একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মারা হয়েছে। যে ক্ষতটা আমি ভেবেছিলাম, ওকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে সেটা পরখ করে দেখলাম প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ক্ষতটা হয়েছিল একটা সীসের ছররায় ওর সামনের ডান পায়ের একটা শিরা কেটে যাওয়ায়।

এই শিকারে সাফল্য আমাকে আনন্দ দিয়েছিল প্রচুর কারণ বাঘটা লম্বায় প্রায় দশ ফুট তিন ইঞ্চি আর ওর শীতকালীন চামড়াও ছিল চমৎকার অবস্থায়। কিন্তু একটা দুঃখও ছায়া ফেলেছিল এই আনন্দের ওপর। আর কোনোদিন আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে পাহাড়ের পাদদেশ কাঁপানো ওর গুরুগম্ভীর গলার গর্জন শুনতে পাব না, আর কোনোদিন জন্তু-জানোয়ারদের চলার পথে দেখতে পাব না ওর বহু পরিচিত থাবার ছাপ—যে পথ ধরে আমাদের দুজনেরই দীর্ঘ পনের বছরের আনাগোনা।

থাকের মানুষখাকী

লাধিয়া উপত্যকায় বহু মাস ধরে শান্তি বিরাজ করছিল কিন্তু ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে নৈনিতালে একটা সংবাদ এল যে কোটাকিন্দ্রী গ্রামে একটি বার বছরের মেয়ে বাঘের হাতে মারা পড়েছে। যে খবরটি আমার কাছে বনবিভাগের ডোনাল্ড স্টুয়ার্ট মারফত এল তাতে বিস্তারিত কিছুই জানা গেল না। কয়েক সপ্তাহ বাদে সেই গ্রামটিতে যাওয়ার পরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানলাম। মনে হয় একদিন দুপুরবেলা মেয়েটি গ্রামটির কাছেই; আর গ্রাম থেকে পরিষ্কার দেখা যায় এমন একটা আম গাছের নিচে ঝড়ে-পড়া আম কুড়োচ্ছিল—এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটা বাঘ এসে উপস্থিত হয়। যারা আশেপাশে কাজ করছিল তারা কোনো সাহায্যে আসার আগেই বাঘটা মেয়েটিকে নিয়ে চলে যায়। বাঘটার পিছু নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। আমি ঘটনাস্থলে পেঁছিনোর বহু আগেই রক্তের এবং শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার সব দাগই ধুয়ে মুছে গিয়েছিল ফলে বাঘটা যে মেয়েটিকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা আমি খুজে পেলাম না।

কোটাকিন্দ্রী. চুকার চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আর থাক থেকে সোজা তিন মাইল পশ্চিমে। কোটাকিন্দ্রী আর থাকের মধ্যের উপত্যকাতেই গত এপ্রিলে চুকার মানুষখেকোকে গুলি করা হয়েছিল। ৩৮ সালের গরমকালের মধ্যে বনবিভাগ থেকে এ অঞ্চলের সব গাছগুলি কাটার জন্যে চিহ্নিত হয়। কিন্তু একটা আশঙ্কা ছিল যে নভেম্বর নাগাদ যখন গাছ কাটা শুরু হওয়ার কথা তার মধ্যেই যদি মানুষখেকোটার কোনো ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে ঠিকাদাররা

মজুর সংগ্রহ করতে পারবে না ফলে তাদের সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এই সূত্রেই ডোনাল্ড স্টুয়ার্ট মেয়েটি মারা পড়ার অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে লেখেন। আমি যখন তাঁর অনুরোধে কোটাকিন্দ্রী যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই তখন স্বীকার করতেই হবে যে ঠিকাদারদের স্বার্থরক্ষার থেকেও স্থানীয় লোকদের উপকারে আসাই আমার কাছে বেশি জরুরী মনে হয়েছিল।

আমার পক্ষে কোটাকিন্দ্রী যাওয়ার সবচেয়ে সোজা রাস্তা ছিল রেলে টনকপুরে যাওয়া, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কালধুঙ্গা আর চুকা হয়ে যাওয়া। এই পথে গেলে আমার একশো মাইল রাস্তা বাঁচবে বটে কিন্তু আমাকে যেতে হবে উত্তর ভারতের সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে। এই অঞ্চলটা এড়াবার জন্যে আমি স্থির করলাম পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে মৌরনৌলা পর্যন্ত যাব—সেখান থেকে পরিত্যক্ত রাস্তা শেরিং রোড দিয়ে সোজা চলে যাব যেখানে কোটাকিন্দ্রীর ওপরে পাহাড়ে রাস্তাটি শেষ হয়েছে সেখান পর্যন্ত।

আমার এই দীর্ঘ পদযাত্রার প্রস্তুতি যখন চলছে, নৈনিতাল থেকে দ্বিতীয় সংবাদ এল যে লাধিয়া উপত্যকার বাঁ দিকে, চুকার থেকে আধ মাইল দূরে সেম নামে ছোট্ট একটি গ্রামে বাঘের হাতে আরেকজন প্রাণ হারিয়েছে।

এবারে বাঘের শিকার হয়েছে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক—সেম গ্রামেরই মোড়লের মা। এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি মারা পড়ে দুটি থাক করা ধাপকাটা খেতের মধ্যেকার খাড়া পাড়ে ঝোপ কাটার সময়। সে ঝোপ কাটতে আরম্ভ করে পঞ্চাশ গজ লম্বা পাড়ের অন্য প্রান্ত থেকে। ঝোপ কাটতে কাটতে এগিয়ে সে যখন নিজের কুঁড়েঘরের গজখানেকের মধ্যে এসে পড়েছে তখন ওপরের মাঠ থেকে বাঘটা ওর ওপরে লাফ দেয়। আক্রমণটা এত আশাতীত আর এত অতর্কিতে হয়েছে যে বাঘটা ওকে মেরে ফেলার আগে স্ত্রীলোকটি শুধু একবার চিৎকার করার সময় পায়। বাঘটি ওকে নিয়ে বার ফুট উঁচু পাড়ে উঠে, ওপবের মাঠটা পেরিয়ে দূরের গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওর ছেলে, প্রায় বছর কুড়ি বয়েস, সেই সময় কয়েক গজ মাত্র দূরে একটা ধান খেতে কা করছিল। সে পুরো ঘটনাটা দেখতে পায় কিন্তু সে এত ভয় পেয়েছিল যে কোনো সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে নি। ছেলেটির জরুরী আবেদনে দুদিন পরে সেম গ্রামে পাটোয়ারী এসে পৌঁছয়—তার সঙ্গে সংগ্রহ করা জনা আশি লোক। বাঘটা যেদিকে গিয়েছে সেই দিকটি অনুসরণ করে সে স্ত্রীলোকটির জামাকাপড় আর কয়েক টুকরো হাড় কুড়িয়ে পায়। এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বেলা দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে—আর বাঘটা তার শিকার খায় যে কুঁড়েঘরের কাছে স্ত্রীলোকটিকে মেরেছিল তার মাত্র ষাট গজের মধ্যেই।

এই দ্বিতীয় সংবাদটি পৌঁছনোর পর আলমোড়া, নৈনিতাল আর গাড়োয়াল এই তিনটে জেলার ডেপুটি কমিশনার ইবটসন আর আমি এক যুদ্ধকালীন

পরামর্শ-বৈঠকে বসলাম। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইবটসন তাঁর তিব্বত সীমান্তে আসকটে একটা জমি-বিরোধের নিষ্পত্তি করতে যাওয়া স্থগিত রাখলেন। তিনি সেখানে বেরনোর জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। ঠিক ছিল তিনি বাগাশ্বর হয়ে আসকটে যাবেন কিন্তু নতুন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হল তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে যাবেন সেম-এ সেখানে থেকে আসকটে রওনা হবেন।

যাত্রার জন্যে যে পথটি আমি বেছে নিয়েছিলাম সেটা পাহাড়ের চড়াইয়ে ভরা তাই শেষে ঠিক হল আমরা নান্‌ধাউর উপত্যকা দিয়ে যাব, নান্‌ধাউর আর লাধিয়ার মধ্যের জলধারা অতিক্রম করে লাধিয়া নদীর ধার দিয়ে দিয়ে সেম গ্রামে পেঁছিব, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইবটসনরা নৈনিতাল ছাড়লেন ১২ই অক্টোবর, তারপর দিন আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম চৌরগল্লিয়ায়।

নান্‌ধাউর নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের পথচলা আর মাছধরা একই সঙ্গে চলতে থাকল। ট্রাউট মাছ ধরার হাল্কা ছিপে, যেদিন আমরা সবচেয়ে বেশি মাছ ধরি, সেদিন ধরেছিলাম একশো কুড়িটি মাছ। পঞ্চম দিনে আমরা পেঁছিলাম দুর্গা পেপল-এ। এখানে নদীর গতিপথ ছেড়ে আমরা একটা খুব খাড়া চড়াইয়ে উঠে রাত কাটালাম নদীটিরই ওপরে। পরদিন সকালে খুব ভোরে যাত্রা করে সে রাতে আমরা চালতি থেকে বার মাইল দূরে লাধিয়ার বাঁ পাড়ে তাঁবু খাটালাম।

সেবার আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বর্ষা তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কারণ পাহাড়ের পাথরে গাগুলো খাড়া উপত্যকায় নেমে যাওয়ার দরুন প্রায় প্রত্যেক সিকি মাইল অন্তর আমাদের নদীটা পেরোতে হচ্ছিল। এইরকমভাবে পার হতে গিয়ে আমাদের পাচক, যে জুতোসুদ্ধ পাঁচফুটের বেশি লম্বা হবে না একবার প্রায় ভেসে যাচ্ছিল। তার সলিল সমাধিই হত, যদি না আমাদের খাবারের ঝুড়ি যে লোকটি বহন করছিল সে তৎক্ষণাৎ সাহায্য করত।

চৌরগল্লিয়া ছাড়ার দশদিন পরে আমরা সেই গ্রামের এক নির্জন মাঠে তাঁবু ফেললাম। মাঠটি, যে কুঁড়েঘরের কাছে স্ত্রীলোকটি মারা পড়েছিল তার থেকে দুশো গজ দূরে। লাধিয়া আর সারদা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে মাঠটির দূরত্ব হবে একশো গজ মতন।

পুলিস বিভাগের গিল ওয়াভেল, যাঁর সঙ্গে লাধিয়া দিয়ে আসার সময়ে আমাদের দেখা হয়েছিল, বেশ কয়েকদিন ধরে সেম্-এ ক্যাম্প করেছিলেন। বনবিভাগের ম্যাকডোনাল্ড আমাদের অনুগ্রহ করে একটা মোষ দিয়েছিলেন। সেটা বেঁধে অপেক্ষা করেছিলেন গিল ওয়াভেল। ওয়াভেল থাকাকালীন বাঘটা বেশ কয়েকবার সেম্-এ এসেছিল কিন্তু মোষটা মারে নি!

সেম্-এ পেঁছনোর পরদিন ইবটসন যখন পাটোয়ারী, বনরক্ষী, আশপাশের গ্রামের গ্রাম-মোড়লদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শুরু করলেন আমি বেরোলাম বাঘের

থাবার ছাপের খোঁজে। আমাদের ক্যাম্প আর নদীর সঙ্গমের মধ্যে, আর লাধিয়া নদীর দুই পাড়ে লম্বা লম্বা বালির চড়া। এই বালির ওপরে আমি একটা বাঘিনীর থাবার ছাপ দেখলাম—সেই সঙ্গে একটি কম বয়সী পুরুষ বাঘের ছাপও দেখা গেল। সম্ভবত এটা সেই বাচ্চাটির থাবার ছাপ যাকে আমি এপ্রলে দেখেছিলাম। বাঘিনীটা লাধিয়া নদী বেশ কয়েকবার এপার ওপার করেছে গত কয়েক দিনে আর গত রাতে আমাদের তাঁবুর সামনের এক ফালি বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। গ্রামের লোকের ধারণা বাঘিনীটাই মানুষ-খেকো। গ্রামের সর্দারের মা মারা পড়ার পর বাঘিনীটা গ্রামে বারে বারে ফিরে এসেছে। সেইজন্যে তাদের সন্দেহ অমূলক নাও হতে পারে।

বাঘিনীটার থাবার ছাপ পরীক্ষা করে বোঝা গেল সে আকারে সাধারণ মাপের আর বয়সে যুবতী। কেন সে মানুষখেকো হল, তা পরে বের করা যাবে। কিন্তু গত বছর সঙ্গমের মরসুমে সে ছিল চুকা মানুষখেকোর সঙ্গে, তখন নিশ্চয়ই চুকা মানুষখেকোর শিকার খেতে ও তাকে সাহায্য করত। এই-ভাবে নরমাংসে ওর রুচি জন্মায় কিন্তু ওর কোনো সঙ্গী ছিল না যে ওর রসনা পরিতৃপ্ত করতে সাহায্য করতে পারে। কাজে কাজেই ওকে নিজেকেই মানুষখাকী হতে হয়েছে। এটা আমার ধারণা মাত্র এবং কিন্তু পরে এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

নৈনিতাল ছাড়ার আগে আমি টনকপুরের তহশীলদারকে লিখেছিলাম আমার জন্যে চারটি বাচ্চা পুরুষ মোষ কিনে সেম্-এ পাঠিয়ে দিতে; চারটি মোষের মধ্যে একটি পথেই মারা যায় আর অন্য তিনটি এসে পেঁছয় ২৪শে। আমরা ওই তিনটি মোষ আর ম্যাকডোনাল্ড যেটি আমাদের দিয়েছিলেন সব কটি একত্রে সেইদিনই সন্ধেবেলায় বাইরে বেঁধে দিয়েছিলাম। পরদিন সকালে যখন আমি জন্তুগুলিকে দেখতে গিয়েছি—দেখি চুকার অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। গ্রামের আশপাশের জমিগুলিতে সদ্য লাঙল দেওয়া হয়েছে। তিনটি পরিবার ওই চষা জমিতে তাদের গরু মোষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। বাঘিনীটি গতরাতে তাদের খুব কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে। তাদের ভাগ্য ভাল কারণ প্রতিবারই গরু মোষগুলি বাঘিনীকে দেখতে পেয়ে ঘুমন্ত লোকজনদের সাবধান করে দিয়েছে। চষা জমি পেরিয়ে বাঘিনীটি কোটাকিন্দ্রীর পথ ধরে চলে গিয়েছে। যাওয়ার পথে আমাদের দুটি মোষের খুব কাছ দিয়ে গিয়েছে সে কিন্তু দুটির একটিকেও স্পর্শ করে নি।

আমরা সেম্-এ পেঁছনোর পরে পাটোয়ারী, বনরক্ষী এবং গ্রামবাসীরা আমাদের বুঝিয়েছিল যে মোষ বেঁধে রাখা শুধু সময়ের অপব্যয় হবে কারণ ওদের দৃঢ় ধারণা মানুষখাকী ওগুলো মারবে না। কারণ হিসেবে ওরা বলেছিল এভাবে মানুষখাকীটিকে মারার চেষ্টা আগেও অনেকে করেছে কিন্তু কোনো ফল

হয় নি—আর মানুষখাকীটা যদি মোষই খেতে চায় তাহলে জঙ্গলে বহু মোষ চরে বেড়াচ্ছে, যে কোনো একটা বেছে নিলেই হল। ওদের উপদেশ সত্ত্বেও আমরা কিন্তু মোষ বাঁধা বন্ধ করলাম না। এর পরের দু রাত বাঘিনীটা একটি বা একাধিক মোষের খুব কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু কাউকে স্পর্শ করে নি।

১৭ই সকালে আমরা যখন প্রাতরাশ সারছিলাম, থাকের মোড়লের ভাই তেওয়ারীর নেতৃত্বে একদল লোক ক্যাম্পে এসে পৌঁছল আর খবর দিল যে তাদের গ্রামের একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা বলল লোকটি গতকাল দুপুরে বেরিয়েছিল—যাওয়ার আগে স্ত্রী-কে বলে গিয়েছিল যে ওর গরু মোষ যাতে গ্রামের সীমানার বাইরে না চলে যায় তাই দেখতে যাচ্ছে ও। ওর না ফেরা দেখে মনে হচ্ছে মানুষখাকীর হাতে মারা পড়েছে লোকটি।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম এবং দশটা নাগাদ ইবটসনদের সঙ্গে আমি থাকের দিকে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে রইল তেওয়ারী আর তার দলবল। দূরত্ব মাত্র দুমাইল হলে কি হবে চড়াইটা ভয়ানক খাড়া, আর আমরাও চেষ্টা করছিলাম কোনো সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে তাই আমরা যখন গ্রামের সীমানায় পৌঁছলাম তখন দলের সবাই হাঁপাচ্ছি, আমাদের গায়ে যেন ঘামের ফেনা ছুটছে।

আমরা যখন ঝোপে ঢাকা সমতল জমির টুকরোটার ওপর দিয়ে গ্রামের দিকে এগোচ্ছি তখন একটি স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলাম। এই সমতল ভূমিটির কথা যুক্তিসংগত কারণেই পরে আমি উল্লেখ করেছি। কোনো ভারতীয় স্ত্রীলোক যখন মৃতের শোকে চিৎকার করে কাঁদে তখন সে আওয়াজ ভুল করার উপায় নেই। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমরা শোকার্ত স্ত্রীলোকটির কাছে এলাম। যে লোকটি নিখোঁজ হয়েছে তারই স্ত্রী মেয়েটি। চষা জমির পাড়ে আরও দশ পনেরজন লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এই লোকগুলি আমাদের জানাল যে ওপরে তাদের বাড়ি থেকে তারা সাদা কিছু একটা দেখতে পেয়েছে, সেটা নিখোঁজ লোকটির কাপড় বলেই তাদের মনে হয়েছে। যেখানে তারা দেখতে পেয়েছে সে জায়গাটি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা ঘন ঝোপে ভরা জমিতে। ইবটসন, তেওয়ারী আর আমি সাদা জিনিসটার তল্লাসে বেরোলাম, মিসেস ইবটসন স্ত্রীলোকটিকে এবং অন্যান্য লোকাজনদের নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

মাঠটিতে কয়েক বছর চাষবাস হয় নি—মাঠটি এক জাতীয় ঘন ঝোপে ঢাকা, সে ঝোপের গাছগুলি অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা গাছের মত। আমরা যখন সাদা জিনিসটার প্রায় ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তখন তেওয়ারী জিনিসটি নিখোঁজ মানুষটির ধুতি বলে চিনতে পারল। তার কাছেই পড়েছিল লোকটির টুপি।

জায়গাটায় একটা লড়াই হয়ে গেছে বোঝা গেল কিন্তু কোথাও কোনো রক্তের চিহ্ন নেই। যেখানে প্রথম আক্রমণ হয়েছিল সেখানে আর যেখান দিয়ে লোকটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারও বেশ খানিকটা জায়গায় রক্তের দাগ না থাকার মানে বাঘটা লোকটিকে প্রথমে কামড়ে যে জায়গাটায় ধরেছিল সেখান থেকে দাঁত সরায় নি। কামড়ের জায়গা পরিবর্তন না করলে রক্ত পড়ার কথা নয়।

পাহাড়ে, আমাদের তিরিশ গজ ওপরে লতায় ঢাকা ঝোপের ভিড়। লোকটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন অনুসরণ করার আগে এই জায়গাটা ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে কারণ বাঘিনীটাকে আমাদের পেছনে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। ঝোপের নিচে নরম মাটির ওপর আমরা বাঘিনীটার থাবার ছাপ দেখলাম। লোকটিকে আক্রমণ করার আগে এই জায়গাটিতেই বাঘিনীটা ওঁত পেতে ছিল।

আগেকার জায়গাটিতে ফিরে গিয়ে আমরা নিম্নলিখিত কার্যসূচী গ্রহণ করলাম। আমাদের প্রধান কাজ হল বাঘিনীটাকে অনুসরণ করে মড়ির ওপর ওকে গুলি করা। এর জন্যে আমাকে যেতে হবে চিহ্ন অনুসরণ করে আর একই সঙ্গে নজর রাখতে হবে সামনের দিকে। তেওয়ারী, যার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না সে থাকবে আমার একগজ পেছনে আর তার কাজ হবে ডাইনে বাঁয়ে তীক্ষ্ণ লক্ষ রাখা। ইবটসন থাকবেন তেওয়ারীর একগজ পেছনে—তাঁর দায়িত্ব থাকবে পেছনের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করার। আমি বা ইবটসন যদি বাঘিনীর একটা কেশাগ্রও কোথাও দেখতে পাই তাহলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আমাদের গুলি ছুঁড়তে হবে।

এই জায়গাটায় গতকাল গরু চরেছিল ফলে জমির অবস্থা ভাল নয়। কোনো রক্তের দাগ ছিল না, বাঘটার যাওয়ার একমাত্র চিহ্ন ছিল কোথাও কোথাও উল্টে থাকা পাতায় বা পায়ে মাড়ানো ঘাসে। তাই আমাদের অনুসরণের কাজটাও এগোচ্ছিল খুব ধীর গতিতে। লোকটিকে দুশো গজ মতন নিয়ে গিয়ে বাঘিনীটি তাকে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল আবার কয়েক ঘন্টা পরে এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই থাকের লোকেরা এইদিক থেকে কয়েকটি সম্বরের ডাক শুনতে পেয়েছিল। লোকটিকে মারার পরই না-নিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে লোকটির গরু মোষগুলি এই আক্রমণ দেখেছিল। তারাই হয়তো বাঘিনীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

লোকটি যেখানে পড়েছিল সে জায়গাটা রক্তে ভেসে গিয়েছিল। বাঘিনীটি আবার যখন লোকটিকে তুলে নিয়ে যায় তখন গলার জখম দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বাঘিনীটি প্রথমে লোকটিকে ধরে গলায়, এবার ধরেছিল পিঠে তাই অনুসরণের কাজটা আমাদের পক্ষে আরও শক্ত হয়ে উঠল। বাঘিনীটি পাহাড়ের ঢাল ছাড়ে নি—এখানে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিড়, দুএক গজের

বেশি দূরে দেখাই যায় না তাই আমাদের গতিও ক্রমে মন্থর হয়ে এল। দুঘন্টায় আমরা আধমাইল রাস্তা পেরিয়ে একটা ঢালের ওপর পেঁছিলাম। এই ঢালটির পরেই সেই উপত্যকাটি যেখানে ছ মাস আগে আমরা চুকার মানুষখেকো বাঘটার খোঁজ পেয়েছিলাম আর মেরেও ছিলাম। এই ঢালটির ওপরে একটা বিশাল উধর্বমুখী পাথর অর্থাৎ আমরা যেদিক থেকে এসেছি পাথরটির মুখ তার বিপরীত দিকে। বাঘিনীটির থাবার ছাপ চলে গেছে পাথরটার ডান দিক ঘেঁষে– আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল বাঘিনীটা পাথরের ঝুঁকে পড়া অংশটার নিচে অথবা তারই আশেপাশে লুকিয়ে আছে।

ইবটসন আর আমি দুজনেই হাল্কা রবার সোলের জুতো পরেছিলাম, তেওয়ারী ছিল খালি পায়ে—সেইজন্যে আমরা পাথরটার কাছে পেঁছিলাম নিঃশব্দে। ইসারায় আমার সঙ্গী দুজনকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ন নজর রাখতে বলে আমি পাথরটার ওপর কোনোক্রমে একটা পা রেখে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে গেলাম। পাথরটার পরেই ছোট্ট কিছুটা সমতল জমি—জমিটা যতই আমার দৃষ্টির সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে ততই আমার মনে হতে লাগল বাঘিনীটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে এ সন্দেহ আমার অমূলক নয়। আরো দুএক ফুট গেলে আমি জমিটার পুরোটা দেখতে পাব এমন সময় আমার সামনে বাঁ দিকে একটা নড়াচড়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটি সোনালী-ডাঁটা গাছ চেপে রাখা হয়েছিল সেটা যেন হঠাৎ স্প্রিংয়ের মত সোজা হয়ে উঠল—তার এক মুহূর্তের মধ্যে দূরের ঝোপটা একটু নড়ে উঠল আর ঝোপগুলির ওধারে একটা গাছ থেকে একটা বাঁদর ডাকতে শুরু করল।

বাঘিনীটা তার খাওয়ার পর ঘুমনোর জায়গাটা বেছেছিল খুব সযত্নে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঘুমিয়ে পড়ে নি, পাথবের ওপর আমার মাথার ওপরটা দেখতে পেয়ে—টুপিটা আমি আগেই খুলে নিয়েছিলাম—ও উঠে দাঁড়ায় এবং একটু পাশে সরে গিয়ে একটা ব্ল্যাকবেরি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ও যদি অন্য কোথাও শুয়ে থাকত তাহলে ও যত তাড়াতাড়িই চলুক না কেন আমি গুলি করার আগে ও কিছুতেই সরে যেতে পারত না। আমাদের এত সযত্ন পরিকল্পিত অনুসরণ একেবারে শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেল। এখন মড়িটা খুঁজে বের করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই আর দেখতে হবে আমাদের বসার মত মড়িটার যথেষ্ট অবশিষ্ট আছে কিনা। ব্ল্যাকবেরি ঝোপের মধ্যে ওকে অনুসরণ করা বৃথা আর তাতে ওকে পরে গুলি করার সুযোগও কমে যাবে।

বাঘিনীটা যেখানে শুয়েছিল তার কাছেই সে তার খাওয়া সেরেছে। জায়গাটা খোলা আকাশের নিচে শকুনদের নজরে আসার মত। সেইজন্যে সে তার মড়িটি সরিয়ে রেখেছে একটা নিরাপদ জায়গায় যেখানে আকাশ থেকে কিছু দেখা যাবে না। এখন অনুসরণ করা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে কারণ

একটা রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই চিহ্ন ধরে গিয়ে আমরা পৌঁছলাম একটা বিরাট বিরাট পাথরের ঢিবিতে। এই পাথরগুলির পঞ্চাশ গজ দূরেই আমরা মড়িটা দেখতে পেলাম।

ওই ছিন্নভিন্ন ক্ষতবিক্ষত রক্ত মাংসের তালের বর্ণনা দিয়ে আমি আপনাদের অনুভূতির ওপর অত্যাচার করতে চাই না। যে লোকটি কয়েক ঘণ্টা আগেই ছিল একজন মানুষ, দুই সন্তানের জনক, ওই শোকার্ত স্ত্রীলোকটিকে রোজগার করে খাওয়ানো পরানোর কর্তা তার শরীর সম্পূর্ণ নগ্ন, একটুকরো সুতো কোথাও নেই, মানুষের শরীরের সবটুকু মর্যাদা যেন তার শরীর থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রীলোকটিকে এখন মেনে চলতে হবে ভারতীয় বৈধব্যের কঠোর অনুশাসন, সারা জীবন এর থেকে আর মুক্তি নেই। আমি এরকম দৃশ্য, আমার বত্রিশ বছরের মানুষখেকো শিকারের জীবনে অনেক দেখেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে দুঃস্বপ্নের মত ওই একতাল মাংসপিণ্ড দেখে সবাই কষ্ট পাওয়ার থেকে শিকার আর ঘাতককে এক জায়গায় ছেড়ে দিলেই ভাল হত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খুনের বদলা খুন এই সহজাত প্রতিশোধ স্পৃহাই জয়ী হত, এছাড়াও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত আশপাশের গ্রামগুলিকে— যে সন্ত্রাসের থেকে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না এমন একটা সন্ত্রাস মুক্ত করার বাসনা। আর যতই উদ্ভট হ'ক না কেন একটা আশা সব সময়েই থাকে যে কোনো অলৌকিক শক্তির জোরে বাঘের শিকার হয়তো এখনও বেঁচে আছে, হয়তো ওর শুশ্রূষার প্রয়োজন।

যে জানোয়ার সম্ভবত মড়ির ওপর জখম হয়ে মানুষখেকো হয়েছে তাকে মড়ির কাছে গুলি করার সুযোগ মেলে না বললেই চলে। তাকে মারার চেষ্টা যতই ব্যর্থ হয় সে যে ভাবেই হ'ক্‌না কেন, জানোয়ারটিও হয়ে ওঠে সেই পরিমানে সতর্ক। এর পরে একটা সময় আসে যখন একবার খেয়েই জানোয়ারটি মড়ি ছেড়ে চলে যায় অথবা ছায়ার মত নিঃশব্দে ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় প্রতিটি ডাল-পাতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে আসে কারণ ও নিশ্চিত জানে যে তার হবু ঘাতক যতই সাবধানে লুকোক, যতই নিঃশব্দ, নিশ্চল হয়ে থাকুক ও তাকে খুঁজে বার করবেই, এরকম ক্ষেত্রে গুলি করার সুযোগ মেলে লাখে একটা কিন্তু সুযোগ এলে আমাদের মধ্যে কেউ ছাড়বে কি ?

যে ঝোপটার মধ্যে বাঘিনীটা আশ্রয় নিয়েছিল সেটার আয়তন হবে প্রায় চল্লিশ বর্গ গজ। বাঁদরটার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওর পক্ষে এই ঝোপ পেরিয়ে যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। আর বাঁদরটা ওকে দেখলেই আমাদের হুঁশিয়ারী দেবে, সেইজন্যে আমরা পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসলাম ধূমপান করতে আর জঙ্গল আমাদের আরো কি শোনায় তা শোনার জন্যে। এর মধ্যেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য কি।

মাচা তৈরি করতে হলে আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে আর সেই ফাঁকে বাঘিনী নিশ্চয়ই মড়িটা তুলে নিয়ে যাবে। যখন সে পুরো মানুষটাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই তাকে অনুসরণ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল আর এখন যখন ওর ভার অনেক কমে গেছে এবং ও বাধা পেয়েছে তখন ও হয়তো মাইলের পর মাইল চলে যাবে--আমরা হয়তো মড়িটা আর খুঁজেই পাব না। সেই জন্যেই আমাদের মধ্যে একজনের মড়িটার কাছে থাকা দরকার, অন্য দুজন দড়ির খোঁজে গ্রামে যেতে পারে।

ইবটসন ও'র স্বাভাবিক বেপরোয়া সাহসে গ্রামে যেতে চাইলেন। আমরা যে কঠিন রাস্তা দিয়ে সদ্য এসেছি সেটা এড়াবার জন্যে তিনি যখন তেওয়ারীর সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেলেন, আমি মড়ির কাছে একটা ছোট্ট গাছের ওপর চড়ে বসলাম। মাটির ওপর চারফুট মত উঠে গাছটা দুইভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে তারই একটিতে হেলান দিয়ে, অন্যটিতে পা রেখে কোনোক্রমে আমি বসলাম। আমার বসার জায়গাটির যা উচ্চতা তাতে বাঘিনী মড়ির দিকে এগোলে ওকে দেখা যাবে। আর ওর যদি আমাকে আক্রমণ করাব কোনো মতলব থাকে তাহলে আক্রমণের দূরত্বে আসার আগেই আমি ওকে দেখতে পাব।

ইবটসন যাওয়ার পর পনের কুড়ি মিনিট কেটেছে হঠাৎ আমি শুনলাম একটা পাথর সামনে-পেছনে টলে যাওয়ার শব্দ। বোঝাই যাচ্ছে পাথরটা খুব দুর্বল ভারসাম্য নিয়ে কোনো রকমে আটকে ছিল। বাঘিনী যখন ওটার ওপরে তার ভার দিয়েছে তখন পাথরটা সামনের দিকে টলে গেছে টের পেয়েই বাঘিনী পা সরিয়ে নিয়েছে আর পাথরটা আবার ফিরে এসেছে যথাস্থানে। আমার সামনে বাঁ দিকে প্রায় কুড়িগজ দূর থেকে শব্দটা এসেছিল—আমার পক্ষে গাছ থেকে পড়ে না গিয়ে একমাত্র ওই একটা দিকেই গুলি করা সম্ভব।

সময় গড়িয়ে চলল—প্রতি মুহূর্তে আমার উচ্চ গ্রামে বাঁধা আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। স্নায়ুর উত্তেজনা আর ভারি রাইফেলটার ভার যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ আমার কানে এল ঝোপের ওপর দিক থেকে একটা ডাল ভাঙার শব্দ। বাঘ কি ভাবে জঙ্গল দিয়ে চলতে পারে এটা তারই একটা উদাহরণ। আওয়াজটা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঠিক কোথায় ও আছে, আমার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল সেই দিকে কিন্তু তা সত্ত্বেও ও এসেছে, আমায় দেখেছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ করেছে তারপর চলে গেছে—অথচ একটি পাতা কিংবা একটা ঘাসের শীষ পর্যন্ত আমি নড়তে দেখি নি।

স্নায়ুর ওপর ভার যখন হঠাৎ কমে যায় তখন ব্যথায় আড়ষ্ট মাংসপেশীগুলি একটু আরাম চায়। এক্ষেত্রে তার মানে রাইফেলটা হাঁটুর ওপর নামিয়ে কাঁধের ও হাতের পেশীগুলিকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়া। যত সামান্যই হ'ক না কেন এই একটু নড়াচড়াতেই আমার সারা শরীরটা যেন একটু আরাম পেল। বাঘিনীটার

দিক থেকে আর কোনো আওয়াজ এল না, তার এক কি দুই ঘণ্টা পরে আমি শুনলাম ইবটসন ফিরে আসছেন।

আমি যতজনের সঙ্গে শিকারে গিয়েছি তার মধ্যে ইবটসনের মত সঙ্গী আর আমি কখনও পাই নি। ওঁর যে শুধু অসাধারণ সাহস তাই নয়, ওঁর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের দিকে লক্ষ সবচেয়ে বড় কথা, যাঁরা শিকার করতে যান তাঁদের মধ্যে ইবটসনের মত স্বার্থবোধহীন লোক বড় একটা দেখা যায় না। উনি গিয়েছিলেন শুধু দড়ি আনতে কিন্তু যখন ফিরে এলেন তখন ওঁর সঙ্গে কম্বল, কুশন, আমি যা খেতে পারি তার থেকেও ঢের বেশি চা আর প্রচুর পরিমাণে দুপুরের খাবার। আমি একটু চাঙ্গা হওয়ার জন্যে বসলাম মড়িটার যে দিক থেকে হাওয়া বইছে সেই দিকটায়। ইবটসন বাঘিনীর লক্ষ বিভ্রান্ত করার জন্যে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে একটা গাছের ওপর একজন লোক উঠিয়ে দিলেন আর নিজে উঠলেন মড়িটার ওপর একটা গাছে দড়ির মাচা তৈরি করতে।

মাচা তৈরি হয়ে গেলে ইবটসন মড়িটাকে কয়েক ফুট সরিয়ে দিলেন- কাজটা খুব আনন্দদায়ক হয় নি নিশ্চয়ই। তারপর একটা চারাগাছের গোড়ায় মড়িটাকে খুব শক্ত করে বেধে দিলেন যাতে বাঘিনীটা মড়ি নিয়ে না চলে যেতে পারে—কারণ চাঁদ ক্ষয়িষ্ণু, এই গাছে-ভরা জঙ্গলে জায়গাটা রাতের প্রথম ঘণ্টা দুয়েক সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। শেষ সিগারেটটি খেয়ে আমি মাচায় উঠে বসলাম।

আমি একটু জুত করে বসার পরে ইবটসন—যে লোকটি বাঘিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্যে অন্য গাছে বসেছিল তাকে ডেকে নিলেন তারপর থাকের দিকে রওনা হয়ে গেলেন—সেখান থেকে মিসেস ইবটসনকে নিয়ে ওঁকে সেম্-এ ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে।

বিদায়ী দলটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও তাদের কণ্ঠস্বর তখনও মেলায় নি। এমন সময় আমি শুনলাম একটা ভারী শরীরের সঙ্গে পাতার ঘষটানির শব্দ—সেই মুহূর্তেই বাঁদরটা, যেটা এতক্ষণ চুপ করেছিল, সেটা ডাকতে আরম্ভ করল। আমি ব্ল্যাকবেরি ঝোপের ওপাশে গাছে বসা বাঁদরটাকে এখন দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ভাগ্য আশাতীত রকম ভাল—বাঘিনীটার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্যে লোকটিকে অন্য গাছে বসিয়ে দেওয়ার কৌশল অন্য একবারের মত বেশ ভালই কাজ দিচ্ছে। একটা উদ্বেগ ভরা মিনিট কাটল তারপরে আরেকটা, হঠাৎ যে ঢিবিটার ওপর দিয়ে আমি বিশাল পাথরটার ওপর উঠেছিলাম সেদিক থেকে একটা কাকার আর্ত চিৎকার করতে করতে আমার দিকে দৌড়ে এল। তার মানে বাঘিনীটা মড়ির দিকে আসছে না, ইবটসনদের পিছু নিয়েছে। আমার উদ্বেগ তখন চরমে কারণ বোঝাই যাচ্ছে মড়ি ছেড়ে ও এখন একটা নতুন শিকার যোগাড় করার চেষ্টা করছে।

যাওয়ার আগে ইবটসন সবরকমভাবে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু টিবিটার এপারে আমার দিকে কাকারের ডাক শুনে ও'র পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক যে বাঘিনীটা মড়ির দিকেই এগোচ্ছে। এই ভেবে উনি যদি সতর্কতার বাঁধনে ঢিল দেন তাহলেই বাঘিনীটা তার সুযোগ পেয়ে যাবে। এইভাবে দশটি অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা মিনিট কেটে গেল তারপর আমি শুনলাম থাকের দিক থেকে দ্বিতীয় আরেকটি কাকারের ডাক; বাঘিনীটা এখনও অনুসরণ করছে কিন্তু ওখানে জায়গাটা তুলনামূলকভাবে ফাঁকা হওয়ার দরুন ও'র দলটিকে আক্রমণের আশঙ্কা কম। ইবটসনদের বিপদের আশংকা কিন্তু একেবারেই কমে নি কারণ ক্যাম্পে পৌঁছতে এখনও ও'দের দুমাইল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যেটা আমি আশঙ্কা করেছিলাম আর পরে সত্যিও প্রমাণিত হয়েছিল, ও'রা যদি আমার গুলির আওয়াজ শোনার জন্যে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকেন, তাহলে এখানে আসার পথে ও'দের ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। ভাগ্যক্রমে ইবটসন বিপদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং দলটিকে একজোটে রেখেছিলেন। পরদিন সকালে থাবার ছাপ দেখে বোঝা গেল বাঘিনীটা সারাটা পথ ও'দের পিছু পিছু গিয়েছিল—কিন্তু তা সত্ত্বেও ও'রা নিরাপদেই ক্যাম্পে পৌঁছেছিলেন।

কাকার আর সম্বরের ডাক থেকে আমি বাঘিনীটার গতিবিধি অনুমান করতে পারছিলাম। সূর্যাস্তের একঘন্টা পরে সে দুমাইল দূরে উপত্যকাটার নিচে ছিল। এখনও তার সামনে সারাটা রাত পড়ে রয়েছে—তাই যদিও মড়ির কাছে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তবুও আমি কোনো একটা সুযোগ যদি আসে সেটার সদ্ব্যবহার করার জন্যে বদ্ধপরিকর রইলাম। সেটা ছিল প্রচণ্ড শীতের রাত, তাই ভাল করে কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি বেশ জুত করে বসলাম। যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নড়াচড়া না করলেও কোনো অসুবিধে না হয়।

আমি মাচায় বসেছিলাম বিকেল ৪টার সময়। রাত দশটা নাগাদ আমি শুনলাম দুটি জানোয়ার পাহাড় থেকে আমার দিকে নেমে আসছে। গাছের নিচের জমাট অন্ধকারে ওদের দেখা যাচ্ছে না তবে ওরা যখন মড়িটার পায়ের দিকে এল তখন বুঝলাম ও দুটি শজারু। গায়ের কাঁটার শব্দ করে, গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে—যা একমাত্র শজারুর পক্ষেই সম্ভব ওরা মড়িটার কাছে এগিয়ে বার কয়েক ঘুরে আবার নিজেদের পথ ধরল। আরো এক ঘণ্টা পরে, চাঁদ তার বেশ কিছুক্ষণ আগে উঠেছে। আমি নিচের উপত্যকা থেকে একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম। জানোয়ারটা যাচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমদিকে। জানোয়ারটা মড়ির দিক থেকে যেদিকে হাওয়া নিচের দিকে বইছে সেদিকে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল—বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর খুব সাবধানে পাহাড় বেয়ে উঠে এল। জানোয়ারটা কিছুটা দূরে থাকতেই ওর বাতাসে গন্ধ শোঁকার শব্দ পেলাম। তখন বুঝলাম ওটা একটা ভাল্লুক। রক্তের গন্ধ ওকে আকর্ষণ,

করছে, কিন্তু রক্তের গন্ধের সঙ্গে মিশে রয়েছে একটা মানুষের অবাঞ্ছিত গন্ধ— তাই কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ও খুব সাবধানে মড়িটার খোঁজ করছিল। জঙ্গলে সবচেয়ে তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তির অধিকারী এই জানোয়ারটি উপত্যকায় থাকতেই বুঝতে পেরেছিল যে মড়িটা কোনো বাঘের সম্পত্তি। অকুতোভয় হিমালয়ের ভাল্লুকের কাছে এটা কোনো একটা বাধাই নয় কারণ ও মড়ির কাছ থেকে বাঘকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার আগের কয়েকবারের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছি। ওকে যেটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে সেটা হল রক্ত আর বাঘের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের গায়ের গন্ধ।

সমতল জমিটাতে পৌঁছে ভাল্লুকটা মড়ির কয়েক গজ দূরে পেছনে ভর দিয়ে বসল। যখন ওর বিশ্বাস হল যে ঘৃণ্য মানুষের গন্ধে ওর কোনো বিপদের আশংকা নেই ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে একটা লম্বা, টানা, চিৎকার করল। ডাকটা সম্ভবত তার কোনো সঙ্গিনীকেই, প্রতিধ্বনি তুলে উপত্যকার নিচে চলে গেল। তারপর আর কোনো ইতস্তত না করে সে দৃঢ় পদক্ষেপে মড়িটার কাছে চলে গেল। ও যখন মড়িটার গন্ধ শুঁকছে তখন আমি রাইফেল তুলে ওর ওপর তাক করলাম। হিমালয়ের ভাল্লুকের মানুষ খাওয়ার ঘটনা আমি একটিই জানি ; সেটা ঘটেছিল, যখন একটি স্ত্রীলোক ঘাস কাটতে কাটতে পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে যায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটি মারা যায়। পরে একটা ভাল্লুক তার থ্যাঁতলানো শরীরটা দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে। যে ভাল্লুকটির কাঁধের ওপর আমার বন্দুকের নিশানা ঠিক করা আছে তার অবশ্য নরমাংসে কোনো রুচি আছে বলে মনে হল না। মড়িটা দেখে গন্ধ শুঁকে ও আবার পশ্চিমমুখী যাত্রা শুরু করল। ওর চলে যাওয়ার শব্দ যখন দূরে মিলিয়ে গেল তখন জঙ্গলে আবার নেমে এল জমাট স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতা ভাঙল সূর্যোদয়ের পরে, ইবটসন আসার পরে।

ইবটসনের সঙ্গে এসেছিল মৃত লোকটির ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়, ওরা মৃতের দেহাবশেষ খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা পরিষ্কার সাদা কাপড়ে জড়িয়ে নিল, তারপর দুটো চারাগাছের সঙ্গে ইবটসনের দেওয়া দড়ি দিয়ে একটা দোলনা মতন বানিয়ে সারদা নদীর তীরে শ্মশান ঘাটের দিকে রওনা হল। যাওয়ার সময়ে তারা হিন্দু মন্ত্র 'রাম নাম সত্ হ্যায়' আর তার আখর 'সত্য বোল্ সত্ হ্যায়' বলতে বলতে গেল।

চোদ্দ ঘণ্টা ঠাণ্ডায় বসে থাকা আমার পক্ষে খুব সুখপ্রদ হয় নি ঠিকই কিন্তু ইবটসনের আনা গরম পানীয় আর খাবার খাওয়ার পর রাতে পাহারা দেওয়ার সব কষ্ট আমি ভুলে গেলাম।

২৭শে সন্ধেবেলা ইবটসনদের চুকা পর্যন্ত অনুসরণ করার পর বাঘিনীটা রাতে কোনো এক সময়ে লাধিয়া পেরিয়ে আমাদের ক্যাম্পের পেছনে একটা

আগাছার জঙ্গলে ঢুকেছিল। এই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পথ ছিল যেটা গ্রামবাসীরা মানুষখেকো আসার আগে পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করত। এরপরে পথটা বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। ২৮ তারিখে দুজন ডাকহরকরা, যারা ইবটসনের ডাক টনকপুরের পথের প্রথম পর্যায়টা নিয়ে যেতো, তারা ক্যাম্পে দেরি হয়ে যাওয়ায় সময় বাঁচানোর জন্যে ওই আগাছার জঙ্গলের রাস্তাটা দিয়ে শর্টকাট করার চেষ্টা করে অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে সবে শর্টকাটের পথ ধরেছিল। ওদের সৌভাগ্য যে সামনের লোকটি খুব সজাগ ছিল আর সে ওই বাঘিনীটাকে দেখতে পায় ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে আসতে এবং তাদের সামনে রাস্তার ওপর শুয়ে থাকতে।

যখন লোকদুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ক্যাম্পে গেল তখন আমি আর ইবটসন সবে থাক থেকে ফিরেছি, আমরা তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে খোঁজ নিতে ছুটলাম। যেখান থেকে বাঘিনীটা রাস্তায় বেরিয়ে লোকগুলিকে কিছুটা অনুসরণ করেছিল সেখানে তার থাবার ছাপ দেখলাম কিন্তু বাঘিনীটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। যদিও একটা জায়গায় যেখানে আগাছার ঝোপ খুব ঘন সেখানে একটা নড়াচড়া আর একটা জানোয়ারের চলে যাওয়া আমরা লক্ষ করেছিলাম।

২৯শে সকালে থাক থেকে একদল লোক এসে খবর দিল যে তাদের একটা ষাঁড় গত রাত্রে গোয়ালে ফেরে নি; যেখানে ষাঁড়টাকে শেষ দেখা গিয়েছিল সেখানে অল্প একটু রক্তের ছাপ দেখা গেছে। বেলা দুটোর সময় আমি আর ইবটসনরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। এক পলক মাটির দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝলাম যে কোনো বাঘই ষাঁড়টাকে মেরে টেনে নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে আমি আর ইবটসন ষাঁড়টাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ ধরে অগ্রসর হলাম। আমাদের সঙ্গে দুজন লোক চলল মাচা তৈরির দড়ি বয়ে। দাগটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে একশো গজ তারপর সোজা নেমে গেছে সেই খাদটার ভেতর যেখানে গত এপ্রিলে আমি বড় বাঘটাকে গুলি করেছিলাম কিন্তু আমার তাক ফসকে গিয়েছিল। এই খাদটার কয়েকশো গজ নিচে বিশাল দেহী ষাঁড়টা দুটো পাথরের ফাঁকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে। ষাঁড়টাকে সরাতে না পেরে বাঘিনীটা ওর পেছন দিক থেকে কিছুটা খেয়ে বাকিটা ফেলে চলে গেছে।

একটা বিরাট ওজন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে বাঘিনীটার থাবার ছাপ ধেবড়ে গেছে সেইজন্যে বলা মুশকিল ওটা সেই মানুষখেকোই কি না। কিন্তু এ অঞ্চলের কোনো বাঘই আমাদের সন্দেহের বাইরে নয়, কাজেই আমি মড়ির ওপর বসাই স্থির করলাম। মড়িটার ধারেকাছে শুধু একটাই নিঃসঙ্গ গাছ, লোকজনেরা যখন তার ওপরে মাচা তৈর করতে উঠেছে নিচের উপত্যকা থেকে বাঘের ডাক শুরু হল। খুব তাড়াতাড়ি দুটো ডালের মধ্যে কয়েকটা দড়ি পাক দিয়ে

দেওয়া হল—ইবটসন রাইফেল হাতে পাহারায় রইলেন, আমি গাছে উঠে আমার জায়গায় বসলাম। আগামী চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে এরকম কষ্টদায়ক আর বিপজ্জনক মাচায় আমি আর কখনও বসি নি। গাছটা পাহাড়ের গা থেকে হেলে ছিল আর অসমানভাবে টানা যে তিনটি দড়ির ওপর আমি বসেছিলাম তার ঠিক নিচে একশো গজ মত খাড়া খাদ গিয়ে পড়েছে একটা পাথরভর্তি নালায়।

আমি গাছে ওঠার সময় বাঘটা বেশ কয়েকবার ডেকেছিল—সন্ধে গভীর হওয়া পর্যন্ত সে ডাক সমানেই চলল, শুধু ডাকের মধ্যের সময়ের ব্যবধানটা বেড়ে যাচ্ছিল। ওর শেষ ডাকটা শোনা গেল আধ মাইলটাক দূরের একটা ঢিবির ওপর থেকে। পরিষ্কার বোঝা গেল বাঘটা মড়ির কাছাকাছিই ছিল আর ও লোকজনদের গাছে ওঠা দেখতে পেয়েছিল। অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই ও বুঝতে পেরেছিল এর মানে কি আর তাই গর্জন করে ও বাধা পাওয়ার প্রতিবাদ জানায়। বাঘটা নিশ্চয়ই তারপরে চলে গিয়েছিল কারণ পরদিন সকালে ইবটসন আসা পর্যন্ত আমি ঠায় ওই তিনটে দড়ির ওপর বসেছিলাম কিন্তু সারা রাতের মধ্যে আর কিছু দেখি নি, শুনিও নি।

খাদটা গভীর আর গাছে ঢাকা তাই শকুনদের পক্ষে মড়িটা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়—মড়িটাও আকারে এত বড় যে বাঘটার বেশ কয়েকবারের খাওয়া চলবে তাই আমরা মড়িটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে আর না বসাই স্থির করলাম।

আমাদের আশা ছিল যে বাঘটা মড়িটাকে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে যেখানে আমাদের পক্ষে গুলি চালানোও সহজ হবে, এ আশা অবশ্য আমাদের হতাশায় পর্যবসিত হয়েছিল কারণ বাঘটা আর মড়ির কাছে ফিরে আসে নি।

দু রাত পরে সেম্-এ আমাদের ক্যাম্পের পেছনে যে মোষটা বেঁধে রাখা হয়েছিল সেটা মারা পড়ে আর আমারই সামান্য একটু অমনোযোগিতার জন্যে বাঘটাকে মারার একটা সুবর্ণসুযোগ আমরা হারাই।

যে লোকগুলি এই দুর্ঘটনার সংবাদ আনে তারা বলে, যে দড়িটা দিয়ে মোষটি বাঁধা ছিল সেটা ছিঁড়ে খাদের নিচ থেকে মোষটাকে ওপরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা সেই খাদ যেখানে আমি আর ম্যাকডোনাল্ড গত এপ্রিলে একটা বাঘিনীর পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু সেবার বাঘিনীটি তার মড়ি খাদের কিছুটা ওপরে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমি বোকার মত সিদ্ধান্ত করলাম এবারও বাঘিনীটি সেইরকমই কিছু করবে।

প্রাতরাশ সেরে আমি আর ইবটসন বেরোলাম মড়িটা দেখার জন্যে আর সন্ধেবেলা মড়িটার ওপর বসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা যাচাই করার জন্যে।

যে খাদের মধ্যে মোষটি মারা পড়েছে সেটা প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া আর নিচে গভীর হয়ে মিশেছে পাহাড়ের পাদদেশের সঙ্গে।

খাদটা দুশো গজ মত সোজা চলে গেছে তারপর বেঁকে গেছে বাঁ দিকে। বাঁকটার পরেই বাঁদিকে একটা জায়গায় ঘন চারাগাছের ঝাড় বুনোনি আর তারপরেই একটা একশো ফুট ঘাসে ঢাকা ঢিবি। খাদটার মধ্যে চারাগাছগুলোর কাছে একটা ছোট্ট পুকুরমত আছে। আমি এপ্রিল মাসে খাদটা বেয়ে বেশ কয়েকবার উঠেছি কিন্তু চারাগাছের জঙ্গলটি বাঘের লুকনোর সম্ভাব্য জায়গা বলে আমার কখনও মনে হয় নি—সেইজন্যেই মোড় নেওয়ার সময় আমার যত সতর্ক থাকা উচিত ছিল তা আমি ছিলাম না। ফলে পুকুরে জলপানরত বাঘিনীটাই আমাদের প্রথম দেখতে পায়। ওর পালাবার একটাই মাত্র নিরাপদ পথ ছিল, সেটাই ও ধরল। পথটা সোজা পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে, ঢিবটার ওপর দিয়ে দূরে শালবনে গিয়ে মিশেছে।

পাহাড়ে চড়াব পক্ষে খাড়াইটা অত্যন্ত বেশি তাই আমরা একটা সম্বরের চলার পথ ধরে খাদটার গা বেয়ে চললাম। এই পথটা অনুসরণ করেই আমরা এসে পৌঁছলাম ঢিবিটার ওপর। বাঘিনীটা এখন একটা ত্রিভুজাকৃতি জঙ্গলের মধ্যে তার একদিকে ঢিবিটা, একদিকে লাধিয়া আর অন্যদিকে একটা গিরিশিখর যার গা বেয়ে নামা কোনো জানোয়ারের পক্ষে সম্ভব নয়। জঙ্গলটার আয়তন বড় নয় আর এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটা হরিণ যেগুলো মধ্যে মধ্যে ডেকে বাঘের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল রাখছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, জায়গায় গভীর সরু সব বৃষ্টির জলের নালা—এগুলোর মধ্যেই শেষে আমরা বাঘিনীর থাবার ছাপ হারিয়ে ফেললাম।

আমরা এখনও মড়িটা দেখি নি তাই আমরা সেই সম্বর চলার পথ ধরেই আবার খাদে ফিরে গেলাম আর মড়িটাকে পেলাম চারাগাছগুলির মধ্যে লুকনো অবস্থায়। এই চারাগাছগুলির গুঁড়ির ব্যাস ছ ইঞ্চি থেকে এক ফুটের মধ্যে। মাচা বাঁধার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট মজবুত নয় তাই মাচা বাঁধার পরিকল্পনা আমাদের ত্যাগ করতে হল। একটা শাবল দিয়ে অবশ্য পাহাড়ের গা থেকে একটা পাথর তুলে দিয়ে বসার জায়গা করা যেত কিন্তু যেখানে মানুষখেকো নিয়ে কারবার সেখানে তা না করাই ভাল।

অথচ গুলি করার এরকম একটা সুযোগ ছেড়ে দিতেও আমাদের ঘোর অনিচ্ছে, তাই আমরা মড়ির কাছে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকার কথা ভাবলাম কারণ আমাদের আশা ছিল বাঘিনীটা অন্ধকার নামার আগেই ফিরে আসবে আর ও আমাদের দেখার আগেই ওকে আমরা দেখতে পাব। কিন্তু এই পরিকল্পনার দুটো প্রধান অন্তরায় ছিল (ক) আমরা যদি গুলি চালাতে না পারি আর বাঘিনীটা যদি ওর মড়ির কাছে আমাদের দেখতে পায় তাহলে গত দুবারের

মত এবারও হয়তো সে মড়িটা ছেড়ে চলে যাবে (খ) মড়িটা আর ক্যাম্পের মধ্যের জায়গাটায় ঘন আগাছার জঙ্গল, আমরা অন্ধকারে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাঘিনীটা ইচ্ছেমত আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। সেইজন্যে গভীর অনিচ্ছে সত্ত্বেও আমরা সে রাতের মত মড়িটা বাঘের কাছে রেখে যাওয়াই স্থির করলাম সব পরিকল্পনা আমাদের তোলা রইল পরদিন সকালের জন্যে।

পরদিন সকালে ফিরে এসে দেখি বাঘিনী মড়িটা তুলে নিয়ে গেছে। খাদের নিচ দিয়ে প্রায় তিনশো গজ মত সে গেছে পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে সেইজন্যে মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ কোথাও নেই। মড়িটা যেখান থেকে তোলা হয়েছে তার তিনশো গজ দূরে একটা জায়গায় আমরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। যদিও ভিজে জমির ওপর বেশ কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এব কোনোটাই সে মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে হয় নি। অবশেষে, কয়েকবার জায়গাটা চক্কর মেরে আমরা সেই জায়গাটি খুঁজে পেলাম যেখানে খাদ ছেড়ে বাঘিনীটি বাঁ দিকের পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে।

যে পাহাড়টার ওপর দিয়ে বাঘিনী তার মড়ি নিয়ে গেছে সেটা ফার্ন এবং সোনালী-ডাঁটা গাছে ভরতি তাই বাঘিনীটাকে অনুসরণ করা কঠিন নয় কিন্তু ওপরে ওঠা কঠিন কারণ পাহাড়টার চড়াই খুব খাড়া আর মধ্যে মধ্যেই আমাদের পথ ছেড়ে ঘুরে অন্যদিকে গিয়ে চিহ্ন খুঁজে নিতে হচ্ছিল। এই দুরূহ পথ প্রায় হাজার ফুট ওঠার পর আমরা এসে পৌঁছলাম একটা সমতল ভূমিতে. তার বাঁ দিকে প্রায় এক মাইল চওড়া একটা পাহাড়। সমতল জমিটার পাহাড়ের দিকটি ফাটা এবড়ো খেবড়ো আর এই গর্তগুলির মধ্যে গজিয়ে উঠেছে নিবিড় শালবন - গাছগুলো দু ফুট থেকে ছ ফুট লম্বা। বাঘিনীটা মড়ি টেনে নিয়ে গেছে ওই নিবিড় শালবনের আশ্রয়ে। মড়িটার গায়ে পা-লাগা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি নি কোথায় আছে ওটা।

মোষটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু দেখার জন্যে আমরা তাকিয়েছি এমন সময়ে আমাদের ডান দিকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। রাইফেল তুলে আমরা মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম তারপর যেখান থেকে গর্জনটা এসেছে তার কিছু দূরে একটা ঝোপে নড়াচড়া দেখে আমরা চারাগাছগুলো ঠেলে দশ গজ মত এগিয়ে একটা ছোট পরিষ্কার মত জায়গায় এলাম। এখানেই বাঘিনীটা নরম ঘাসের ওপর ঘুমিয়েছিল। ঘেসো জমিটার ওধারে পাহাড়টার আরো বিশ গজ মত ওপরে একটা সমতল জায়গা। যে আওয়াজটা আমরা শুনেছিলাম সেটা এসেছিল ওই ঢাল থেকেই। যত নিঃশব্দে সম্ভব ঢালটি বেয়ে উঠে আমরা সবে পঞ্চাশ গজ মত চওড়া সমতল জমিটাতে পৌঁছেছি এমন সময় বাঘিনীটা ঢালের ওদিক দিয়ে খাদের মধ্যে নেমে গেল কিছু কালিজ আর একটি

১৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল জোড়া পাহাড় ও উপত্যকা।
শীতে এখানে জমে থাকে তুষাব। গ্রীষ্মে উপত্যকাগুলি
বোদে জ্বলে খাক হয়ে যায।

কাকার ত্রস্ত চিৎকার করে উঠল। ওকে অনুসরণ করা বৃথা সেইজন্যে আমরা মড়িটার কাছে ফিরে এলাম। মড়িটা এখনও খাওয়ার মত যথেষ্ট অবশিষ্ট আছে, তাই বসার মত দুটো গাছ ঠিক করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা মড়ির কাছে ফিরে গেলাম। রাইফেল থাকাতে কিছুটা কষ্ট করেই আমরা আমাদের বাছাই করা গাছ দুটিতে উঠলাম। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বসে রইলাম আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলাম না। সন্ধেবেলা আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম, তারপর ফাটা অসমতল জমির ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আমরা খাদটার কাছে পেঁছিলাম। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনেরই একটা অদ্ভুত, গা শিরশির করা অনুভূতি হচ্ছিল যে আমাদের পেছন থেকে কেউ অনুসরণ করছে। কিন্তু দুজনে কাছাকাছি থেকে বিনা বিপত্তিতেই আমরা রাত নটা নাগাদ ক্যাম্পে পেঁছিলাম।

ইবটসনরা যতদিন সম্ভব সেম্-এ কাটালেন। এবার তাঁদের যাওয়ার পালা। পরদিন খুব সকালে আসকটে তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত কাজের তাগিদে তাঁরা তাঁদের বার দিনের পদযাত্রা আরম্ভ করলেন। যাওয়ার আগে ইবটসন আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে আমি কোনো মড়ি একা অনুসরণ করব না বা সেম্-এ আর দু একদিনের বেশি থেকে আরও বেশি করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করব না।

ইবটসন ও তাঁর পঞ্চাশজন লোকজন চলে যাওয়ার পরে ঘন আগাছার জঙ্গলে ঘেরা আমাদের ক্যাম্পটিতে রইলাম শুধু আমি আর আমার দুই ভৃত্য—আমার কুলিরা ছিল গ্রামের সর্দারের বাড়ির একটি ঘরে। তাই সারাদিন ধরে আমি তাদের লাগিয়ে দিলাম ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহের কাজে—এখানে এ কাঠ অজস্র পাওয়া যায়। এর কারণ আমি চেয়েছিলাম সারা রাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। আগুন দেখে ভয় পেয়ে পালাবে না হয়তো বাঘিনীটা কিন্তু সে যদি আমাদের তাঁবুর আশেপাশে রাতে ঘোরাঘুরি করে, তাহলে আগুনের আলোয় তাকে দেখতে পাব আমরা। যাই হ'ক রাতে বড় করে আগুন জ্বালিয়ে রাখার সপক্ষে প্রয়োজন হলে আমাদের যুক্তি আছে—কারণ রাতগুলো এখন বেশ ঠাণ্ডা।

সন্ধের দিকে আমার লোকেরা নিরাপদে ক্যাম্পে ফিরে এলে বাঘিনীটা নদী পেরিয়েছে কেনা দেখার জন্যে একটা রাইফেল নিয়ে আমি লাধিয়ার দিকে গেলাম। আমি বালির ওপর বেশ কিছু ছাপ দেখলাম কিন্তু তার মধ্যে কোনোটাই নতুন নয়। সন্ধেবেলা যখন আমি ফিরলাম তখন আমার ধারণা আরও দৃঢ় হল যে বাঘিনীটা এখনও নদী পেরোয় নি, আমাদের দিকেই আছে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, অন্ধকার তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ আমাদের তাঁবুর

কাছে একটা কাকার ডাকতে শুরু করল তার ডাক সমানে চলল প্রায় আধঘণ্টা ধরে।

মোষ বাঁধার কাজটি, যার দায়িত্ব আগে ছিল ইবটসনের লোকদের ওপর, তার ভার এখন আমার লোকরাই নিল। পরদিন সকালে তারা যখন মোষগুলোকে আনতে গেল তখন আমি তাদের সঙ্গে গেলাম। আমরা বেশ কয়েক মাইল হাঁটলাম কিন্তু বাঘিনীর কোনো চিহ্ন আমার চোখে পড়ল না। প্রাতরাশ সেরে একটা ছিপ নিয়ে আমি দুটি নদী যেখানে মিলেছে সেখানে গেলাম। সেদিনটা আমার জীবনে সবচেয়ে ভাল একটা মাছ ধরার দিন। জায়গাটা বড় বড় মাছে ভর্তি। আমার হুইল বারে বারে ভেঙে গেলেও সেদিন মহাশোল মাছ যা মেরেছিলাম তা আমার ক্যাম্পকে খাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্ট।

আগের সন্ধের মতই আজও আমি লাধিয়া পেরোলাম, উদ্দেশ্য একটা পাথরের ওপর থেকে নদীর ডান পাড়ে খোলা জায়গাটার ওপর নজর রাখা— লক্ষ করা কখন বাঘিনীটা নদী পেরোয়। দুটি নদীর সঙ্গমের জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ থেকে সরে আসতেই শুনলাম আমার বাঁ দিকের পাহাড় থেকে একটা সম্বর আর একটা হরিণের ডাক, পাথরটার কাছে এগোতেই দেখলাম বাঘিনীটার সদ্য ফেলা থাবার ছাপ। সেই ছাপ অনুসরণ করে ফিরে এসে দেখি যেখানে বাঘিনীটা হেঁটে নদী পেরিয়েছে সেখানকার পাথরগুলি তখনও ভিজে। মাছ ধরার সুতো গুটোবার জন্যে কয়েক মিনিট দেরি, এক কাপ চায়ের প্রলোভনে কিছুটা সময় ব্যয় -এর মূল্য দিতে হবে একটি মানুষের জীবন দিয়ে, কয়েক হাজার লোকের সপ্তাহের পর সপ্তাহ উদ্বেগের আর আমার দীর্ঘ পরিশ্রমের বিনিময়ে। কারণ আমি যদিও সেম্-এ আরো তিনদিন ছিলাম বাঘিনীটাকে গুলি করার আর কোনো সুযোগ আমি পাই নি।

৭ই সকালে টনকপুরে যাওয়ার কুড়ি মাইল হাঁটার প্রস্তুতি হিসেবে যখন আমি ক্যাম্প ভেঙে দিচ্ছিলাম তখন আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ভিড় করে এল। তারা আমায় অনুরোধ করল আমি যেন তাদের মানুষখেকোর খেয়ালখুশির ওপর ফেলে দিয়ে না চলে যাই। ওদের মত অবস্থায় যারা পড়েছে তাহাদের যতটুকু উপদেশ দেওয়া যায় তা দিয়ে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলাম তাদের।

পরদিন সকালে টনকপুর থেকে আমি ট্রেন ধরলাম এবং ৯ই নভেম্বর নৈনিতালে পৌছলাম। আমি ঠিক একমাস বাইরে ছিলাম।

আমি ৭ই নভেম্বর সেম্ ছেড়েছি আর ১২ই থাকে, মানুষখেকোটির হাতে একটি মানুষ মারা পড়েছে। খবরটা আমি পেলাম হলদোয়ানির আঞ্চলিক বনবিভাগের অফিসারের মাধ্যমে—পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের শীতকালীন

গৃহে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই। জোর কদমে হেঁটে ২৪শে সকালে সূর্যোদয়ের কিছু পরেই আমি চুকায় পেঁছিলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল চুকায় প্রাতরাশ সেরে থাকে চলে যাব আর থাক গ্রামটিকেই আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র করব। কিন্তু থাকের মোড়লকে, যাকে আমি পেলাম চুকায়, আমায় বলল যে ১২ই লোকটি মারা পড়ার পরই প্রতিটি নবনারী, শিশু থাক ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি যদি থাকে ক্যাম্প ফেলতে চাই তাহলে আমি হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারব কিন্তু আমার সঙ্গের লোকজনদের জীবন রক্ষা আমি করতে পারব না। খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। আমি লোকজন পেঁছিনোর জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই মোড়ল আমার ক্যাম্প করার একটা জায়গা বাছাই করতে সাহায্য করল। এমন একটা জায়গা নেওয়া হল যেখানে আমার লোকজন মোটামুটি নিরাপদ থাকবে। আমিও—জঙ্গল কাটতে যে হাজার হাজার লোকের ভিড় হচ্ছে তার বাইরে একটু নিরিবিলি থাকতে পারব।

মড়িটা সম্বন্ধে বিভাগের আঞ্চলিক অফিসারের তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি টনকপুরের তহশীলদারকে তার যোগে চুকায় তিনটি কচি মোষ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমার অনুরোধ অনুযায়ী খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করা হয়েছিল। আমি পেঁছিনোর আগের দিন সন্ধেবেলায় তিনটি জানোয়ার চুকায় পেঁছে গিয়েছিল।

প্রাতরাশ সেরে আমি একটি মোষ নিয়ে থাকের দিকে রওনা হয়ে গেলাম—উদ্দেশ্য ছিল ১২ই লোকটা যেখানে মারা পড়েছে মোষটা সেখানে বেঁধে দেওয়া। মোড়ল আমাকে সেদিনকার ঘটনার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল কারণ সে নিজেই প্রায় মরতে বসেছিল বাঘিনীর হাতে। মনে হল সেদিন বিকেল নাগাদ ওর দশ বছর বয়েসী নাতনীকে নিয়ে বাড়ি থেকে ষাট গজ মত দূরে একটা খেতে ও আদা তুলতে গিয়েছিল। এই খেতটা আয়তনে দেড় বিঘার মতন হবে আর তিন দিক জঙ্গলে ঘেরা। বেশ খাড়া একটা পাহাড়ের ঢালের ওপর অবস্থিত হওয়ায় খেতটা মোড়লের বাড়ি থেকে দেখা যায়। বৃদ্ধ এবং তার নাতনী বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পরে ওর স্ত্রী, যে বাড়ির উঠোনে ধান কুটছিল, খুব উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে ওকে জিজ্ঞাসা করে ও কি কালা ? ও কি শুনতে পাচ্ছে না ওর ওপরের জঙ্গলে ময়ূর এবং অন্যান্য পাখিরা কিচির-মিচির শুরু করেছে ? সৌভাগ্যক্রমে ও খুব তৎপরতার সঙ্গেই কাজ করেছিল। কোদাল ফেলে, শিশুটির হাত ধরে ও বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। ওর স্ত্রীর চিৎকার সমানেই চলে, আর সে বলতে থাকে খেতের ওপর দিকটায় ঝোপের মধ্যে ও লাল কোনো একটা জানোয়ার দেখতে পাচ্ছে। এর আধঘন্টা পরে মোড়লের বাড়ি থেকে তিনশো গজ দূরে একটা মাঠে গাছের ডাল কাটতে কাটতেই লোকটি বাঘিনীটার হাতে মারা পড়ে।

মোড়লের বর্ণনা শোনার পর সেই গাছটা খুঁজে বার করতে আমার কোনো অসুবিধে হল না। ওটা ছিল দুটো ধাপকাটা খেতের মধ্যেকার তিনফুট উঁচু আলের ওপর গজিয়ে ওঠা গাঁটওয়ালা ছোট্ট গাছ—বছরের পর বছর এর পাতা কেটে গরু মোষদের খাওয়ানো হয়। যে মানুষটি মারা পড়েছিল সে গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একটা ডাল ধরে আরেকটা ডাল কাটছিল যখন, বাঘিনীটা পেছন দিকে থেকে আসে, ডাল থেকে ওর হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নেয় তারপর ওকে মেরে ফেলে টেনে নিয়ে যায় খেতের সীমানা বরাবর ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

থাক্ গ্রামটি বর্তমান জমিদারদের পূর্বপুরুষদের উপহার দেন চাঁদ রাজারা যাঁরা গুর্খা দখলের আগে বহু শত বছর ধরে কুমায়ুনে রাজত্ব করেন। এই উপহারটি দেওয়া হয় পূর্ণাগিরির মন্দিরে তাঁদের কাজের বিনিময়ে। (চাঁদ রাজাদের প্রতিশ্রুতি যে থাক এবং অন্য দুটি গ্রামের সব জমি সর্বসময়ের জন্যে খাজনামুক্ত থাকবে তার সম্মান ইংরেজ সরকার একশো বছর ধরে রেখেছিল)। কয়েকটা কুঁড়েঘরের সমষ্টি থেকে কালক্রমে গ্রামটি একটি বেশ সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখন এখানে বেশ টালিছাওয়া পাকা বাড়ি দেখা যায়। তার কারণ এখানকার জমিই শুধ উর্বর নয়, মন্দিরগুলি থেকে আয়ও এখানে যথেষ্ট।

কুমায়ুনের অনান্য গ্রামের মতই থাক তার একশো বছরের জীবনে অনেক ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কিন্তু এর দীর্ঘ ইতিহাসে গ্রাম এরকম ফাঁকা হয়ে যাওয়ার নজীর বোধহয় আর নেই। আমি এর আগে যে কয়েকবার এসেছি প্রতিবারেই গ্রামের কর্মব্যস্ত চেহারাই দেখেছি কিন্তু আজ বিকেলে যখন আমি বাচ্চা মোষটি সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গেলাম তখন দেখলাম চারিদিক নিস্তব্ধ। গ্রামের একশোজন বা আরও কিছু বেশি অধিবাসী সবাই পালিয়েছে আর সঙ্গে নিয়ে গেছে তাদের গৃহপালিত পশুগুলি—সারা গ্রামে আমি একটি মাত্র জানোয়ারই দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে একটা বেড়াল। বেড়ালটা আমায় খুব আন্তরিক স্বাগতম জানাল। লোকজন এত তাড়াতাড়ি পালিয়েছে যে বহু বাড়ির দরজা হাট করে খোলা—তারা বন্ধ করার সময় পায় নি। গ্রামের প্রতিটি রাস্তায়, বাড়ির উঠোনে, বাড়ির সামনে ধুলোয় আমি বাঘিনীটার থাবার ছাপ দেখলাম। খোলা দরজাগুলো বিপজ্জনক হতে পারে কারণ গ্রামের এঁকাবেঁকা পথটি গিয়েছে এই দরজাগুলো ঘেঁষেই আর এর যে-কোনো একটির মধ্যে বাঘিনীটার ওঁত পেতে থাকা অসম্ভব নয়।

গ্রামের তিরিশ গজ ওপরে পাহাড়টির গায়ে কয়েকটা গোয়াল। এই গোয়ালগুলোর কাছে আমি যে পরিমাণ কালিজ, লাল জংলী মোরগ এবং সাদা ঝুঁটিওলা ছাতারে দেখেছিলাম আগে কোনো জায়গায় একসঙ্গে তা দেখি নি। যেরকম সহজ বিশ্বাসে পাখিগুলি আমাকে তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে

দিল তাতে মনে হল থাকের লোকজনের জীবহত্যা সম্বন্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্কার আছে।

গরুর গোয়ালগুলির ওপরে ধাপকাটা খেত থেকে পুরো গ্রামটা পরিষ্কার দেখা যায় তাই মোড়লের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে যে গাছটিতে বাঘিনীটি তার শেষ শিকার ধরেছিল সে গাছটি খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হল না। গাছটার নিচে নরম জমিতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন আর কয়েক ফোঁটা জমা রক্ত দেখা গেল। এইখান থেকে বাঘিনীটি মড়িটাকে চষা খেতের ওপর দিয়ে প্রায় একশোগজ নিয়ে গেছে তারপর একটা বেড়ার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে দূরের ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। গ্রাম থেকে আসা ও ফিরে যাওয়ার পদচিহ্ন দেখেই অনুমান করলাম সারা গ্রামটাই জড়ো হয়েছিল ওই দুর্ঘটনার জায়গায়। কিন্তু সেই গাছটি থেকে বেড়া পর্যন্ত একটাই থাবার ছাপ—আর সেটা বাঘিনীর। লোকটিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে এই থাবার ছাপ পড়ে। বাঘিনীটিকে অনুসরণ করে লোকটির শরীরটি উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাই হয় নি।

গাছটার নিচ থেকে কিছুটা মাটি খুঁড়ে একটা শেকড় বার করে আমি মোষটাকে তার সঙ্গে বেঁধে দিলাম। কাছাকাছি একটা গাদা থেকে প্রচুর খড় এনে সামনে রেখে আমি তাকে শুইয়ে এলাম।

পাহাড়ের উত্তরদিকে গ্রামটা এখন ছায়ায় ঢাকা—যদি ক্যাম্পে ফিরতে হয় তাহলে আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত—খোলা দরজাগুলোর বিপদ এড়াবার জন্যে গ্রামটা ঘুরে আমি বাড়িগুলির নিচে রাস্তাটি ধরলাম।

এই রাস্তাটি গ্রাম ছাড়ার পরে একটা বিশাল আমগাছের নিচ দিয়ে যায়—এর গোড়ায় একটা পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের উৎস। একটা বিরাট পাথরের খাত কেটে কিছুটা যাওয়ার পরে জলটা পড়েছে এবড়ো-খেবড়ো একটা পাথরের পাত্রের মত জায়গায়। সেখান থেকে জলটা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের জমিতে—ফলে সেখানকার জমি নরম এবং কর্দমাক্ত। আমি ওপরে ওঠার সময় এই ঝরনার জল খেয়েছিলাম তাই কাদার ওপর আমার পায়ের ছাপ পড়েছিল। এবার দ্বিতীয়বার জল খাওয়ার জন্যে ঝরনাটার দিকে এগোতে দেখি আমার পায়ের দাগের ওপর বাঘিনীর থাবার ছাপ। তৃষ্ণা মেটার পর বাঘিনী রাস্তাটা এড়িয়ে নীল বাসক আর বিছুটির ঝোপ ভরা একটা খাড়া আলের ওপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছেছে। সেখানে কোনো একটা বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে ও সম্ভবত আমার গাছে মোষ বাঁধা লক্ষ করেছে আর আশা করছে আমি যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ দিয়েই ফিরে যাব। আমার নেহাতই ভাগ্য ভাল যে আমি ওই খোলা দরজাগুলো পেরোবার বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ঘুর রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিলাম।

চুকা ছাড়ার সময়ে সব রকম হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা নিয়ে আমি

ভালই করে ছিলাম কারণ এখন থাবার ছাপ থেকে বুঝলাম ক্যাম্প ছাড়ার পর সারাটা পথ বাঘিনীটা আমায় অনুসরণ করেছে। পরদিন সকালে থাকে ফিরে গিয়ে দেখলাম আমি বাড়িগুলির নিচের রাস্তা ধরা থেকেই বাঘিনীটা আমায় অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে আর চুকার চষা ক্ষেত পর্যন্ত সে আমার পিছু ছাড়ে নি।

আমার সঙ্গে আলোর যা ব্যবস্থা ছিল তাতে পড়াশুনা সম্ভব নয় সেইজন্যে সে রাতে খাওয়ার পরে আগুনের পাশে বসে আমি পুরো ব্যাপারটা মনে মনে পর্যালোচনা করলাম আর একটা উপায় ঠাওরাবার চেষ্টা করলাম কি করে বাঘিনীটাকে জব্দ করা যায়। সে রাতে আগুনে শুধু আরামদায়ক উত্তাপই ছিল না, ছিল একটা নিরাপত্তার আশ্বাসও।

২২শে বাড়ি ছাড়ার সময়ে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম যে আমি দশ দিনের মধ্যেই ফিরব আর এটাই হবে মানুষখেকো শিকারে আমার শেষ অভিযান। বছরের পর বছর রোদ জলে পোড়া, পরিশ্রম আর দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকা এতে আমার শরীরের ওপর ধকলও যেমন যাচ্ছিল, আমার বাড়ির লোকদেরও অশান্তির শেষ ছিল না। চৌগড়ের বাঘিনী বা রুদ্রপ্রয়াগের চিতা মারার সময়ে তো বেশ কয়েক মাস আমায় বাইরে কাটাতে হয়েছিল। ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে যদি আমি মানুষখেকোটাকে না মারতে পারি তাহলে এ দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে অন্য কাউকে খুঁজে বার করতে হবে।

আজ ২৪শে রাত—আমার সামনে ঠিক ছদিন সময় আছে। সেদিন সন্ধেবেলা বাঘিনীটার হালচাল দেখে মনে হল ও আরেকটা মানুষ শিকারের জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে আমার হাতে যা সময় আছে তাতে ওর সঙ্গে দেখা করা কঠিন হবে না। দেখা করার অনেক রকম রাস্তা আছে, একে একে প্রতিটিই চেষ্টা করা হবে। পাহাড় অঞ্চলে বাঘকে গুলি করার সবচেয়ে ভাল সুযোগ মেলে মড়ির ওপর কোনো গাছে বসে থাকলে। সে রাতে বাঘিনীটা যদি থাকে আমার বাঁধা মোষটা না মারে তাহলে পরের এবং তারও পরের প্রতিরাতে আমি আমার বাছাই করা জায়গায় অন্য দুটি মোষও বেঁধে রাখব। মানুষ শিকার না পেলে বাঘিনীটা আমার একটা মোষ মারতেও পারে, যেমন এপ্রিলে আমি আর ইবটসন সেম্-এ ক্যাম্প করার সময়ে মেরেছিল। আগুনটা সারারাত জ্বালিয়ে রাখার মত মোটা সোটা কাঠ দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম আর তাঁবুর পেছনের আগাছার জঙ্গল থেকে ভেসে আসা কাকারের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে প্রাতরাশ যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চুকা আর সেম্-এর মাঝামাঝি জায়গায় নদীর ডান পাড়ে বালির চড়ার ওপর থাবার ছাপ দেখতে। পথটা চষা জমি ছাড়িয়ে কিছুটা যায় ঘন আগাছার

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এইখানে আমি একটা বড় পুরুষ চিতার থাবার ছাপ দেখলাম—সম্ভবত এটাকে দেখেই কাকারটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। একটা ছোট পুরুষ বাঘ গত সপ্তাহে লাধিয়া নদী বহুবার পারাপার করেছে—ঠিক সেই সময়টা বাঘিনীটা একবারই নদী পেরিয়েছে, সেম্-এর দিক থেকে আসার সময়ে। একটা বিরাট ভাল্লুক আমি আসার কিছুক্ষণ আগেই বালির ওপর দিয়ে চলাফেরা করেছে। আমি ক্যাম্পে ফিরে আসার পরে কাঠের ঠিকাদাররা বলল যে তারা সকালে কাজ ভাগ করে দেওয়ার সময়ে একটা ভাল্লুক দেখেছিল—ভাল্লুকটার মনোভাব খুব হিংস্র ছিল। তাই মজুরেরা যে অঞ্চলে ভাল্লুকটা দেখা গিয়েছিল সেখানে আর কাজ করতে চাইছে না।

বেশ কয়েক হাজার লোক—ঠিকাদারদের হিসেব অনুযায়ী পাঁচ হাজার হবে, গাছ কেটে, করাত দিয়ে চিরে মোটর চলাচলের জন্যে যে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জড়ো হয়েছিল চুকায় আর কুমায়া চকে। মজুরদের এই বিরাট দলটি যখনই কাজ করত তখনই তারস্বরে চিৎকার করত সাহস রাখার জন্যে। উপত্যকায় কুড়োল করাতের শব্দ, খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট গাছ পড়ার শব্দ, হাতুড়ি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে পাথর ভাঙা আর তার সঙ্গে কয়েক হাজার লোকের চিৎকার—এই সব মিলিয়ে যে সম্মিলিত শব্দ তা বর্ণনা করা যায় না, অনুমান করে নিতে হয়। এই রকম ভয়ার্ত যেখানকার লোকজন সেখানে থেকে থেকে ভয় পাওয়াই তো স্বাভাবিক। আগামী কয়েকটা দিন নানা ধরনের গুজবের তদন্ত করতে গিয়ে আমার প্রচুর হাঁটাহাটি আর সময় নষ্ট হল। সব গুজবই বাঘিনীটার আক্রমণ আর তার মানুষ মারা নিয়ে। অবাক হবার কিছু নেই, কারণ বাঘিনীটার সম্বন্ধে সন্ত্রাস শুধু লাধিয়া উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ এমন নয়, সারদা পেরিয়ে কালধুঙ্গা হয়ে একেবারে গিরিখাত পর্যন্ত চলে গেছে। এই পুরো জায়গাটার আয়তন হবে প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল যেখানে কাজ করছে অতিরিক্ত আরও প্রায় দশ হাজার লোক।

একটা জানোয়ার যে এতবড় একদল মজুরকে সন্ত্রাসের মধ্যে রাখতে পারে তা কল্পনার অতীত। সন্ত্রাস শুধু মজুরদের মধ্যেই নয়, এছাড়াও আছে আশপাশের গ্রামবাসীরা, শ'য়ে শ'য়ে লোক যারা মজুরদের জন্যে খাবার নিয়ে আসে, অথবা যারা পাহাড়ের ফলমূল যেমন কমলালেবু (যা বার আনায় একশো কিনতে পাওয়া যায়), কাঠ বাদাম, লঙ্কা, এসব নিয়ে টনকপুরের বাজারে যায়—আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যেও। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হতো যদি না সাভোর মানুষখেকোর ঐতিহাসিক নজীর আমাদের সামনে থাকত—যেখানে দুটো সিংহ শুধু রাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পুরো উগান্ডা রেলের কাজ দীর্ঘদিন থামিয়ে রেখেছিল।

আসল গল্পে ফিরে আসা যাক। ২৫শে সকালে প্রাতরাশ সেরে আমি

দ্বিতীয় মোষটা নিয়ে থাকের দিকে রওনা হলাম। পথটা চুকার চষা খেত পেরিয়ে, পাহাড়ের নিচ দিয়ে ঘুরে আধমাইলটাক যাওয়ার পরে দুভাগ হয়ে গিয়েছে।

একটা পথ ঢালু জমির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে থাকের দিকে, অন্য পথটা পাহাড়ের নিচ দিয়ে আরও আধমাইলটাক গিয়ে এ'কে বে'কে কুমায়া চকের মধ্য দিয়ে কোটাকিন্দ্রী পর্যন্ত গিয়েছে।

পথটি যেখানে বিভক্ত, সেখানে আমি বাঘিনীটার থাবার ছাপ দেখলাম। থাক পর্যন্ত সেই ছাপ অনুসরণ করে এলাম আমি। ও যে গত সন্ধেবেলা আমার পিছু পিছু পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল তাতেই প্রমাণ হয় যে মোষটা মারে নি। ঘটনাটা হতাশাজনক হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয় কেননা বাঘ, কোনো কোনো সময় গাছে বাঁধা কোনো জানোয়ারকে মারার আগে জানোয়ারটার কাছে রাতের পর রাত ফিরে ফিরে যায়—খিদে না পেলে বাঘ কখনও হত্যা করে না।

দ্বিতীয় মোষটাকে একটা আম গাছের কাছে রেখে,—সেখানে ঘাস প্রচুর—আমি বাড়িগুলি ঘুরে ফিরে দেখার সময় দেখলাম এক নম্বর মোষটা প্রচুর খড় খেয়ে, বিনিদ্র রাতের ধকল সামলে নেওয়ার জন্যে পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। থাবার ছাপ দেখে বুঝলাম বাঘিনীটা গ্রামের দিক থেকে এগিয়ে এসে মোষটার কয়েক ফুটের মধ্যে এসেছিল—তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথেই সে ফিরে যায়। মোষটাকে নিয়ে ঝরনার কাছে গিয়ে ওটাকে এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টা চরে বেড়াতে দিলাম তারপর সেটাকে নিয়ে গিয়ে গতরাতের জায়গাতেই আবার বে'ধে রেখে দিলাম।

দ্বিতীয় মোষটাকে বাঁধলাম আমগাছটার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জায়গায়। আমি আর ইবটসনরা যেদিন তদন্তে আসি সেদিন এই জায়গাটিতেই সেই শোকার্ত মহিলা আর গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিল। এই পথের মধ্যে একটা নালা পড়ে, তার একদিকে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি আর অন্যদিকে একটা বাদাম গাছ। বাদাম গাছটার ওপর মাচা বাঁধা চলে। আমি দু নম্বর মোষটাকে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে বাঁধলাম আর ওর সামনে বেশ কয়েকদিন চলার মত প্রচুর খড় রেখে দিলাম। থাকে আর আমার বিশেষ কিছুই করার নেই সেইজন্যে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম এবং তৃতীয় মোষটা নিয়ে লাধিয়া পেরিয়ে সেম্-এর পেছনে একটা নালায় ওকে বে'ধে রেখে এলাম। এ জায়গাটাতেই বাঘিনীটা গত এপ্রিলে আমাদের একটা মোষ মেরেছিল।

আমার অনুরোধে টনকপুরের তহশীলদার খুঁজে-পেতে তিনটে বেশ পুষ্ট বাচ্চা মোষ আমার জন্যে বেছেছিল। তিনটেকেই এখন বাঁধা হয়েছে বাঘিনীটা ঘোরাফেরা করার জায়গায়। ২৫শে সকালে যখন আমি মোষগুলিকে

দেখতে বেরোলাম আমার খুব আশা ছিল যে বাঘিনীটা হয়তো একটা মোষ মারবে, সেই মড়ির ওপর বসে ওকে গুলি করার একটা সুযোগ অন্তত আমি পাব। লাধিয়ার ওপারে যেটা বাঁধা ছিল সেটাকে দিয়ে শুরু করে পালা করে সব কটি মোষ আমি দেখলাম—বাঘিনী একটাকেও স্পর্শ করে নি। আগের দিনের সকালের মতই আমি আবার ওর থাবার ছাপ দেখলাম থাকের দিকে যাওয়ার পথে—কিন্তু এবারে ছিল এক জোড়া দাগ, একটা আসার, আরেকটা যাওয়ার। আসার সময়ে এবং ফিরতি পথেও বাঘিনীটা রাস্তার ওপর দিয়েই যাতায়াত করেছে আর আমগাছের পঞ্চাশ গজ দূরে কাটা গুঁড়িতে বাঁধা মোষটার কয়েক ফুটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

আমি চুকায় ফেরার পর থাক গ্রামবাসীদের একটা প্রতিনিধিদল মোড়লের নেতৃত্বে আমার তাঁবুতে এসে আমায় অনুরোধ করল ফুরিয়ে যাওয়া রসদের যোগান আনতে তারা যখন গ্রামে যাবে আমি যেন তাদের সঙ্গে যাই। ঠিক দুপুরবেলায় আমি থাকে পেঁছিলাম—আমার পেছনে মোড়ল আর তার প্রজারা এবং আমার খাবার ও মাচা তৈরির দড়িদড়া বহনকারী চারজন আমার লোক। থাকে পেঁছে আমি পাহারা দিতে লাগলাম। সেই ফাঁকে গ্রামের লোকজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার সংগ্রহ করে নিল।

মোষ দুটোকে খাবার জল খাইয়ে আমি দু নম্বর মোষটাকে গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলাম আর এক নম্বর মোষটাকে পাহাড়ের নিচে মাইল খানেক নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা চারা গাছে বেঁধে রাখলাম। তারপরে আমি গ্রামবাসীদের চুকা পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে, পাহাড়ের চড়াই বেয়ে কয়েকশো গজ ফিরে এসে, আমার লোকজন মাচা বাঁধতে বাঁধতে কোনোরকমে আমি খাওয়া সেরে নিলাম।

এখন এটা পরিষ্কার যে আমার মোটাসোটা মোষগুলোর ওপর বাঘিনীটার কোনো লোভ নেই। থাক যাওয়ার পথে গত তিনদিনে আমি পাঁচবার বাঘিনীটার থাবার ছাপ দেখেছি। আমি স্থির করলাম ওই পথের ওপর বসেই বাঘিনীটাকে গুলি করার চেষ্টা করব। বাঘিনীটা আসার সময় আমায় সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা ছাগল আমি পথের ওপর বেঁধে রাখলাম। বিকেল চারটে নাগাদ আমি গাছে চড়ে বসলাম। আমার লোকজনদের পরদিন সকালে আটটার সময় ফিরে আসতে বলে আমি পাহারা দিতে শুরু করলাম।

সন্ধের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল—কোটটা ভাল করে কাঁধের ওপর টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি এমন সময় মাচার একদিকের দড়ি খুলে গেল। ফলে বসা আরও কষ্টকর হয়ে উঠল। ঘণ্টাখানেক পরে ঝড় উঠল। বৃষ্টি যদিও খুব বেশি হয় নি কিন্তু আমি বেশ ভিজে গিয়েছিলাম, ফলে কষ্ট আরও বাড়ল। যে ষোল ঘণ্টা আমি গাছে বসেছিলাম তার মধ্যে আমি কিছু দেখি নি বা শুনি নি। আমার লোকজন সকাল আটটায় ফিরে এল। আমি ক্যাম্পে ফিরে

গরম জলে স্নান করে ভাল করে খাওয়া দাওয়া সেরে আমার ছয়জন লোককে নিয়ে থাকের দিকে রওনা হলাম।

রাতের বৃষ্টি পুরনো সব দাগগুলি ধুয়ে মুছে দিয়েছে। যে গাছটায় আমি বসেছিলাম তার দুশো গজ দূরে বাঘিনীটার নতুন থাবার ছাপ দেখলাম—ঠিক যে জায়গাটিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ও থাকের পথে রওনা হয়েছিল সেইখানে। খুব সাবধানে আমি প্রথম মোষটির দিকে এগোলাম, দেখলাম ওটা পথের ওপর ঘুমিয়ে আছে। বাঘিনী ওর চারপাশ ঘুরে কয়েকগজ এগিয়ে আবার পথটি ধরেছে তারপর পাহাড় ধরে এগিয়ে গেছে। ওর থাবার ছাপ ধরে আমি দ্বিতীয় মোষটার দিকে এগোলাম. যেখানে মোষটাকে বাঁধা হয়েছিল সে জায়গাটার কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি দুদুটো নীল হিমালয়েয় ম্যাগপাই মাটির থেকে উঠে চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের নিচে নেমে গেল।

এই পাখিগুলির উপস্থিতির মানে (ক) মোষটি মৃত (খ) মোষটিকে আংশিক-ভাবে খাওয়া হয়েছে তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি এবং (গ) বাঘিনীটা খুব কাছাকাছি নেই। যে গুঁড়িটায় মোষটিকে বাঁধা হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখি যে মোষটাকে পথ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে শরীরের কিছুটা অংশ খাওয়া হয়েছে এবং মৃত জানোয়ারটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলাম যে ওটা বাঘিনীর হাতে মারা পড়ে নি, খুব সম্ভবত সাপের কামড়ে ওটার মৃত্যু হয়েছে (আশপাশের জঙ্গলে অনেক শঙ্খচূড় সাপ আছে) এবং ওটাকে পথের ওপর মরে পড়ে থাকতে দেখে বাঘিনীটা কিছুটা খেয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। বাঘিনীটা যখন দেখেছে দড়িটা ছেঁড়া যাবে না তখন কিছু শুকনো পাতা আর কাটকুটো দিয়ে মোষটাকে ঢেকে থাকের পথে রওনা হয়েছে।

বাঘেরা কখনও গলিত পচা মাংস খায় না কিন্তু কখনও কখনও অন্য জানোয়ারের মারা দেহের মাংস খায়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি একবার একটা চিতার মৃতদেহ একটা ঘাস-পোড়া রাস্তার ওপর ফেলে রেখে এসেছিলাম। পরদিন সকালে যখন আমি একটা ফেলে আসা ছুরি উদ্ধার করতে সেখানে যাই তখন দেখি একটা বাঘ মৃতদেহটাকে প্রায় একশো গজ টেনে নিয়ে গিয়ে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলেছে।

চুকার থেকে ওপরে ওঠার সময় আমি গত রাতে বসা মাচাটা ভেঙে দিয়ে এসেছিলাম। দুজন লোক বাদাম গাছটায় উঠল আমার মাচা তৈরির জন্যে। অবশ্য গাছটা মাচার পক্ষে যথেষ্ট বড় ছিল না। অন্য চারজন ঝরনার কাছে গেল চা তৈরির মত এক কেটলি জল আনার জন্যে। বিকেল চারটের মধ্যে আমি চা বিস্কুট দিয়ে হাল্কা খাবার খেয়ে নিলাম। এই খেয়েই আমায় থাকতে হবে পরদিন পর্যন্ত। আমার লোকজন থাকেই কোনো একটা বাড়িতে থাকার জন্য আমার অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু সে অনুরোধে রাজী না হয়ে আমি ওদের

ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাম্পে ফেরার পথে ওদের বিপদের আশঙ্কা আছে কিন্তু থাকে কোনো বাড়িতে রাত কাটালে যে বিপদ হতে পারে এটা তার তুলনায় কিছুই নয়।

গাছে আমার বসার জায়গাটি দুটো সোজা ডালের সঙ্গে দড়ির কয়েকটা পাক দিয়ে তৈরি, নিচে আরো কয়েকটা দড়ি প্যাচানো যার ওপর আমি পা রাখতে পারি। আরাম করে বসার পর আমার আশপাশের কয়েকটা ডাল টেনে এনে একটা সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলাম—একটু ফাঁক রাখলাম যেখান দিয়ে লক্ষ করে আমি গুলি করতে পারি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার 'গুপ্তস্থান'টির পরীক্ষা হয়ে গেল—কারণ আমার লোকজন চলে যাওয়ার পরেই ম্যাগপাই দুটি ফিরে এল। তারপর অন্যদের ডাকাডাকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নয়টি পাখি সন্ধ্যে পর্যন্ত মড়িটা ঠুকরে ঠুকরে খেল। পাখিগুলো থাকাতে আমি একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম কারণ বাঘিনী এদিকে এগোলে ওরা আমায় সাবধান করে দেবে। পাখিগুলি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আমার রাতের পাহারা।

নেপাল পাহাড়ের পেছন থেকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠে যখন চারিদিকের পর্বত-শ্রেণী আলোয় ভাসিয়ে দিল তখনও কিন্তু গুলি করার মত যথেষ্ট দিনের আলো আছে। গতরাতের বৃষ্টিতে সব ধুলো, ধোঁয়া মুছে গিয়ে চারিদিক ঝকঝকে তকতকে হয়ে গিয়েছিল, এবং চাঁদ ওঠার কয়েক মিনিট পর আলো এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমি দেড়শো গজ দূরে একটা গম ক্ষেতে একটা সম্বর আর তার বাচ্চাকে পরিষ্কার খেতে দেখলাম।

মরা মোষটা আমার সামনে থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে [illegible]র যে পথটা দিয়ে বাঘিনী আসবে বলে আমি আশা করছিলাম সেটার দূরত্ব দুতিন গজের কম। এই দূরত্ব থেকে গুলি করা খুব সহজ হবে, বাঘিনীটা আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই কিন্তু সবই হবে বাঘিনীটা যদি আসে। ওর না আসার কিন্তু কোনো কারণ নেই।

চাঁদ ওঠার পর ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে, সম্বরটা আমার গাছের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে এমন সময় গ্রামের ঠিক ওপরের পাহাড়টিতে একটা কাকার ডাকতে শুরু করল। কাকারটা কয়েক মিনিট ডেকেছে এমন সময় গ্রামের দিক থেকে টানা চিৎকার ভেসে এল। চিৎকারটার সঠিক বর্ণনা আমি করতে পারব না কিন্তু 'আর-আর-আআর' একটা আওয়াজ ক্রমেই দীর্ঘতর হলে যেমন হয়, আওয়াজটা অনেকটা সেইরকম। চিৎকারটা এত অপ্রত্যাশিত আর এত হঠাৎ হয়েছে যে আমি গাছ থেকে নেমে গ্রামের দিকে দৌড়বার জন্যে নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছি—আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল মানুষখেকোটা নিশ্চয় আমার কোনো লোককে মারছে। কিন্তু তার পরের মুহূর্তে এক ঝলকে আমার

মনে পড়ে গেল ওরা যখন আমার গাছের নিচ দিয়ে যায় তখন একে একে আমি ওদের সবাইকে গ‍ুনে নিয়েছিলাম—ওরা আমার একত্রে থাকার নির্দেশ ঠিকমত মানছে কিনা দেখার জন্যে দ‍ৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত ওদের ওপর নজর রেখেছিলাম।

চিৎকারটা কোনো বিপন্ন মান‍ুষের ভয়ার্ত চিৎকার কিন্তু য‍ুক্তি দিয়ে আমি ব‍ুঝতে পারলাম না একটা জনমানবহীন গ্রাম থেকে কিভাবে এ ধরনের চিৎকার আসতে পারে। এটা আমার কল্পনা নয় কারণ কাকারটা চিৎকার শ‍ুনেই হঠাৎ ওর ডাক থামিয়ে দিয়েছিল, সম্বরটা বাচ্চা নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল। দ‍ুদিন আগে লোকজনদের গ্রামে পেঁছে দেওয়ার সময়ে আমি বলেছিলাম তাদের বিশ্বাস তো খ‍ুব বেশি—এরকম দরজা জানলা হাট করে খোলা বাড়িতে সব কিছ‍ু ফেলে রেখে যাওয়া তো সহজ নয়। এর উত্তরে মোড়ল বলেছিল তাদের গ্রামে বছরের পর বছর যদি কোনো লোক না থাকে তাহলেও তাদেব ধন সম্পত্তি নিরাপদেই থাকবে কারণ তারা প‍ূর্ণাগিরির প‍ুরোহিত, তাদের ওপর চুরি ডাকাতি করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। সে আরও বলেছিল যদি রক্ষীর কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে বাঘিনীটা যতদিন বেঁচে আছে সেই ওদের সম্পত্তি একশোটা রক্ষীর থেকেও ভাল পাহারা দেবে, কারণ বাঘিনী থাকাতে আশপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোনো কারণেই কেউ গ্রামের দিকে আসার সাহস পাবে না—অবশ্য ওদের যেমন পেঁছে দিয়েছি তেমনি আমি যদি তাদের সঙ্গে থাকি সে আলাদা কথা।

চিৎকারটা আর ফিরে এল না। আমার আর কিছ‍ুই করার ছিল না তাই দড়ির ওপর আসনে আবার বসলাম। রাত দশটায় একটা কাকার, যে খেতের নিচের দিকে কাঁচ গম খাচ্ছিল, হঠাৎ ডাকতে ডাকতে পালিয়ে গেল—ঠিক তার মিনিটখানেক পরেই দ‍ুবার বাঘিনীটার গর্জন শোনা গেল। ও এখন গ্রাম ছেড়ে চলতে শ‍ুর‍ু করেছে। ওর যদি মোষটাকে আরেকবার খাওয়ার ইচ্ছে নাও থাকে, তাহলেও যে পথে গত কয়েক দিন—প্রতিদিন অন্তত দ‍ুবার করে যাতায়াত করেছে সেই পথ দিয়ে ও আসতেও পারে। ট্রিগারে আঙ‍ুল রেখে তীক্ষ্ণ দ‍ৃষ্টিতে পথটির দিকে তাকিয়ে আমি দিনের আলো জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। স‍ূর্য ওঠার ঘণ্টা খানেক পরে আমার লোকজন ফিরে এল। আমার কথা ভেবেই ওরা একবোঝা জ্বালানী কাঠ নিয়ে এসেছিল—তাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বসলাম হাতে ধ‍ূমায়িত এক কাপ চা নিয়ে।

বাঘিনীটা আমাদের আশপাশের ঝোপেও ওঁত পেতে থাকতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে ও বহ‍ু মাইল দ‍ূরে চলে গেছে কারণ রাত দশটায় ওর গর্জন শোনার পর জঙ্গল ছিল নিস্তব্ধ।

ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখি আমার তাঁব‍ুর কাছে কয়েকজন লোক বসে আছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছে গতরাতে ভাগ্যদেবী আমার ওপর কতটা সদয় ছিলেন দেখার জন্যে। অন্যরা আমাকে খবর দিতে এসেছে যে বাঘিনীটা পাহাড়ের পাদদেশে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের কিছু আগে পর্যন্ত সমানে গর্জন করেছে। জঙ্গলে এবং মাল পাঠানোর নতুন রাস্তায় কর্মরত মজুরেরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ করেছে। বাঘিনীটার সম্বন্ধে আমার লোকজন আগেই আমায় বলেছিল—কি ভাবে চুকার আশে পাশে ক্যাম্প করে থাকা হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তারা সারারাত বসে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল।

আমার তাঁবুর কাছে যারা জড়ো হয়েছিল তার মধ্যে ছিল থাকের মোড়ল। সবাই চলে গেলে আমি তাকে মাসের ১২ তারিখে থাকে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। এই দুর্ঘটনায় মানুষখেকোর শিকার হতে হতে সে কোনোরকমে বেঁচে গেছে।

আরেকবার মোড়ল আমাকে সবিস্তারে বলল কিভাবে আদা খুঁড়তে ও নাতনীকে নিয়ে খেতে গিয়েছিল, কিভাবে স্ত্রীর চিৎকার শুনে ও নাতনীর হাত ধরে দৌড়ে বাড়ি চলে আসে—সেখানে কান খোলা না রেখে নিজের ও নাতনীর জীবন বিপন্ন করার জন্যে কিভাবে ওর স্ত্রী ওকে ভর্ৎসনা করে—ঠিক তার কয়েক মিনিট পরেই কিভাবে বাঘিনীটা তার বাড়ির ওপরের মাঠে গাছের পাতা কাটায় ব্যস্ত একটি লোককে মারে।

এ গল্পের সবটাই আমার আগে শোনা. তাই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম বাঘিনীর মানুষটাকে মারা কি ও নিজের চোখে দেখেছে ? ও উত্তর দিল না, যেখানে ও দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে গাছটা দেখা যায় না। আমি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ও কি করে বুঝল মানুষটা সত্যিই মারা পড়েছে। ওর উত্তর হল ও আওয়াজ শুনে অনুমান করেছিল। আমার আরও প্রশ্নের জবাবে ও বলল লোকটা সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকে নি শুধু চিৎকার করে উঠেছিল। যখন প্রশ্ন করলাম লোকটি একবার চিৎকার করেছিল ? ও বলল. না—লোকটা চিৎকার করেছিল তিনবার। এবার সে নিজেই গলার স্বর নকল করে দেখিয়ে দিল লোকটা কিভাবে চিৎকার করেছিল। আমি গতরাত্রে যে চিৎকার শুনেছিলাম এটা তারই এক অভ্যস্ত দুর্বল সংস্করণ।

আমি তখন মোড়লকে বললাম গতরাতে আমি কি শুনেছিলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম ঘটনাচক্রে কারো কি গ্রামে ফেরার কোনো সম্ভাবনা আছে ? ও খুব জোর দিয়ে বলল না সে সম্ভাবনা নেই। যাওয়ার দুটো মাত্রই রাস্তা আছে—যে সব গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা দুটি গিয়েছে সেখানকার প্রতিটি নরনারী শিশু জানে যে থাক গ্রামে কোনো জনমানবের বাস নেই এবং তার কারণ কি তাও ওরা জানে। সারা জেলায় একথা কারো অজানা নয় যে থাকের কাছে যাওয়া দিনের

আলোতেও বিপজ্জনক—তাই গতরাতে আটটার সময় কারো গ্রামে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যখন ওকে প্রশ্ন করা হল যে একটা পরিত্যক্ত গ্রাম থেকে এরকম একটা চিৎকার কি কারণে আসতে পারে—আর গ্রামে যে কোনো জনপ্রাণী নেই সেই ব্যাপারে ও নিশ্চিত—তখন ও বলল, এর কোনো সদুত্তর ওর জানা নেই।

আমার অবস্থাও মোড়লের থেকে কোনো অংশে ভাল নয় তাই ধরেই নিতে হবে যে সেই বিপন্ন কণ্ঠের পরিষ্কার, আর্ত চিৎকার আমি, কাকারটা বা সম্বরটা শুনি নি।

মোড়ল শুদ্ধু আমাব সব অতিথিবা চলে যাওয়ার পর আমি যখন প্রাতরাশ সারছি তখন আমার ভৃত্য আমায় খবর দিল গতকাল সন্ধেবেলা সেম্ গ্রামের মোড়ল আমার কাছে এসেছিল। সে আমার জন্যে খবর রেখে গেছে যে, যে কুঁড়েঘরের কাছে ওর মা মারা পড়ে তারই পাশে একটা মাঠে ঘাস কাটার সময ওর স্ত্রী জমিতে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে। ও আমার জন্যে সকালবেলা লাধিয়ার পারাপার করার জাযগায় অপেক্ষা করবে। সুতরাং প্রাতরাশ সেরেই আমি রক্তের দাগ সম্বন্ধে খোঁজখবর করার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি যখন নদীটা হেঁটে পেরোচ্ছি, দেখলাম আমার লোকজন আমার দিকে দৌড়ে আসছে, শুকনো মাটিতে পৌঁছনো মাত্রই ওরা আমায় বলল যে ওরা যখন সেম্-এর ওপরের পাহাড়টা থেকে নেমে আসছে তখন ওরা একটা বাঘের ডাক শুনতে পায়—ডাকটা আসছিল উপত্যকার ওদিকে চুকা আব থাকের মাঝামাঝি পাহাড়টা থেকে। জলের আওয়াজে আমি বাঘেব ডাক শুনতে পাই নি। আমি লোকজনদের বললাম আমি সেম্-এ যাচ্ছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চুকায় ফিরব। তারপরে আমি রওনা হলাম।

মোড়ল ওর বাড়ির কাছে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল—ওর স্ত্রী আমাকে নিয়ে গেল যেখানে গতকাল রক্তের দাগ দেখেছিল সেই জায়গাটায়। দাগটা একটা মাঠের মধ্যে দিযে কিছুটা গিয়ে কয়েকটা বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গিয়েছে। একটা পাথরের ওপর আমি কিছু কাকারের লোম দেখলাম। আরো কিছুদূর গিয়ে দেখলাম একটা বড় পুরুষ চিতার থাবার ছাপ—যখন ছাপটা দেখছি তখনই কানে এল একটা বাঘের ডাক। আমার সঙ্গের লোকজনদের শান্ত হয়ে বসতে বলে কোন জায়গায় বাঘটা থাকতে পারে বোঝার জন্যে কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ডাকটা আবার কানে এল, আবার, তারপর দুমিনিট বাদে বাদে ডাকটা চলতেই থাকল।

ডাকটা বাঘিনীটার। অনুমানে বুঝলাম বাঘিনীটা আছে থাকের পাঁচশ গজ নিচে গভীর নালাটার মধ্যে যে নালাটা আমগাছের নিচে ঝরনার কাছ থেকে শুরু হয়ে পথটার সমান্তরালভাবে চলে গেছে। পথটা যেখানে কুমায়া চকের পথের

সঙ্গে মিলেছে সেখানে নালাটা পথের মাঝ-বরাবর গিয়েছে। মোড়লকে বললাম চিতাটা অন্য সময় সুবিধে মত মারা যাবে। তারপর যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পের রাস্তা ধরলাম। নদীর পার ঘাটে যে চারজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের চুকা যাওয়ার জন্যে সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি আমার তাঁবু ঘিরে এক জনতার ভিড়—তাদের মধ্যে অধিকাংশই দিল্লীর করাতী কিন্তু তাদের সঙ্গে আরও ছিল ছোট ঠিকাদার দালাল কেরানী ঘড়িবাবু, আর যে লোকটা লাধিয়া উপত্যকায় কাঠের ও রাস্তা তৈরির ঠিকাদারী নিয়ে যে টাকা লগ্নী করেছে তারই অধীনস্থ কুলি দলের সর্দার। তারা জানতে এসেছে চুকায় আমি আর কতদিন থাকব। তারা জানাল যে কাঠ বইতে আর রাস্তায় কাজ করতে এরকম বহু পাহাড়ী সেইদিনই সকালে বাড়ি চলে গেছে আর আমি যদি ১লা ডিসেম্বর চুকা ছেড়ে চলে যাই, ওরা শুনেছে আমার ইচ্ছে সেইরকমই, তাহলে পুরো মজুরের দল আর সেই সঙ্গে ওরা সেই দিনই চলে যাবে। এমনিতেই ভয়ে ওরা ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারছে না তার ওপর আমি যদি চলে যাই তাহলে আর একজনও এ উপত্যকায় থাকতে সাহস করবে না। সেদিন ছিল ২৯শে নভেম্বর। আমি ওদের বললাম আমার হাতে এখনও দুটো দিন আর দুটো রাত আছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু কোনোমতেই ১লা সকালের বেশি থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে বাঘিনীটা ডাক থামিয়েছিল। আমার চাকর আমায় কিছু খাবার দিলে, সেটা খেয়ে আমি থাকের পথে রওনা হলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাঘিনী আবার যদি ডাকে, আর আমি যদি বুঝতে পারি ও কোথায় আছে তাহলে খুব সাবধানে ওর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব। যদি ও অ না ডাকে তাহলে মোষটার মড়ির ওপর বসব। আমি পথের ওপরেই, যেখান দিয়ে ও নালাটার মধ্যে ঢুকেছে সেখানে ওর থাবার ছাপ দেখলাম আর থাক যাওয়ার পথে যদিও আমি বারে বারে ওর ডাক শোনার জন্যে দাঁড়াচ্ছিলাম কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। সুতরাং সূর্যাস্তের কিছু আগে আমি সঙ্গে আনা চা বিস্কুট খেয়ে নিয়ে বাদাম গাছটায় উঠলাম তারপর বসলাম কয়েক টুকরো দড়ি জড়ানো আমার সেই আসনে—এটা দিয়েই এখন আমার মাচার কাজ চালাতে হবে। এবারে ম্যাগপাইগুলো ছিল না তাই গত সন্ধের মত ওদের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে দু-এক ঘন্টার নিশ্চিন্ত ঘুম আমার আর হল না।

যদি কোনো বাঘ মড়ির কাছে প্রথম রাতে ফিরে না আসে তার মানেই এ নয় যে সে মড়িটা ফেলে রেখে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি বাঘকে দশম রাতে ফিরে এসে মাংস বলে চেনা যায় না এমন মড়ি খেতে দেখেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোনো মড়ির ওপর বসছি না, বসছি এমন একটা জানোয়ারের ওপর যেটাকে বাঘিনীটা মৃত অবস্থায় পেয়েছে আর কিছুটা খেয়েও গেছে। বাঘিনীটা যদি

মানুষখেকো না হত তাহলে ওর দ্বিতীয় রাতে ফিরে আসার ওপর ভরসা করে সারা রাত একটা গাছে বসে থাকার কথা ভাবতামই না, বিশেষ করে যখন মোষের মড়িটা প্রথম রাতেই ওকে ফিরে আসার মত আকর্ষণ করতে পারে নি। সেইজন্যে গুলি চালানোর সুযোগের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়ে আমি গাছের ওপর সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে রইলাম। যদিও গতরাতের মত দীর্ঘ সময় আমাকে কাটাতে হয় নি তবু কষ্ট হয়েছিল অনেক বেশি কারণ যে দড়ির ওপর আমি বসেছিলাম সেগুলো যেন গায়ে কেটে বসে যাচ্ছিল। চাঁদ ওঠার অল্পক্ষণ পর থেকেই একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল আর চলল সারা রাত ধরে আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে। এই দ্বিতীয় রাতে আমি জঙ্গলের বা অন্য কোনো আওয়াজ শুনি নি—সেই সম্বরটাও বাচ্চা নিয়ে আর মাঠে খেতে আসে নি। যখন চাদের আলো ছাপিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠছে তখন আমার মনে হল যেন দূর থেকে একটা বাঘের ডাক শুনলাম। কিন্তু আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারলাম না।

যখন ক্যাম্পে ফিরে গেলাম তখন আমার চাকর এক কাপ চা আর স্নানের জন্যে গরম জল নিয়ে তৈরি। কিন্তু স্নান করার আগেই এক উত্তেজিত জনতাকে আমায় বিদায় করতে হল কারণ আমার ৪০ পাউণ্ডের তাঁবুর মধ্যে স্নান করা চলে না। তারা তাদের গত রাতের অভিজ্ঞতা আমায় বলার জন্যে ছটফট করছিল। ওদের কথাবার্তায় মনে হল চাঁদ ওঠার কিছুক্ষণ পরেই চুকার কাছ থেকে বাঘিনীটা ডাকতে আরম্ভ করে আর কিছুক্ষণ বিরতির পরে পরেই ঘণ্টা দুয়েক ডেকে কুমায়া চকের মজুর বস্তির দিকে চলে যায়। বস্তির লোকজন ওর আসার আওয়াজ পেয়েই চিৎকার করে ওকে তাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু তাড়ানো দূরে থাক, চিৎকারে বাঘিনীটা আরও খেপে যায় এবং যতক্ষণ না লোকগুলো ভয়ে চুপ করে যায় ততক্ষণ ক্যাম্পের সামনে গর্জন করতে থাকে। এই কাজটি সেরে বাঘিনীটি চুকা এবং মজুর বস্তির মাঝামাঝি জায়গায় বাকি রাতটা কাটায়—চিৎকার করে ওকে বিরক্ত করার সাহস কারো আছে কিনা দেখার জন্যেই হয়তো।

মানুষখেকো শিকারের এইটিই আমার শেষ দিন। তাই একটু বিশ্রাম এবং ঘুমের খুব প্রয়োজন থাকলেও আমি স্থির করলাম দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু বাঘিনীর সঙ্গে মোলাকাতের একটা শেষ চেষ্টা করে কাটাতে হবে।

শুধু চুকা আর সেম্-এর লোকই নয় আশপাশের সমস্ত গ্রামের বিশেষ করে তল্লাদেশের লোকজনের বিশেষ ইচ্ছে যে আমি একটা জ্যান্ত ছাগলের ওপর বসে চেষ্টা করি। এই তল্লাদেশেই বছর কয়েক আগে আমি তিনটে মানুষখেকো মারি। তাদের বক্তব্য—"সব পাহাড়ী বাঘই ছাগল খায় আর মোষ দিয়ে চেষ্টা করে যখন ভাগ্য ফেরাতে পারেন নি তখন ছাগল দিয়ে একবার চেষ্টাই করে দেখুন না?" বাঘিনীটাকে গুলি করার কোনো আশাই আমার ছিল না কিন্তু

নেহাতই ওদের মন রাখার জন্যে যে দুটি ছাগল এই উদ্দেশ্যে আমি কিনেছিলাম তাদের ওপর বসে এই শেষ দিনটি আমি কাটাতে রাজী হলাম।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে বাঘিনীটা রাতে যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন, থাককে কেন্দ্র করেই ওর যত ঘোরাফেরা আর সেইজন্যে মধ্যাহ্নে দুটো ছাগল এবং আমার চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে থাকের দিকে রওনা হলাম।

চুকা থেকে থাকের পথ, যেমন আমি আগেও বলেছি, খুব খাড়া একটা ঢিবির ওপর দিয়ে। থাকের সিকি মাইল এদিকে পথটা ঢিবি ছেড়ে মোটামুটি একটা সমতল জমি পার হয়ে গিয়েছে, সমতল জমিটা আমগাছ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমতল জমিটা জুড়ে পথটা গিয়েছে ঘন আগাছার ঝোপের মধ্যে দিয়ে এবং দুটো পুবমুখী নালা পথটা কেটে মূল নালাটির সঙ্গে মিলেছে। এ দুটো নালার মাঝামাঝি জায়গায়, যে গাছটায় বসে আমি গত দুরাত কাটিয়েছি সেই গাছটার থেকে একশো গজ দূরে একটা বিরাট বাদাম গাছ আছে। যখন আমি ক্যাম্প ছাড়ি তখন এই গাছটিই ছিল আমার লক্ষ। পথটা গিয়েছে গাছটার ঠিক নিচ দিয়েই এবং আমি ভাবলাম, আমি যদি গাছটার মাঝামাঝি উঠি তাহলে আমি শুধু ছাগল দুটোই নয় মৃত মোষটিকেও দেখতে পাবো। কারণ একটি ছাগল আমি বাঁধা ঠিক করেছিলাম মূল নালাটির ধারে অন্যটি ডান দিকে পাহাড়ের পাদদেশে। যেহেতু এই তিনটি বিন্দুর দূরত্বই গাছ থেকে বেশ কিছুটা সেইজন্যে আমি কোনো জরুরী অবস্থার জন্যে নেওয়া ৪৫০।৪০০ রাইফেলের ওপরেও একটা নির্ভুল ২৭৫ রাইফেল নিয়ে তৈরি হলাম।

চুকার থেকে ওঠার পথটা এই শেষ দিনে আমার বিশেষ কষ্টকর মনে হল এবং ঢাল ছেড়ে পথটা যেখানে সমতল জমির সঙ্গে মিশে... সেই জায়গাটাতে পৌঁছেছি অমনি আমার বাঁ দিকে প্রায় দেড়শোগজ দূর থেকে বাঘিনীটা ডেকে উঠল। এখানে জমি ঘন আগাছায় ভর্তি, গাছগুলো লতাপাতায় জড়ানো, অসংখ্য সরু গভীর নালায় ক্ষতবিক্ষত আর চারিদিকে ছড়ানো বিশাল বিশাল পাথর—মানুষখেকোর দিকে নিঃশব্দে এগনোর পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। আমি কি করব তা স্থির করার আগে আমার জানা দরকার বাঘিনীটা শুয়ে আছে অথবা চলে বেড়াচ্ছে। চলে বেড়ালে. কোন দিকে বেড়াচ্ছে। অবশ্য শুয়ে থাকাও অসম্ভব নয় কারণ এখন বেলা ১টা বেজে গেছে। তাই লোকজনকে আমার পেছনে বসতে বলে আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার বাঘিনীর ডাক শোনা গেল; ও অন্তত পঞ্চাশ গজ সরে গেছে, মনে হল মূল নালাটা ধরে ও থাকের দিকে যাচ্ছে।

এটা খুবই আশার কথা কারণ বসার জন্যে যে গাছটা আমি বেছে নিয়েছিলাম, নালাটার থেকে তার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। লোকজনকে চুপচাপ আমার পেছন পেছন অনুসরণ করতে বলে আমি পথটা ধরে খুব দ্রুত এগোলাম।

আমরা প্রায় অর্ধেক পথ পেঁছেছি, গাছটায় যেতে আর দুশো গজ মত বাকি—পথের এমন একটা জায়গায় এগোচ্ছি যেখানে পথের দুধারে ঘন আগাছার ঝোপঝাড়—এমন সময় একঝাঁক কালিজ ঝোপ থেকে উঠে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। আমি হাঁটু গেড়ে বসে পথটা কয়েক মিনিট লক্ষ করলাম কিন্তু কিছুই না ঘটায় আমরা সতর্কতার সঙ্গে এগোলাম এবং কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়াই গাছটার কাছে পেঁছলাম। যত তাড়াতাড়ি এবং নিঃশব্দে সম্ভব একটা ছাগল বেঁধে দেওয়া হল নালাটার ধারে, অন্যটাকে বাঁধা হল ডানদিকে পাহাড়ের পাদদেশে, লোকজনকে চষা খেতের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে আমি তাদের নির্দেশ দিলাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত মোড়লের বাড়ির ওপরের বারান্দায় থাকতে তারপর দৌড়ে চলে গেলাম গাছটার কাছে। গাছটায় চল্লিশ ফুটের মত উঠলাম তারপর একটা দড়ির সাহায্যে রাইফেলটা ওপরে টেনে তুললাম। আমার বসার জায়গা থেকে ছাগল দুটির দূরত্ব একটির সত্তর গজ অন্যটির ষাট গজ—আমি শুধু ছাগল দুটিই দেখতে পাচ্ছিলাম না মোষটিরও একাংশ এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমার ২৭৫ রাইফেলটি খুব নিভুল তাই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার দৃষ্টির মধ্যের জমিটুকুর যে কোনো জায়গায় বাঘিনীটা দেখা দিলেই ওকে আমি মারতে পারব।

আমি গতবাবে কেনার পর থেকেই ছাগলদুটো একসঙ্গে আছে তাই এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াতে দুজনেই আকুলস্বরে দুজনকে ডাকাডাকি করতে লাগল। সাধারণভাবেই একটা ছাগলের ডাক শোনা যায় প্রায় চারশো গজ দূরত্ব থেকে কিন্তু এখানে অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল না কারণ পাহাড়টার যে দিকে ছাগলগুলো বাঁধা হয়েছিল সেদিকে খুব জোর বাতাস নিচের দিকে বইছিল—আমি ডাক শোনার পর বাঘিনীটা যদি সরেও গিয়ে থাকে তাহলেও ওর পক্ষে ছাগলগুলোর ডাক না শোনা অসম্ভব। আর ও যদি ক্ষুধার্ত হয়—ও যে ক্ষুধার্ত একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহলে সেটা হবে আমার গুলি চালানোর একটা খুব ভাল সুযোগ।

আমি গাছে মিনিট দশেক কাটানোর পর যেখান থেকে কালিজের ঝাঁকটা উড়েছিল সেখানে একটা কাকার ডেকে উঠল। দুএক মিনিটের জন্যে আমার আশা যেন আকাশ ছুঁয়েছিল কিন্তু তার পরেই সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল কারণ কাকারটা ডাকল মাত্র তিনবার আর প্রতিবারই ওর ডাকটা শেষ হল একটা জিজ্ঞাসায়, যার অর্থ ওই ঝোপের মধ্যে একটা সাপ আছে যেটাকে ও বা কালিজগুলি মোটেই পছন্দ করে নি।

আমার বসার আসনটা অসুবিধের নয় আর সূর্যের আলোও তখন বেশ আরামদায়কভাবে উষ্ণ তাই পরবর্তী তিনঘণ্টা গাছে বসে থাকতে আমি কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নি। বিকেল চারটের সময় থাকের ওপরের পর্বতশ্রেণীর

পেছনে সূর্য অস্ত গেল আর তারপরেই বাতাস হয়ে এল অসহ্য ঠাণ্ডা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমি কষ্ট সহ্য করলাম তারপর হাল ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম, কারণ ঠাণ্ডায় আমার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল—এখন যদি বাঘিনীটা আসেও তাহলেও ওকে তাক করে মারা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি দড়ির ঢিল দিয়ে রাইফেলটা নামিয়ে দিলাম, নিজে নামলাম তারপর চষা জমির ধারে হেঁটে গেলাম আমার লোকজনকে ডাকতে।

আমার মনে হয় কোনো কাজ করতে দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির পর ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়ার যে হতাশা—সে অভিজ্ঞতা হয় নি এমন লোক খুব কমই আছে। একটা শ্রমক্লান্ত দিনের শেষে ব্যাগ ভর্তি পাহাড়ী তিতির নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসা আর সেই একই রাস্তায় মাইলের পর হতাশা ক্লান্ত মাইল হাঁটা, ব্যাগ যখন খালি এই দুটি তুলনা করুন। একটি মাত্র দিনের শেষে এই ধরনের হতাশার শিকার আপনি যদি হয়ে থাকেন—আর আপনার অভিপ্রেত শিকার যদি শুধুমাত্র তিতির হয় তাহলে আপনি অনুমান করতে পারবেন সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি যখন লোকজনদের ডেকে ছাগলগুলিকে খুলে ক্যাম্পের দুমাইল পথ পাড়ি দেওয়ার জন্যে রওনা হলাম আমার হতাশার গভীরতা, কারণ আমার তখন একটা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শুধুমাত্র কয়েকটি পাখি মারাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না আর আমার ব্যর্থতার ফলভোগ শুধু আমাকেই করতে হবে না আরো অনেকেরই ভাগ্য জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

বাড়ি থেকে যাতায়াতের সময়টুকু বাদ দিলে আমি মানুষখেকোটার পিছু পিছু ঘুরছি এদিকে ২৩শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর, ওদিকে আবার ২০শে থেকে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত এবং আপনাদের মধ্যে যাঁরা গলায় বাঘের দাঁত বসার ভয় নিয়ে হেঁটেছেন একমাত্র তাঁরাই কিছুটা অনুমান করতে পারবেন এই ধরনের আশঙ্কার মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটালে একজনের স্নায়ুর ওপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

তার ওপরে আমার অভিপ্রেত শিকার ছিল একটা মানুষখেকো, যাকে গুলি করতে ব্যর্থ হওয়া মানেই ও অঞ্চলে যারা কাজ করছে বা বসবাস করে তাদের প্রত্যেকের জীবন সংশয়। জঙ্গলের কাজ আগেই থেমে গেছে এবং জেলার সব-চেয়ে বড় গ্রামটির অধিবাসীরা সবাই ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। অবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ এবং নিঃসন্দেহে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে যদি মানুষখেকোটাকে মারা না হয় কারণ পুরো মজুরের দল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কাজ থামিয়ে থাকতে পারবে না আর আশপাশের গ্রামের অধিবাসীরাও বাড়িঘর খেতখামার ছেড়ে থাকতে পারবে না—যেমন পেরেছে থাকের তুলনামূলকভাবে সচ্ছল অধিবাসীরা। কয়েকটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, বাঘিনীটা বহুকাল আগেই মানুষ সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক ভয় হারিয়েছে, যেমন—কর্মরত মানুষদের

সামনেই মাঠে আম কুড়োচ্ছিল এমন একটি স্ত্রীলোককে তুলে নিয়ে যাওয়া, একটি স্ত্রীলোককে তার বাড়ির দরজার সামনে মারা, গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে একজন লোককে গাছ থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং গতকাল রাতে কয়েক হাজার লোককে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা। এখানকার স্থায়ী এবং অস্থায়ী অধিবাসীদের কাছে পাহাড়ের পাদদেশের বাজারে, অথবা পূর্ণগিরির মন্দিরে যাওয়ার জন্যে যে সব লোকজন এই জেলার মধ্যে দিয়ে যায় তাদের কাছে একটা মানুষখেকোর উপস্থিতির তাৎপর্য কি তা আমার থেকে ভাল আর কে জানে ? সেই আমি, লোকজনকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি মত মানুষখেকো মারার শেষ দিনটিতে মন্থর গতিতে ক্যাম্পে ফিরে চলেছি ; মনের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করা গভীর হতাশার এই যথেষ্ট কারণ নয় কি ? আমার মনে হয়েছিল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ হতাশার গ্লানি আমার সঙ্গ ছাড়বে না। সেই মুহূর্তে আমি আনন্দের সঙ্গে বাঘিনীটাকে ধীর নিরুদ্বেগভাবে গুলি করার একটা সুযোগের জন্যে আমার বত্রিশ বছরের মানুষখেকো শিকার জীবনের সাফল্য বিনিময় করতে রাজী ছিলাম।

সাতদিন সাতরাত ধরে বাঘিনীটাকে গুলি করার একটি সুযোগের জন্যে আমার কয়েকটি প্রয়াসের কথাই আপনাদের জানিয়েছি কিন্তু আমার প্রচেষ্টা শুধু মাত্র সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি জানতাম আমাকে লক্ষ এবং অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রতিবারই আমি যখন আমার ক্যাম্প আর থাকের মধ্যে দুমাইল জঙ্গলটির মধ্যে দিয়ে যেতাম, বাঘিনীটাকে বুদ্ধির লড়াইয়ে হারাবার জন্যে আমার বত্রিশ বছরের জঙ্গল জীবনে শেখা সব কৌশলই প্রয়োগ করতে হত আমাকে। আমার হতাশা যতই তিক্ত হ'ক না কেন আমি জানতাম আমার কোনো চেষ্টার ত্রুটি এ ব্যর্থতার জন্যে দায়ী নয় বা এমন কোনো কাজ আমি অসমাপ্ত রাখি নি যা থাকতে পারে এই ব্যর্থতার মূলে।

আমার লোকজন আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর আমায় জানাল কাকারটা ডাকার একঘন্টা পরে ওরা বাঘিনীটার ডাক শুনেছিল—ডাকটা আসছিল বহুদূর থেকে কিন্তু ঠিক কোনদিক থেকে ডাকটা আসছিল সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত নয়। বোঝাই যাচ্ছে বাঘিনীটার মোষের মতই ছাগলের ব্যাপারেও অনীহা কিন্তু তাহলেও দিনের ঠিক ওই সময়টিতে একটি অতি পরিচিত অঞ্চল ছেড়ে ওর চলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক নয় অবশ্য এমন যদি না হয় যে ও কোনো আওয়াজে আকৃষ্ট হয়েছিল যা আমি বা আমার লোকজন শুনি নি। যাই হ'ক, কারণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই একথা পরিষ্কার যে ও চলে গেছে এবং আমার আর কিছু করার না থাকায় আমি ক্লান্ত পদক্ষেপে ক্যাম্পের পথে পা বাড়ালাম।

পথটা, আমি আগেই বলেছি সেই ঢিবিটার সঙ্গে মিশেছে যেটা থাক থেকে সিকি মাইল দূরে চুকা পর্যন্ত গিয়েছে এবং আমি যখন এসব জায়গায় পেঁাছেছি

—যেখানে ঢিবিটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া আর যেখান থেকে দেখা যায় বিরাট গিরিবর্ত দুটি, যেগুলি মিশেছে লাধিয়া নদীর সঙ্গে, সেখানে উপত্যকার ওদিক থেকে আমি বাঘিনীর ডাক আরেকবার শুনলাম। বাঘিনীটা তখন কুমায়া চকের একটু ওপরে বাঁদিকে এবং কোটাকিন্দ্রীর ঢিবিটা, যেটার ওপর ওই অঞ্চলে কর্মরত লোকেরা ঘাসের বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছে তারই কয়েকশো গজ নিচে।

সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত তবু এই একটা গুলি করার সুযোগ; এইটিই আমার শেষ সুযোগ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমার করা উচিত না অনুচিত।

আমি যখন গাছ থেকে নেমে আসি তখন অন্ধকার হওয়ার আগে ক্যাম্পে ফিরে যেতে আমার একঘণ্টা হাতে ছিল। লোকজনদের ডাকা, তাদের বক্তব্য শোনা, ছাগলগুলো সংগ্রহ করে ঢিবির দিকে হাঁটার সময় লেগেছিল প্রায় তিরিশ মিনিট এখন নেপাল পর্বত শ্রেণীর মাথায় সিঁদুর রঙ লাগিয়ে অস্তগামী সূর্যের অবস্থান দেখে আমি হিসেব করে নিলাম আমার হাতে এখনও প্রায় একঘণ্টা দিনের আলো আছে। এই সময়ের হিসেব—আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে আলোর হিসেব এখন সব থেকে বেশি জরুরী কারণ এখন আমার সামনের সুযোগটি যদি আমি গ্রহণ করতে পারি তবে পাঁচটি লোকের জীবন বাঁচবে।

বাঘিনীটি এক মাইল দূরে আছে—মধ্যের জমিটা জঙ্গল সমাকীর্ণ, বড় বড় পাথরে ভর্তি আর গভীর নালায় ক্ষত বিক্ষত হলেও ও ইচ্ছে করলে এই দূরত্বটা স্বচ্ছন্দে আধঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করতে পারে। যে প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমি বাঘিনীটাকে ডেকে আনার চেষ্টা করব কিনা। যদি আমি ডাকি আর ও শুনতে পায় এবং দিনের আলো থাকতে থাকতেই এসে আমায় গুলি করার সুযোগ দেয় তাহলে সব ঠিক আছে; কিন্তু অন্যদিকে ও যদি আসে আর আমায় গুলি করার সুযোগ না দেয় আমাদের মধ্যে কয়েকজন আর ক্যাম্পে পেঁছিবে না কারণ এখনও আমাদের যেতে দুমাইল পথ বাকি—এই পথটা পুরোটাই গিয়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, কোনো কোনো জায়গায় পথটার দুধারেই বিশাল বিশাল পাথর, আবার কোনো কোনো জায়গায় ঘন ঝোপঝাড়। সঙ্গের লোকজনদের সঙ্গে আলোচনা করা অর্থহীন কারণ তারা কেউই এর আগে কোন জঙ্গলে আসে নি সেজন্য সিদ্ধান্ত যাই হ'ক সেটা নিতে হবে আমাকেই।

আমি বাঘিনীটাকে ডাকাই স্থির করলাম।

রাইফেলটা একজনের হাতে দিয়ে আমি বাঘিনীটা আর একবার ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তারপর মুখের ওপর হাত জড়ো করে, ফুসফুসে যতটা সম্ভব নিঃশ্বাস ভরে নিয়ে উপত্যকার ওপর দিয়ে একটা উত্তরের ডাক পাঠিয়ে দিলাম। ওর উত্তর ফিরে এল, তারপর কয়েক মিনিট ধরে চলল ডাকের উত্তরে ডাক। ও

আসবে—হয়তো ও রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণ, যদি ও গ্লি করার মত আলো থাকতে থাকতেই এসে পেঁছিয় সব সুবিধেই তাহলে থাকবে আমার দিকে, কারণ ওর মুখোমুখি হওয়ার মত সুবিধের জায়গা আমি নিজের ইচ্ছেমত বেছে নিতে পারব। নভেম্বর মাস বাঘদের সংগমের সময় আর বোঝা গেল ও গত আটচল্লিশ ঘণ্টা জঙ্গল তোলপাড় করে একজন সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং এখন একটা বাঘ তার মিলিত হবার আবেদনে সাড়া দিচ্ছে ভেবে ও তার সঙ্গে যোগ দিতে কোনো সময় নষ্ট করবে না।

ঢিবিটার চারশো গজ নিচে পথটা প্রায় পঞ্চাশ গজ গিয়েছে একটা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে। এই সমতল ভূমির দূরের ডানদিকে পথটা একটা বিরাট পাথরকে পাক খেয়ে খাড়া নেমে গেছে তারপর চুলের কাঁটার মত মোচড় খেতে খেতে পরবর্তী বাঁক পর্যন্ত গিয়েছে। এই পাথরের ওপরেই আমি বাঘিনীটার সম্মুখীন হওয়া স্থির করলাম এবং নিচে নামার পথে বেশ কয়েকবার ডাকলাম— উদ্দেশ্য আমার অবস্থান পরিবর্তনের কথা ওকে জানানো এবং ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

আমি চাই এই জায়গাটির একটি পরিষ্কার ছবি আপনি মনে মনে এঁকে নিন যাতে পরবর্তী ঘটনাগুলি আপনি অনুধাবন করতে পারেন। চল্লিশ গজ চওড়া, আর আশি গজ লম্বা একটা চতুর্ভুজ জমির কথা ভাবুন যেটা গিয়ে শেষ হয়েছে মোটামুটি খাড়া একটা পাথরের গায়ে। থাক থেকে নেমে আসা পথটা এই জমিটার ওপর দিয়ে গেছে সরু বা দক্ষিণ দিকটায় তারপর জমিটার মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে পঁচিশ গজ গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে এবং চতুর্ভুজ জমিটা ছেড়েছে ওটার চওড়া অথবা পূব দিকে। যে জায়গাটায় পথটা সমতলভূমি ছেড়েছে সেখানে একটা প্রায় চার ফুট উঁচু পাথর আছে। যেখানে পথটা ডান দিকে মোড় নিয়েছে তার থেকে কিছুটা এগিয়ে একটা তিন চার ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি উঠে চলে গেছে চতুর্ভুজ জমিটার উত্তর দিক পর্যন্ত যেখানে জমিটা সোজা নেমে গেছে একটা খাড়া পাথরের গা বেয়ে। এই নিচু ঢিবিটার নিকটবর্তী অথবা পথের দিকে সারিবন্ধ ঘন ঝোপঝাড়—চার ফুট উঁচু যে পাথরটার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার দশ ফুটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। চতুর্ভুজ জমিটার অন্যান্য জায়গা গাছ, ছড়ানো ঝোপঝাড় আর ছোট ঘাসে ভর্তি।

আমার ইচ্ছে ছিল পাথরটার দিকে পথের ওপর শুয়ে থাকা এবং বাঘিনীটা আমার দিকে এগনোর সময়ে গুলি করা কিন্তু এই অবস্থানটি পরখ করে দেখলাম যে ও আমার দু-তিন গজের মধ্যে আসার আগে ওকে আমি দেখতেই পাব না, আর তাছাড়া বাঘিনীটা পাথরটা ঘুরে অথবা আমার বাঁ দিকের ছড়ানো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আমায় ধরতে পারে একেবারে সম্পূর্ণ আমার দৃষ্টির বাইরে থেকে। পাথরটার যে দিক দিয়ে বাঘিনীটা আসবে আমি আশা করেছিলাম তার

উল্টো দিকে একটা সরু আলসে মত বেরিয়ে আছে। তার ওপর বসে দেখলাম আমার পশ্চাদ্দেশের অল্প অংশই আলসেটার ওপর ধরল—বাঁ হাতে পাথরটার গোলাকৃতি ওপরটা ধরে আর ডান পা-টা টানটান করে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে আঙুল দিয়ে মাটি স্পর্শ করে আমি কোনো মতে ওটার ওপর থাকতে পারলাম। লোকজন এবং ছাগলগুলিকে রাখলাম ঠিক আমার পেছনে, আমার থেকে দশ বারো ফুট নিচে।

বাঘিনীকে অভ্যর্থনা জানানোর সব প্রস্তুতিই এখন শেষ আর যার জন্যে এত আয়োজন সে ততক্ষণে তিনশো গজের মধ্যে এগিয়ে এসেছে। দিক জানাবার জন্যে শেষবারের মত ওকে একবার ডেকে আমি পেছন ফিরে দেখলাম আমার লোকজন ঠিক আছে কিনা।

লোকজনকে যে অবস্থায় দেখলাম তা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে হাস্যকর মনে হত কিন্তু এখন দৃশ্যটি খুব করুণ মনে হল। খুব কাছ ঘেঁষে, হাঁটু মুড়ে, মাথা কাছাকাছি এনে বৃত্তাকারে ওরা বসে আছে, ছাগলগুলো ওদের তলায় লুকানো—ওদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সেই উৎকণ্ঠাভরা কৌতূহল যা দেখা যায় একটা বড় কামান ছুটে যাওয়ার আগে অপেক্ষমান দর্শকদের মুখে। ঢিবিটার ওপর থেকে আমরা প্রথম বাঘিনীর ডাক শোনার পরে লোকজন অথবা ছাগলগুলো একটা চাপা কাশির ওপরে একটি আওয়াজও করে নি। ওরা এতক্ষণে বোধ হয় ভয়ে হিম হয়ে গেছে—হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই- আর যদি হয়েও থাকে তাহলেও ওদের বাহাদুরী না দিয়ে উপায় নেই কারণ ওরা যে কাজ করার সাহস দেখিয়েছে তা আমি ওদের অবস্থায় থাকলে করার কথা স্বপ্নেও ভাবতাম না। এই ভয়াবহ জানোয়ারটি গত দুরাত ধরে ওদের জাগিয়ে রেখেছে, এর সম্বন্ধে গত সাতদিন ধরে ওরা নানারকম অতিরঞ্জিত এবং রক্ত জল করা গল্প শুনেছে আর এখন যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ওরা বিনা অস্ত্রে বসে আছে একটা জায়গায় যেখান থেকে ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না শুধু শুনতে পাচ্ছে মানুষখেকোটা কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে; এর থেকে বেশি সাহস বা বিশ্বাসের কথা কল্পনাও করা যায় না।

আমি যে আমার রাইফেলটা, একটা ডি, বি, ৪৫০।৪০০ বাঁ হাত দিয়ে ধরতে পারছিলাম না (এই হাত দিয়ে ধরে পাথরের আলসেটার ওপর কোনোরকমে আমি বসেছিলাম) তাতে আমার একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল—কারণ পাথরটার গোলাকৃতির ওপরে রাইফেলটা পিছলে যেতে পারে—অবশ্য তা যাতে না হয় সেজন্যে আমি একটা রুমাল ভাঁজ করে রাইফেলটা তার ওপরে রেখেছিলাম—কিন্তু আমার কোনো ধারণা ছিল না ঠিক এই অবস্থায় বসে একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাইফেল ছুঁড়লে তার পিছন পানের ধাক্কার প্রতিক্রিয়া কি হবে। রাইফেলটার মুখ যে পথটার দিকে তার ওপরে কুঁজের মত একটা উঁচু জায়গা।

আমার উদ্দেশ্য ছিল পাথরটার থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে এই কুঁজের মত উঁচু জায়গাটায় উপস্থিত হলেই বাঘিনীটার মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ব।

বাঘিনীটা কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে এল না—এ রাস্তায় এলে কুঁজটার কিছু দূরে একটা পথের ওপর উঠত ও একটা গভীর গিরিবর্ত পার হয়ে ও সোজা চলে এল যেখানে আমার শেষ ডাকটা ও শুনেছিল, সেখানে ঘড়ির কাঁটা একটা বাজার সময় যে ভাবে থাকে ও অনেকটা সেই ধরনের একটা কোণ সৃষ্টি করে এল। এই কৌশলের ফলে নিচু পাথরের ঢিবিটা আমাদের মধ্যে পড়ে গেল, ওপারটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ও খুব নির্ভুলভাবে আমার শেষ ডাকের জায়গাটা বের করেছিল কিন্তু দূরত্বটা ঠিক আঁচ করতে পারে নি এবং সম্ভাব্য সঙ্গীকেও আশানুরূপ জায়গায় দেখতে না পেয়ে ওর রাগ ক্রমেই একটা প্রচণ্ড রূপ নিচ্ছিল। এই অবস্থায় একটা বাঘিনীর রাগ যে কি আকার ধারণ করতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার এর থেকে ধারণা হবে যে আমার বাড়ি থেকে কিছু মাইলের মধ্যে একটি বাঘিনী একবার জনসাধারণের রাস্তা প্রায় এক সপ্তাহ বন্ধ রেখেছিল, যা কিছুই যাওয়ার চেষ্টা করে তাই আক্রমণ করে ও এমনকি একটা উটের সারিও ওর হাত থেকে রেহাই পায় নি—এই চলে যতদিন না একজন সঙ্গীর সঙ্গে ওর মিলন হয়।

এমন কোনো আওয়াজ আমার জানা নেই যা খুব কাছাকাছি থেকে একটা অদৃশ্য বাঘের গর্জনের থেকে বেশি স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্ট করতে পারে। আমার লোকজনের ওপর এই ভয়ংকর আওয়াজের প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে তা ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছিল এবং ওরা যদি আর্ত চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করত তাহলেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হতাম না কারণ যদিও একটা ভাল রাইফেলের পেছন দিক আমার কাঁধে, কুঁদো আমার গাল ছুঁয়ে আছে, তাহলেও আমার নিজেরই চিৎকার করে ওঠার বাসনা আমি বহু কষ্টে দমন করছিলাম।

কিন্তু এই গর্জনের থেকেও ভয়াবহ হচ্ছে ক্রম বিলিয়মান আলো। আর কয়েক সেকেণ্ড, খুব বেশি হলে দশ থেকে পনের সেকেণ্ডের মধ্যেই অন্ধকার এত ঘন হয়ে আসবে যে আমার রাইফেলের সাইটে কিছু দেখা যাবে না—তখন আমাদের জীবন নির্ভর করবে একটা মানুষখেকোর মর্জির ওপর—শুধু তাই নয়, সঙ্গীর সঙ্গলিপ্সু এক বাঘিনীর ওপর। বেপরোয়াভাবে হত্যার হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হলে একটা কিছু করতেই হবে, আর খুব তাড়াতাড়ি—একমাত্র করণীয় যার কথা আমি এই মুহূর্তে ভাবতে পারি তা হচ্ছে ডাকা।

বাঘিনীটা এখন আমার এত কাছে যে প্রতিবার ডাকার আগে ওর নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম—এর পরে ও যখন ফুসফুস ভর্তি করে নিশ্বাস নিল, আমিও ঠিক তাই করলাম, তারপর দুজনে একসঙ্গে ডেকে

উঠলাম। চমকে ওঠার মত দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া হল। মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করে ও মরা পাতার ওপর দিয়ে, উঁচু ঢিবিটা বেয়ে আমার সামনের ডান দিকের ঝোপে দ্রুত পদক্ষেপে চলে এল আর যখন ও আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, ও থেমে গেল আর পরমুহূর্তে ওর গুরুগম্ভীর গলার গর্জন আছড়ে পড়ল আমার মুখের ওপর—আমার মাথায় টুপি পরা থাকলে সেটা গর্জনের মুখে উড়ে যেতো। মুহূতের বিরতি, তারপরেই আবার দ্রুত পদক্ষেপ; দুটো ঝোপের মধ্যে একঝলক দেখা দিয়ে ও একেবারে খোলা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়েই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল।

আমার ভাগ্য আশাতীত রকম ভাল হওয়ার দরুনই বাঘিনীটা সামনে ডানদিকে যে আধডজন পা ফেলেছিল তা ওকে নিয়ে গেল ঠিক সেই বিন্দুটিতে যেখানে আমার রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করা আছে। শেষ ডাকটির আগে যে দিক দিয়ে আসছিল সেই দিকেই ও যদি এগিয়ে যেত তাহলে আমার গল্প কোনোদিন লেখা হত কি না সন্দেহ—তার সমাপ্তিটা অন্যরকম হত কারণ গোলাকৃতি পাথরটার ওপরে রাইফেল ঘোরানো অসম্ভব ছিল আর তেমনিই অসম্ভব ছিল একহাতে রাইফেল তুলে গুলি চালানো।

বাঘিনীটার নৈকট্য এবং ম্লান হয়ে আসা আলোর দরুন ওর মাথাটাই শুধু আমি দেখতে পেলাম। আমার প্রথম বুলেটটা লাগল গিয়ে ওর ডান চোখের নিচে আর দ্বিতীয়টি যেটি আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে ছোঁড়া নয়, হঠাৎ ছুটে গিয়ে লাগল ওর গলায়—ও পাথরে নাকটা রেখে চির বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়ল। ডানদিকের নলটার পেছনের ধাক্কায় পাথরটার ওপর আমার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে আমি ঠিকরে পড়লাম আলসেটার ওপর থেকে এবং আমি শূন্যে থাকা অবস্থায় রাইফেলটা আরেকবার ছুটে যাওয়ায় বাঁ দিকের নলের পেছনের ধাক্কায় রাইফেলটা প্রচণ্ড জোরে লাগল আমার চোয়ালে আর আমি মানুষ-ছাগলের ওপর ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম। আবার ওই চারটি লোককে আমি বাহাদুরী জানাই যে পরমুহূর্তেই বাঘিনীটা ওদের ওপর ঝাঁপ দেবে কিনা তার কোনো স্থিরতা নেই তবুও আমায় পড়ন্ত অবস্থায় ওরা ধরে ফেলেছিল এবং এইভাবে আমাকে যাঘাত থেকে আর আমার রাইফেলটি ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে ওরা বাঁচিয়েছিল।

মানুষ ও ছাগলের পায়ের জট থেকে নিজেকে উদ্ধার করে আমি যে লোকটি কাছে ছিল তার হাত থেকে আমার ২৭৫ রাইফেলটি নিয়ে ম্যাগাজিনের মধ্যে বেশ কয়েকটা গুলি পুরে দিলাম তারপর পাঁচটা গুলির একটা ঝাঁক ছেড়ে দিলাম, গুলিগুলো শিস দিয়ে চলে গেল উপত্যকার ওপর দিয়ে সারদা পেরিয়ে নেপালের মুখে

উপত্যকা এবং আশপাশের গ্রামের লোক যারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আমার রাইফেলের আওয়াজ শোনার জন্যে, তাদের কাছে দুটো গুলির আওয়াজের যে কোনো মানে হতে পারে কিন্তু দুটো গুলির পরেই ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড বিরতির পরে পরে আরো পাঁচটি গুলির আওয়াজ ওদের কাছে একটাই শুভ সংবাদ পৌঁছে দেবে যে মানুষখেকোটি মারা পড়েছে।

পাহাড়ের ওপর বাঘিনীটার প্রথম ডাক শোনার পর থেকে আমি আমার লোকজনের সঙ্গে কথা বলি নি। আমি যখন ওদের বললাম যে বাঘিনীটা মারা গেছে এবং আর আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মনে হল ওরা আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না তাই আমি ওদের বললাম গিয়ে দেখতে আর আমি একটা সিগারেট বার করে ধরালাম। খুব সতর্কভাবে ওরা পাথরটার ওপর উঠল কিন্তু তার বেশি এগোল না কারণ আমি আগেই বলেছি বাঘিনীর শরীব পাথরের ওদিকটা স্পর্শ করে ছিল। সে রাতে ক্যাম্পে, ক্যাম্প আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে ওরা যখন উদ্‌গ্রীব শ্রোতাদের কাছে ওদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল —ওদের বিবরণী ঘুরে ফিরে এই একটি কথায় শেষ হচ্ছিল,—'তারপর বাঘটা, যার গর্জন শুনে আমাদের পিলে গলে জল হয়ে যাচ্ছিল, সাহেবকে মাথায় মেরে আমাদের ওপর উল্টে ফেলে দিল আর তোমরা যদি আমাদের বিশ্বাস না কর, গিয়ে ও'র মুখ দেখ।' আয়না, ক্যাম্পে একটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস আর আমার যদি একটা আয়না থাকতও তাহলেও আমার চোয়ালের ফোলাটা, যার জন্যে আমাকে বেশ কিছুদিন শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হয়েছিল, নিশ্চয়ই আমার যে রকম মনে হচ্ছিল যতখানি ফোলা এবং কষ্টকর দেখাত না।

একটা চারাগাছ কেটে বাঘিনীটাকে তার সঙ্গে বাঁধার সময়টুকুর মধ্যেই লাধিয়া উপত্যকায় এবং আশপাশের সমস্ত বস্তি এবং গ্রামে আলো দেখা যেতে লাগল। ওই চারজন লোক বাঘিনীটাকে ক্যাম্পে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্মানের জন্যে খুবই আগ্রহী ছিল কিন্তু কাজটা ছিল ওদের সাধ্যের বাইরে সেইজন্যে আমি ওদের রেখে সাহায্যের জন্যে এগোলাম।

গত আট মাসে আমার তিনবার চুকা যাত্রায় দিনের বেলা বহুবার এ পথটা পেরিয়েছি এবং তখন সব সময় আমার হাতে ছিল গুলিভরা রাইফেল আর এখন নিরস্ত্র অবস্থায় অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি, আমার একমাত্র চিন্তা কি করে পড়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। কোনো প্রচণ্ড ব্যথা হঠাৎ কমে যাওয়া যদি সব থেকে সুখের হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারপরেই স্থান নেবে কোনো ভয়াবহ আতঙ্কে হঠাৎ নির্মূল হয়ে যাওয়া। মাত্র একঘণ্টা আগেই ওই মানুষগুলোকে তাদের ক্যাম্প,· বাড়ি থেকে টেনে বার করতে খ্যাপা হাতির দলের দরকার হত, কিন্তু তারাই এখন গান করতে করতে, চিৎকার করতে করতে, একা বা সদলে চারিদিক থেকে জড়ো হচ্ছে থাক-মুখী রাস্তাটার ওপর। এই দ্রুত

জমে ওঠা ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকটি লোক বাঘিনীটাকে বয়ে আনতে সাহায্যের জন্যে রাস্তার ওপর দিকে চলে গেল। অন্যরা আমার ক্যাম্পের পথের সঙ্গী হল এবং আমি সম্মতি দিলে ওরা সেদিন আমায় বয়ে নিয়ে যেত। আমাদের গতি খুব মন্থর ছিল কারণ নবাগতদের তাদের নিজেদের মতন ভাবে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমাদের থেকে থেকেই দাঁড়াতে হচ্ছিল। এর ফলে যে দলটি বাঘিনীটা বয়ে আনছিল তারা আমাদের ধরে ফেলার সময় পেল এবং আমরা এক সঙ্গেই গ্রামে প্রবেশ করলাম। সেদিন আমি এবং আমার লোকজন যে সংবর্ধনা পেয়েছিলাম বা চুকায় সে রাতে যে সব দৃশ্য দেখেছিলাম তা বর্ণনা করার চেষ্টা করব না কারণ জীবনের অধিকাংশ সময় জঙ্গলে জঙ্গলে কাটালেও, কথা দিয়ে ছবি আঁকার সামর্থ্য আমার নেই।

একটা খড়ের গাদা নামিয়ে বাঘিনীটাকে তার ওপর শোয়ানো হল আর দৃশ্যটি আলোকোজ্জ্বল করার জন্যে, উষ্ণতার জন্যেও বটে, কারণ রাতটা অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা আর একটা উত্তুরে বাতাসও বইছিল তাই আশপাশ থেকে জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব করা হল। মাঝরাত নাগাদ আমার চাকর, থাকের মোড়ল এবং যার বাড়ির কাছে আমি ক্যাম্প করেছিলাম সেই কুনোয়ার সিং-এর সাহায্যে জনতাকে তাদের নিজের নিজের গ্রাম ও মজুর-ক্যাম্পে ফিরে যেতে রাজী করাল—তাদের বলা হল পরদিন বাঘিনীটাকে চোখ ভরে দেখার সুযোগ তারা যথেষ্ট পাবে। নিজে চলে যাওয়ার আগে থাকের মোড়ল আমায় বলে গেল যে সকালে ও থাকের অধিবাসীদের গ্রামে ফিরে যেতে বলবে। ও কথা রেখেছিল এবং দুদিন পরে সব লোকজন তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল আর তারপর থেকেই তারা সুখে স্বচ্ছন্দেই বসবাস করছে।

আমার মাঝরাতের খাওয়া শেষ করে আমি কুনোয়ার সিংকে ডেকে পাঠালাম এবং তাকে বললাম যে প্রতিশ্রুত দিনটিতে বাড়ি পৌঁছতে হলে আমায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হয়ে যেতে হবে এবং ওকে সকালে লোকজনকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন আমায় চলে যেতে হল। ও কথা দিল এ কাজটি ও করবে, তখন আমি গেলাম বাঘিনীটার ছাল ছাড়াতে। পকেট ছুরি দিয়ে একটা বাঘের ছাল ছাড়ানো অনেক সময়ের ব্যাপার কিন্তু এতে জানোয়ারটা ভালভাবে পরখ করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় যা অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায় না। এবং মানুষখেকোদের ক্ষেত্রে মোটামুটি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায় জানোয়ারটি মানুষখেকো হয়ে যাওয়ার কারণ কি।

বাঘিনীটি তুলনামূলকভাবে কম বয়েসী এবং সঙ্গমের মরসুমের আগে ঠিক যেমনটি আশা করা যায়, শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, ওর গাঢ় রঙের শীতের চামড়াতে কোনো দাগ নেই এবং আমার দেওয়া খাদ্যসম্ভার বারে বারে প্রত্যাখ্যান করলেও ওর শরীর চর্বিতে ঢাকা। ওর শরীরে ছিল দুটি

বন্দুকের গুলির ক্ষত কিন্তু কোনোটাই চামড়ার ওপর দেখা যায় না। একটা ওর বাঁ কাঁধে. ক্ষতটা হয়েছে কোনো ঘরে তৈরি গাদাবন্দুকের ছররায়—ক্ষতটা ক্রমে বিষাক্ত হয়ে যায় তারপর যখন শুকোতে আরম্ভ করে তখন বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে চামড়া, বেশ পাকাপাকিভাবে মাংসের সঙ্গে জুড়ে যায়। এই ক্ষতটা ওকে কতটা অক্ষম করে দিয়েছিল তা বলা কঠিন হত কিন্তু ওটা শুকোতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছে এবং ওর মানুষখেকো হওয়ার মূলে এ ক্ষতটি একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষতটি, যেটি ওর ডান কাঁধে, সেটিও হয়েছে গাদাবন্দুকের গুলিতেই তবে সেটা বিষাক্ত না হয়ে শুকিয়ে গেছে।

মানুষখেকো হওয়ার আগের দিনগুলিতে মড়ির ওপর পাওয়া এই চোট দুটিই ওর মানুষের মড়ি এবং অন্যান্য যে সব মড়ির ওপর আমি বসেছিলাম সেগুলির কাছে ফিরে না আসার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ। বাঘিনীটার ছাল ছাড়ানো হলে আমি স্নান করে পোশাক পরে নিলাম এবং যদিও আমার মুখে ফোলা ও ব্যথা দুইই ছিল আর সামনে ছিল কুড়ি মাইল দুর্গম রাস্তা, আমি যখন হেঁটে চুকা ছাড়লাম তখন আমি যেন বাতাসে উড়ছি। উপত্যকায় এবং আশেপাশে হাজার হাজার লোক তখন শান্ত ঘুমে মগ্ন।

যে জঙ্গলের গল্প আপনাদের শোনাতে শুরু করেছিলাম তা শেষ হল এবং আমিও আমার মানুষখেকো শিকার জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

একটা দীর্ঘমেয়াদী কাজের পালা শেষ হল এবং সেদিন যে আমি নিজের পায়ে হেঁটে বেরোতে পেরেছিলাম আর আমাকে যে থাকের সেই মানুষটির প্রদর্শিত প্রথা অনুসারে একটা দোলনায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি। এতে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করি।

জীবনের অনেক ক্ষেত্রে প্রাণটা ঝুলেছে একটা সুতোর মুখে, কখনও রোদে জলে ঘোরা, পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ হয়ে উঠেছে কঠিন কিন্তু আমার শিকারের ফলে একটি মানুষের প্রাণও যদি বেঁচে থাকে তাহলে এসব কষ্ট স্বীকারের জন্যে নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করব।

শুধুই বাঘ

আমার মনে হয় সব শিকারীই যাঁদের রাইফেল এবং ক্যামেরা এই দুটি জিনিস দিয়ে বাঘ শিকারের দ্বৈত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ হয়েছে তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এই দুই ধরনের শিকারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য —এ পার্থক্য যদি বেশি নাও হয় তাহলেও অনেকটা হাল্কা ছিপ দিয়ে পাহাড়ের বরফগলা ঝরনায় ট্রাউট মাছ ধরা আর রৌদ্রতপ্ত পুকুরপাড়ে একটা স্থির ছিপ দিয়ে মাছ মারার পার্থক্যের মত।

ক্যামেরা এবং রাইফেল দিয়ে শিকারের মধ্যে খরচের ব্যবধানের কথা এবং ব্যাঘ্রকুলের দ্রুত বিলুপ্তির মূলে এর অবদানের কথা বাদ দিলেও বলা যায় যে একটা ভাল ছবি তোলা শিকারীকে বাঘ মারার ট্রফি পাওয়ার থেকেও অনেক বেশি আনন্দ দেয়; তা ছাড়া ছবি আনন্দ দেয় বন্য প্রাণী সম্বন্ধে উৎসাহী সবাইকে আর ট্রফি লাভের আনন্দ শুধু ট্রফি বিজেতার ব্যক্তিগত। উদাহরণ স্বরূপ আমি ফ্রেড চ্যাপম্যানের দৃষ্টান্ত দেখাব। চ্যাম্পিয়ন যদি ক্যামেরার বদলে রাইফেল দিয়ে বাঘ শিকার করতেন ও'র ট্রফিগুলি সব গৌরব হারিয়ে এতদিনে ডাস্টবিনে স্থান পেত কিন্তু ও'র ক্যামেরায় ধরা তথ্যগুলি ও'র নিজের কাছে একটা চিরন্তন আনন্দের উৎস এবং পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের শিকারীদের কাছে গভীর আগ্রহের জিনিস।

চ্যাম্পিয়নের বই 'with a camera in Tiger-land দেখতে দেখতেই আমার প্রথম বাঘের ছবি তোলার কথা মনে হয়। চ্যাম্পিয়নের আলোক চিত্রগুলি স্থির ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ লাইটে তোলা, এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় দিনের আলোয় ছবি তোলা স্থির করলাম। একজন অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধুর উপহার, একটি বেল অ্যান্ড হাওয়েলের ১৬-সি. মি. ক্যামেরা আমার ঠিক প্রয়োজনমত অস্ত্রটি আমার হাতে তুলে দিল এবং যে 'অরণ্যের স্বাধীনতা'র অধিকারী আমি তা আমাকে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবাধে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দিয়েছিল। দশ বছর ধরে আমি ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে শ'য়ে শ'য়ে মাইল ঘুরে বেড়াই। কোনো কোনো সময়ে বাঘরাই তাদের মড়ির কাছে আমার এগনো বিশেষ পছন্দ না করায় আমায় বিদায়জ্ঞাপন করে আর অন্যান্য সময় বাঘিনীরা তাদের বাচ্চাদের কাছে আমার এগনোর প্রতিবাদে আমায় জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই সময়টিতে আমি বাঘদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্য কিছু শিখি এবং যদিও বাঘ সম্ভবত দুশো বার দেখেছি তবু আমি সন্তোষজনক কোনো ছবি তুলতে সমর্থ হই নি। ফিল্ম আমি

বহুবার এক্‌সপোজ করেছি কিন্তু প্রতিবারই বেশি আলো, কম আলো, ঘাস পাতার বাধা বা লেন্‌সে মাকড়সার জাল হওয়ার দরুন ফল হতাশাজনক হয়েছে ; একবার ছবি খারাপ হয়ে গিয়েছিল ধোয়ার সময়ে ফিল্মের ওপরের প্রলেপটি গলে যাওয়ার দরুন।

অবশেষে ১৯৩৮ সালে আমি পুরো শীতকালটা একটা ভাল ছবি তোলার শেষ চেষ্টায় কাটাব ঠিক করলাম। অভিজ্ঞতার থেকেই আমি বুঝেছিলাম যে যেমন তেমনভাবে বাঘের ছবি তোলা সম্ভব হবে না। আমার প্রথম চিন্তাই হল একটা ভাল জায়গা বেছে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত আমি একটা খোলা পঞ্চাশ গজ চওড়া গিরিবর্ত বেছে নিলাম, তার মধ্যিখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা ঝরনা আর দু পাড়ে ঘন গাছ আর ঝোপঝাড়ের ভিড়। খুব কাছাকাছি ছবি নেওয়ার সময়ে ক্যামেরার আওয়াজ বন্ধ করারার জন্যে আমি ঝরনাটা কয়েক জায়গায় আটকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু ছোট ছোট জলপ্রপাতের মত তৈরি করলাম। এবার আমি বাঘের খোঁজ করলাম এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি জায়গায় সাতটি বাঘের খোঁজ পেয়ে তাদের কয়েক গজ করে আমার জঙ্গলের স্টুডিওর দিকে আকৃষ্ট করতে আরম্ভ করলাম। এটা খুব সময়সাপেক্ষ এবং পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার—এর প্রতি পদে বাধা এবং হতাশা, কারণ যে অঞ্চলটায় আমি এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম সেখানে বহু শিকার হয়ে গেছে এবং একমাত্র দৃষ্টির বাইরে রেখেই অবশেষে আমি বাঘগুলিকে ঠিক যে জায়গাটিতে চাই সেখানে নিয়ে আসতে পারলাম। একটি বাঘ আমার না জানা কোনো কারণে পৌছনোর পরদিনই চলে যায় কিন্তু আমি তার একটা ভাল ছবি নেওয়ার আগে নয়। আর ছটিকে একত্রে করে আমি তাদের ওপর প্রায় হাজার ফুট ফিল্ম আলোকসম্পাত করি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে শীতটা ছিল আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বেশি ভিজে স্যাঁতসেঁতে এবং লেন্সের ওপর জলকণা জমে, ক্যামেরায় কম আলো যাওয়ার ফলে, এবং তাড়াতাড়ি ও সযত্নে ফিল্মের রিল গোটানোর দরুন বেশ কয়েকশো ফুট ফিল্ম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রায় ছ' শো ফুট ফিল্ম আছে যার সম্বন্ধে আমার গর্ব অসীম কারণ সেটি হচ্ছে ছটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের জীবন্ত আলেখ্য— তার মধ্যে চারটি পুরুষ—দুটির দৈর্ঘ্য দশ ফুটেরও বেশি আর দুটি বাঘিনী দুটির মধ্যে একটি সাদা বাঘিনী—ছবিটি তোলা দিনের আলোয়, দশ থেকে ষাট ফুট দূরত্বের মধ্যে।

পুরো ছবি তোলার ব্যাপারটা শুরু থেকে শেষ অবধি সাড়ে চার মাস সময় লেগেছিল আর যে অগুনতি ঘণ্টা আমি আমার ছোট্ট ঝরনা আর ক্ষুদে জলপ্রপাতগুলির কাছে শুয়ে কাটাই একটি বাঘও আমায় কোনোদিন দেখতে পায় নি।

ছটি বাঘের কাছে দিনের আলোয় কয়েক ফুটের মধ্যে এগনো একটা অসম্ভব

ব্যাপার সেইজন্যে রাত চলে যাওয়ার পর দিনের আলো ফোটার আগে খুব ভোরে এগোতে হত ওদের দিকে—শীতকালের জমে থাকা শিশিরের দরুনই সম্ভব হত সেটা আর ছবি তুলতে হয়েছিল যেমন আলো আর সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সেই অনুযায়ী। ১৬ মি. মি ফিল্ম পর্দায় প্রতিফলনের পর যতই পরিষ্কার দেখাক না কেন এর এনলার্জমেন্ট ভাল হয় না। যাইহ'ক এই বইয়ের সঙ্গের ছবিগুলির থেকে আমার অরণ্য স্টুডিও এবং আমার ছবির বিষয়বস্তুদের আকার এবং অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।

———

ট্রৌ টপ্‌স

মুখবন্ধ

মহামান্যা রাণীর ১৯৫২ সালে ট্রী টপ্‌স পরিদর্শনের গল্প জিম করবেট লেখেন ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৫ সালে কেনিয়াতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগে। তখন তাঁর বয়েস প্রায় আশির কাছাকাছি। ১৯৫১ সালে তিনি যখন ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে আসেন তখন তাঁর শরীরে বয়সের ছাপ তত পড়ে নি, কিন্তু ব্রিটিশ সেনাদলকে বার্মা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে জঙ্গল যুদ্ধে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে মধ্য ভারতে তিনি যে কঠিন অসুখে পড়েন তার থেকে তিনি কোনোদিনই সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি।

আমি জানি না তাঁর সম্বন্ধে যে ছবি তাঁর পাঠকেরা মনে মনে এঁকেছেন তার সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিপটে আঁকা ছবির পার্থক্য কতখানি। এক হিসেবে যে পাঠক তাঁকে তাঁর লেখার মাধ্যমে জেনেছেন তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবের চেয়েও ভাগ্যবান। তাঁর লেখায়, মানুষখেকোর মুখোমুখি হওয়ায়, যে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বিপদের বিবরণ পাঠককে অতুলনীয় আনন্দ দেয় সে সম্বন্ধে তিনি কথা বলেছেন কদাচিৎ। আমার মনে হয়, তিনি ভাবতেন এ ব্যাপারগুলো,—যে বিরাট জানোয়ারদের শক্তি ও সাহসকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাদের এবং তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এদের মানুষের সন্ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠার ঘটনাটা তিনি সহজেই ভুলে যেতে পারতেন। তাঁর পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারেন নি যে এই শান্ত ও নিরহঙ্কার মানুষটির নাম এবং কীর্তি সারা কুমায়ুন জুড়ে ছড়ানো কুঁড়েঘরগুলির প্রতিটি পাহাড়ীর মুখে মুখে। আমার সন্দেহ হয় যে উনি ওঁর সর্বপ্রথম বইটি, 'ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' ১৯৪৪ সালে পৃথিবীকে উপহার দিতেন কিনা, যদি না তাঁর আশা থাকত যে বইটির প্রকাশ সেণ্ট ডানস্টান তহবিলে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারে, যে-প্রতিষ্ঠানটি তার আগের বছরই যুদ্ধে অন্ধ হয়ে যাওয়া ভারতীয় সৈনিকদের জন্যে একটা শিক্ষণ শিবির খুলেছিল। আমার মনে পড়ে এ সাহায্য যে কত অকিঞ্চিৎকর হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা। তিনি অনুভব করেন নি যে তাঁর বলা গল্প কি আনন্দদায়ক হতে পারে বা তাঁর বলার গুণে গল্প আরও কত বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা বিশ্ব অল্প-দিনের মধ্যেই স্বীকার করেছিল তাঁর বর্ণনার ক্ষমতার তুলনা মেলা ভার এবং সে ক্ষমতা কোনো সচেতন শিল্প প্রচেষ্টার আওতায় পড়ে না। সে যাই হ'ক, যেহেতু তিনি নিজেই নিজের কাহিনীর নায়ক, সেহেতুই অবশ্যম্ভাবীভাবেই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নিজের ইতিহাস ও জীবনযাত্রার অনেক তথ্য।

যাঁরা ‘মাই ইণ্ডিয়া’ বা ‘জাঙ্গল লোর’ পড়েছেন তাঁদের বলে দিতে হবে না যে তিনি ছিলেন একটি বৃহৎ পরিবারের একজন এবং বড় হয়েছিলেন গরমকালে হিমালয়ের শৈলাবাস নৈনিতালে ও শীতকালে নৈনিতালের নিচে পাহাড়ের পাদদেশে তাঁদের পারিবারিক ছোট্ট জমিদারী কালাধুঙ্গিতে। শিকার ছিল তাঁর রক্তে এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি জঙ্গল এবং জঙ্গলের জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের জন্যে সচেষ্ট হন, যা ভবিষ্যতে, তাঁর ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে শিকারের আনন্দ উপভোগের প্রয়োজনে সহায়ক হবে। সেই সময় জঙ্গলে নিঃশব্দে চলার যে অভ্যাসটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বা জঙ্গলের দৃশ্য ও শব্দের সঙ্গে যে গভীর পরিচয় তাঁর হয়েছিল তা পরবর্তী জীবনে কোনোদিন তিনি ভুলে যান নি এবং এই সময়েই রাইফেল চালানোয় যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুল লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা তিনি অর্জন করতে শুরু করেন তা পরবর্তী জীবনে তাঁর বহু কাজে এসেছিল। সেই সময় তাঁকে জানতেন এমন একজন বলেছেন যে তাঁর যৌবনেও এ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো আত্মতুষ্টির ভাব ছিল না। তাঁর কাছে—গুলি করে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করা ছিল একটা দায়িত্ব, কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়। যদি কোনো জানোয়ার মারতেই হয় তাহলে তা হওয়া দরকার তৎক্ষণাৎ যাতে তার কোন কষ্ট না হয়।

নৈনিতালে স্কুল ছাড়ার পরেই তিনি রেলওয়ে বিভাগে কাজে নিযুক্ত হন; প্রথমে ছোট ছোট পদে কিন্তু পরবর্তীকালে মোকামা ঘাটে, যেখানে গঙ্গা নদী দুটি বিভিন্ন রেলপথের মধ্যে এক চওড়া ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে, সেখানে পরিবহণের দায়িত্ব নিয়ে। এখন সেখানে নদীর ওপর এক বিরাট সেতু হয়েছে কিন্তু তখন প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টনেরও বেশি মাল সেখান থেকে ফেরিযোগে পার করা হতো এবং জলপথেই নিয়ে যাওয়া হতো এক রেলপথ থেকে আর এক রেলপথে। সেখানকার কাজ অসম্ভব শ্রমসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কুড়ি বছর সে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তার মূলে শুধু তাঁর শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতার ক্ষমতা নয়, কণ্ট্রাক্টর হিসেবে তাঁর নিয়োগ করা বিরাট কুলিদলের সঙ্গে বন্ধুর মত তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা তাঁর প্রতি, তাদের মনোভাবের অবিসংবাদী প্রমাণ দেয়। তাঁরই সহায়তায় গড়ে ওঠে সাগরপারে কাজ করার জন্যে কুমায়ুন লেবার কোর এবং তাঁর নিজের বিভাগটি তিনি নিয়ে যান ফ্রান্সে। এই সময়েই মোকামা ঘাটে তাঁর অধীনস্থ ভারতীয় কর্মীরা কুলিমজুরদের একটা বোঝাপড়ায় আসে যে তাঁর পুরো অনুপস্থিতির সময়টা তারা একযোগে তাঁর হয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁকে মেজরের বিশেষ পদ দেওয়া হয়।

এই বছরগুলিতে যে ধরনের কাজ তাঁকে করতে হতো তাতে শিকারের অবসর ছিল না বললেই চলে কিন্তু কুমায়ুনে ছুটি কাটানোর সময় তিনটি বিভিন্ন সময়ে

মানুষখেকোর সন্ত্রাসমুক্ত করার ডাকে তিনি সাড়া দিতে পারেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে তিনি চম্পাবত ও মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো এবং পানারের চিতা মারেন। এগুলির মধ্যে প্রথম এবং শেষোক্ত হত্যাকারীরা দুজনে মিলে ৮৩৬টি মানুষের জীবন নেয় এবং আমাদের সমসাময়িকের মধ্যে এই দুটি মানুষখেকো কুমায়ুনের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে—যদিও পরে অন্যেরা ছিল আরও বেশি কুখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় রুদ্রপ্রয়াগের চিতার কথা, যেটা সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৫০টি মানুষ মারে (করবেট তাঁর 'ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' বইয়ে নিহত পরিসংখ্যান লিখেছেন ১২৫।—সম্পাদিকা)—সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে কারণ হিমালয়ের এক বিখ্যাত হিন্দু তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার পথের তীর্থযাত্রীরাই ছিল তার শিকার।

মোকামা ঘাটের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর জীবনে আরম্ভ হয় এক নতুন অধ্যায়। তিনি নিজেই এখন তাঁর নিজের প্রভু। তাঁর জীবনের প্রয়োজন ছিল স্বল্প; তিনি অবিবাহিত ছিলেন কিন্তু নৈনিতাল ও কালাধুঙ্গিতে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর দুই বোনের বিশ্বস্ত অনুসঙ্গ এবং এ দের মধ্যে একজন (তাঁর লেখায় বহু জায়গায় উল্লিখিত ম্যাগি) তাঁর মৃত্যুর পরেও জীবিত।

তাঁর জীবনের এই সময়েই বেশির ভাগ মানুষখেকোর মুখোমুখি তাঁকে হতে হয় যাদের সম্বন্ধে বইয়ে তিনি লিখেছেন। পার হয়ে যাওয়া বছরগুলি, যে উদ্যম এবং সাহস নিয়ে এই কাজে তিনি নেমেছিলেন, তা বিন্দুমাত্র কমাতে পারে নি। অমানুষিক পরিশ্রমের পরে, বহু বিনিদ্র রাত কাটিয়ে তিনি যখন রুদ্র প্রয়াগের চিতাটা মারেন তখন তাঁর বয়েস ৫১ বছর- তিনি যেমন বাঘের পিছু নিয়েছিলেন বাঘও তেমনি তাঁর পিছু নিতে ছাড়ে নি। থাকের বাঘটিকে যখন মারেন তখন তাঁর বয়েস তেষট্টি। ও'র শারীরিক ক্লান্তি সহ্য করার বা কোনো দুর্ভোগ, দুর্ঘটনার মুখে সম্পূর্ণ শান্ত থাকার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম।

কিন্তু এখন যে ধরনের জীবন তিনি যাপন করতে লাগলেন তার আর একটা দিক ছিল। মনে হয় প্রচলিতার্থে শিকার ব্যাপারটি তাঁর জীবনে আর মুখ্য ছিল না। তাঁর মতে বাঘ বা চিতা সম্পূর্ণ স্বাধীন, যতক্ষণ না তারা মানুষের জীবনহানি ঘটায়। অনেক সময় যখন আমরা একসঙ্গে থাকতাম পাহাড়ীদের প্রতিনিধিদল আসত সাহায্য চাইতে; সত্যি কথা বলতে কি তারা চাইত তাঁকেই। তাদের জগৎ জানত যে সারা কুমায়ুনে একমাত্র তিনিই অনেক সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও দিবারাত্রির আতংক থেকে অন্যদের মুক্ত করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক ভয়ের সীমার বাইরেও এখানে অন্য কিছু একটা আছে কারণ পাহাড়ের প্রাচীন দেবতাদের মতিগতি বোঝা ভার, কে জানে আতংকটা তাঁদেরই অভিপ্রেত

কিনা ? কিন্তু এসব ক্ষেত্রে করবেট যে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেন তা যতই সহৃদয় বা বন্ধুত্বপূর্ণ হ'ক না কেন কয়েকটা কঠোর বিধি তিনি মেনে চলতেন। তাদের গরু ছাগল কি মারা পড়েছে না পড়েছে তা নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। বাঘ জঙ্গলের রাজা এবং তার প্রাপ্য তাকে দিতেই হবে। যতক্ষণ না তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে যে বাঘটা ঘটনাক্রমে বা বাগেব মাথায় মানুষ মারছে না, মারছে খাদ্য হিসেবে ততক্ষণ তিনি কিছুতেই তাদের সাহায্যে যেতে রাজী হতেন না।

আরও লক্ষ করা যেত যে তাঁর জঙ্গল সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ যা একসময় লাগত তাঁব শিকারের প্রয়োজনে, এখন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিনগুলি পাহাড়ের কোলে বা জঙ্গলে কাটানোর মত উপভোগ্য আর কিছু ছিল না। যার প্রতিটি মোচড়ানো ডাল, প্রতিটি পাখি বা জানোয়ারের ডাক তাঁর কাছে বিশেষ অর্থবহ ছিল। সে অর্থ যদি তখন তাঁর কাছে পরিষ্কার নাও হতো তাহলেও এগুলি তাঁকে ভবিষ্যত চিন্তা ও পর্যালোচনার খোরাক যোগাত। তাঁর কাছে এটা প্রকৃতি-অনুসন্ধান নয়— এটাই তাঁর জগৎ এবং এখানকার অধিবাসীদের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে এই আপাত ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোর ওপরেই। গুলি চালানোর চেয়ে ছবি তোলাটাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। আমার মনে পড়ে একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় যখন তিনি কালাধুঙ্গি জঙ্গলে একটা লতাপাতা জড়ানো ঝোপ থেকে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল অবস্থায় বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি বললেন যে তিনি একটি বাঘিনীর ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বাঘিনীটার মেজাজ ভাল ছিল না এবং যতবার তিনি ঝোপের মধ্যে যাচ্ছিলেন ততবার সে তাঁকে বাইরে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। যাইহোক, তিনি আরো বললেন যেন নেহাৎ একটা জানা দুর্বলতাব প্রশ্রয় দিচ্ছেন, যে বাঘিনীটার বাচ্চারা তার সঙ্গে আছে। কুমায়ুনের জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে এখন তাঁর অন্তরঙ্গতা অনেকটা এই ধরনের। ওঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল যার দরুন বাঘিনীটি ওর বাচ্চার কাছে আসার জন্যে ওঁকে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু এ নিয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যখন সেনাদলকে জঙ্গল লড়াইয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করছেন তখন তাঁকে অনারারী লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল-এর পদ দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ সালে তাঁকে 'ভারত সাম্রাজ্যের বন্ধু' এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সরকার এর আগে তাঁকে যে 'অরণ্যের স্বাধীনতা' অর্থাৎ সংবলিত জঙ্গলে তাঁর প্রবেশের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন তার মূল্য তাঁর কাছে ছিল খুব বেশি। কুমায়ুনের আপামর জনসাধারণ তাঁকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করত সে সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করছি না। তিনি যেমন দয়ালু ও হৃদয়বান ছিলেন তেমনিই পারতেন নিজেকে অবাধে বিলিয়ে দিতে, কোনো প্রতিদানের আশা না রেখেই। আমার মনে হয় পুরনো দিন হলে

ভারতীয়রা যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়ের স্মৃতিকে ভগবানের অংশ বলে পুজো করত উনি তাঁদেরই মধ্যে স্থান পেতেন।

যখন তাঁর বহু বন্ধুবান্ধব ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে যান, তিনি ও তাঁর বোনও ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং কেনিয়ার নিয়েরিতে বসবাস শুরু করেন। সিদ্ধান্তটা নেওয়া নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষে সহজ হয় নি। তিনি কালাধুঙ্গিতে তাঁর নিজের বাড়িটিকে যেমন ভালবাসতেন তেমনিই পেয়েছিলেন তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের অকৃপণ ভালবাসা। কিন্তু কেনিয়াতে তাঁর বন্য জীবনের ছবি তোলার আগ্রহ চরিতার্থ হয়েছিল কারণ সেখানে ছবি তোলার উপকরণ ছড়িয়ে ছিল অজস্র। ট্রী টপ্‌স নিয়েরির কাছে হওয়ার দরুন তিনি সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এখন আমরা তাঁর জবানীতেই মহামান্যা রাণীর ট্রী টপ্‌স পরিদর্শনের গল্প শুনব কারণ এই সময়ে তিনি বন্ধুবান্ধবদের যে চিঠি লেখেন তাতে দেখা যায় মহারাণীর দলভুক্ত হতে পেরে তিনি কি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

হেইলী

লণ্ডন
সেপ্টেম্বর ১৯৫৫
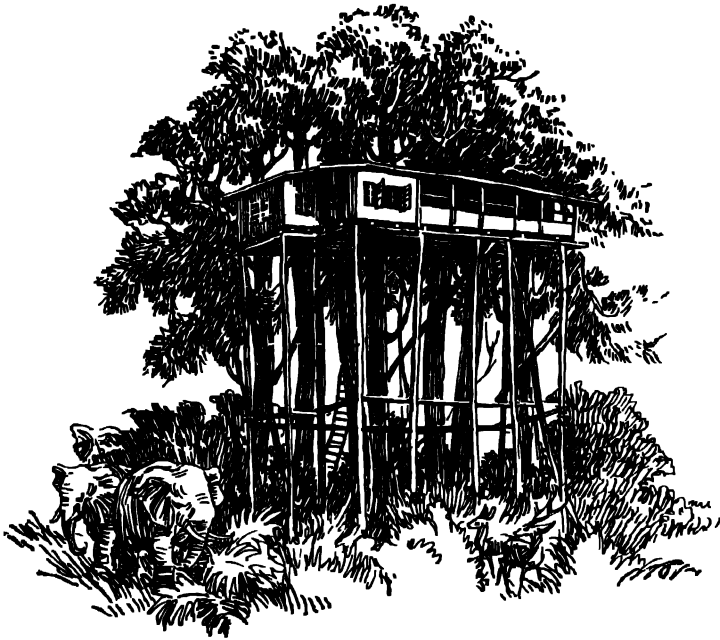
সেদিন ১৯৫২ সালের ৫ই ফেব্রুআরি উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় স্নান করছিল গাঢ় নীল আকাশ, বইছিল শরীর মন চাঙ্গা করে তোলা সতেজ বাতাস।

আমি জমির থেকে তিরিশ ফুট ওপরে একটা কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম, আমার সামনে জঙ্গলের মধ্যে দুশো গজ লম্বা এবং একশো গজ চওড়া একটা ডিম্বাকৃতি ফাঁকা জমি। জমিটার দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে একটা ছোট হ্রদ, তার মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাসের চাবড়া, বাকি জায়গাটায় একটা সল্ট লিক। হ্রদের ওদিকে একটা তুষার শুভ্র বক নিশ্চল দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অসাবধানী ব্যাঙদের আসার অপেক্ষা করছে এবং তার সামনে প্রসারিত জলে একজোড়া ড্যাবচিক (জলজ পাখি) তাদের চারটি বাচ্চা নিয়ে, যাদের মারবেলের মত ছোট্ট দেখাচ্ছিল, চলেছে এক বিপদসংকুল পৃথিবীতে তাদের প্রথম অভিযানে। সল্ট লিকের ওপর একটা গণ্ডার অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ঝুঁকে নোনা জমি চাটছে তারপরেই মাথা ঝাঁকিয়ে তুলছে জঙ্গল থেকে তার দিকে বয়ে আসা বাতাস প্রাণভরে নেওয়ার জন্যে।

হ্রদ এবং সল্ট লিকের তিন দিক ঘন বৃক্ষ সমাকীর্ণ জঙ্গলে ঘেরা এবং চতুর্থ দিকটিতে, যেটি আমার থেকে সবচেয়ে দূরে, একশো গজ চওড়া একফালি ঘেসো জমি এসে পড়েছে একেবারে হ্রদের পাড় পর্যন্ত। ঘেসো জমিটার প্রান্তে একটা ফ্রেমের মত এক সার বাদাম গাছ। পূর্ণ প্রস্ফুটিত এই বাদাম গাছগুলির বেগুনের ছোঁয়া মেশা নীল ফুলগুলিব মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে এক দঙ্গল

কলোবাস বাঁদর। ওদের লেজগুলি দেখতে অনেকটা সাদা ঝুমকো ফুলের মতো। এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে পড়ার সময় তাদের ঘাড় থেকে ঝুলে পড়া সাদা কেশরগুলো—যেন মনে হচ্ছে বিরাট আকারের প্রজাপতি। এর থেকে বেশি শান্ত সুন্দর দৃশ্য আর কল্পনা করা যায় না ; কিন্তু দৃশ্যত শান্ত হলেও সব জায়গায় শান্তি ছিল না কারণ বাঁদরগুলোর ওপারেই ঘন জঙ্গলে একপাল হাতি ছিল এবং তাদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছিল। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তরই বাতাস চিরে ভেসে আসছিল হাতির বৃংহিত আর সেই সঙ্গে তাদের ক্রুদ্ধ চিৎকার আর গুরুগম্ভীর গর্জন। তাদের ঝগড়ার আওয়াজ কাছে এগিয়ে এলে বাঁদরগুলো দল বেঁধে জড়ো হল এবং হুঁশিয়ারীর ডাক ডেকে গাছের মাথায় মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা মা বাঁদর বুকে ঝুলন্ত একটা ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে। নিঃসঙ্গ গণ্ডারটি এতক্ষণে স্থির করল যে ওর নুনের প্রয়োজন মিটে গেছে—ঘোঁৎ করে আওয়াজ করে ও একবারেই সম্পূর্ণ ঘুরে গেল, যেমনটি শুধু গণ্ডারই পারে তারপর মাথা উঁচু করে, ল্যাজ বাতাসে তুলে বাঁ পাশের জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। শুধু অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রত্যাশা পূরণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা বকটির এবং ড্যাবটিক পরিবারটির হাতির দল এগিয়ে আসায় কোনো ভাবান্তর হল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর জঙ্গল থেকে হাতিরা বেরতে লাগল, ভারতীয় প্রথায় এক লাইনে নয়, প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া জায়গা জুড়ে। এখন তাদের চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেছে—ধীরে সুস্থে তারা দুজন তিনজন করে ছড়ানো ছেটানো ঝোপওলা ঘাসের ফালিটার দিকে গেল—ততক্ষণে সামনে পেছনে দৃষ্টি চালিয়ে আমি সাতচল্লিশটি হাতি গুণে ফেলেছি। সর্বশেষে ফাঁকায় এল তিনটি পুরুষ হাতি, তার মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে পালের গোদা, অন্য দুটি তার ছোট ভাই বা ছেলে হবে - কিন্তু তারা এমন একটা বয়সে পৌঁছেছে যে তারা বয়োজ্যেষ্ঠের কাছ থেকে দলের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবে।

আমি যে পাটাতনটার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম তার ওদিকে কয়েক ধাপ ছোট্ট সিঁড়ি গিয়েছে সেই কুঁড়েঘরটিতে যা পৃথিবীর সর্বত্র ট্রী টপ্‌স নামে পরিচিত। কুঁড়েঘরটি বানানো হয়েছে একটা বিশাল ফিকাস (ফিকাস : বট জাতীয় গাছ। —সম্পাদিকা) গাছের ওপরের ডালপালার মধ্যে আর এতে ওঠা যায় একমাত্র একটা সরু তিরিশ ফুট লম্বা মইয়ের সাহায্যে। এক সময়ে কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্যে মইয়ের নিচের দিকটা একটা হাতল দিয়ে পাশেরই একটা গাছের ডালপালার মধ্যে তুলে দেওয়া হত কিন্তু নিরাপত্তার এই ব্যবস্থাটি বহুদিন আগে থেকেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই কুঁড়েঘরটিতে আছে একটি খাবার ঘর যার এক কোণায় আছে একটি জ্বালানী কাঠের স্টোভ, অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে তিনটি শোওয়ার ঘর, আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ শিকারীদের জন্যে একটা সরু ছোট ঘর আর একটা লম্বা খোলা বারান্দা যেখানে আছে আরামদায়ক

গদীওয়ালা বসার জায়গা। বারান্দাটির থেকে দৃষ্টি অবাধে চলে যায় ছোট হ্রদ, সলট লিক পেরিয়ে দিগন্তজোড়া জঙ্গল পর্যন্ত—যার পটভূমিতে অ্যাবার্ডেয়ার পর্বতশ্রেণী উঠে গেছে ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়।

যুবরাণী এলিজাবেথ এবং ডিউক অফ এডিনবারা দুদিন আগেই নিয়েরির কুড়ি মাইল দূরে সাগানার রয়েল লজে পৌঁছেছিল এবং সেদিন সকালে দাড়ি কামানো শেষ করতে না করতেই এক অভাবিত টেলিফোন বার্তা এল আমার কাছে যে মহামান্যা যুবরাণী আনন্দের সঙ্গে আমাকে তাঁর ট্রী টপ্স-এর সঙ্গী হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। যুবরাণীর দলবল লজ ছাড়বে একটার সময়, তারপর আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে ট্রী টপ্স-এ পৌঁছবে বেলা দুটোয়, সেখানে আমায় অভ্যর্থনা করতে হবে তাঁদের।

নিয়েরির পোলো মাঠটি কেনিয়ার শ্রেষ্ঠ পোলো মাঠগুলির অন্যতম এবং আগের দিনই সেখানে একটা প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়ে গেছে যাতে ডিউক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুবরাণী ছিলেন দর্শকের আসনে। পোলো মাঠটি নিয়েরি থেকে আটমাইল এবং রয়েল লজ থেকে পনের মাইল দূরে মাঠটির তিনদিক ঘিরে জঙ্গল আর উঁচু উঁচু ঘাস। আমি এবং আমার বোন ম্যাগি দুজনেই ভিড়ের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দবোধ করি না, সেইজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি দেখার জন্যে যখন দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন জড়ো হচ্ছে পোলো মাঠে তখন আমরা গাড়ি চালিয়ে চলে গেলাম গভীর জঙ্গল থেকে মাঠের দিকে চলে আসা একটা গভীর গিরিখাতের ওপর একটা সাঁকোয়। সে সময়টায় যদিও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় নি কিন্তু নিরাপত্তা আইনের বেশ কড়াকড়ি চলছিল কারণ চারিদিক ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং আশপাশের অঞ্চলে কয়েকটা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল যেগুলো সম্বন্ধে কাগজগুলি সহজবোধ্য কারণেই সম্পূর্ণ নির্বাক ছিল। গভীর গিরিখাতটা সম্বন্ধে ছিল আমার দুশ্চিন্তা কারণ সে পথে সহজেই পোলো মাঠে পৌঁছনো যায়। যাই হোক গিরিখাতের মধ্যে পড়া বালির চড়া পরখ করে কোনো পায়ের দাগ না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম—সে সন্ধেটা আমাদের কাটল সাঁকোটার কাছেই, গিরিখাতটার ওপর নজর রেখে, সেইটাই পোলো ম্যাচে আমাদের অনুপস্থিত থাকার কারণ।

টেলিফোন বার্তাটা পাওয়ার পর আমি আরেকবার দাড়িটা কামিয়ে নিলাম, তারপর প্রাতরাশ সেরে গেলাম শাসনবিভাগের হেডকোয়ার্টারে রাস্তার একটা ছাড়পত্রের জন্যে কারণ যুবরাণীর দলবলের জন্যে যে রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আমাকে সেই রাস্তাটাই ব্যবহার করতে হবে। দুপুরবেলা আমি প্রধান রাস্তাটা দিয়ে আট মাইল মোটর চালিয়ে গেলাম, তারপর মোটরটা পোলো মাঠের কাছে রেখে একটা সরু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া দু মাইল লম্বা একটা এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরলাম যেটা চলে গেছে ট্রী টপ্স পাহাড়ের পাদদেশ

পর্যন্ত। এইখানে, যেখানে পথটা শেষ হচ্ছে এবং একটা সরু পায়ে চলার পথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছশোগজ উঠে যাচ্ছে ট্রী টপ্‌স পর্যন্ত, আমি গাড়ি থেকে আমার হাতব্যাগ ও বৃটিশ কম্বলটা বার করে নিয়ে গাড়িটাকে নিয়েরিতে পাঠিয়ে দিলাম। রাস্তাটার দুপাশে অনেক গাছে কাঠের টুকরো পেরেক দিয়ে গেঁথে মই মতন করা আছে, হাতি, গণ্ডার বা মোষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে এই ঘটনা থেকে যে যুবরাণী এবং তাঁর দলবল এই পথ দিয়ে হাঁটার দুদিন পরেই এইরকম মই গাঁথা চারটে সবচেয়ে বড় গাছ হাতির দল উপড়ে ফেলেছিল।

ফেব্রুআরির পঞ্চম দিনটিতে—সময় এখন বেলা ১.৩০ মি এবং ঠিক ২ টোর সময় আসবে সেই শুভক্ষণ। হাতিগুলো, এখনও চুপচাপ আর শান্ত, ঘাস ঝোপঝাড় খেতে খেতে ধীরে ধীরে হ্রদের দিকে সরে যাচ্ছিল এবং এখন তাদের আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। পালেতে সব আকারের আর সব বয়সের হাতি ছিল, এবং এর মধ্যে পাঁচটি মাদী হাতির সঙ্গে ছিল তাদের বাচ্চা—যাদের বয়স কয়েক সপ্তাহের বেশি হবে না। এই পাঁচটি মাদী হাতি এবং তিনটি মাদ্দা হাতি ছিল সংগমের এই সময়টিতে 'কামান্ধ' এবং তাদের থেকেই যত বিপদের আশঙ্কা। যাই হোক, হাতির পালটি যদি আর তিরিশ মিনিট হ্রদের ওদিকে থাকে তাহলে আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। মিনিটগুলো যেন আর কাটতেই চায় না, দুশ্চিন্তা থাকলে যেমনটি হয়, এবং পনের মিনিট বাকি থাকতে হাতির পালটি সল্ট লিকের দিকে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকল। সল্ট লিকটা এসেছে ফিকাস গাছটার কয়েক গজের মধ্যেই এবং বের হয়ে থাকা বারান্দাটা থেকে নিচে সল্ট লিকে যে কোনো হাতির ওপর তাক করে একটা রুমাল ফেলে দেওয়া এখন সম্ভব। লিক এবং গাছটার মধ্যে কিছু ছোট ডাল-পালা বিছানো হয়েছে, ওপরের কুঁড়েঘরটিতে ওঠার মইটির দিকে কেউ এগোলে তাদের এবং গাছটির মধ্যে একটি পর্দা গঠন করার জন্যে। এই ডালপালাগুলি হাতি এবং অন্যান্য জানোয়ার পিষে ফেলেছে এবং আমি যে সময়ের কথা লিখছি সে সময়ে পর্দা শুধু নামেই, তার অস্তিত্ব আর কিছু নেই।

বারান্দার ওপর, প্রতিটি মুহূর্ত পার হচ্ছে এবং আমার উদ্বেগও বাড়ছে। সাতচল্লিশটি হাতির দলটি এখন জড়ো হয়েছে সল্ট লিকের ওপর। এখন হচ্ছে ঠিক আক্রমণের সময় এবং যুবরাণীর দলটি ঠিক সময়মত এলে এখন ওই পথটির ওপর থাকা উচিত—এমন সময়ে একটা বিরাট পুরুষ হাতি, দুটি কমবয়েসী পুরুষ হাতির একটি স্ত্রী হাতির দিকে বিশেষ মনোযোগে রুষ্ট হয়ে তাদের আক্রমণ করল এবং এই তিনটি জানোয়ার রাগে বৃংহিত ধ্বনি তুলে চিৎকার করতে করতে বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গেল আর বৃত্তাকারে ঘুরে আসতে লাগল ট্রী টপস-এর পেছন দিকে—যে পথটি দিয়ে যুবরাণী ও তার

সঙ্গীরা আসবেন সেই পথটির দিকে। দলের রক্ষীরা কি হাতির চিৎকার শুনে, এগনো বিপজ্জনক ভেবে যেখানে গাড়ি থেকে নামা হয়েছে সেই ফাঁকা জায়গাটার অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার দিকে ফিরে যাবে, না তারা ঝুঁকি নিয়ে কুঁড়েঘরটিতে ওঠার মইয়ের দিকে এগোবে? বারান্দাটা পার হয়ে আমি জঙ্গলের দিকে তাকালাম। মইটার নিচ থেকে পথটা প্রায় চল্লিশ গজ চলে গেছে সোজা লাইনে, তারপর বাঁদিকে বেঁকে চোখের আড়ালে চলে গেছে। প্রচুর ভয়াবহ আওয়াজ চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল কিন্তু পথটার ওপর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না এবং এখন আমার আর করার কিছু নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি দেখতে পেলাম একটি লোক উদ্যত রাইফেল নিয়ে আসছে আর ঠিক তার পেছনেই ছোট্টখাট্ট চেহারার একজন। দলটি পোঁছে গিয়েছে এবং পথটির বাঁকের কাছে এসে,—যেখান থেকে সল্ট লিকে হাতির পালটিকে পরিষ্কার দেখা যায়— দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর সময় নষ্ট করা চলে না, তাই মই থেকে নেমে আমি ছোট্টখাট্ট মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলাম যাঁকে আগের দেখা ছবি থেকে আমি যুবরাণী এলিজাবেথ বলে চিনতে পারলাম। এক ঝলক হাসির মধ্যে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে, মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে, যুবরাণী ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন সল্ট লিকের কুঁড়েঘরের দিকটিতে, মইয়ের নিচ থেকে দশ গজের মধ্যে জড়ো হওয়া হাতির পালটির দিকে। ক্যামেরা ও হাত ব্যাগ আমার কাছে দিয়ে যুবরাণী খাড়া মইটা বেয়ে উঠলেন, তার পেছন পেছন এলেন লেডী পামেলা মাউন্টব্যাটেন, ডিউক এবং কম্যাণ্ডার পার্কার। এডোয়ার্ড উইণ্ডলির নেতৃত্বে রক্ষীদল তারপর ঘুরে পায়ে চলার পথটি দিয়ে ফিরে গেল।

আমার সুদীর্ঘ জীবনকালে কিছু সাহসিকতার কাজ আমি দেখেছি কিন্তু সেদিন সেই ফেব্রুআরির পঞ্চম দিনে যা আমি দেখলাম তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছু বড় একটা দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। যুবরাণী এবং তাঁর সঙ্গীরা, যাঁদের আফ্রিকার জঙ্গলে পায়ে হেঁটে চলার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সেই অপূর্ব দিনটিতে বেরিয়েছিলেন শান্তিমতে ট্রী টপ্স-এ যাবেন বলে, এবং তাঁদেরই পরবর্তী বক্তব্য অনুযায়ী তাঁরা বেরোবার মুহূর্ত থেকেই ক্রুদ্ধ হাতির মাতামাতিতে তাঁদের কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। এক লাইনে, গভীর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, যেখানে দৃষ্টি দু-এক গজের বেশি চলে না, তাঁরা সেইসব শব্দের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁরা যত কাছে এগোচ্ছিলেন শব্দগুলো যেন তত বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। তারপর পথের বাঁকটিতে এসে যখন হাতির পালটি তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল তখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের মইয়ের নিরাপত্তায় পোঁছনোর জন্যে হাতির দলটির দশ গজের মধ্যে যেতে হবে। মই দিয়ে ওঠার এক মিনিটের মধ্যেই যুবরাণী বারান্দার ওপর বসে অকম্পিত হাতে হাতির ছবি তুলছিলেন।

দিনের ঠিক ওই সময়টিতে ট্রী টপ্‌স-এর কাছে হাতি সচরাচর আসে না এবং যখন তাদের ছবি তোলা হচ্ছে। তারা—ঠিক হাতির কাছ থেকে যেমনটি আশা করা যায় তেমনিই সব কাণ্ডকারখানা করছিল। বয়স্ক মদ্দা হাতিটা পালে

ফিরে এল, তার পেছনে বেশ সম্মানজনক দূরত্ব রেখে এল অল্পবয়সী মদ্দা হাতি দুটি – বয়স্ক হাতিটি বৃংহিত ধ্বনি এবং ক্রুদ্ধ চিৎকারে আবার সে দুটোকে তাড়িয়ে দিল। এক ঝাঁক বক ফাঁকা জমিটার ওপর এসে নামল – তাদের দেখেই একটা হাতি শুঁড়ে ধুলো ভরে নিয়ে, সতর্ক পায়ে এগিয়ে, ধুলোটা ছড়িয়ে দিল বকগুলোর ওপর—ঠিক যেন কেউ বন্দুক ভর্তি কালো বারুদ ছড়িয়ে দিল। বকগুলো কারুরি কোনো ক্ষতি করে নি এবং একমাত্র দুষ্টুমি বুদ্ধি থেকেই হাতিটা তাড়াল ওদের কারণ কাজটা করেই ও শুঁড়টা ওঠা নামা করতে লাগল, যেন হাসির বেগেই, আর আনন্দে ওর কানটা পটপট করতে লাগল। ডিউক এই পার্শ্ব দৃশ্যটি খুব আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করছিলেন এবং আবার যখন বকগুলো ফিরে এল, সেই হাতিটিই, অবশ্য অন্য কোনো হাতিও হতে পারে, আবার যখন শুঁড়ে ধুলো ভরে পাখিগুলির দিকে এগোল, তিনি দৃশ্যটির দিকে যুবরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—এবং যুবরাণী পুরো ঘটনাটির ছবি তুলে নিলেন। একটি মাদী হাতি এখন এগিয়ে এল আমাদের দিকে, পাশে তার অসম্ভব খুদে এক বাচ্চা। বারান্দাটার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক গজের মধ্যে মা হাতিটি তার শুঁড়ের সোঁদা ডগাটি নুন মেশানো মাটির ওপর রেখে তুলে মুখে ভরে দিল। বাচ্চাটি তার মায়ের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে মায়ের সামনের বাঁ পায়ের মধ্যে দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে বাঁট চুষতে লাগল। সন্তানের মায়ের ওপর টানের এই দৃশ্যে মুগ্ধ যুবরাণী সিনে ক্যামেরার এপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হঠাৎ বলে উঠলেন 'ও, দেখ! ওটা বাচ্চাটাকে তাড়িয়ে দেবে!' এটা বলা

হল যখন তিন চার বছর বয়সের একটা ছোট্ট হাতি মায়ের কাছে দৌড়ে এসে সামনের ডান পায়ের মধ্যে দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দুধ খেতে লাগল তখন। যতক্ষণ ওরা খেলে, ওদের মা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং বাচ্চাটা আর তার বোনের যথেষ্ট খাওয়া হলে, এমনও হতে পারে তার বাঁটে আর দুধ ছিল না বলেই মা হাতিটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবং বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দার নিচ দিয়ে হ্রদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া একফালি জমির দিকে গেল। এখানে ও শুঁড়ের মধ্যে জল শুষে নিয়ে, মাথা উঁচু করে গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে জল খেলে। তেষ্টা মেটার পর ও হ্রদের মধ্যে আরো কয়েক গজ এগিয়ে গেল, তারপরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। একা পড়ে যাওয়ায় বাচ্চাটা ভয়ে কচি সরু গলায় চিৎকার করতে লাগল। মা হাতিটা এই সাহায্যের আবেদনে কোনো কর্ণপাতই করল না কারণ এটা একটা শিক্ষা যে মা যেখানে আগে আগে যাচ্ছে সেখানে তাকে অনুসরণ করা বাচ্চার পক্ষে নিরাপদ। অবশেষে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে বাচ্চাটা জলে নেমে পড়ল এবং সে কাছাকাছি এলে তার মা গভীর মমতায় কাছে টেনে তাকে শুঁড় দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে সাঁতরে নিয়ে গেল হ্রদের ওপারে।

হাতির পালকে লক্ষ করার সময় যেটা মনকে খুব স্পর্শ করে সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ওপর ওদের মমতা। বড়রা খাওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন একঘেয়ে লাগে তখন বাচ্চাগুলো খেলতে খেলতে গিয়ে পড়ে বড়দের সামনে। যখন এটা ঘটে তখন বড়রা তাদের আঘাত না করে, না মাড়িয়ে আস্তে করে পাশে সরিয়ে দেয়। বন্য জগতের সব জীবজন্তুর ভেতর হাতিদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পারিবারিক, দলবদ্ধ জীবনযাত্রা দেখা যায়। যখন আসন্ন মাতৃত্বের দরুন কোনো স্ত্রী হাতি অবসর নেয়, অন্য বয়স্কা স্ত্রী হাতিরা তাকে সঙ্গ দেয়, তার বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নবজাত বাচ্চাটি যতদিন না হাঁটতে সক্ষম হয় ততদিন পুরো পালটা থাকে তার কাছাকাছি বাচ্চা অথবা বয়স্ক হাতি কোন অসুবিধেয় পড়লে বা বিপদের সম্মুখীন হলে, তা সে সত্যিই হ'ক আর কাল্পনিকই হ'ক, অন্যরা এগিয়ে আসে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে। সেইজন্যেই যে সমস্ত পালে বাচ্চা থাকে সেগুলোকে এড়িয়ে চলা হয় এবং এই একমাত্র কারণেই মইয়ের দিকে এগনো ছিল বিপজ্জনক কারণ হাওয়ার গতি বদলে গেলে বা কোনো ছোট বাচ্চা সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত মাদী হাতি দলটিকে দেখতে পেলে, আক্রমণের একটা বিরাট আশঙ্কা থাকে। ভাগ্যক্রমে হাওয়ার গতি বদলায় নি এবং হাতি-গুলির দিকে ধীরে সুস্থে ও নিঃশব্দে এগনোর দরুন যুবরাণী আর তাঁর সঙ্গীরা হাতিদের নজর এড়িয়ে গেছেন।

কারা, একটা বড় পুরুষ বেবুন, সম্প্রতি একটা লড়াইয়ে ওপরের ঠোঁটের কিছুটা অংশ হারিয়ে যার চেহারা আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে, এখন সে তার এগারো জনের পরিবার নিয়ে একটা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে এল সল্ট লিকের

ধারে। এইখানে তারা থেমে গেল, কারণ হাতিরা বেবুনদের পছন্দ করে না এবং আমি একবার দেখেছি হাতিদের তাড়া খেয়ে বেবুনদের এইরকমই একটা পরিবার গাছে উঠে পড়েছে আর হাতিগুলো সেই গাছ ঝাঁকাচ্ছে ওদের ফেলে দেওয়ার জন্যে। এ যাত্রায় কারা কোনোরকম ঝুঁকি নিচ্ছিল না। পুরো দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে তার পরিবারদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল তারপর সলটলিক ঘুরে বাঁ দিক দিয়ে এগলো বটগাছটার দিকে। একটি সাহসী কমবয়েসী স্ত্রী বেবুন এবার দল ছেড়ে বেরোল এবং কুঁড়েঘরটির একটা কাঠের খুঁটি বেয়ে উঠে এল বারান্দাধার ওপর। রেলিঙ-এর ওপর রাখা ক্যামেরা, দূরবীন ইত্যাদি বাঁচিয়ে, রেলিঙ বরাবর দৌড়ে সে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা ফিকাস গাছের ডাল ধরে ফেলল। এখানে তার পুরস্কার মিলল একটা প্রায় তার মাথার সাইজের মিষ্টি আলু—ও যখন পরমানন্দে দাঁত দিয়ে আলুটা ছাড়াচ্ছে তখন কয়েক ফুট দূরত্ব থেকে তার ফিল্ম এবং ছবি উঠে গেল।

সকলের অজ্ঞাতে সময় বয়ে চলল এবং যুবরাণীকে যখন বলা হলো খাবার ঘরে চা প্রস্তুত তখন তিনি বললেন—ও, আমি কি চা এখানে খেতে পারি? এসব আমি এক মুহূর্তের জন্যেও হারাতে চাই না। যখন চা খাওয়া হচ্ছিল, হাতিগুলো সল্ট লিক থেকে সরে এল, কেউ কেউ গেল বাঁ দিকের জঙ্গলে এবং অন্যরা বারান্দার নিচ দিয়ে ডানদিকে হ্রদের পাড়ের দিকে রওনা দিল। যখন যুবরাণী চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে একগোছা ছবি দেখছিলেন তখন আমি দেখলাম এক জোড়া জল হরিণ একটা জঙ্গুলে পথ দিয়ে পূর্ণ বেগে সল্ট লিকের দিকে দৌড়চ্ছে। ওই দুটি জানোয়ারের দিকে আমি যুবরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি ক্যামেরার দিকে হাত বাড়ালেন আর ছবিগুলি তাঁর কোল থেকে মেঝেয় পড়ে গেল। ঘটনাটার উপযোগী দু' একটা ভদ্রতা সূচক কথা বলে যুবরাণী ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলে ধরলেন আর সেই সঙ্গেই হরিণ দুটো, যাদের মধ্যে তফাৎ ছিল এক কদমের, জল তোলপাড় করে ঝাঁপ দিল হ্রদে। সামনেরটা যখন গজ চল্লিশেক গিয়েছে তখন সেটা হোঁচট খেল একটা ডোবা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে এবং মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে পেছনেরটা শিঙ ঢুকিয়ে দিল তার গায়ে। হতভাগ্য জীবটির পাছায় ঢুকল একটা শিঙ এবং তার দু পায়ের মধ্যে দিয়ে পেটে ঢুকল অপরটা। শিঙগুলো ঢুকে এমনভাবে আটকে ছিল যে কিছুদূর হেঁচড়ে যাওয়ার পরেই তবে সে শিঙগুলো ছাড়াতে পারল। আহত জানোয়ারটি জলে লাফিয়েই চলল যতক্ষণ না সে পৌছল একটা বড় ঘাস বনের আশ্রয়ে। এখানে গলা জলে সে থামল এবং তার আক্রমণকারী বদ্ধ জলে বৃত্তাকারে কয়েকবার ঘুরে ক্রুদ্ধ ভাবে ঘাড় নেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা, জঙ্গলে আরম্ভ হওয়া এক লড়াইয়ের শেষ দৃশ্য আর পুরো ব্যাপারটা ইতিমধ্যে যুবরাণীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল—এবার তিনি

ক্যামেরা সরিয়ে রেখে দূরবীন জোড়া তুলে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরবীনজোড়া আমার হাতে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি রক্ত? আপনার কি মনে হয় ও মরে যাবে? হ্যাঁ, ওটা রক্তই। চারিদিকের জল রক্তে রাঙা হয়ে গেছে এবং আহত জানোয়ারটি যেভাবে কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তা দেখে আমি বললাম আমার মনে হয় ও মারা যাবে।

কারা এবং তার পরিবারের সঙ্গে ইতিমধ্যে সল্ট লিকে যোগ দিয়েছিল পাঁচটি বনশুয়োর এবং একটি সুদৃশ্য কমবয়সী স্ত্রী ঝোপ-হরিণ এবং তারা দৃশ্যটিতে কিছুটা বৈচিত্র্য আনছিল। দুটি তরুণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে একটি পুরুষ বন্ধুর ভালবাসার জন্যে, তারা দুজনেই ছেলেটির দাবীদার এবং এর ফলে রাগারাগি আর প্রচুর চিৎকার। কারা এই সময় আরাম করে রোদ্দুরে শুয়েছিল একদিকে ওর ছবি উঠছিল এবং অন্যদিকে ওর স্ত্রী, স্ত্রীসুলভ কর্তব্য-বোধে ওর ঘন লোমের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চামড়ায় চুলকানি ধরানো জিনিসগুলি খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিল—তা না হলে কারা তিনজন কম বয়েসীকে পিটিয়ে ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করে দিত। এদিকে যখন এই সমস্ত ব্যাপার চলছে, বনশুয়োর পাঁচটি হাঁটু গেড়ে সল্ট লিকের পাড়ের ছোট ছোট ঘাস মুড়িয়ে সমান করে দিতে ব্যস্ত এবং কারার সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটি পরম অধ্যবসায়ে তরুণী হরিণীটির পেছনের পা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল—ওর ল্যাজটা ধরার জন্যে। যতবারই ও চেষ্টা করছে হরিণীটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে—খেলাটা ও নিজেও উপভোগ করছে দর্শকদের মতই।
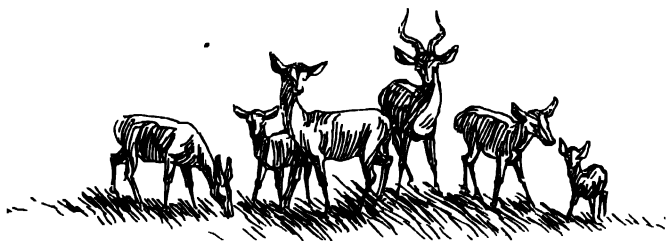
যুবরাণী বা ডিউক কেউই ধূমপান করেন না কিন্তু যেহেতু আমি নিজে এই জঘন্য অভ্যাসটিতে আসক্ত সেইজন্যে আমি যুবরাণীর পাশে আমার জায়গাটি ছেড়ে বারান্দার প্রান্তে চলে গেলাম, যেখানে ডিউক যোগ দিলেন আমার সঙ্গে। আমাদের কথাবার্তা চলা কালে আমি তাঁকে বললাম যে আমি এরিক শিপটনকে চিনি আর 'দি টাইমস্' পত্রিকায় আমি ভয়ংকর তুষারমানব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়েছি এবং শিপটনের তোলা বরফে পায়ের ছাপের ছবিগুলিও দেখেছি। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল ভয়ংকর তুষারমানব সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কোনো মতামত আছে কিনা তখন আমার উত্তর শুনে ডিউক বেশ মজা পেলেন যে আমি

বিশ্বাস করি না বরফে যে পায়ের দাগের ছবিগুলি শিপটন তুলেছেন সেগুলি কোনো চার পেয়ে জীবের এবং যদিও আমি স্বপ্নেও ভাবি না শিপটন কোনো রসিকতার চেষ্টা করেছেন, আমার মনে হয় এর ফলে তিনি নিজেই পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছেন। আমি আরও বললাম যে তুষারমানব সম্বন্ধে চারিদিকে যে বিপুল উৎসাহ তার পরিপ্রেক্ষিতে দাগগুলি অনুসরণ করে শিপটনের পেছন দিকের উৎসে এবং সামনের দিকের গন্তব্য সন্ধানে না যাওয়াটা হতাশাজনক। ডিউক বললেন তিনি এই একই প্রশ্ন শিপটনকে করেছিলেন এবং শিপটন তার উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন যে দাগগুলি এসেছে বায়ুধৌত পাথরগুলির দিক থেকে যার ওপরে কোনো বরফ নেই এবং দাগগুলি চলেও গেছে তুষারহীন পাথরের ওপর দিয়ে, সেইজন্যেই দাগ অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও দীর্ঘতর হতে থাকল। আরও জানোয়ার, সত্যি কথা বলতে কি ট্রী টপ্‌স-এর ওপর থেকে এত বেশি জানোয়ার আগে আর কখনও দেখা যায় নি, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জমিটার ওপর আসতে লাগল। সূর্যের তির্যক রশ্মিতে এই জানোয়ারগুলি এবং নিঃশব্দ সমারোহে ফুটে থাকা কেপ-নাট ফুলগুলির হ্রদের নিথর জলে প্রতিফলন এমন একটা শান্তি, সৌন্দর্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল যা কোনো ধ্যানমগ্ন শিল্পীর তুলিতেই ধরা পড়ত আমার ভাষায় তা প্রকাশ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

যুবরাণীর সঙ্গে যোগ দিলে তিনি আবার আমার হাতে দূরবীন জোড়া দিয়ে বললেন—আমার মনে হয় বেচারা মারা গেছে। চোট খাওয়া জলাহরিণটাকে সত্যিই মৃত দেখাচ্ছিল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই যে ঘাসের চাবড়াটার ওপর ও বিশ্রাম করছিল তার থেকে মাথাটা ও তুলল এবং হাঁকুপাঁকু করে কোনোরকমে পাড়ে গিয়ে গলাটা লম্বা করে, থুতনিটা মাটিতে দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। ও এই ভঙ্গীতে নিশ্চল অবস্থায় মাটিতে বেশ কয়েক মিনিট শুয়ে থাকার পর তিনটি হাতি ওর কাছে এল এবং শুঁড় লম্বা করে তাকে ল্যাজ থেকে মাথা পর্যন্ত শুঁকল। শুঁকে যা দেখল তা ওদের বিশেষ পছন্দ হল না তাই মাথা নেড়ে তাদের অপছন্দ জানিয়ে তারা ধীর পায়ে চলে গেল। হাতিদের উপস্থিতিতে হরিণটার যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি তার থেকেই আমরা ধরে নিলাম যে হরিণটা মারা গিয়েছে সেইজন্যে আমি আর কম্যাণ্ডার পার্কার গেলাম ওটাকে দেখার জন্যে। আমরা যখন কুঁড়েঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মই দিয়ে নামছি তখনই মৃত জানোয়ারটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সম্ভবত ট্রী টপ্‌স-এ যাওয়ার সময় পথে যে দুটো চিতার থাবার ছাপ দেখেছিলাম তারাই ওকে টেনে নিয়ে গেছে—কারণ জায়গাটায় পৌঁছে আমরা শুধুমাত্র দেখলাম সেটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তস্রোতের কাছেই একটা বড় ঝোপ ছিল যার পেছনে আংশিকভাবে খাওয়া জলাহরিণটার দেহাবশেষ পরদিন দেখা গিয়েছিল।

সারা বিকেল এবং সন্ধে ধরে, যুবরাণী যে ঘটনাগুলি দেখেছেন, এবং যে সমস্ত জানোয়ারের ছবি তুলেছেন, সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত নোট নিলেন। আমি জানতাম তিনি যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন তখন বাড়ির যাঁরা তাঁর তোলা ফিল্ম দেখবেন, নোটগুলি তাঁদেরই জন্যে ধারাবিবরণী হিসেবে ব্যবহার করা হবে—তাঁর সে সফরে যাওয়া অবশ্য ঘটে ওঠে নি।

অপূর্ব সূর্যাস্তের শেষ আভা আকাশ থেকে মিলিয়ে যেতে আর হাল্কা জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাতে, ক্যামেরাগুলো সরিয়ে ফেলা হল এবং আমরা আলোচনার বিষয় ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলাম। আমি যুবরাণীকে বললাম তাঁর পিতার অসুখের কথা শুনে কি গভীর দুঃখ আমি পেয়েছিলাম এবং তিনি যে আবার তাঁর প্রিয় শিকার, পাখি মারা আরম্ভ করার মত সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাতে কত আনন্দিত হয়েছি আমি। আমি তাঁকে আরও বললাম বি-বি-সি'র সংবাদে, তিনি লণ্ডন বিমানবন্দর ছাড়ার সময় তাঁর পিতা টুপি ছাড়া তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় জ্ঞাপন করেছেন শুনে আমার কিরকম খারাপ লেগেছিল। আমি আশা প্রকাশ করায় যে তাঁর নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগে নি, যুবরাণী আমায় বললেন তাঁর পিতা ওইরকমই ; তিনি কখনও নিজের ভালমন্দ চিন্তা করেন না। যুবরাণী তারপর আমায় বললেন তাঁর পিতার দীর্ঘ অসুস্থতার কথা, তাঁদের দুশ্চিন্তা, ভয়, আশা এবং সর্বোপরি আনন্দের কথা যখন একদিন হাঁটার ছড়িটি কাঁধে ফেলে তিনি বলেছিলেন—'আমার মনে হয় আমি এখন গুলি চালাতে পারি।' তাঁর অসুখ ভালর দিকে মোড় নিয়েছে এবং বাঁচার জন্যে তাঁর মধ্যে একটা নতুন তাগিদ এসেছে ভেবে সবাই এটাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আমি কখনও মাঠ মোরগ মেরেছি কি না যুবরাণীর এ-জিজ্ঞাসায় আমি জবাব দিলাম, চেষ্টা করেছি তবে সফল বিশেষ হই নি ; তখন তিনি আমায় বললেন, আমি তো বুঝব, মাঠমোরগ মারা কত কঠিন, এবং এ থেকেই কিছুটা ধারণা করতে পারব রাজার হাতের নিশানা কত নির্ভুল, যে, প্রথম দিন বেরিয়েই তিনি মাত্র একটি 'বাট' বা ওই পাখি মারার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তেতাল্লিশটা পাখি মেরেছিলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে একটা গোটা সপ্তাহ ধরে অনেকগুলি 'বাট্'-এর সাহায্যেও এতগুলি পাখি আমি মারতে পারি নি। যুবরাণী সায় দিয়ে বললেন হ্যাঁ, সত্যিই তাঁর পিতার হাতের নিশানা খুব ভাল। তারপর তিনি আমায় জানালেন সেই ফেব্রুআরির পঞ্চম দিনটিতে তাঁর পিতা কোথায় শিকারে ব্যস্ত থাকবেন এবং তার পরদিন কোথায় শিকারের ইচ্ছে তাঁর আছে।

এ ধরনের কথা বলা হয়েছে শুনেছি এবং লেখা আমি নিজেই দেখেছি যে যুবরাণী তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরকালে যখন মহামান্য রাজাকে লণ্ডন বিমান বন্দরে বিদায় জানান তখনই তিনি জানতেন যে তিনি আর তাঁর পিতাকে ইহজগতে

দেখতে পাবেন না। একথা আমি বিশ্বাস করি না। তরুণী যুবরাণী সে রাতে তাঁর পিতা সম্বন্ধে যে ভালবাসা ও গর্ব নিয়ে কথা বলেছিলেন এবং ফিরে যাওয়ার পর পিতাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখার যে গভীর আশা প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ফিরে যাওয়ার পর পিতাকে আর দেখতে পাবে না একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এখন ডিনার পরিবেশন করা হয়ে গেল এবং আমরা বারান্দা ছেড়ে, লাইন করে ঢুকলাম খাওয়ার ঘরে। উপস্থিত সাতজনের জন্যে জায়গা করা হয়েছিল আর আমি যখন ঘরের অন্য প্রান্তে এগোচ্ছি তখন যুবরাণী বলে উঠলেন 'আপনি আমাদের দুজনের মধ্যে বসুন না।' উনি একথা বলা মাত্রই ডিউক তাঁর জন্যে প্রস্তুত গদীমোড়া আসনটি আমায় দেখিয়ে তার পরের গদীছাড়া আসনটিতে বসলেন। পালিশহীন খাওয়ার টেবিলটির দু পাশে ছিল বেঞ্চি—সেগুলো এত শক্ত কাঠে তৈরি যে ডিউক কোনোদিন অত শক্ত বেঞ্চিতে বসেছেন কিনা সন্দেহ। আমরা সেদিন ছিলাম এরিক এবং লেডী বেটি ওয়াকার-এর নিমন্ত্রিত অতিথি এবং সেদিন যে প্রচুর সুখাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল প্রত্যেকেই তার তারিফ করেছিলেন কারণ দিনভর উত্তেজনা এবং জঙ্গলের তাজা পরিষ্কার বাতাসে আমাদের প্রত্যেকেরই খুব খিদে পেয়েছিল। যখন কফি তৈরি হচ্ছে তখন স্পিরিট ল্যাম্পটিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায় ও সেটাকে টেবিল থেকে ঝটকা মেরে ফেলে দেওয়া হয় ঘাসের মাদুর ঢাকা মেঝের ওপর। সবাই যখন পাগলের মত আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে তখন আফ্রিকান ছেলেটি, যে ডিনার পরিবেশন করেছিল, ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল, একটা ভিজে কাপড় দিয়ে আগুনটা নেভাল, তারপর স্টোভের পেছনে তার খুপরিতে চলে গেল এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই সে ল্যাম্পে আবার তেল ভরে, জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রেখে গেল। অদূর ভবিষ্যতেই ট্রী টপ্‌স-এ হানা দেওয়া হয় এবং সেই চালাক চটপটে ছেলেটিকে, ঘরটির বিছানা, খাবার, রান্নার বাসনপত্র এবং অন্যান্য অস্থাবর সরঞ্জামের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছেলেটির হাড় আফ্রিকার সূর্যে আরও সাদা হয়ে উঠছে না সেও যোগ দিয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের দলে, এ শুধু কল্পনার বিষয়।

ডিনারের পর যুবরাণী ও তাঁর দলবল বারান্দায় ফিরে গেলেন। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সল্ট লিকের ওপর দেখা গেল নয়টি গণ্ডার। সেই বকটি, ড্যাবচিক পরিবারটি, হাতির পাল ও অন্যান্য জানোয়ার সব চলে গিয়েছিল আর যে ব্যাঙগুলো আগে এত সরব ছিল তারাও এখন চুপচাপ।

যুবরাণীর দলবলকে বারান্দায় রেখে, যেখানে তাঁরা চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত ছিলেন, আমি আমার বৃটিশ কম্বলটি, যেটি যুদ্ধের সময় আমার প্রচুর কাজে এসেছিল, সেটি নিয়ে তিরিশ ফুট মইটির ওপরের ধাপে আরাম করে বসলাম। অনেক সুদীর্ঘ রাত আমায় গাছের ডালে বসে কাটাতে হয়েছে, ফলে কয়েক

ঘণ্টা একটা মইয়ের ধাপের ওপর বসে থাকাটা আমার কাছে কোনো কষ্টই নয় ; সত্যি কথা বলতে কি আজকের রাতটিতে, এটা আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার। এই কথা অনুভব করে আনন্দ যে একটি রাতের জন্যে এমন এক মূল্যবান জীবন রক্ষার সম্মান আমি পেয়েছি যিনি বিধিদত্ত সময়ে ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে বসবেন। সেই আজকের এই পরম দিনটির পরে আমার নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকবার জন্যে একলা থাকারও দরকার ছিল।

চাঁদ ডুবে গেল—জঙ্গলের গভীরে এখন সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকারের দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, কিছু দেখা যায় না কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না কারণ মই বেয়ে এক সাপ ছাড়া অন্য কিছু উঠলে তার কম্পন আমি অনুভব করব। আমার মুখের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে এবং ফিকাস গাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের পটভূমিতে দেখা যায় একটা ঝুলন্ত ম্যানিলা দড়ি, যেটা গিয়েছে একটা কপিকলের মধ্যে দিয়ে এবং যেটা ব্যবহার করা হয় মাটি থেকে মালপত্র, খাবার ইত্যাদি ওপরের ঘরের টেনে তুলতে। হঠাৎ দড়িটা নড়ে উঠল—কোনো শব্দ কিন্তু আমার কানে আসে নি। নরম থাবার ওপর চলছে এরকম কিছু একটা দড়িতে একটা হাতে দিয়েছে বা দড়িটা ঘেঁষে চলে গেছে। উদ্বেগ-ভরা কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল কিন্তু মইটা আর কেঁপে উঠল না তারপর দড়িটা দ্বিতীয়বার আবার নড়ে উঠল। সম্ভবত আমি পথের ওপর যে চিতা-গুলোর থাবার ছাপ দেখেছিলাম তাদেরই মধ্যে একটা মইয়ের কাছে এসেছিল কিন্তু মইয়ের ওপর একজন কেউ আছে দেখে চলে গেছে। মইটা, যতই খাড়া হ'ক, চিতার মতন ওঠার ক্ষমতা যার, সেরকম কোনো জানোয়ারের কাছে এটা কোনো বাধাই হত না এবং আমি যতই অন্যরকম জানি না কেন, আমার ওপরের পাটাতনটা হয়তো চিতারা পর্যবেক্ষণের খুঁটি হিসেবে বা রাতে শোয়ার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করত। ভারতীয় জঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় আফ্রিকার জঙ্গল রাতে হতাশা জনকভাবে নিস্তব্ধ,—সে রাতে, সারারাতের মধ্যে মাঝে মাঝে গণ্ডারদের ঝগড়া বাদ দিলে আমি শুনেছিলাম একটি হায়েনার করুণ ডাক, একটা ঝোপ-হরিণের ডাক এবং একটি গাছ—হাইরাক্স-এর (হাইরাক্স : ছোট চতুষ্পদ প্রাণী, খরগোশ জাতীয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় রক-ব্যাজারকে এই নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটি নেউল ও ভাল্লুকের মাঝামাঝি এক মাংসাশী নৈশ চতুষ্পদ। —সম্পাদিকা) চিৎকার।

ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিলাম এবং কুঁড়েঘরটিতে উঠে দেখলাম যুবরাণী একটা মিটার হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে সল্ট লিকের ওপর একটা বুড়ো গণ্ডারের ছবি তোলার আগে আলো পরখ করে দেখছেন। আফ্রিকার দিনের আলো আসে খুব তাড়াতাড়ি এবং প্রথম সূর্যের রশ্মি চারিদিক আলোকিত করে তুললেই, যুবরাণী যার জন্যে

অপেক্ষা করছিলেন, সেই ছবি তুলতে লাগলেন। তিনি যখন গণ্ডারটার ছবি তুলতে ব্যস্ত তখন ডিউক সল্ট লিকের দিকে এগিয়ে আসা অন্য একটা গণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্পষ্টতই দুটি গণ্ডার পুরনো শত্রু, কারণ তারা দুজনে দুজনের দিকে লড়াইয়ের ভঙ্গীতে ছুটে এল—কিছু-ক্ষণের জন্যে মনে হয়েছিল হয়তো রাজকুলের দর্শকদের জন্যে একটা বিরাট লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। অভিজ্ঞ বক্সারের মত এগিয়ে পিছিয়ে, ঠিকমত জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করে গণ্ডার দুটি কিছুক্ষণ দুজনে দুজনকে পাশ কাটিয়ে চলল, তারপর নবাগত গণ্ডারটি ঠিক করল বিবেচনার দাম সাহসের থেকে বেশি এবং রাগ প্রকাশের জন্যে একবার ঘোঁত করে, দৌড়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে গেল—যুবরাণীও এতক্ষণে সুযোগ পেলেন লেডী বেটি পরিবেশিত গরম চা পান করার।

যদিও সামান্য কয়েক ঘন্টা ঘুমিযে ছিলেন তবুও যুবরাণী দ্বিতীয় দিনটি আরম্ভ করলেন উজ্জ্বল চোখে, ফুলের মত সতেজ মুখ নিয়ে। তাঁর গালের রক্তিমাভা বাড়ানোর জন্যে কোনো কৃত্রিম সাহায্যের দরকারও হয় নি, তিনি ব্যবহারও করেন নি। বহু বছর আগে এক শীতের দিনে আমি গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়েছিলাম যুবরাণীর পিতামহের সঙ্গে এবং তাঁকে দেখে আমার বুঝতে দেরি হল না এই অপূর্ব লাবণ্য তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন।

গণ্ডারগুলো এখন চলে গেছে, শুধু সাদা বকটা হ্রদের পাড়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে এবং ড্যাবচিক পরিবারটি নিথর জলের ওপর দাগ কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর বিশেষ কিছুই করার নেই তাই ক্যামেরা দুরবীন সরিয়ে রেখে আমরা প্রাতরাশ সারার জন্যে খাবার ঘরে গেলাম—প্রাতরাশে ছিল স্ক্র্যাম্বেল্‌ড ডিম, আর বেকন, টোস্ট, মারমালেড, কফি, যেটা বানাতে এযাত্রায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি এবং আফ্রিকার সেরা রসাল ফল। এখন গলা নিচু করে কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং আমাদের প্রাতরাশ সারা হয়ে গেলে আমি বললাম যে যুবরাণীই তাঁদের পরিবারে একমাত্র, যিনি একটা গাছের ওপর ঘুমিয়েছেন আর গাছের ওপর তৈরি ডিনার এবং প্রাতরাশ খেয়েছেন।

যে রক্ষীদল যুবরাণীর দলবলকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষমান গাড়ি-গুলোতে নিয়ে যাবে। এডোয়ার্ড উইণ্ডলির নেতৃত্বে তারা এসে পোঁছল এবং খুশিতে উজ্জ্বল যুবরাণী গাড়িতে চলে যাওয়ার সময় হাত নেড়ে চিৎকার করে বললেন 'আমি আবার আসব।' রয়েল লজে ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবরাণীকে জানানো হল যে তাঁর পিতা, যাঁর সম্বন্ধে এত ভালবাসা ও গর্ব নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন, গতরাত্রে, ঘুমের মধ্যেই মারা গিয়েছেন।

আমার মনে হয় যুবরাণী এলিজাবেথ এবং ডিউক ফিলিপ ট্রী টপ্‌স-এ ৫ই ফেব্রুআরি বেলা ২ টো থেকে ৬ই ফেব্রুআরি বেলা ১০টা পর্যন্ত যেমন আনন্দে ও নিশ্চিন্তে সময় কাটিয়েছিলেন অন্য কোনো যুবক যুবতীর ভাগ্যে তা ঘটে নি।

নিজের কথা বলতে পারি যে, যে কয় ঘণ্টা তাদের সান্নিধ্যে থাকার সম্মান ও সুযোগ আমার হয়েছে তা যতদিন আমার স্মৃতিশক্তি থাকবে ততদিন আমার সঙ্গেই থাকবে।

ট্রী টপ্‌স-এর অতিথিদের জন্যে একটি রেজিস্টার রাখা আছে—কি কি জানোয়ার দেখা গিয়েছে তাও তার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। যুবরাণী ট্রী টপ্‌স-এ আসার পরের দিন রেজিস্টারটি আমার কাছে আনা হয় কিছু লেখার জন্যে। যুবরাণীর দলবলের প্রত্যেকের নাম, কি কি জানোয়ার দেখা গিয়েছে এবং জানোয়ারগুলি সংক্রান্ত প্রতিটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করার পর আমি লিখেছিলাম :

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একটি তরুণী যুবরাণী থাকাকালীন একটি গাছে উঠলেন এবং তাঁরই বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জীবনে সবচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, পরের দিন তিনি গাছ থেকে নেমে এলেন রাণী হয়ে—ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

যে ফিকাস গাছ ও কুঁড়েঘরটি যুবরাণী এলিজাবেথ এবং ডিউক অফ এডিনবারার পদার্পণে সম্মানিত হয়েছিল আর সিকি শতাব্দী ধরে যেখানে পৃথিবীর প্রতি প্রান্ত থেকে অজস্র অতিথি সমাগম হত, আজ তার অবশিষ্ট আছে শুধুমাত্র ছাইগাদার ওপরে একটা মরা, কালো গাছের গুঁড়ি। এই ছাইয়ের ওপরেই কোনোদিন গড়ে উঠবে নতুন আর এক ট্রী টপ্‌স—সেখানে আর এক বারান্দা থেকে নতুন মুখেরা দেখবে অন্যসব পাখি, জানোয়ার। কিন্তু আমরা যারা সেই প্রাচীন গাছটি এবং বন্ধুত্বের উষ্ণতা মাখা কুঁড়েঘরটি জানতাম তাদের কাছে ট্রী টপ্‌স চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

নিয়েরি
৬ই এপ্রিল, ১৯৫৫

অপ্রকাশিত রচনা

গুংগি

[এটি জিম করবেটের একটি অপ্রকাশিত রচনা। এটির উল্লেখ ভূমিকায় পাওয়া যায়। করবেটের বন্ধু এবং অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষ আর. ই. হকিন্স আমাকে লেখাটির কথা জানান। "মাই ইণ্ডিয়া" বইয়ের জন্য করবেট এটি লেখেন এবং পরে বই থেকে বাদ দেন। লেখাটি আমরা অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের সৌজন্যে পেয়েছি। 'গুংগি' মানে বোবা। ১৯১৪ সালে নৈনিতালের কাছে একটি মেয়েকে পাওয়া যায়। তখনকার খবরের কাগজে তাকে 'নেকড়ে শিশু' বলা হয়েছিল। এ তারই কাহিনী।]

যে উপত্যকার পাদদেশে মানুষখেকো বাঘটির তল্লাস করছিলাম বলে আগের অধ্যায়ে বলেছি, সেখান দিয়ে একটি মোটর চলাচলের রাস্তা আলমোড়া আর রাণীখেতের সঙ্গে মিটারগেজ রেলের টারমিনাস কাঠগুদামের সংযোগ ঘটিয়েছে। এই রাস্তাতেই, রতিঘাট থেকে তেমন দূরের নয়, একদিন একদল লোক কাজ করছিল। তারা দেখতে পেল রাস্তার ওপরে পাহাড়ে, দেখে মনে হল একটা অদ্ভুত জন্তু, একটা ঝোপের আড়াল থেকে আরেকটায় যাচ্ছে। গাঁইতি-শাবল ফেলে দিয়ে লোকগুলো সে ঝোপটা ঘিরে ফেলে আর ঘিরে কাছে এগোতেই দেখে একটি উলঙ্গ মানুষ একটা ঝোপের নিচে ভয়ে গুটিসুটি মেরে আছে। লোকেরা কাছে যেতেই সে চার হাত-পায়ে জোরসে ছুটে মানুষের গণ্ডী পেরিয়ে চলে যায়। অনেক দূর তাড়া করে তাকে ধরে কাবু করে কেবল দড়ি দিয়ে

হাত-পা বেঁধে একটা কাণ্ডীতে (পাহাড়ীদের মাল বইবার কোনাচে ঝুড়ি) করে নৈনিতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমি তখন মোকামাঘাটে ছিলাম। যাকে নেকড়ে-শিশু বলা হচ্ছে, নৈনিতালের কাছে তাকে পাওয়া যাবার খবর কাগজে পড়ছিলাম। কাগজে পড়ে আমি পেশাদারী ফোটোগ্রাফার লরীকে টেলিগ্রাম করে আমার জন্যে ওই শিশুর অনেকগুলো ছবি তুলতে বললাম। যে হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, লরী সেখানে গেল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো ছবিই তুলতে পারল না। কারণ যে ঘরে শিশুটিকে আটকে রাখা হয়েছিল, তার এক কোণে খড়ের গাদার নিচে সে লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বের করতে পারে নি লরী। পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে শিশুটি খবর হয়ে রইল। ও নেকড়ে শিশু না বানর-শিশু তা নিয়ে প্রচুর জল্পনা কল্পনা চলল। কালে উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। সবাই ভুলে গেল তাকে।

কয়েক মাস বাদে যখন নৈনিতালে গেলাম, একটি চিঠি পেলাম। সেটি ইংলণ্ডের একটি অ্যাসোসিয়েশনের ভারত-সরকারকে লেখা। সংস্থাটির সভাপতি সার বামফিল্ড ফুলার। সে চিঠিতে নৈনিতালের নেকড়ে শিশু বিষয়ে সব খবর চাওয়া হয়েছিল।

এ চিঠি পেয়ে, গত পনের বছরে রতিঘাটের দশ মাইলের মধ্যে কোনো গ্রাম থেকে কোনো শিশু হারিয়েছে কি না তার তদন্ত করতে ; আর নেকড়ে-শিশুর বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কিছু ও অঞ্চলের কোনো লোক কোনো দিন দেখেছে কি না তারও খোঁজ নিতে আমার বন্ধু মোতি সিংকে পাঠালাম। ও আমার সঙ্গে বিশ বছর আছে।

মোতি সিং যখন খোঁজখবর চালাচ্ছে, আমি গেলাম নৈনিতালের তহশীলদারের আপিসে। সেখানে সব নথিপত্র রাখা হয়। নৈনিতাল জেলায় কোনো শিশু হারাবার রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে তহশীলদারের সহায়তায় ওর পনের বছরেরও বেশি সময়ের নথিপত্র দেখলাম। কি মোতি সিংয়ের, কি আমার তদন্তে কিছুতেই, কোনো শিশু হারিয়েছে অথবা ও অঞ্চলের জঙ্গলে শিশুর মত দেখতে, কোনো কিছু দেখতে পাওয়া গেছে বলে জানা গেল না।

তারপর আমি গেলাম ক্রসথোয়েইট হাসপাতালে। সেখানে শিশুটিকে ভর্তি করা হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত লেডী মিস মিশ্র আমাদের পরিবারের পুরনো এবং প্রিয় বন্ধু। যখন তাঁকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বললাম, তিনি অসীম অনুগ্রহে যতভাবে পারেন সাহায্য করতে চাইলেন। মিস মিশ্র ছাড়া একজন নার্স আর একজন ওআর্ড অ্যাটেনডেন্ট শিশুটিকে দেখাশোনা করেছিলেন।

এই তিনজন মহিলার কাছ থেকে আর হাসপাতালের নথিপত্র থেকে আমি নিচের খবরগুলো বের করতে পারলাম।

১৫.৭. ১৯১৪ তারিখে আন্দাজ ১৪ বছরের একটি মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রেজিস্টারে তার নাম লেখা হয়েছিল গুংগ। দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায়, একজন পাহাড়ীর পিঠে কাণ্ডীতে চাপিয়ে মেয়েটিকে হাসপাতালে আনা হয়। তার সঙ্গে ছিল একটি পুলিস আর বেশ বড়সড় এক জনতার ভিড়। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল মানুষে ও ভয় পাচ্ছে। ওকে একটি খালি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যে দাঁড়তে বাঁধা ছিল তা যখন খোলা হচ্ছে, ও নার্সকে কামড়ে দেয়, ভীষণ গর্জন করে তিনটি মহিলাকেই ভয় খাইয়ে দেয়। ছাড়া পেতেই চার হাত-পায়ে ছুটে মেয়েটি ঘর পেরিয়ে চলে গিয়ে এক কোণে গুটিসুটি মেরে থাকে।

মিস মিশ্র, নার্স আর ওআর্ড অ্যাটেনডেণ্টের কাছ থেকে আমি এই সব খুঁটিনাটি জানতে পারলাম।

(১) মিস মিশ্র ওকে গুংগ (বোবা নাম দিয়েছিলেন, কেননা মেয়েটি কথা বলতে পারত না।

(২) ওর বয়স আন্দাজ চোদ্দ বছর।

(৩) ও বেশ সবল আর স্বাস্থ্যবতী। অপুষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি।

(৪) শরীর খুব নোংরা আর ঘনলোমে ঢাকা।

(৫) মাথার চুল ছোট আর জটপড়া।

(৭) কাঁধে আর শরীরের ওপর দিকে অনেক গভীর আঁচড়ানি। কতকগুলো সেরে যাচ্ছিল, কতকগুলো শুধু জখমের দাগ।

(৮) যে সব জামাকাপড় ওকে ছুঁড়ে দেয়া হয়, তা ও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু এক বোঝা খড় খুশি হয়েই নিয়েছিল। সেটি ঘরের এক কোণে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি তারপর থেকে তার নিচেই লুকিয়ে থেকে গিয়েছিল।

(৯) সব রকম রান্না খাবারই খেতে ও নারাজ হয়েছিল। তবে কাঁচা মাংস, ফল আর শাকসবজী খেত।

(১০) ও সন্তোষ জানাত পাখির কূজনের মত এক রকম শব্দ করে। অসন্তোষ জানাত গর্জন করে।

(১১) ঘরে যে কাঁচা মাংস, ফল অথবা তরিতরকারী ছুঁড়ে দেওয়া হত, তা মুখে ঢোকাবার জন্যে মানুষ আর বাঁদর যেমন হাত ব্যবহার করে, ও তা করত না। তবে হাতের পেছন দিয়ে ওগুলো ওর সামনে জড়ো করত। তারপর

ঘরের যে কোণটিতে ও বাসা বানিয়ে নিয়েছিল সেখানে ওগুলো দাঁত দিয়ে তুলে তুলে নিয়ে যেত।

(১২) চার হাত-পায়ে, অর্থাৎ হাত ও পায়ের চেটো ও পাতায় ভর করে ও খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করত, কনুই আর হাঁটুর ভরে চলত না।

(১৩) অভ্যেসগুলো খুব নেংরা ছিল ওর, মলমূত্র ত্যাগের আর শৌচের শিক্ষা ওর হয় নি। যখন ঘর ধোয়ার দরকার হত, ওর কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হত। কাঠের থামের ঠেকনোর ওপর বারান্দার ছাত। থামগুলোর একটায় শক্ত করে দড়িটা বাঁধা হলে পরে তখনি, দেখে মনে হত যেন বিনা আয়াসেই ও থামের ওপর অব্দি বেয়ে উঠে যেত। আবার টেনে না-নামানো অব্দি ও ওখানেই থাকত।

(১৪) মিস মিশ্র, নার্স আর ওআর্ড অ্যাটেনডেন্ট, তিনজনই পাহাড়ী মেয়ে। মেয়েটির গায়ের রং, মুখচোখ আর গড়ন পেটন দেখে ওঁদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল ও পাহাড়ী মেয়ে। ওঁদের সুনিশ্চিত অভিমত হল, সব বন্য প্রাণী যে অর্থে নিরীহ আর বন্য, মেয়েটিও সে অর্থে নিরীহ আর বন্য। তা বাদ দিলে মেয়েটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আর খুব বুদ্ধিমতী।

ওর ক্রস্থোয়েইট হাসপাতালে থাকার শেষের দিকে, গুংগি আর ওর অ্যাটেন্ডেন্টদের কামড়ে দিতে চেষ্টা করত না। ওকে স্নান করাতে, চুল আঁচড়ে দিতে, নখ কাটতে দিত। প্রতিবার কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওকে একটা ঢিলে এককাটের জামা পরতে দিত। সদয় ব্যবহারে এতখানি কাজ হয়েছিল ওর। তবে বিছানা বা কম্বল ব্যবহার করতে ওকে মোটে রাজী করানো যায় নি। কোণের সেই খড়ের নিচেই সর্বক্ষণ থাকত। ওর সন্তোষের রকমফের জানাবার জন্যে ও সেই কূজন ধ্বনিটিরই রকমফের করে করে সন্তোষ জানাত।

২৫ ৭.১৯১৪ তারিখে প্রহরাধীন অবস্থায় গুংগিকে বেরিলির পাগলা গারদে পাঠানো হয়। ভর্তি হবার অল্পদিন বাদেই ও সর্দিগর্মি লেগে মারা যায়। সভ্যতার সঙ্গে অল্প কয়দিনের পরিচয়ের পরই এমনি করেই নেকড়ে-শিশু গুংগি বিদায় নিল। ও কে, কোথা থেকে ও এসেছিল। এই জল্পনা-কল্পনাটুকু শুধু রেখে গেল পেছনে।

শুধু নৈনিতালে আর চারপাশের পাহাড়েই নয়, গুংগির আবির্ভাব সারা ভারতবর্ষেই স্বাভাবিকভাবেই দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। ওর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার জন্যে অনেক তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মত হল, ও হয় নেকড়ে-শিশু, নয় তো বানর-শিশু। ভারতীয়দের মত হল ও নেকড়ে-শিশু।

গুংগি যে বানর-শিশু, সে তত্ত্বটি এই সব কারণে খারিজ করা চলে—মুখে খাবার পোরার জন্যে গুংগি হাত ব্যবহার করত না ; ও কাঁচা মাংস খেত ; ও

যদি দীর্ঘদিন বানরদের সঙ্গে থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে ওকে বানরদের সঙ্গে দেখা যেত ; কেন না পাহাড় অঞ্চলে বানররা কখনো আবাদী জমি থেকে বেশি দূরে থাকে না, ওদের অভ্যেসগুলো এমন যে, সেজন্যে ওরা খুবই চোখে পড়ে ; কিন্তু ওকে কখনোই বানরদের দলে দেখা যায় নি।

তাহলে রইল এই কথাটি, ও তবে নেকড়ে-শিশু। নেকড়েরা যে শিশুদের লালন-পালন করে, সেই রমুলাস আর রেমাসের কাল থেকেই এই অতি প্রাচীন বিশ্বাসটি চলে আসছে। ভারতবর্ষের আগাগোড়া জুড়ে এ বিশ্বাসটি আজও প্রচলিত। এমন কি যেসব জায়গায় শত শত বছর আগেই নেকড়ে লোপ পেয়েছে, সেখানেও। এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি যদি বলি, যে কোনো নেকড়ে কোনো শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করেছে এরকম একটি ঘটনাও বাস্তবে ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাসই করি না, তাহলে আমি যে শুধু তামাশার পাত্রই হব, সে আমি জানি।

এমন কি ইদানীংকার বছরেও নেকড়ের বাসা বলে পরিচিত মাটির গর্ত থেকে শিশুদের খুঁড়ে বের করে আনার ঘটনার রিপোর্ট মিলেছে। কিন্তু আমি যতগুলো ঘটনা জানি, তাতে প্রতিবারই দেখা গেছে শিশুটি অপ্রকৃতিস্থ। আর মাটির বুকে কোনো অপ্রকৃতিস্থ শিশুকে পাওয়া গেলে তাতে এই প্রমাণ হয় না, যে কোনো নেকড়েই শিশুটিকে গর্তে রেখেছিল, তাকে খাইয়েছিল।

নেকড়ে-শিশুদের এইসব গল্প আমি এই এই কারণে বিশ্বাস করি না :

(ক) ভারতীয় নেকড়ে একটি নিরীহ প্রাণী। অমন এক নিরীহ প্রাণীকে জনবসতিতে ঢুকে শিশুকে তুলে নিয়ে যেতে হলে সে তা করবে চরম উপবাসের অবস্থায় পৌঁছে। তাই যদি হয়, তাহলে উপোসী জানোয়ারটি পেটের খিদে না মিটিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছানাদের উপহার দেবে, অথবা ছানা না থাকলে পরে ওকে পোষার জন্যে রাখবে, এ ধারণা করা যায় না। আমি যা জানি, বন্যজগতে জীবনযাত্রা এমনই কষ্টকর এক ব্যাপার যে, বন্য জন্তুরা খেলার জন্যে বা পোষার জন্যে কোনো কিছু রাখতে পারে না। তাছাড়া, সে অবস্থায় শিশুটিকে যে খাদ্য খেতে হবে, তা খেলে সে বাঁচবেই না।

(খ) ভারতীয় শিশুদের মধ্যে যারা খানিকটা গরিব ঘরের, তারা তাদের মা-বাবার সঙ্গেই ঘুমোয়। নেকড়েরা সেই গরিব ঘরের শিশুদের তুলে নিয়ে গেছে বলেই বরাবর শোনা যায়। যখন গায়ে দাঁত বসিয়ে তাকে জ্যান্ত তুলে নিয়ে যাচ্ছে নেকড়ে, তখন কোনো শিশু চুপ করে থাকবে ; সে শিশুর বাপ-মা, অথবা পাড়াপড়শি, অথবা প্রতি ভারতীয় গ্রামে যে নেড়ি কুকুরদের দল থাকে তারা কি হচ্ছে তা জানতেই পারবে না, এ আমি বিশ্বাসই করব না।

(গ) ভারতীয় নেকড়ে শেয়ালের চেয়ে সামান্যই বড় হয়। সে কিছুদূর পর্যন্ত কোনো শিশুকে মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে বটে ; কিন্তু কোনো

শিশুকে মাটি থেকে তুলে তাকে বহুমাইল দূরে নিজের বাসায় জ্যান্ত বয়ে নিয়ে চলে যাবে, তত গায়ের জোর নেকড়ের আছে বলে আমি মানি না।

(ঘ) আর শেষ কথাটি বলি। হয়ত নিজের অজ্ঞতাই জাহির করছি একথা বলে। যেখানে নেকড়ে বিরল এবং আকারে ছোট, সেই ভারতবর্ষেই কেন নেকড়ে-শিশু দেখা যায়? যেখানে নেকড়ে সংখ্যায় অনেক, আর আকারেও বড়, সেই রাশিয়া আর কানাডায় নেকড়ে-শিশু দেখা যায় না কেন?

গুংগি যদি অপ্রকৃতিস্থ হত; জনবসতির কাছাকাছি গর্ত থেকে বের করে আনা শিশুদের যেরকম শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থায় পাওয়া যায় বলে বলা হয়— ওকেও যদি তেমনি অবস্থাতেই পাওয়া যেত; মোতি সিংয়ের তদন্ত আর তহশীলদারের নথিপত্র সত্ত্বেও আমি তাহলে কোনো ইতস্তত না করে বলতাম, ও হচ্ছে ভারতের অবাঞ্ছিত মেয়েদের একজন। নিজে যেমন পারে করে খাক গে, বলে ওকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু গুংগি অপ্রকৃতিস্থ ছিল না। ওর শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। ওর চেয়ে ভাল হয় না। ও ধরা পড়েছিল জনবসতি থেকে অনেক দূরে। বহুদিন ও মানুষের থেকে দূরে ছিল, মানুষদের দেখে বন্য প্রাণীদের অমনি আচরণ করতেই দেখেছিল। এইসব কারণ দিয়ে ওর নিরীহতা, বন্যতা আর মানুষ-ভীতিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

যেসব কারণ দেখানো হল সেজন্যে তো বটেই, তাছাড়াও, গুংগিকে যেখানে পাওয়া যায় তার একশো মাইলের মধ্যেও নেকড়ে নেই,—এই কারণেও বানর আর নেকড়ে বাদ যাচ্ছে। তাহলে রইল একটি অত্যন্ত সুদূর সম্ভাবনা। ও হয়তো জংলী কুকুর অথবা ভাল্লুকদের দলে ভিড়েছিল। তারা ওকে লালন-পালন করেছিল এত বড় কথা আমি বলব না। যে অঞ্চলে ওকে পাওয়া যায় সেখানে ওই দুটি প্রাণীই দেখা যায়। দুটি প্রাণীই ওকে কাঁচা মাংস খেতে শেখাতে পারত।

গুংগি যখন রাস্তার কুলিদের হাতে ধরা পড়ে। ওর পরিচয় ঠিক ঠিক জানবার জন্যে, পরে আমি যে খোঁজখবর করি তা ছাড়া কোনোরকম তদন্তই করা হয় নি এ খুবই দুঃখের কথা। পাহাড়ী মেয়ে গুংগি, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দেশে বুনো হয়ে গিয়েছিল। একটা গরম সমতলের শহরে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী রাখার জন্যে তাকে পাঠানো হল. এও খুবই দুঃখের কথা।

এজন্যে ক্রস্‌থোয়েইট হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত লেডী ডাক্তারকে দোষ দেবার কিছু নেই। গুংগির কোনো ডাক্তারী চিকিৎসার দরকার ছিল না। ও ছিল বলে শত শত লোক কৌতূহলে সেখানে যেত। তারা হাসপাতালের নিয়মিত কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। তাই গুংগিকে সরিয়ে নিতে বলা মিস মিশ্রের পক্ষে ঠিকই হয়েছিল।

তবে, কুমায়ুনে যেসব জীবজন্তু পাওয়া যায় তাদের কোনোটির সঙ্গে গুংগি মিশেছিল কি না তা জানবার একটি সুযোগ হারিয়ে গেল। এমন সুযোগ আর না মিলতেও পারে। সবচেয়ে কাছের চিড়িয়াখানায় ওইসব জানোয়ারের সঙ্গে ওকে মুখোমুখি রাখলে পরে এ খবরটি জানা যেত। তাছাড়াও, গুংগি যে কথা কইতে পারত না, তার মানে এই নয় যে ও একেবারে বোবা।

ওকে কথা কইতে শেখানো যেত এ খুবই সম্ভব। লিখতে শেখানো তো যেতই। সত্যি সত্যিই বন্য প্রাণীরা শিশুদের লালন করবার ভার নেয় কি না, ওদের সঙ্গে কাছাকাছি হয়ে শিশুদের বাস করতে দেয় কি না, গুংগির কাহিনী তাহলে সে ব্যাপারটির পাকাপাকি ফয়সালা করে দিত।

কেন না, অত্যন্ত ভালোভাবে ট্রেনিং পাওয়া যে তিনজন মহিলা ওকে দেখাশোনা করেছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্য অনুসারে গুংগি ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, খুবই বুদ্ধিমতী। তাহলে ওর ধরা পড়বার আগের জীবনের অভিজ্ঞতাটি গুংগির তরুণ স্মৃতিতে এমন করে ধরা থাকত, যা মুছে যায় না কিছুতে। ওকে যখন কথা কইতে বা লিখতে শেখানো যেত, তখন সে অভিজ্ঞতার একটা রেকর্ডও থাকত। সে রকম কোনো রেকর্ড তৈরি হলে পরে, আমি আশা করতাম, গুংগি বলত, ও ভাল্লুকদের দলেই মিশেছিল। তার কারণ হল এই

ভাল্লুকরা অনেকটা সময় গাছের ওপরে কাটায়। গুংগি প্রায় বিনা আয়াসেই কাঠের থামে চড়তে পারত। ও গাছে চড়তেও পারত এরকম ধরে নেওয়া যুক্তি সংগত।

ভাল্লুকরা সামনের থাবা দিয়ে ওদের খাবার কাছে টেনে আনে, তারপর দাঁতে কামড়ে মাটি থেকে খাবার তুলে নেয়। গুংগিও তাই করত।

ভাল্লুকরা কাঁচা মাংস, ফল আর তরিতরকারী খায়। গুংগিকে যখন প্রথম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ও শুধু ওইসব খাবারই খেত।

হিমালয়ের সব জায়গার ভাল্লুকরাই মেয়েদের জখম করে বলে একটা কথা চালু আছে। এ বিশ্বাসটি এমন জোরদার, যে কয়েক রকম ফলের মরসুমে মেয়েরা গ্রামের কাছের জঙ্গলে যায় না। গুংগির কাঁধ আর শরীরের ওপরভাগের আঁচড়ের ব্যাখ্যা মেলা দরকার। কাঁটাবন দিয়ে যাবার সময়ে যদি ওর গায়ে আঁচড়গুলো লাগত, তাহলে ওর শরীরের নিচের দিকে, হাতে আর পায়েও আঁচড় থাকত।

একজন ফরেস্ট গার্ড একটা কথা চালু করেছিল। একজন ফরেস্ট অফিসার একটি ভাল্লুককে গুলি করে মারেন। ভাল্লুকটির পেছন পেছন চার হাতে পায়ে গুংগিকে নাকি যেতে দেখা গিয়েছিল। যে ফরেস্ট অফিসারের কথা বলা হয়, তিনি হলেন স্মাইদিস্। আগের অধ্যায়ে যে মানুষখেকো বাঘের কথা

বলেছি। সেটিকে উনি মেরেছিলেন। স্মাইদিস্ আমাকে বলেন, যে অঞ্চলে গুংগকে পাওয়া যায়, সেখানে একটি ভাল্লুক তিনি মেরেছিলেন বটে, তবে তিনি যতদূর জানেন, ভাল্লুকটিকে মারার সময়ে তার সঙ্গে কোনো শিশু ছিল না।

আর তাই, গুংগ যে কে ছিল; কারা ছিল ওর সঙ্গী, যতদিন না চোদ্দ বছর বয়স হল, ততদিন ও জঙ্গলে টিকে রইল কি করে; সে কাহিনী এক রহস্যই থেকে যাবে।

নাম-নামান্তর

দ্যুতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

॥ বন্যজন্তু, জঙ্গল, হাতি, শিকার ও সংসৃষ্ট বিষয়ক সটীক দেশীয় শব্দসূচী ॥

জিম করবেট অমূনিবাসে এই শব্দসূচী যোগ করতে পেরে আমার ভাল লাগছে। জিম করবেট বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আজীবন আগ্রহী ছিলেন, এবং বন ও বন্যপ্রাণী মানে শুধু শিকার কাহিনীই নয়, সে বিষয়ে শেখার ও জানার শেষ নেই। আমার এই শব্দসূচীকে আমি বলব, জিম করবেটের প্রতি আমার অসম্পূর্ণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এটির প্রয়োজন বহুদিনই অনুভব করেছি, এই সুযোগে কাজটিতে হাত দেওয়া গেল।

শব্দগুলি চয়নের চেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই করেছি, তবু স্বীকার্য, খানিকটা অনিবার্য ভাবেই ঝোঁকটা পূর্ব ভারতের উপরে পড়েছে। গ্রথিত শব্দ-তালিকাগুলি কোনভাবেই সম্পূর্ণ নয়, নিশ্চয়ই অনেক প্রমাদ ও ত্রুটি রয়ে গেল। উৎসাহী পাঠক এগুলি দেখিয়ে দিলে, নূতন শব্দ ও তথ্য আমাকে জানালে ভবিষ্যতে তালিকাগুলি সমৃদ্ধতর, সম্পূর্ণতর রূপ পাবে। উপভাষা-ভিত্তিক এক বিশেষ সর্বভারতীয় শব্দসম্ভার সংগ্রহের প্রচেষ্টা আমার বা কারো একার পক্ষে দুরূহ, হয়ত বা অসম্ভবই। কাজেই আমার মনে হয়, এই বর্তমান প্রচেষ্টার প্রধান মূল্য, এই শব্দতালিকা গ্রন্থনের কাঠামোটি দাঁড় করানো। আমি দক্ষিণভারতীয় শব্দ খুব কমই সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ত্রুটি খন্ডন ভবিষ্যতে অবশ্য কর্তব্য।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রচলিত শব্দাবলী বাংলা লিপ্যন্তরে কিছু অসুবিধা আছে। যথা দাক্ষিণী 'র' ও 'ল' বাংলার 'র' ও 'ল' নয়। অনন্যোপায় হয়ে এখানে আমাদের অক্ষরেই লিখেছি। একই কারণে অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ বাংলায় না থাকায় অন্য ভাষায় ব্যবহৃত 'ৰ' শব্দটি 'ওয়' দিয়ে লিখেছি, যাতে বানান শব্দানুগ হয়। এটাও সাধারণ নিয়ম হিসাবে সর্বত্র অনুসরণ করা যায় নি, কারণ বাস্তব উচ্চারণে অনেক ক্ষেত্রে আমার বাঙালী কানে 'ব' শব্দেরই প্রাধান্য ঠেকেছে। তাছাড়া 'ৰ'কে 'ওয়' করা সহজ, কিন্তু তাতে ঔ-কার যোগ করা মুশকিল। এসব ক্ষেত্রে 'ৰ'কে 'ব' দিয়ে লিখেছি। ভবিষ্যতে এই শব্দগুলি অন্তঃস্থ 'ব'/'ৰ' দিয়ে লেখাই উচিত হবে।

দক্ষিণভারতীয় শব্দগুলি সংগ্রহ ও তাদের উচ্চারণ ঠিক করতে শ্রীগোবিন্দন কুট্টি (মালায়লম্—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়); ডাঃ এন. ভি. সুব্বারাও (তেলুগু—জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া); শ্রী ডি কান্নন (তামিল); শ্রী জি. রামকৃষ্ণ (কান্নাড়া—জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া); মারাঠী

শব্দগুলি বিষয়ে শ্রীমতী নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় (সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়ান্সেস্); এ'দের সহৃদয় সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

হাতি সম্পর্কিত শব্দগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে রাজকুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার (গৌরীপুর) কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। শুধু হাতি নয়, গোয়ালপাড়ার উপভাষায় প্রচলিত সমস্ত শব্দই এ'র কাছ থেকে নিয়েছি। তাছাড়াও হাতি সম্বন্ধে প্রতিটি বিষয়ে, নানা খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার এবং তাঁর মতামত ও ব্যাখ্যা শোনার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও যে ভুলত্রুটি রয়ে গেল, তারজন্য আমি নিজে দায়ী।

সংকেত : আঃ = আসাম ; উঃ = উত্তর ; উঃ প্রঃ = উত্তর প্রদেশ ; উঃ ভাঃ = উত্তর ভারত ; কাঃ = কাম্নাড়া ; কাথি ঃ = কাথিওয়াড় ; কুঃ = কুর্কু ; খাঃ = খাসিয়া ; গাঃ = গারো ; গোঃ = গোয়ালপাড়া (আসাম) ; গুঃ = গুজরাট ; তাঃ = তামিল ; তিঃ = তিব্বতী ; তেঃ = তেলুগু ; ত্রিঃ = ত্রিপুরা ; দঃ = দক্ষিণ ; দঃ ভাঃ = দক্ষিণ ভারত, হয়দরাবাদ অঞ্চল ; নেঃ = নেপাল ; পঃ = পশ্চিম ; পঃ ভাঃ = পশ্চিম ভারত ; পাঃ = পাঞ্জাব ; পূঃ - পূর্ণিয়া ; পূঃ ভাঃ = পূর্ব ভারত ; বাং = বাংলা ; বিঃ = বিহার ; ভাঃ = ভাগলপুর ; ভোঃ ভোটিয়া ; মঃ = মহারাষ্ট্র ; মঃ ভাঃ = মধ্য ভারত ; মাঃ - মালদা ; মালাঃ = মালায়লম্ ; মৈঃ = মৈমনসিংহ ; লেঃ = লেপচা ; সুঃ = সুন্দরবন ; হিঃ = হিন্দী ; (?) = প্রয়োগ/উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ঠিকমত যাচিয়ে নেওয়া যায়নি।

(১) জঙ্গল

পূর্ব, উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারত

শব্দ **ব্যাখ্যা ও টীকা**

আদাং (গাঃ)—জুমের ক্ষেত, সাধারণত গ্রাম ('সং') থেকে বেশ দূরে। হাতির ও শুয়োরের উপদ্রবের জায়গা।

কন্দেল (উঃ প্রঃ)—নদীর পারে ঘন ঘাসের জঙ্গল।

কাগার (মঃ ভাঃ)—পাহাড়ের গায়ে গভীর কাটা বা ভাঁজ।

কাদির (নেঃ)—নদীনালার জায়গা, বর্ষায় জলে ডুবে যায়, জল নেবে গেলে ঘাস গজায়। হরিণ ও বাঘের জায়গা।

কাদির / খাদির (উঃ প্রঃ)—নিচু জায়গা, গঙ্গার পুরানো খাত।

কান্দা (মৈঃ)—বিলের উঁচু পাড়, উঁচু জায়গা। হাতি দিয়ে শিকারের উপযুক্ত জায়গা।

কাঁঠাল (পূঃ)—শালের ছোট জঙ্গল।

কোল (উঃ প্রঃ)—শুকনো জলের নালা।

খল (মৈঃ)—পাহাড়ে ঘেরা নিবিড় বন।

খাড়ি (পুঃ)—ছোট পাহাড়ী নদী।

খিন্দ্ / খি'দ (মঃ ভাঃ)—ছোট গিরিসঙ্কট, 'pass'। হাঁকায় জানোয়ার এই রকম জায়গা দিয়েই পালায়।

খোপ্—(গোঃ)—'ছোপা' দ্রঃ।

খোলা (মৈঃ)—নদী বা নালা। মৈমনসিংহ/সিলেটের সীমান্ত থেকে নেপাল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

খোরা (মঃ ভাঃ)—(১) জঙ্গলের মধ্যে খোলা জায়গা, 'glen'। (২) পাহাড়ের গায়ে গভীর ভাঁজ, 'ravine'।

খোহ্ (উঃ ও মঃ ভাঃ)—গুহা।

গজারিগড় (মৈঃ)—শালের বড় জঙ্গল। গজারি=শালগাছ।

গড়—মৈমনসিংহ অঞ্চলে অন্য শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'জঙ্গল' অর্থ হয়; যথা 'গজারিগড়', 'নলগড়', 'চুত্রা (বিছুটি) গড়' ইত্যাদি।

গন (সুঃ)—জোয়ার।

গাছগড়া (মৈঃ) বিলের ধারে ঘন গাছের জঙ্গল। 'কান্দা' দ্রঃ।

গার্জালিবাড়ি (গোঃ, আঃ)—বর্ষার প্রারম্ভে নূতন গজানো ঘাসের জায়গা বা জঙ্গল।

ঘাসজঙ্গল—হাতি দিয়ে শিকারের প্রকৃষ্ট জায়গা একদা ছিল। ইকড়া (আঃ), উলু, নল, ছন, কাশ, তারা ইত্যাদির জঙ্গল।

ঘুপ্ (মৈঃ)—বিলের মধ্যে 'ব'-দ্বীপ।

চটান্ (মৈঃ গোঃ)—উঁচু সমান জায়গা।

চালা (মৈঃ)—উঁচু জায়গায়—অর্থাৎ জলা নয়—জঙ্গল; বিশেষত, মধুপুরগড় অঞ্চলে শালের জঙ্গল বোঝায়। অনেক সময় 'একচালা'ও বলা হয়।

চারকোশিয়া ঝারি (নেঃ)—হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গল।

চিড়িং (গাঃ)—ছোট পাহাড়ী নদী বা ঝর্ণা।

ছড়া—(১) ছোট পাহাড়ী নদী। (মৈঃ) (২) নদীর পুরনো খাত। (গোঃ)

ছগ্গন (উঃ ও মঃ ভাঃ)—পাথর।

ছিট্ বন (মৈঃ)—মূল জঙ্গলের সংলগ্ন হাল্কা জঙ্গল।

ছোপা/ঝোপা—ঘন ঘাসের বা ছোট গাছের ঝোপ। মার্চ মাসে পূর্ব ভারতে ঘাসের জঙ্গলে আগুন দেওয়া হয়। তখন এগুলি প্রায়ই পোড়ে না, এবং ক্রমশই দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। এগুলো তখন জন্তু জানোয়ারের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়। 'খোপ' দ্রঃ।

জুম—জঙ্গল পুড়িয়ে চাষ করার আদিম পদ্ধতি। 'টাঙিয়া' দ্রঃ।
ঝিরা (মঃ ভাঃ)—পাহাড়ী প্রস্রবন ; ঝিরঝির করে বয়ে যায় বলে।
ঝোরা (দার্জিলিং গোঃ)—পাহাড়ী নদীর খাত, ঝর্ণা।
টাঁড় (দঃ বিঃ)—উঁচু, শুকনো জায়গা।
টাঙ্গর (মৈঃ)—ঘাসের জঙ্গল।
টাঙিয়া—জঙ্গল পুড়িয়ে চাষ করার আদিম পদ্ধতি। 'জুম' দ্রঃ।
টাপ্পু (পুঃ, পঃ মাঃ)—বিস্তীর্ণ জলার মধ্যে বা পাশে জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু জায়গা ; জন্তু জানোয়ারের বিশেষ আশ্রয়স্থল। 'কান্দা' দ্রঃ।
টাল (মাঃ)—বিলের নিচু জায়গা, 'টাপ্পু' নয়।
তেরাই—হিমালয়ের পাদদেশে 'ভাবর' অঞ্চলের নিচে জলা জঙ্গল।
থল (কাছার)—দুই ছোট পাহাড় বা টিলার মাঝে সমান ঘাসে ঢাকা জায়গা ; বর্ষায় জলে কাদায় ভরে যায়। 'থল'=স্থল ; অর্থাৎ পাহাড় বা উঁচু জায়গা নয়।
থবলচু (গাঃ)—Tapioca. গারোপাহাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে এর চাষ হয়। হাতির অতি প্রিয় খাদ্য।
দল্দল্ (মঃ ভাঃ)—গভীর কাদা। 'দাব', 'ফাসান' দ্রঃ।
দাব্ (মৈঃ)—গভীর কাদা ; যেখানে হাতি 'দেবে' যায়।
দিয়ারা (মাঃ, মুর্শিদাবাদ)—নদীর চর।
দুন (উঃ প্রঃ)—হিমালয়ের পাদদেশে উঁচু উপত্যকা—'দেহ্রাদুন', 'পাতলীদুন' ইত্যাদি।
দেওয়ার (হিঃ)—জঙ্গলে একাধিক নালার সংযোগস্থল। 'পারা' বা 'কাড়া' (bait) বাঁধতে হলে বা হাঁকায় প্রতীক্ষারত শিকারীর পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা।
দোলা (গোঃ)—জঙ্গলের মধ্যে নিচু সমান জায়গা। বর্ষায় জল জমে। গাছ নেই। 'বাইদ' দ্রঃ।
নক্মা (গাঃ)—গ্রামের প্রধান।
নক্পান্থি/নক্মান্তি (গাঃ)—গ্রামে অবিবাহিত বয়স্ক ছেলেদের ও গ্রামের অতিথিদের থাকার নির্দিষ্ট ঘর।
নালা—(১) ছোট নদী বা জল যাবার রাস্তা।
(২) পাহাড়ের ভাঙা কোল—'ravine'।
(৩) সাধারণত শুকনো, বৃষ্টির জল যাবার রাস্তা (উঃ প্রঃ)।
নাহার (উঃ ও মঃ ভাঃ)—খাল।
পোরাও (মঃ ভাঃ)—তাঁবু গেড়ে আস্তানা করার জায়গা।
পুং (গোঃ, গাঃ)—নুন/ক্ষারমাটি, (salt lick)। 'মাটি খোলা' দ্রঃ।
পুণ্ডি (গোঃ)—তারা ঘাসের স্থানীয় নাম।

পোড়ান বন্দ্ (মৈঃ)—যে জঙ্গল পুড়ে গেছে।

পোরালি বাড়ি (আঃ)—'পোড়ান বন্দ্' দ্রঃ।

ফাসান (হিঃ, গোঃ)—চোরা বালি বা গভীর কাদা। 'দাব্', 'দলদল' দ্রঃ।

বাইদ (মৈঃ)—জঙ্গলের মধ্যে নিচু ঘাসের জমি। বর্ষায় জল জমে। 'বাইদ' ও তার পাশে 'চালা', এই দুইয়ে মিলে জঙ্গল।

বাদা—আবাদী জায়গা। বিশেষ প্রয়োগ—'গারোবাদা'।

বান্দি (মঃ ভাঃ)—সরকারী সংরক্ষিত বন, যাতে শিকার নিষিদ্ধ। Government Reserved Forest.

বাড়ি (আঃ, কাছার, উঃ বঙ্গ)—অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ 'জঙ্গল'; যথা, 'বাঁশ বাড়ি', 'নলবাড়ি', 'তারাবাড়ি', 'ছনবাড়ি' ইত্যাদি।

বালাস (মঃ ভাঃ)—পাহাড়ের উপর সমান জায়গা।

বেতোনি (পূঃ আসাম)—বেতের জঙ্গল।

বৈট্—কচ্-এর 'রান্'-এ উঁচু জায়গা, বর্ষায় দ্বীপের মতো ভেসে থাকে। খরার সময় টিলার মতো উঁচু হয়ে থাকে।

বোঝি / বোজা (উঃ প্রঃ তেরাই)—ঘন ঘাস বা গাছের ঝোপ। 'ছোপা' দ্রঃ।

ভাবর—হিমালয়ের পাদদেশে শুকনো জঙ্গল, মোটেই জল নেই।

ভারানি (সুঃ)—জঙ্গলের মধ্যে ছোটখাল; জোয়ারে জল থাকে, ভাটায় নয়।

ভিটা (গোঃ)—উঁচু জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত মনুষ্যাবাস। চিতাবাঘ, কখনো কখনো বড় বাঘ, শুয়োরের আস্তানা।

ভির (পাঃ)—ঘাসের সংরক্ষিত বন, 'grazing reserve'।

ভেরবাড়ি (গোঃ)—কাদা, হাতি দাবে। 'দলদল', 'দাব' দ্রঃ

মদেশ (নেঃ) সমভূমি। 'মদেশিয়া'=সমভূমির লোকেরা।

মান্দ (বিঃ)—গুহা।

মাটিখোলা (আঃ)—'পুং' দ্রঃ।

মেল (মঃ ভাঃ)—'দেওয়ার' দ্রঃ।

রং (গাঃ)—পাথর।

রমনা (মঃ ভাঃ)—শুকনো ঘাস সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ঘাসের জঙ্গল।

রাও/রাওস্ (উঃ প্রঃ)—পাথুরে নালা যা দিয়ে বৃষ্টির সময় জল যায়, অন্য সময় শুকনো।

রাখ্ (বিঃ, উঃ প্রঃ)—ঘাসের বিস্তীর্ণ জঙ্গল।

রান্ (উঃ পঃ ভাঃ)—মরুভূমি; কাদা বা বালুকাকীর্ণ নোনা সমতলভূমি। 'কচের রান্'।

রামা (গাঃ)—রাস্তা।

রিং (গাঃ)—নৌকা।
লোনা (মৈঃ)—নুনমাটি, 'পুং', 'মাটি খোলা' দ্রঃ।
শলাই (মঃ ভাঃ)—ছোট সেগুনের চারা।
শির্‌পাত (হিঃ, উঃ প্রঃ)—উঁচু ঘাস।
সং (গাঃ)—গ্রাম। 'সংগিথাম'=নূতন গ্রাম; 'সংগিছাম'=পরিত্যক্ত গ্রাম; হাতির জায়গা, বিশেষত কাঁঠালের সময়।
সড়াই বাড়ির রাস্তা (মৈঃ)—জঙ্গলের রাস্তা
সোত/সত (উঃ প্রঃ (তরাই)—যে নদীতে 'স্রোত' বা জল আছে; অর্থাৎ 'রাও' বা 'রাওস' নয়।
সোঁধি/সৌন্ধি (মঃ ভাঃ)—খেজুরের জঙ্গল।
হাওর (মৈঃ, সিলেট)—বিস্তীর্ণ জলাজায়গা, বর্ষায় জলে একাকার হয়ে যায়। খরায় একাধিক বিলে পরিণত হয়।
হোপা (মৈঃ)—ঝোপ।

দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি শব্দ

বাঙলা	তামিল	মালায়লাম্	কান্নাড়া	তেলুগু
জঙ্গল	—কাট্টু	কাডু	কাডু	আডিভি
নদীরঘাট(ford)	—	কাডাভু	কানিভে	
বড় পাহাড়	—মালাই		মালা	পেন্দা কোয়াণ্ডা
ছোট পাহাড়	—	কুন্নু	বেট্টা, গুড্ডা	কোয়াণ্ডা
টিলা	—	চেরুমালা		ছিন্নাকোয়াণ্ডা
পাথর/পাথুরে ঢিবি	—পারেই	পারা	কাল্লু	রাই
পুকুর	—কুলাম্	কুলাম্	কোলা, কুণ্টে	কুণ্টা
গুহা	—গুহাই	গুহা	গুহে	গুহা
নদী	—আরু	পুর্‌রা	নদী	নদী
গাছ	—মারম্	মার্‌রম্	মারা	চেট্টু
উইয়ের ঢিবি	—এরুম্বুপুট্টু	পুট্টু	হুত্তা	চীমালা পুট্টা
পায়েচলা রাস্তা	—কুরুকুওয়ারি	ওয়ার্‌রি	দারি	ডারি
ছোট নদী	—নীরোট্টম্	তোড়ু	ঝরি	সেল ইয়েরু
পুল (bridge)	—পালম্	পালম্	সেতুয়ে	ওয়ান্তেনা
বাঁশ	—মুঙ্গিল	মুলা	বম্বু	ভিদুরু
পোড়া জঙ্গল	—বেন্দা কাডু	তীবেন্দা কাডু	চেন্দ কাডু	
লম্বাঘাস	—পেরিয়া পুল্লু	ওয়ালিয়া পুল্লু	পেরিয়া পুল্লু	রেল্লু

(২) বন্যজন্তু

ব্যাখ্যাঃ নামগুলি প্রেটার (Prater) অনুসৃত ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। বৈজ্ঞানিক লাতিন নামগুলিও এখান থেকেই নেওয়া, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এলারম্যান ও মরিসন স্কট-এর প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে (Ellerman and Morrison Scott : শেষে গ্রন্থপঞ্জী দ্রঃ)। সরলীকরণের জন্য ভারতীয় উপপ্রজাতিগুলির (Sub-species) নাম দেওয়া হয়নি। উৎসাহী পাঠক প্রেটার, এবং অত্যুৎসাহী পাঠক মরিসন-স্কট থেকে দেখে নিতে পারেন।

তালিকা থেকে পুরো প্রাইমেট (Primate) গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ রোডেণ্ট (Rodent) বা মার্টেন (Marten) জাতীয় ছোট ছোট জীবদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সময়াভাবে এও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। এই তালিকা বহির্ভূত কয়েকটি জীব 'শিকার' তালিকায় স্থান পেয়েছে ; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। বন্যজন্তুর দেশী নাম ব্র্যানফোর্ডে যত আছে, অন্য কোথাও তত নেই। নিম্নোক্ত শব্দসংগ্রহের মূলভিত্তি ব্র্যানফোর্ড।

The Tiger (*Panthera tigris*—Linn)

কেঁদো বাঘ, গো-বাঘ (বিশেষ অর্থে যে বাঘ গরু মারে, cattle lifter) —(বাং) ; হালুম বাঘ (মৈঃ) ; শেলাবাঘ (মৈঃ, মাঃ, মঃ ভাঃ) ; শিয়াল (সুঃ) ; মানুষখেকো বাঘ (বাং) ; ঢোকিয়া পড়িয়া/পটিয়া বাঘ (আঃ) ; গো-বাঘ (গোঃ) ; খ্যা (খাঃ) ; সা, রাগাড (?) , খুড়ি (?) ; তেখু (নাগা) ; হাম্‌বি (কুকি) ; সামিও (আবর) ; সু (খাম্‌টি) ; মিসি (উঃ কাছাড়) ;

মাচ্ছা (গাঃ) ; পাটে বাঘ, (নেঃ) ; কেওয়া, (লিম্‌বু) ; শুটং (লেঃ) ; টুখ্‌ (ভোঃ) ; তাগ্‌ (তিঃ) ; শের, বাঘ, শেরনী (স্ত্রী), বাঘনী (স্ত্রী), (হিঃ) ; তুং (উঃ বিঃ, ভাঃ) ; নঙ্গিয়া চোর (গোরখপুর,) ; নাহার (বুন্দেল-খণ্ড, মঃ ভাঃ) ; ওয়াঘ (মঃ) ; উঁটিয়া বাঘ (গৃহপালিত পশু/উট খাদক বাঘ, cattle lifter—পঃ ভাঃ, হিঃ) ; লোখিয়া বাঘ (বন্য পশুখাদক বাঘ, Game killer—হিঃ) ; আদম/আদমি খোর বাঘ, (maneater হিঃ) সিনুহ (সিন্ধী) ; নারি (কুর্গ্‌) ; কুলা/কুল (সাঁওতালী, হো-কোল, কুর্কু) ; কুলা (কুর্কু) ; পুলি (গোণ্ডী) ; লাকুড়া (ওঁরাও) ; বুবুকাল (গোণ্ডী—দঃ চাঁদা) ; পুলি, পেরম পুলি, পুলি রেন্দা পুলি ? (তাঃ) ; পুলি পেদ্দা পুলি (তেঃ) ; শুলি, কুলি (?), উর্ডনাই (?) (কানাঃ) ; পোরাই পুলি (?), পুলি, কুদুয়া (?) (মালঃ)

The Lion (*Panthera leo*—Linn)

সিংহ (বাং, আঃ) ; সিংহবাঘ (গোঃ) ; সিং, উ-সিং (প্ঃ), কা-সিং (খাঃ) ; শের, শের বাব্বর, বাবর শের, সিংহ (হিঃ) ; উঁটিয়া বাঘ (গুঃ) ; সাওয়াচ্/সাওয়াজ (কাথিঃ, কুচ্) ; সিম্‌হ (মঃ) ; সিংহম্ (মালাঃ) ; সিম্‌হা (কাঃ) ; সিম্‌হম্ (তেঃ) সুহ্ (প্ঃ), সিসিং (স্ত্রী)—(কাশ্মীর)

The Leopard or Panther (*Panthera pardus*—Linn)

গুলবাঘ, চিতাবাঘ (বাং) ; হ্যাঁকা বাঘ (মৈঃ—'হ্যাঁকর্ হ্যাঁকর্' করে ডাকে বলে) ; চিতিয়া (গোঃ) ; নাহর কুটুকী/কুটিয়া বাঘ (আঃ) ; খ্যা (খাঃ) ; চিতা (বড় আকৃতির), টেন্যুয়া (ছোট আকৃতির)—(প্ঃ) ; কাজেঙ্গ্লা (মণিপুরে) ; স্যি/স্যিয়াক্/সোঙ্কিয়াক (?) (লেঃ) ; মিসি পাত্‌রাই, কামকেই (কুকি) ; হরিয়াকোন, মোর্, রুসা, তেখ্‌খুইয়া, কেঁথি (নাগা) ;

চিত্রা, চিতা, চিতাবাঘ, ছোটা বাঘ, টেঁন্ডুয়া (ছোট আকৃতির), বাঘেরা, গুলবাঘ (বড় আকৃতির), আধনাহ্‌রা, নিমার (বড় আকৃতির), সোনাচিতা (হিঃ) ; থোপলে বাঘ, চিতুয়া, ঘুংগি (বড় আকৃতির), নিগালে (ছোট আকৃতির) (নেঃ) ; হেয়্, তার গোরাল ঘোর হে (পঃ হিমালয় অঞ্চল—যে 'তার' —ইত্যাদিকে হনন করে) ; সুহ্ (কাশ্মীর) ; শিক্ (তিঃ) ; ক্রাওঙ, লাগা/লাঘো বাঘ (মঃ ভাঃ) ; তেওরিয়া, সোনোরিয়া (কুঃ) ; বরকাল (দঃ চাঁদা) ; চিতর/চিতার, গোরদাগ, বরকাল, ব্যেহিরা (গোণ্ডী) ; তিড়ুয়া (?), শ্রীঘস্ (?) (বুন্দেলখণ্ড) ; দিগদো, কারদা, আর্সানিয়া, সিংঘল, বিরিয়া বাঘ (গুঃ) ; গোরবাচা/বরবাচা (?) (দঃ ভাঃ— মঃ) ; বিব্ব্যা, বিওয়া, বিব্‌ল্যা, বিব্‌লেয়া, বোরবাঘা (?) (মঃ) ; কারুচ, তেঁওকুলা (কোল) ; চিরুথাই, ভেস্কাই (?) (তাঃ) ; চিরুথাপুলি, ছিন্নাপুলি, (তেঃ) ; চিরথে, হোংগিয়া (?), ইরবা (?), (ছোট), কেরকল (?), কিরুবা, হোনিগা (?), মাট/মুটনাই (?) (কাঃ) ; চিন্নাপুলি (?), পুলি, পুল্লিপুলি (মালাঃ)

The Snow Leopard or Ounce (*Panthera uncia*—Schreber)

সাফাইদ চিতা (হিঃ) ; বরহেল হে (পঃ হিমালয়) ; খারওয়াগ (কুনাওয়ার অঞ্চল) ; ইকর/ইকের, জিগ্, সাহ্, সাচক্ স্তিয়াং (তিঃ) ; শাহ (ভোঃ) ; ফালে (লেঃ)।

The Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*—Griffith)

ফুলেশ্বরী বাঘ (মৈঃ) ; ঘোং (গোঃ) ; লতামাকরি বাঘ (আঃ) ; জিক্ (লিম্বু) ; লামচিতা (নেঃ) ; কুং, কিং (ভোঃ) ; পুংমার, সাতচুক/সাচ্চুক, সাচ্চা (লেঃ)।

The Marbled cat (*Felis marmorata*—Martin)
হাপা (গোঃ—যে কোনো জঙ্গলী বিড়ালকেই বলা চলে) ; লতা কুটুকী মেঙ্কুরী (আঃ) ; শিকমার (ভোঃ) ; দোশাল (লেঃ) ।

The Leopard cat (*Felis bengalensis*—Kerr)
বন বিড়াল (বাং—সাধারণভাবে সব জঙ্গলী বিড়ালকেই বলা চলে) ; চিতা বিল্লি (হিঃ) ; ওয়াগাঁত (মঃ—পঃ ঘাট অঞ্চল) ; চিরিথা, চিরিথাপ্‌নে (তাঃ) ।

The Rusty spotted cat (*Felis rubiginosa*—Geoffroy)
নামাল্লি পিল্লি (তাঃ) ।

The Fishing cat (*Felis viverrina*—Bennett)
মাছ বাঘ্‌রাল, মাছ বিড়াল (বাং) ; ওয়াপ্‌ (মৈঃ) ; খটাশ্‌ (সঃ) ; হেকড়া বাঘ (গোঃ) ; মাছোবৈ মেকুরী (আঃ) । বারাউন (?), বাঘডাশা, খ্‌পিয়া বাঘ (হিঃ)

The Jungle cat (*Felis chaus*—Guld)
বনবিড়াল (বাং) ; মেচেকা, বনবোন্দা (আঃ) ; বনবিল্লি (উঃ প্‌ঃ মাঃ; প্‌ঃ) ; সরিয়াল (প্‌ঃ মাঃ) ; গরড়া (মাঃ—সাধারণ ভাবে সব বিড়াল) ; বের্‌কা (রাজমহল) ; খটাশ, জঙ্গলী বিল্লি (হিঃ) ; বনবিড়ালো (নেঃ) ; মাঞ্জার (কুঃ) ; ওয়ার্কয়া (গোন্ডী) ; বউল (?) বাওগা (?) (মঃ) ; কাটু/কাড্ড্‌প্‌নে (তাঃ) ; জার্‌কাপিল্লি (?) ; জাব্‌গ্‌, আন্ডি পিল্লি (তেঃ) ; চের্‌প্‌লি (?), কাট্টু্‌প্‌চ্চা (মালাঃ) ; বেল্লা বেক্ক্‌ (?) কাড়ু বেক্ক্‌ (কাঃ—কাড=জঙ্গল ; বেক্ক্‌=বিড়াল)

The Desert cat (*Felis Libyca*—Forster)
জংলী বিল্লী (হিঃ) ; ঝং মেনো (কচ্‌)

The Caracal (*Felis caracal*—Schreber)
শিয়া/শিয়ে, গোস্‌/গ্‌স্‌ (হিঃ—"কালোকান," ফার্সী শব্দ) ; এচ্‌/এথ্‌ (?) (লাদক) ; সাগ্‌ড়ে/চোগ্‌ড়্‌ (?) (তিঃ) ।

The Lynx (*Felis lynx*—Linn)
পাটশালাম (কাশ্মীর) ; ঈ (লাদক, পঃ তিব্বত) ; ফিয়াওকু (লাহুল)

The Spotted linsang or Tiger civet (*Prionodon pardicolor*—Hodgson)
কুটুকী/জহমাল (আঃ) ; জিক্‌চুম্‌ (ভোঃ) ; স্‌হীল্‌দ্যা/সিল্‌দ (?) (লেঃ) ।

The Large Indian civet (*Viverra zibetha*—Linn)

বাঘডাশ্যা, পুড়ো গোলা (বাং); বাঘরোল (সুঃ); বাঘাইল্লা (মৈঃ, গোঃ), বাঘশেইল্যা (গোঃ); হাকড়াকান্দা, জহামাল (আঃ) : কুং (ভোঃ), খটাশ (হিঃ—অন্যান্য অনেক ছোট মাংসাশী জন্তুকেও এই নামে ডাকা হয়); সাফিয়ং (?) (লেঃ); ভ্রন (নেপাল তেরাই); নিত বিড়ালো (নেঃ)।

The Small Indian civet (*Viverricula indica*—Desmarest)

গন্ধগোলা, গন্ধগোকুল (বাং); গয়েন্দারি/গেঁদারি (গোঃ); গন্ধ বেউলো (খুলনা); গরু হামাল (আঃ); খটাশ, কস্তুরি (হিঃ), মুস্‌ক্ বিল্লি (হিঃ—দাক্ষিণাত্য); সগোৎ (হো-কোল); সইয়ার, বাঘ-মাইয়ুল (নেঃ তেরাই); জওয়ারী মাঞ্জার (মঃ); পুনাগু বেকু, পুনগুকোঠি (?) (কাঃ); পুনুগুপিল্লি (তেঃ), পুনুগুপুনই (তাঃ); মেরুকু (মালাঃ) (**মন্তব্য :** বাংলায় Large Indian civet ও Small Indian civet-এর মধ্যে নামকরণে পার্থক্য অস্পষ্ট, এবং প্রায়ই একের নামে অপরকে ডাকা হয়। আসামেও সব civet-ই 'জহামাল'। তাতে নানাবিধ বিশেষণ সংযোগ বোধহয় চেষ্টাকৃত। মনে হয় এগুলির প্রকৃত ব্যবহার সাধারণ লোকের মধ্যে নেই)।

The Common Palm-civet or Toddy cat (*Paradoxurus hermaphroditus*—Pallas)

তাম (পঃ বাং); বাঘরোল (সুঃ); বাঘাইল্লা, বাঘডাশা (মৈঃ—Small Indian civet দ্রঃ); গন্ধ বেউলো (খুলনা—Small Indian civet দ্রঃ); খটাশ (উঃ পঃ মাঃ, পুঃ); তগৎ (?) (সিংভূম); ঝাড়কা কুত্তা, চিংগার (?), লাকটি, খটাশ (হিঃ); জিনার (গো) তারিখোয়া জহামাল (আঃ—মনে হয় গোগোইকৃত ইংরেজীর অনুবাদ, প্রকৃত ব্যবহার নয়); মাছাব্বা, মালোয়া (নেঃ তেরাই); উদ, উদমাঞ্জার (মঃ); মেনুরি (দঃ ভাঃ); মানুপিল্লি (তেঃ); মারাবেকু, মানতা (?) কেরাবেকু (?) (কাঃ); মারুরামেরু (মালাঃ, তাঃ); মারুরুপিল্লী, ভেরুভু (?) (তাঃ)।

The Himalayan Palm-civet (*Paguma larvata*—Aamelton Smith)

পাহারী জহামাল (আঃ—গগৈ)।

The Binturong or Bear-cat (*Arctitis binturong*—Raffles)

ইয়ং (আঃ)।

The Common mungoose (*Herpestes edwardsi*—Geoffrey)

(**মন্তব্য :** প্রেটার চার রকম mungoose উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু দেশী নামকরণে এদের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট ; এমনকি প্রায় নেই বলা চলে)।

নেউল, বেজি (বাং); বিজ্জু (মাঃ); নেউল (পুং), বেজি (স্ত্রী)—(গোঃ) মঙ্গুস, নেওয়ল, নেওয়ারা (হিঃ উঃ ও মঃ ভাঃ); নকুল মুঙ্গুস (মঃ); নুরুলিয়া (গুঃ); কীরী (তাঃ); মুঙ্গীস (কাঃ); মুঙ্গিসা য়েনতুয়া (তেঃ)।

The Striped-necked mungoose (*Herpes vitt collis*—Bennett)

সারেকীরী (তাঃ); চেনকীরী (মালাঃ); কেঁপকীরী (কাঃ)।

The Ruddy mungoose (*Herpestes smithi*—Gray)

কোরাল্, মংগুজ, (হিঃ—মঃ ভাঃ); কোণ্ডা ইয়েনতওয়া (তেঃ); এরিমা কীরী পিল্লি/পিলাই (তাঃ)।

The Striped hyaena (*Hyaena hyana*—Linn)

হুরার, হুঁড়ার (বাঃ, বিঃ); হুঁড়ার (নেঃ); হুড়ার, লাগাবাঘা, দাগা, লক্কর বাঘা, লাকড়া (হিঃ-উঃ ভাঃ); রেঁভা, রেঁহ্রা, ধোপেচা (গোণ্ডী); লক্কর বাঘা (মঃ ভাঃ—উঃ অঞ্চল); ঝিরক্, তরস্ (মঃ ভাঃ—দঃ অঞ্চল); তরস্ (মঃ); ঝিরক/ঝরক/জরক (কাথিঃ); তরস্, চেরক (সিন্ধী); ধোপড়ে, রেন্ডাল (কুদুঃ); হেবর, কুলা (হো-কোল); ভেরকো টুড় (?) (রাজমহল); তেরস্/তরস্ (দঃ ভাঃ—হায়দ্রাবাদ); কালাড়া কোরাতু, কালুথাই/কালুঠাই পুলি, কোরাচি (?) কুল্লুথাপুলি (তাঃ); দুম্মুল গুড্ডু, কোরনা গুড্ডু (তেঃ); কাৰ্টাকিরুবা, নাইহুলি (কাঃ); নাইপুলি (ম॰)।

The Wolf (*Canis lupus*—Linn)

নেকড়ে হুরার (বাং); ভেরিয়া, নেকড়া, বাঘিয়া, বিঘানা, গুর্গ (?), বিগারা হুঁড়ার, হুরার (হিঃ—উঃ ও মঃ ভাঃ) হুরার (বিঃ); চাঙ্গু (বিঃ); বিগারা (মঃ ভঃ—মাণ্ডলা); বিরঘিরা (গোণ্ডী); লাণ্ডগা, লাড়গা (মঃ); শাংকো (লাদাক্); নার (কাথিঃ); লাঙ্গ, লাংড়াঘ্ (দঃ ভাঃ); তোডেলু (তেঃ); ঠোলা, ভ্রাকা (?) (কাঃ); ওনাই (তাঃ); চেন্নাই (মালাঃ)।

The Jackal (*Canis aureus*—Linn)

শিয়াল, ভুঁড়ো শিয়াল (বাং); গিদর (পঃ মাঃ, পুঃ); শিয়াল (আঃ); মিসিয়াং (খাঃ); আমু (ভোঃ); হিজাই, জোক্ষত (মিকির); মেশরং (উঃ কাছাড়); হিয়ান (?) (নাগা); গিধর, শিয়াল, ফিয়াও, ফিয়াল (হিঃ—উঃ ও মঃ ভারত); লারাইয়া, কোলা, কোলিয়াল (হিঃ—মঃ ভাঃ); লারাইয়া (বুন্দেলখণ্ড); কোলিয়াল নের্কা (গোণ্ডী); কারিস্তা (হো-কোল);

কোলহা (মঃ) ; শাল (প্ঃ), শা-অজ/শাওজ (?) (স্ত্রী) (কাশ্মীর) ; কোলা, কোলিয়া (দঃ ভাঃ) ; নরি (তাঃ) ; নাক্কা (তেঃ) ; নরিয়া, নরি, কান্নি নরি (?) (কাঃ) ; কুরক্কান, নরি (?) (মালাঃ) ।

The Red fox (*Vulpes vulpes*—Linn)

রঙা শিয়াল (আঃ-গগৈ) ; লোমরি (হিঃ) ; ওয়াম্‌ (নেঃ) ; লোহ্‌ (কাশ্মীর)

The Indian fox (*Vulpes bengalensis*—Shaw)

খেঁকশিয়াল (বাং) ; খাটাশ (মৈঃ) ; খিঙ্কির (মাঃ, প্ঃ) ; রামশিয়াল (আঃ) ; লোকোরিয়া, লোকরি (হিঃ) ; খিকির, খেকর (বিঃ) ; কোকরি (মঃ) ; লোকোরিয়া (বুন্দেলখন্ড, মঃ ভাঃ), ফ্যাওরো (নেঃ) ; খেক্‌রি/কেক্‌রি (গোন্ডী) ; কোই কোই (কুর্কু) ; কোংক্‌ (?), কেম্পু, নরি, মোল্লা নরি, চন্দক নরি (?) (কাঃ) ; কোংকা নাক্কা, গুন্ট নাক্কা পোত্তি নারা (?) (তেঃ) ; কর‍ুনরি (মালাঃ) ।

The Dhole or Indian wild dog (*Cuon alpinus*—Pallas)

জঙ্গলী কুকুর কুত্তা (বাং) ; রামকুত্তা (মৈঃ) ; কুয়াং (গোঃ, আঃ) ; রাংকুকুর (আঃ—গগৈ) ; বনকুকুর (নেঃ) ; পাওহো (ভোঃ) ; সা-তুং (লেঃ) ; কয়াল (দঃ বিঃ) ; সোনাহা, সোন রাম জঙ্গলী/বনকুত্তা, ঢোল (হিঃ) ; তাওসা, ভুঁসা, বুঁয়াসু, ভুল্‌সা (পঃ হিমালয়) ; সিন্দাকি (লাদক) ; হাজি, ফরা (?) (তিঃ) ; কোলকুত্তা, কান কেন কাই, কাড়নাই, সিব নাই (গুঃ) ; কিলসুন (?), কোলসা (?) কোলাসনা, কোলসারা (?) ; ডোঙাসীতা (কুর্কু) ; রামকুন (কাশ্মীর) ; এরাম নাইখো (মঃ ভাঃ) ; ডোঙানাইক, এরামনাইকো (গোন্ডী) ; টানি (হো-কোল) ; ছেন্নাই, বাতাইকরণ, কাটনাই, কাটনরি, চেন্‌নাই, শিল নুরিয়া/রি, বাতাই কারায়ু (তাঃ) ; আডিভি/বেজাকুত্তা (তেঃ) ; সোনহুন (?) চিন্না নাই (?) কাডু নাই (কাঃ—কাড = জঙ্গল, নাই = কুকুর) ; চেন্‌নায় (মালাঃ) ।

The Sloth bear (*Melursus ursinus*—Shaw)

ভাল্লুক (বাং) ; মাটি ভালুক (আঃ গোগোই) ; ভালু (নেঃ) ; রিচ্‌ বিঁচ, আদমজাদ, ভালু (হিঃ) ; আশোয়াল (মঃ) ; রীঁচ (দঃ অঞ্চল), ভালু (উঃ অঞ্চল) (মঃ ভাঃ) ; বান্না (কোল) ; উরজল, ইয়েরিজ, আশোল, ইয়েজল, ইয়েন্নাজ (?) (গোন্ডী) ; বান্না (কুর্কু) ; কারাডি (তাঃ, কাঃ) ; এলুগু বর্টি এলুগুড্ডু, এলুগু, (তেঃ) ; কারয়ুম কারাডি (তাঃ, মালাঃ) ; কারাডি (কাঃ) ।

The Malayan bear (*Helarctos malayanus*—Raffles)

(আসামে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ে যথা, মেঘালয়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়।)
গছভালুক (আঃ—গগৈ) ; মাক্‌বুল (গাঃ) ;
মুফুর, মাংসু, ভুর্থা (?) (উঃ কাছাড়) ; ভুম্বি (কুকি) ; সাওয়ম (মণিপুর) ; হুসুমু, থাগুরা, থেগা, চুপ, লভান, সাপা (নাগা)।

The Brown bear (*Ursus arctos*—Linn)

মুগা ভালুক (আঃ গগৈ) ; দুব, দেউর (নেঃ) ; বরফ কা রিঁচ, লালভালু, সফেদভালু শিয়ালা রিচ (হিঃ) ; শিন হাপৎ, হারপৎ, হাপৎ (কাশ্মীর) ; ড্রিনমোর (লাদক) ; তোম্‌থাইনা (তিঃ)।

The Himalayan black bear (*Selenarctos thibetanus*—G. Cuvier)

রিচ, রিঁচ, ভালু (হিঃ) ; হিং বং, সানার (নেঃ) ; ডোম (ভোঃ) ; সোনা (লেঃ) ; মাগিয়েন (শিম্বা) ; সিতাং/সিতুং (আবর) ; সাতুন, মাপোল (?) (আসামের পাহাড় অঞ্চল) ; হাপৎ (কাশ্মীর)।

The Cat-bear or Red panda (*Ailurus fulgens*—F. Cuvier)
ওযাহ্‌, ইয়ে, নিগালোয়া—পোনোয়া (নেঃ) ; ওক ডোঙা, ওয়াকর, ওয়াক ডোস্‌কা (ভোঃ) ; সংকম (লেঃ)।

The Common otter (*Lutra lutra*—Linn)
The Smooth Indian otter (*Lutra perspicillata*—I. Geoffroy)
(মন্তব্য ঃ জীববিজ্ঞানীরা otter বা উদবিড়ালকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ; কিন্তু দেশী নামকরণে এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃতি পায় নি)।
উদ, উদবিড়াল, ভোঁদড় (বাং) ; উদ (আঃ, গোঃ) ; উদ, উদাবিলাও, পানিকুত্তা (হিঃ) ; অগ্‌-ই-আর (পাঃ) ; নীরওয়ানি, নীরনাই, নীর্‌নাই (তাঃ) ; নীটকুক্কা, নীরু কুক্কা, কুক্কা (তেঃ) ; নীর্‌নাই, উদরা, (কাঃ) ; নীরনাই, নীর্‌নাই, দিলওয়াই বেক্কু (?) (মালাঃ) ; জলমানুষ (মঃ ভাঃ) ; লাদ (হ্‌) ; পান মাঞ্জার, জল মাঞ্জার (মঃ)।

The Indian porcupine (*Hystrix indica*—Kerr)

শজারু (বাং) ; সেজা (মৈঃ) ; শাহি (পঃ মাঃ) ; ছেদা (গোঃ) ; কটলা/কেটেলা পহু (আঃ) ; দুমসি (নেঃ) ; শায়ি (?) শারসোল (?) শয়াল, শাহি (হিঃ) ; শালেন্দ্রা (পঃ ঘাট) ; শালু, সেওয়াল (মঃ) ; শাওরি. চাওড়ি (গুঃ) ; সিষ্কার (সিন্ধী) ; জেকরা (কুঃ) ; হুইগ

(গোণ্ডী) ; জীক (হো-কোল) ; মুল্লাপান্দি, ইয়েছু পান্ডি, ইয়েছু কিয়ারাডি (তেঃ) ; ইয়েড়, মুল্লাম পান্ড্রু (তাঃ) ; মুল্লু হান্দি (কাঃ) ; মুল্লম্‌পন্নি (মালাঃ) ।

The Common Indian hare (*Lepus nigricollis*—F. Cuvier)

খরগোশ (বাং) ; ফইট্টা, ফইট্টা হরিণ (মৈঃ) ; লাম্ভা (পঃ মাঃ, পুঃ) ; বিলাই শেমা (গোঃ) ; শহা পহ্‌ (আঃ—উচ্চারণ 'হহা') ; কলহাই (সাঁওতালী) ; খরায়ো (নেঃ) ; খরা (বিঃ) ; খরগোশ (হিঃ) ; কোয়ালি (কুঃ) ; মালোল (গোণ্ডী) ; কুলাই (কোল ; সাঁওতালী) ; মান্যো (রাজমহল) ; সসা (মঃ) ; মুশল (তাঃ) ; চুরাঁপিল্লি (তেঃ) ; মোলা (কাঃ) ; মুইয়ল্‌ (মালাঃ) ।

(মন্তব্য ঃ প্রেটার আরো দু রকম খরগোশের নাম উল্লেখ করেছেন ; Desert hare (Lepus dayanus) এবং Black-naped hare (Lepus nigricollis) । এদের সঙ্গে আমরা পূর্বাঞ্চলে পরিচিত নই । উপরের দক্ষিণ ভারতীয় নামগুলি ব্ল্যানফোর্ড অনুযায়ী বিশেষ করে Black-naped hareকে নির্দেশ করে) ।

The Himalayan mouse-hare (*Ochotona roylei*—Ogilby)

গুমচি-পিচি (ভোঃ) ; কুমচেন (লেঃ) ; রং রুনট, রং ভুনি (?) (কুলোয়ার)

The Indian elephant (*Elephos maximus*—Linn)

হাতি (বাং, আঃ) ; হাতি, হাত্‌নি (স্ত্রী) (হিঃ) ; মংমা (গাঃ) ; মিয়াউং মিয়ুং (উঃ কাছাড়) ; টেংমু (লেঃ) ; লাংচেন, লাম্বোচে (ভোঃ) ; সংসো, সুপো, চু, ৎসু (নাগা) ; সিত্তে (আবর) ; ৎসাং (খাম্‌টি) ; মাগুই (সিং ফো) ; সাইঁপ (কুকি) ; আমিয়েন্‌, মানিয়ং (মিশমি) ; সামু (মণিপুর) ; হাত্তী (মঃ) ; হাউস্ত (কাশ্মীর) ; আর্‌নি (দঃ ভাঃ) ; ইয়েনে, আনেই (তাঃ) ; আনা, আনে, আনৈ (তাঃ, কাঃ) ; আনা (মালাঃ) ; এনুগু (তেঃ) ।

The Asiatic wild ass (*Equus hemionus*—Pallas)

ঘোরখর (হিঃ) ।

The Great Indian one-horned rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*—L.)

গণ্ডার (বাং) ; গঁড় (আঃ) ; গেঁড়া (নেঃ, গাঃ) ; গেন্ডা (মঃ) ; গেণ্ডা, গয়গাদন (হিঃ) ।

The Gaur (*Bos gaurus*—H. Smith)

বনগরু (বাং, গোঃ); সেলোই (চট্টগ্রাম); মিথুন, মেথোন (আঃ); গৌর, গৌরিগাই, গাউরিগাই, বনবোড়া (হিঃ); গয়াল (উঃ প্রঃ); গয়াল (উড়িষ্যা); বনবোড়া (মঃ ভাঃ); বনপাড়া, বনবোড়া (মাণ্ডলা ও শেওনি জেলা); পোরামাও (গোণ্ডী); গোয়াই (কুঃ); গাভিয়া, গাওয়াইয়া (মঃ); সাইনাল (হো-কোল); গউর (চাঁদা-মঃ ভাঃ); পেরামাও (দঃ গোণ্ডী); গাইভা (পুং), রিট্‌কিল (স্ত্রী), গোয়াই (কুঃ); গাভীয়া, গাওয়াইয়া (মঃ); কার্ড ইয়েম্মে (স্ত্রী), কার্ড কোরণা (পুং), কালুজেলি, কাটিউ, কাট্রু এরুমাই (তাঃ); কাডুইয়েথু (পুং); কাডকোনা, কারথি (?) (কাঃ); খুলগা, জঙ্গলী খুলগা (কাঃ, পঃ ঘাট); কাটু, কাটু-পোথ (মালাঃ); আডিভিয়েন্দু (পুং), আডিভি আ-উ (স্ত্রী) (তেঃ)।

The Gayal (*Bos frontalis*)

মন্তব্য : বর্তমানে একে পৃথক প্রজাতি (species) বলে ধরা হয় না।

মিথুন সিবা (দাফলা), (চট্টগ্রাম); বনরিয়া গরু, মেথোন মিথুন (আঃ); সান্দুং (মণিপুর); সেল, সিও (কুকি); হুই, বুইসাং (নাগা); গয়াল (হিঃ)।

The Wild buffalo (*Bubalus bubalis*– Linn)

জঙ্গলী মহিষ (বাং); অরণা (মৈঃ, গোঃ, নেঃ); বনরীয়া মোহ (আঃ); ইরোই (মণিপুর); সিলোই (কুকি); মিসিপ (উঃ কাছার); মাতমা (গারো); মৈৎ (খাঃ); অরণা (পুং), অরণি (স্ত্রী) জঙ্গলী ভৈংসা (হিঃ); (মঙ্গ-ভাগলপুর); গেরা এরুমি (গোণ্ডী); বাররেহ্ (মারিয়া গোণ্ডী); বিরবিয়ার (হো-কোল); কোরণা (তাঃ) জঙ্গলী মহিষ (মঃ); কাতু কোনা, কারতি (?) (কাঃ); কাট্রি কাটু পোত্তু (মালাঃ); আডিভি টুল্লা (পুং) আডিভি বারবে (স্ত্রী) (তেঃ)।

কয়েকটি বিশেষ শব্দ :

কোট/খুট অরণ (মৈঃ)—জঙ্গলী পুং মহিষ কয়েকটি পোষা স্ত্রী মহিষকে ভাগিয়ে নিয়ে নতুন দল তৈরী করলে তার নাম। দোমাচা (গোঃ)—জঙ্গলী ও পোষা মহিষের সংমিশ্রণে উদ্ভূত মহিষ।

নাথার (মৈঃ, গাঃ)—ডোর মহিষ, riding buffalo.

বয়ার (মৈঃ), পাড়া (গোঃ) - বড় পুং মহিষ। পাড়া (মৈঃ)—অল্প বয়সী পুং মহিষ। ওয়ালি পাড়া (গোঃ) – প্রজননকারী পুং মহিষ, breeding bull, কাক্‌নি/কাকিনী (মৈঃ), পাড়ি (গোঃ)—বড় স্ত্রী মহিষ। অরণা থারা (গোঃ) – যে স্ত্রী মহিষের বাচ্চা হয় নি। কাছুর, বাওর (মৈঃ, গোঃ, আঃ)– গৃহপালিত মহিষের দুই আকৃতিগত ভাগ। 'কাছর' দেহের ও

শিঙের আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে জঙ্গলী মহিষের কাছাকাছি। সাধারণত যে জঙ্গলে জঙ্গলী মহিষ আছে তার সংলগ্ন রাখালের দলে প্রায়ই জঙ্গলী মহিষ এসে যোগ দেয় এবং কখনো কখনো রাখালের পোষা পুং মহিষকে মেরে ফেলে স্ত্রী মহিষগুলির উপর কর্তৃত্ব করে। অনেক সময় এই কারণে রাখালগুলি বড় পুং মহিষ রাখেই না। এই ধরনের বাথানে, এবং সাধারণত এই অঞ্চলগুলিতেই কাছর জাতের মহিষদেখা যায়। 'বাঙর' মহিষই আমরা সব সময়ে চার পাশে দেখি। ছোট চেহারা, গোলমত ছোট সিং—জঙ্গলী বা 'কাছর' এর মতো ছড়ানো লম্বা শিং নয়—ছোট চেহারা, নিরীহ প্রকৃতি।

The Shapu or Urial (*Ovis orientalis* Gmelin)
(**মন্তব্য ঃ** প্রেটার-এ বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া নেই)।
শাপো (পুং) ; শামো (স্ত্রী), শা (লাদক) ; উরিয়াল (পাঞ্জাব)

The Nayan or great Tib etan sheep (*Ovis amon hodgsoni* —Blyth)
নায়ান (পুং) ; নায়ানমো (স্ত্রী) —(লাদক) ; নিয়াং/নায়াং, নায়ারা, হিয়াং/হোয়াং (তিঃ)।

The Bharal of blue sheep (*Pseudois nayaur*—Hodgson)
বুরহেল, বরহেল, ভরাল, ভরার, মেণ্ডা (পুং), ভরুট (হিঃ) ; নাও, কনাও (ভোঃ) ; বনভেড়া, বরোয়াল, নেরবতি (নেঃ) ; বারুত (হিমালয়-সাধারণ নাম) ; ভরাল (গারোয়াল) ; ওয়া/ওয়ার (শতদ্রু উপত্যকা) ; মা, স্না, নাপ্দু (লাদক, তিঃ) ।

The Ibex (*Capra ibex*—Linn)
টাংরোল (কুলু) ; বাজ (কুনোয়ার) ; খেল, কাইল/কালে (কাশ্মীর) ; স্কিন, স্কিন (পুং) দাবমো/দানমো/ল'দামুও (স্ত্রী) ;—(লাদক) ; রাজ (শতদ্রু উপত্যকার উপরের দিকে)।

The Markhor (*Capra falconeri*—Wagner)
মারখর (পাঞ্জাব, দক্ষিণ কাশ্মীর) ; রাচে, রাপোচে (পুং) ; রাওয়াচে (স্ত্রী)—(লাদক)।

The Himalayan tahr (*Hemitragus jemlahicus*—H. Sly)
ঝারল/ঝরাল (নেঃ) ; ঝুলা, তার (গারোয়াল) ; তেহর, জেহ্র (পঃ হিমালয়, সিমলার কাছে) ; এসবু (পুং) এস্‌বি (স্ত্রী)—(শতদ্রু উপত্যকা) ; ঝুলা (পুং) থরনিথর (স্ত্রী) —(কুনোয়ার) ; কার্ত (কুলু, চাম্বা) ; ক্রাসু, জাগলা (কাশ্মীর)।

The Nilgiri Tahr (*Hemitrdgus hylocerius*—Ogilby)

ওথারি আড়ু/ওথার্‌রি আটু (তাঃ) ; কাড়/কার্ড আড়্‌ (কাঃ) ; মাল্লা আটু (মালাঃ) ; ভেরাই আড়ু (তাঃ, কাঃ) ;

The Serow (*Capricornis sumatraensis*—Bechstein)

ইয়ান্‌, ওয়াল্‌, কুল্‌, থর, (নেঃ—এবং তেহ্‌র ও তার ?) ; সে-চি (লেঃ) ; গিয়া, গয়া (সিকিম) ; সারাও (গারোয়াল, ইয়াম্‌/কুমায়ুন) ; সেরো, সেরোয়া, সারাও (উঃ পঃ হিমালয়) ; ইয়াম্‌/ভয়াম্‌ (কুল্‌) ; ঝারিয়াল, গোয়া (চাম্বা) ; আইম্‌ (কুনোয়ার) রাম্‌, হাল্‌জ্‌, সালাভির (কাশ্মীর) ; এইম্‌ (শতদ্রু উপত্যকা)

The Goral (*Nemorhaedus goral*—Hardwicke)

দেও ছাগলি (আঃ) ; রা-গিয়ায়্‌ (সিকিম, ভোঃ) ; সুহ্‌ গিং (লেঃ) ; ঘোরাল/গোরাল (নেঃ) ; গয়ের, পেবর, গয়েরুর (কুমায়ুন) ; শাহু শার (শতদ্রু উপত্যকা) ; বাঁই (পাঞ্জাব, ঝিলাম উপত্যকা) ; গোরাল (উঃ পঃ হিমালয়) ; পিজ, পিজর, রাঁই, রোম (পূঃ কাশ্মীর) ।

The Takui (*Budorcas taxicolor*—Hodgson)

তাকিন (মিশমী) ; থাকিন/থাকোন (হিমালয়, সাধারণ ভাবে-সর্বত্র) ।

The Chiru or Tibetan antelope (*Panthalops hodgsoni*—Abel)

ছিরু (নেঃ) ; চিরু (লাদক) ; ৎসুস্‌ (পুং), চুস্‌ (স্ত্রী), ইসস/ইসর্স, চিরু, চুকু, চিরুচুহু (তিঃ) ।

The Goa or Tibetan gazelle (*Procapra picticaudata*—Hodgson)

গোয়া (লাদক, তিঃ) ; রাগাও (তিঃ) ।

The Chinkara or Indian Gazelle (*Gazella gazella*—Pallas)

চিকারা, চিংকারা, কালাপাশু (হিঃ) ; ফাঁসফেলা (উঃ প্রঃ) ; হিরণ (পাঃ) ; কালিপি (মঃ ভাঃ, গোণ্ডী) ; কালসিপি (মঃ, গোণ্ডী) ; কুরাস্‌, মেরিক (গোণ্ডী) ; বারা জিন্‌কা, বারুড়ু জিন্‌কা (তেঃ) ; চিৎহুলে, সুঁক হুলে, তিস্‌কো, বুদারি, মুদারি, বুড়ারি (কাঃ) ; সাংথুলি (মণিপুর অঞ্চল) ।

The Black buck or Indian antelope (*Antelope cervicapra*—Linn)

কৃষ্ণসার হরিণ (বাং) ; বারাস্ত/বারুত/বরাথ/শাশিয়া, শাশিন, কৃষ্ণসার মৃগ (নেঃ) ; বামনি হরিণ (উড়িষ্যা, মঃ) বুচেতা (ভাগলপুর) ; কালসার(পুং),

বাওতি (স্ত্রী)—(বিহার) ; মৃগ, কালাবিত, কালাহিরণ, গুয়া (পুং), হরিণ/ হরণি (স্ত্রী) (হিঃ) ; কালা (পুং), গারিয়া (স্ত্রী)—(তিরহুত—সাহেবদের স্থানীয় ভাষা বুঝতে ভুল নয় তো ?) ; মিরগ (পাঃ) ; হরিণ, কালাবিত, হরু (মঃ) ; কালিয়ার (পুং), বেভা (স্ত্রী)—কাথিওয়ার ; কুৎসার (কুঃ) ; ভেলিমান, কেলিমান, মুরুকা / মুরুকুমান (তাঃ) ; জিনকা, ইরি (পুং), লেডি, সেড়ি (স্ত্রী) (তেঃ) ; সিগ্রি, শুলে শুলা কেরা, জিন্‌কে মোরাভি (?) (কাঃ) ।

The Four-horned antelope (*Tetracerus quadricornis*—Blainv)

চারশিঙ্গা, চৌশিঙ্গা, চৌকা, ডোডা, চাঙ্কা ডোডা জঙ্গলীবকরা (হিঃ) ; কোটারি (ছোঃ নাগপুর) ; ভিরকুরা (পুং), ভির (স্ত্রী), কোটরা (গোণ্ডী) ; মেণ্ডা (কুঃ) ; বনবকরি (মঃ ভাঃ) ; বেঁকরা (মঃ) ; ভোকড়া (গুঃ) ; জঙ্গলী বক্‌রি (দঃ ভাঃ—হায়দরাবাদ) ; গুটরা, বোটার (কাথিওয়ার) ; কুরঙ্গ (কোঙ্কন) ; নালুকুণ্ডু মান (তাঃ) ; কোণ্ডাকুরি (তেঃ) ; কুণ্ডু কুরি (?) কুণ্ডুকুরি কোকি (?) (কাঃ) ।

The Nilgai or blue bull (*Boselaphus tragocamelus*—Pallas)

নীলগাই (বাং) ; ঘোড়ফরাস (মাঃ)' চির নীলগাই (নেঃ) ; নীল, নীলা, নীল্‌গা (পুং), নীলগাই (স্ত্রী), রোজ, রোজা, রোহি, রুই, রুঝ. রোঝ, রোজেরি, রোজরা (হিঃ—অঞ্চলান্তরে প্রয়োগ ভিন্ন । দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে 'নীল' বা নীলা'ই চালু) ; নীল (পুং), রোহ, নীলগাই (মঃ) ; রুই (দক্ষিণ ভারত-হায়দরাবাদ, গুঃ) ; নীলাল, গুরাইয়া (গোণ্ডী) ; মুরিস (কোল) ; রোজ (কাথিওয়ার) ; রেজি (পাঃ) ; মনুপটু (তাঃ) ; মানু-পতু (তেঃ) ; কাডরাই (?) মাইরু (?) মারাভি (?) (কাঃ)

The Kashmir stag or Hangul (*Cervus elaphus hanglu*—Wagner)

হাঙ্গল, হঙ্গলু (পুং), মিয়ামার (স্ত্রী) (কাশ্মীর) ; ছাঙ্গুল (পাহাড়ী) ; হাঙ্গুল (পঃ হিমালয়), বরাশিঙা (হিঃ)

The Thamin or Brow-antlevel (*Deer Cervuseddi*—Meclelland)

সাংগাই, সাংগ্রাই, সাংলাই (মণিপুর)

The Swamp deer (*Cervus duvauceli*—Cuvier)

বড়শিঙ্গা, বারশিঙ্গা (বাং) ; ঘোড়বাগ, ঝাঁকাল (মৈঃ) ; ভালাঙ্গী (গোঃ) ; বিলোয়া পশু (?) ; দল হরিণ (আঃ) ; লামডালি ডালগাম্পা মাচ্ছক গারো—'বড় (বহু শিঙওয়ালা বড় হরিণ') ; গোণ্ড, গোঁর, ঘোস,

(নেঃ, তেরাই); বারায়া (নেঃ); বারশিঙা, বড়শিঙ্গা, মাহা (হিঃ); বারশিঙা, গোন্ডা, গোঁড় (উঃ প্রঃ); মালে, মাহাগইঞ্জক, গোঁএন, গইঞ্জক (পুং), গাওনিধাক (পুং), গাওনি (স্ত্রী), শাল সাঁমর, বরানের ওয়্যারি, বারসিঙ্গা (মঃ ভাঃ); ঘেসার মাউ (দঃ চাঁদা)

The Sambar (*Rusa unicolor*—Kerr)

সম্বর (বাং); গাউজ (পুং), লাড়ি/ঢোলাই/ঢুলানি (স্ত্রী) (যে কোন বড়জাতের যথা, বারশিঙা -স্ত্রীহরিণ সম্পর্কে প্রযোজ্য), পাড়া (অল্পবয়সী পুং), পাড়ি (অল্পবয়সী স্ত্রী), কালর/কালোয়ার গাউজ (বিরাট আকৃতির কালচে রঙের পুং); মাচ্ছক (গারো); ছালখাওয়া (গোঃ); খা-খোয়া পহু (?), সরপহু (আঃ); সাচা (দাফ্‌লা-অরুণাচল); মাহার (নেঃ তেরাই); জরায়ো (পুং), জরাই (স্ত্রী) গোন —(বড়), শুয়োরে —(ছোট)-(নেঃ); মউক সম্বর, সাঁবর, ঝাঁক (শিঙাল পুং) (হিঃ); ধাক (পুং), রোই (স্ত্রী) (মঃ ভাঃ মেলঘাট); ডোঙারিয়া ধাক মোণ্ডলা—বারসিঙ্গা থেকে পৃথক করে); বারদোরিয়া (নাগপুর); মেরু (পঃ ঘাট); ধাংক, ধাঁক (মঃ ভাঃ); (সারস্‌ হো-কোল); মা আও, মা-উ (দঃ চাঁদা, গোণ্ডী); সাম্বর (মঃ); ধালনার, ধাকনার (কুঃ); মেরু (মঃ); কাডমাই, কাডুমাই, কুডুমান কুড়া মান (তাঃ); কুডুয়ে কাডাডি (?) কাড্ডামা, (?) কাডাভি (?) (কাঃ);

The Hog deer (*Axis porcinus*—Zimm)

নাথরিনি হরিণ (?)—(বাং); জাত হরিণ, শুকরা হরিণ (শুয়োরের মতো মাথা নিচু করে চলে বলে—Barking Deer দ্রঃ)—(মৈঃ); খটিয়া (গোঃ); কটিয়া হরিণ/কটিয়া পহু (আঃ); লগুনা, খরলগুনা, রামগাই, গুগরিয়া (নেঃ, নেঃ তেরাই); শুকরিয়া হিরণ, পারা (হিঃ); দোদার (রোহিলাখণ্ড্‌); দারা (পাঃ)

The Chital or Spotted deer (*Axis axis*—Erxleben)

চিতল (বাং), বড় খটিয়া (রংপুর); চিতল (গোঃ, নেঃ); কুটুকী হরিণ পহু (?), চিতল (আঃ); চাতিরা ভাগলপুর; বুড়িয়া (গোরখপুর); ঝাঁক (শিঙাল), চিতল, চিত্রা (হিঃ); চিতল (মঃ); কাকুর (নিমার—ময়রা); লুপি, কাস্‌ (গোণ্ডী); চিতল, দারকার (কুঃ); পশু (কাথিওয়ার পালিমান, পুল্লিমান) মালা (তাঃ); সরগা, পারা সরগা (পুং), সারং, জাতে, (?) সারাঙ্গী জিন্‌কে, সারাগা, সারগর, মারনু (?) (কাঃ) ; দুপি (?) (তেঃ); দুপ্পি (তেঃ, দঃ) চাঁদা।

The Muntjac or Barking deer (*Muntiacus Muntjac*—Zimm)

মায়া (বাং-রংপুর) ; শূকরা হরিণ ; শুয়োরের মতো দাঁত বের করা থাকে বলে (একই নামে আবার Hog Deer-কেও ডাকা হয়—দ্রঃ) ; খাউট্টা হরিণ ('খাউ', 'খাউ', করে ডাকে বলে) ; (মৈঃ) ; বরগাচ্ছক, মারাখা (গারো) ; রাতোয়া, রাতে রাথে, রাথেয়া (নেঃ) ; সগরা (গোঃ) ; সুগরিপহু, সগরা (আঃ) ; কারশিয়ার (ভোঃ) ; শিক্রু (লেঃ) ; কোটরা (বিঃ) ; জঙ্গলী বক্‌রা, কাকর (হিঃ, মঃ ভাঃ, উঃ প্রদেশ) ; বেরাকি (হিঃ মঃ ভাঃ) ; গুট্‌রা (পুং), গুটরী (স্ত্রী), ভেক্‌রা, ভের্‌কি, কোর্তা (গোণ্ডী) , মেণ্ডা (কুঃ) ; বৈকুর, বৈকর, বেকুরা, বেক্‌রি, বেক্‌রা (মঃ) ; কালাই, কার্ত আড্ু (তাঃ) ; কুক্কাগড়ি ? (তেঃ) ; (কাড্ুকুরি, কাউকরি, চালি ?) ; (কাঃ) ।

The Musk deer (*Moschus moschiferous*—Linn)

কস্তুরি (নেঃ) ; কস্তুরা, মুশ্‌ক নাফা (হিঃ) ; বেইনা, বেনা (গারোয়াল, কুমায়ুন) ; কস্তুরে, রুস, রাওস, রোস (কাশ্মীর) ; রিবিও, রিবজো (লাদক) ; লা, লা লাওয়া (তিঃ) ।

The Indian chevrotain or Mouse-deer (*Moschida memina*)

জিত্রি, জিত্রা হরিণ (বাং) , হরিণা শেদা (গোঃ) ; নিগনি হরিণ (আঃ) ; গাণ্ডোয়া/গাড়োয়া ; (উড়িষ্যা) ; পিমুরি, পিসাই, পিসুরা, পিসোরা (হিঃ, মঃ) ; পিসোরা (মঃ ভাঃ) ; মঙ্গওয়ারি মোগলা—(মঃ ভাঃ) ; মুসা হিরণ দে (চাঁদা) ; তুরি মাউ (গোণ্ডী) ; মুগি (মধ্যভারত) ; করমপানি, সারুগুমার্ণ, কুর, কুরণপল্লি, সেরাগ আউড়ু (তাঃ) ; কুরুপান্দি (তেঃ) কুরা আঁডি (?) কুরে (?) (কাঃ) ।

The Indian wild boar (*Sus Serofa*—Linn)

শুয়োর, বরা (বাং) ; শিকার (মৈঃ) ; ওইকিয়া (দলছুট, একলা Solitary) (গোঃ) ; ওয়াক্ (গারো) ; (বমরীয়া) গাহরি (আঃ) ; ওক (মণিপুর) ; ফিনরাং (খাঃ) ওমা (মেচ) ; বানেল (নেঃ) ; শুয়ার ; বরাওয়া, কালা জানোয়ার, বদ জানোয়ার, বড়া জানোয়ার (হিঃ) ; জিনাওয়ার (পাঃ) ; পাড্ডি (গোণ্ডী) ; বরা (মাণ্ডলা —মঃ ভঃ) ; শুকরি, বরা, বরা (কুঃ) ; বানডুক্কর ডুক্কর (মঃ, গুঃ) ; কাটু/কাডুপনি/পান্নি (তাঃ) ; আডিভি পান্দি (তেঃ) ; হান্দি মিস্কা (?) কাডুহান্দি (কাঃ) ; শুকরম/পন্নি/কাট্টপান্নি (মালাঃ) ।

মন্তব্য ঃ "কালা", "বদ" ইত্যাদি ধর্মীয় কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা বলে থাকেন।

The Pigmy hog (*Sus saluanius*—Hodgson)

খটেয়া শুয়োর (গোঃ) ; ছানো বানেল (নেঃ) ; ছোটা শুয়ার (হিঃ) ;

(৩) হাতি

হাতিধরা, হাতির সরঞ্জাম ও বিবিধ

পূর্ব, উত্তর ও মধ্য ভারত

শব্দ **ব্যাখ্যা ও টীকা**

অঙ্কুশ—মূর্ধন্য 'ণ'-র আকৃতির মাহুতের হাতে রাখার অস্ত্র, শুধু 'ণ'-এর পুটলিটি এখানে ছুঁচালো।

অগুরং (গোঃ)—ছোট ফাঁদ, যেটা ধরা হাতিকে গাছের সঙ্গে বাঁধায় ব্যবহৃত হয়। শিকারী 'ফাঁদ' বা 'ফাঁস' আট দশ হাত লম্বা হয়।

আকাঁড়ি (মৈঃ)—মাথাটা লোহার, বাকিটা কাঠের তৈরী অঙ্কুশ।

আকশি (গোঃ)—'আকাঁড়ি' দ্রঃ।

আগারি (গোঃ, আঃ)—হাতির সামনের জোড়াপায়ের বাঁধন।

আন্নি (গোঃ, আঃ মৈঃ)—খেদায় 'কোট'-এর (দ্রঃ) সামনে ফুঁদেল (funnel)-এর দেওয়াল। এর দুই দেওয়াল আস্তে আস্তে সরু হয়ে এসে কোট-এর দরজায় শেষ হয়।

আঁভু—(১) দুই হাতির কানে একটা কড়া দিয়ে তা পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিলে কানে টান লাগায় হাতি ছুটতে পারে না। এই কড়ার নাম আঁভু।

(২) এক পায়ের 'বেড়ি', (দ্রঃ) লোহার পাত বা শিকল দিয়ে তৈরী, ভেতরে কাঁটা দেওয়া। চলার সময় এর সঙ্গে বাঁধা দড়ি বা শিকল (কানাচ-দ্রঃ) মাহুতের হাতে থাকে। হাতি পালাতে চেষ্টা করলে মাহুত এই শিকল বা দড়ি টেনে ধরে। একে কানের সঙ্গে বাঁধার মতো হাতি সর্বদা কষ্ট পায় না। 'কাঁটা বেড়ি' (ব্যথা-'বেড়ি') দ্রঃ।

আয়না (মৈঃ)—নিলামের জন্য তৈরী হাতির শ্রেণী বিভক্ত তালিকা।

আসন (গোঃ)—হাতির ঘাড়, যেখানে মাহুত বসে।

একছড়া (গোঃ, আঃ) —একটা 'কুন্‌কি' 'দ্রঃ'-র সঙ্গে বেঁধে নুতন ধরা হাতিকে শিক্ষা দেওয়া।

এক ছুরিয়া —প্রথমে 'দোহার' করার পর ('দোহার' দ্রঃ) যখন একটা 'কুন্‌কি'কে বাদ দেওয়া হয়।

ওলানে ওয়ালা (মৈঃ)—খেদার হাঁকাওয়ালা. 'beaters'; যারা হাতিকে 'ওলায়' বের করে।

কানাচ (মৈঃ)—'বেড়ি'-র (দ্রঃ) সঙ্গে লাগানোর জন্য লম্বা লোহার শিকল। বেড়ি লাগানোর পর এই শিকল মোটা গাছে বা খুঁটিতে বেঁধে হাতিকে বাঁধা হয়।

কাঠমস্তি (মৈঃ)—অল্প. সামান্য মদস্রাব হয়ে 'মস্তি' হওয়া। অপরিণত বয়স্ক পুং হাতির প্রথমে 'কাঠমস্তি'ই হয়। মাদি হাতির 'মস্তি'তে যেহেতু স্রাব কম, এবং এ অবস্থা সামান্য কয়েকদিন থাকে, সেজন্য একেও 'কাঠমস্তি' বলে। 'কাট্রিখোলা' দ্রঃ।

কানাট্ (গোঃ)—বাঁশের চোখা লাঠি। অঙ্কুশের সঙ্গে বা পরিবর্তে মাহুতের হাতে থাকে।

কানার (মৈঃ)—'কানাট' (দ্রঃ)

কামলা (গোঃ, আঃ)—'ঘাসিয়া', 'পাতাওয়ালা', 'মেট', 'চারাকাট' দ্রঃ।

কুকুর শুঙিয়া—'মেলা' (দ্রঃ), বিশেষ করে 'খেদা' (দ্রঃ) শিকারের সময় যারা সারা জঙ্গল তন্নতন্ন করে ঘুরে জঙ্গলী হাতির খবর আনে। 'পাঞ্জালী' দ্রঃ।

কুন্‌কি- (১) হাতি ধরায় শিক্ষিত হাতি, পুং বা স্ত্রী। স্যাণ্ডার্সন (পৃঃ ১২৬) এই অর্থেই কথাটা ব্যবহার করছেন (২) স্ত্রী হাতি (মৈঃ, ত্রিঃ)।

কুন্‌কিদার—'কুন্‌কি' বা হাতি ধরায় শিক্ষিত হাতির মালিক। 'মেলা' বা 'খেদা' শিকারে একাধিক কুন্‌কিদার 'মহলদার'-এর (দ্রঃ) সঙ্গে লাভের অংশে ভাগ নেবার ভিত্তিতে যোগ দিয়ে থাকে।

কোলজাঠা (গোঃ)—'ভুলসি'-র (দ্রঃ) সঙ্গে ঝোলানো ছোট 'জাঠা' (দ্রঃ)

কোট (মৈঃ)—'খেদা' করে বা তাড়িয়ে হাতির দলকে যে ঘেরা জায়গায় বন্দী করা হয়। 'গড়' দ্রঃ।

কোট খালাস (মৈঃ)—'কোট' থেকে ধৃত জঙ্গলী হাতিকে বের করা।

কোট দাখিল (মৈঃ)—হাতি 'কোট' এ ধরা পড়া।

খেদা—হাতির দলকে খেদিয়ে বা তাড়িয়ে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় বন্দী করা। এই পদ্ধতিতে হাতি ধরা—'খেদা শিকার'।

খাউদুয়াল (মৈঃ)—প্রধান 'দুয়াল' (দ্রঃ) থেকে নির্গত ছোট 'দুয়াল'।

খুঁটি (মৈঃ)—'কোট'-এর প্রধান খুঁটি।

গজবাগ—ধাতুনির্মিত অঙ্কুশ.

গত্ / গৎ (মৈঃ)—শিক্ষাকালে হাতির যে ত্রুটি থেকে যায়। 'গোনোগৎ নাই'—হাতির কোন ত্রুটি বা বদঅভ্যাস নেই।

গর্ত শিকার—গর্ত করে ফাঁদ পেতে হাতি ধরা, 'pit fall'। প্রাচীনতম হাতি

ধরার পদ্ধতি। বর্তমান কালে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে মহীশূর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত।

গদি—চটের তৈরী মোটা, শক্ত, অথচ হাল্কা, মাঝখানটা চেরা (হাতির শিরদাঁড়াকে বাঁচানোর জন্য) গদি। মৈমনসিংহ অঞ্চলে ভেতরে শোলা, আসামে হোগলা, ও অন্যত্র খড় বা ঘাস ভরে 'গদি' তৈরী হয়।

গড় (গোর, আঃ) —'কোট' দ্রঃ।

গড় খালাস (গোঃ, আঃ)—'কোট খালাস' দ্রঃ।

গড়দাখিল (গোঃ, আঃ)—'কোট দাখিল' দ্রঃ।

গলা ঘুরানিয়া (আঃ) - সদ্য ধরা হাতি। সোজা গাছের সঙ্গে কেবল গলায় বাঁধা। চার পা খোলা। এতে হাতি কেবল গাছের চারপাশে ঘুরতে পারে।

গলা খামারি (গোঃ,—জঙ্গলী হাতিকে ধরে 'আগারি', 'পিছারি' বাঁধলে গলার বরাবর একটা খুঁটি (খামারি) পুঁততে হয়। সেই খুঁটিতে ফাঁদ আটকালে হাতি জব্দ থাকে। মাথা ঘুরিয়ে আক্রমণ করতে পারে না।

গাজালি শিকার (আঃ)—বর্ষার প্রারম্ভে নূতন ঘাস বা গাজালি ওঠার সময় হাতির দল পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে। তখন হাতি ধরা। সাধারণত এক মাসের জন্য (জুন মাস) এর অনুমতি দেওয়া হয়।

গাদেলা—মোটা তোষকের মতো গদি, যার ওপর 'গদি' বাঁধা হয়। গদির ঘষা থেকে হাতির পিঠকে রক্ষা করে।

গোকুল কাঁটা (গোঃ)—লোহার তৈরী 'পানফল' আকৃতির কাঁটা। মাটিতে ছড়িয়ে দিলে হাতি পার হতে পারে না।

ঘাই দাঁড (গোঃ)—প্রধান 'দাঁড' (দ্রঃ)।

ঘাসিয়া (বিঃ)—মাহুতের সহকারী ; হাতির খাওয়া সংগ্রহের ও পরিচর্যার প্রধান দায়িত্বে থাকে। 'মেট', 'কামলা', 'পাতাওয়ালা' দ্রঃ।

ঘাস (আঃ)—পোষা হাতির উদ্ভিজ্জ খাদ্য। 'চারা' দ্রঃ।

চারজামা—(১) চারপাশ জাল দিয়ে ঘেরা, ছোট বাক্সের মতো হাওদা। পা মুড়ে বসতে হয়।—(মৈঃ) (২) পাশের দিকে মুখ করে আরোহীরা পা ঝুলিয়ে বসতে পারেন—সামনে পিছনে লোহার শিক দেওয়া। অনেক সময় পা রাখার জন্য তক্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মৈমনসিংহ অঞ্চলে একে 'শিকা চারজামা' বলে।

চারকাটা (উঃ প্রঃ)—'পাতাওয়ালা', 'ঘাসিয়া', 'মেট' দ্রঃ।

চারা (উঃ বঙ্গ, মৈঃ)—'ঘাস' দ্রঃ।

চারাকাট (নেঃ)—'পাতাওয়ালা', 'ঘাসিয়া', 'মেট' দ্রঃ।

চৌদন্তী (নেঃ)—দুই দাঁতালের মারামারি। 'মহরা নেওয়া' দ্রঃ।

ছড়্ (মৈঃ)—গদির ওপরে বাঁধা দড়ি, যা ধরে আরোহীরা বসেন। আসামে এই নাম নেই, কারণ গদি বাঁধার দড়িই ঘুরিয়ে ওপরে দেওয়া হয়।

ছড়্ বন্দ্—হাওদার মাঝখানের দড়ির টানা।

ছাড়ি বাঁধা—গলার ফাঁস বা ফাঁদ দিয়ে সেটাকে আবার বেঁধে দেওয়া, যাতে ফাঁসি না লাগে।

ছিউনিয়া বাট (গোঃ, আঃ)—'গচ'-এর সামনে ফুঁদেল বা 'রাঙ্গি'-র দেওয়াল বা 'সামি'-র শেষপ্রান্তে এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত টানা রাস্তা। 'রাঙ্গি'-র মুখের দু পাশেই 'ছিউনিয়া বাট'-এর দু প্রান্তে, 'টং' বা মাচান থাকে। হাতির দল 'ছিউনিয়া বাট্' পার হয়ে 'রাঙ্গি'-তে ঢুকলেই এরা মাচান থেকে খবর দেয় ও তখন হৈ-চৈ করে হাতির দলকে 'গড়'-এ ঢোকানো হয়।

জলসহা (মৈঃ)—নূতন ধরা হাতির তিন বর্ষা পার হওয়া। এ না হলে হাতি সত্যিই বশ মেনেছে বলা যায় না। 'পানি সহা'—দ্রঃ।

জাঙ্গিয়া (গোঃ, বিঃ)—পেছনে দু পায়ের উরুতে একসঙ্গে টাইট করে বাঁধা দড়ি, যাতে সদ্য বা নূতন ধরা হাতি জোরে পা ফাঁক করে দৌড়ে পালাতে না পারে।

জাঠা/জাঁঠা—ছোট লোহার ফলাযুক্ত বাঁশের লম্বা বল্লম। মৈমনসিংহ অঞ্চলে মেটের হাতে থাকে।

ঝট্কা (গোঃ)—নূতন ধরা হাতি গাছের সঙ্গে বাঁধার জন্য ব্যবহৃত মোটা রশি। সাধারণতঃ পা বাঁধার দড়ি। নূতন ধরা হাতির জন্য চারগাছা ঝট্কা লাগে—প্রতি পায়ে একগাছা।

ঝরণ (গোঃ)—দুষ্ট হাতির পেছনের পায়ে বাঁধা প্রলম্বিত দীর্ঘ শিকল। এটা সব সময়ই হাতির পায়ে বেঁধে রাখা হয়। এতে হাতি দৌড় দিয়ে পালাতে পারে না ; এবং শিকলের শব্দে মানুষও সাবধান হতে পারে।

ঝাঁপ (মৈঃ, ত্রিঃ)—'কোট'-এর প্রধান দরজা।

ঝাঁপ মাঝি (মৈঃ, ত্রিঃ)—যে লোক হাতির দল কোট-এ ঢোকার পর দরজা বা ঝাঁপ বন্ধ করার দায়িত্বে থাকে।

টোকা (মৈঃ, ত্রিঃ)—ধীরে ধীরে, অল্প আওয়াজ করে, হাতিকে অযথা ত্রস্ত না করে কোট-এর দিকে তাড়িয়ে আনা।

ঠোর (মৈঃ, ত্রিঃ)—বন্যজন্তু, বিশেষত হাতি চলার রাস্তা। 'দুয়াল', 'দণ্ডী' দ্রঃ।

ডাঙ্গস্ (মৈঃ)—'অঙ্কুশ', 'গজবাগ' দ্রঃ।

ডুলাস/দুলাস—হাতির গলার দুপাশ দিয়ে ঝোলানো দড়ির তৈরী ফাঁস, যাতে

পা রেখে মাহুত হাতি চালায়। ঘোড়ার যেমন 'রেকাব', হাতির তেমনি 'ভুল্‌সি'।

ডোল (মৈঃ)—হাতি ধরার ফাঁস। 'ফান্দ্', 'দোমা' দ্রঃ।

ডোগি (আঃ)—হাতির পেছনের পায়ের বাঁধন (স্ট্রেসী)।

ডোগিভরা (গোঃ)—হাতির সামনের পা বাঁধা। 'বান্ডা দেওয়া/ভরা' দ্রঃ।

তাও খাওয়া (মৈঃ, গোঃ)—হাতির গরম হওয়া। জলের অভাবে কোট-এ পড়া হাতির অনেক সময় এ অবস্থা হয়। তাগা—'নাকজরি' দ্রঃ।

তাগাছুরিয়া (গোঃ, আঃ, বিঃ)—ধরা হাতির শিক্ষা হয়েছে। এখন কোনো মানুষের 'তাগা' ধরে যাওয়ার দরকার নেই। 'নাকজরি' দ্রঃ।

তামাল বাঁধা (মৈঃ)—পোষাহাতির ওপর জালের মতো বাঁধা দড়ি, যাতে হাতি ধরার সময় দৌড়াদৌড়িতে মাহুত বা 'ফান্দি' (দ্রঃ) বা 'দাইসার' (দ্রঃ) পড়ে না যায়। আসামে এই প্রথা নেই।

তেলভাট্রি, তলভাট্রি (গোঃ. আঃ)—'ভাট্রি' দ্রঃ।

তেহার (গোঃ, আঃ)—হাতি ধরার সময় যখন তিনটে হাতি থেকে তিনটে ফাঁস লাগানো হয়। বড় হাতি ধরতে কখনো কখনো সাতটা পর্যন্ত ফাঁস লাগানো হয়।

থল ডাঙরিয়া (আঃ)—বিশেষ স্থান বা 'থল'-এর অধিপতি দেবতা। খেদা করার সময় এর আশীর্বাদের জন্য পুজো দেওয়া হয়।

থান—হাতি বেঁধে রাখার নির্দিষ্ট জায়গা—'Stall'।

থান যাওয়া (গোঃ)—হাতির ঘুমানো।

দাঁড (আঃ, গোঃ)—হাতি চলার রাস্তা, হাতির [illegible]এর দাগ। 'ঠোর', 'দুয়াল', 'মলম' দ্রঃ।

দন্ডিগড় (আঃ, গোঃ)—হাতি চলার রাস্তার উপর তৈরী গড়।

দরজা (গোঃ)—ঝাঁপ দ্রঃ

দরবারী হাওদা—'হাওদা' দ্রঃ

দাইদার (মৈঃ)—'হেড' মাহুত বা 'ফান্দি' (দ্রঃ)। 'দাইদার'রা হাতির চিকিৎসার ও দায়িত্বে থাকে। বিশেষতঃ, বড় হাতি 'পরতালা'-য় ধরার বিশারদ।

দানা—পোষা হাতিকে দৈনিক নুন সহ যে চাল বা ধান খেতে দেওয়া হয়। সাধারণ অবস্থায় বনের হাতি যতক্ষণ জেগে থাকে—দিনে অন্ততঃ বিশ ঘণ্টা—একটানা খেয়ে যায়। পোষা অবস্থায় হাতি কাজ করে। তখন সে খেতে পায় না। সে জন্য পোষাহাতিকে কন্‌সেনট্রেটেড (concentrated) খাদ্য দিতে হয়। দানা এই কাজ করে। তার সঙ্গে নুন, কারণ সমস্ত উদ্ভিজ্জ ভোজী জন্তুদের নুন শরীরের পক্ষে একান্ত দরকার। বনে এরা

নুনমাটি বা ক্ষারমাটি খেয়ে এর প্রয়োজন মেটায়। পোষা অবস্থায় এর সুযোগ নেই। কাজেই আলাদা করে নুন দিয়ে এই অভাব পূরণ করে দিতে হয়।

দুই ছড়া—দুইটা হাতির সঙ্গে নূতন ধরা হাতিকে বাঁধা। সাধারণত শিক্ষাদেবার প্রথম পর্যায়ে এটা করা হয়। পরে 'একছড়া' করা হয়।

দুম্‌চি (মৈঃ)—হাতির লেজের তলা দিয়ে টেনে ঘুরিয়ে যে দড়ি বাঁধা হয়।

দুমেলা—ইংরেজী' 'U'-এর আকৃতির ধাতু নির্মিত চোঙা, লেজের তলায় থাকে, এবং গদি বাঁধার দড়ি এর ভিতর দিযে টানা হয় যাতে লেজের গোড়া দড়ির ঘষা থেকে বাঁচে।

দুয়াল (মৈঃ, ত্রিঃ, কাঃ)—বন্য জন্তু. বিশেষত হাতি চলার পথ। 'ঠেরি', 'দণ্ডি' দ্রঃ।

দোমা (মৈঃ)—হাতি ধরার ফাঁস। 'ফান্দ্,' 'গেল' দ্রঃ।

দোহার (গোঃ, আঃ)—(১) হাতি ধরতে বা ধরা হাতিকে নিয়ে আসতে যখন দুই হাতি দিয়ে দুইটা ফাঁস লাগানো হয়। (২) দোহার-দোহারকি ='ফান্দি' বা 'দাইদার'-এর পেছনে হাতি ধরার সময় যে সাহায্যকারী মাহুত বসে—(মৈঃ)।

ধর্মকোট (মৈঃ)—সবচাইতে কম খরচার 'খেদা'। 'নুনমাটি' বা 'পুং'-এর রাস্তায় তৈরী কোট। এতে হাতির দলকে বহু লোক দিয়ে 'খেদা' করা বা তাড়ানোর প্রয়োজন হয় না। আসামে এই ধরনের খেদাই বর্তমানে করা হয়ে থাকে। 'পুং গড়' দ্রঃ।

ধরণা (গোঃ)—পোষাহাতি বাঁধার বড় শিকল।

ধুরা হাতি রাখার জায়গা. পিলখানা। এক বা একাধিক 'থান' নিয়ে 'ধুরা' এবং তাতে লোকজনও থাকবে।

নাক-জরি—সদ্য ধরা হাতির গলার ফাঁসে গলার উপর একটা লম্বা দড়ি লাগানো হয়। সেটা মাথার উপর দিয়ে টেনে একজন লোক হাতিকে তার পেছনে পেছনে চলতে শেখায়। অবশ্যই প্রথমে হাতে জাঠা থাকে। হাতি শিক্ষার প্রথম দিন থেকেই এটা করতে হয়। পরে আস্তে আস্তে দড়ি ছোট করা হয় হাতেও জাঠা থাকে না। এর পর এই অভ্যাস ছাড়ানো একটা মুস্কিল। 'নাক-জরি' মানে নাকের দড়ি। অন্য নাম তাগা। 'তাগা ছুড়' মানে হাতির শিক্ষা সম্পূর্ণ, আর মানুষের সামনে থাকার দরকার নেই।

নাকি—শুঁড় দিয়ে বিপদ, ভয়ের, বা রাগের সংকেতসূচক তীক্ষ্ণ বৃংহন।

নিকল্‌স (Nicholls) গদি—(আঃ —হাল্কা, ধাতুর নলের তৈরী 'চার জামা'। এতে তিন সারি আরোহী বসতে পারেন।

পরতালা/পরতালা শিকার—শিক্ষিত স্ত্রী হাতি দিয়ে বিশেষ কায়দায় দলছুট্ (Solitary) বড় গুন্ডা হাতিকে ধরা।

পস্থি (গোঃ)—নূতন ধরা হাতিকে শিক্ষা দেবার জন্য উঁচু ও সেগুনের খুঁট দিয়ে শক্ত করা ঘেরা জায়গা—(স্টেসী)। 'হাল' দ্রঃ।

পাছোয়া (নেঃ, গোঃ)—হাতির পেছনে মাহুতের যে সহকারী বসে।

পাঞ্জালী (মৈঃ)—বন্য হাতি বিশারদ। হাতির খবর আনে ও খেদার কাজের নেতৃত্ব করে। আসামে ঠিক এই জিনিসটা নেই। 'কুকুর শুঙিয়া' দ্রঃ।

পাতবেড় (মৈঃ)—বন্য হাতির দলকে প্রথমে একটা জঙ্গলে লোক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। জঙ্গলের ভেতর পাতার কুটীর বানিয়ে তাতে লোক থাকে এবং সর্বক্ষণ পাহারা চলে যাতে হাতি এই বেড়ের বাইরে না যায়। বলা বাহুল্য ভেতরে পর্যাপ্ত খাদ্য ও জল থাকলেই এটা সম্ভব। পরে আস্তে আস্তে তাড়িয়ে দলকে 'কোট' এর মধ্যে ঢোকানো হয়। আসামে এই কায়দা চালু নেই। এই ব্যবস্থায় প্রচুর লোক ও ব্যয়সাপেক্ষ।

পাতাওয়ালা (লেঃ, উঃ বঙ্গ) —'মেই,' 'ঘাসিয়া' দ্রঃ, 'চারা কাটা' দ্রঃ।

পানিসওয়া (লেঃ)—'জলসহা' দ্রঃ।

পিছারি (গোঃ, আঃ)—হাতির পেছনের জোড়া পায়ে বাঁধন।

পিঠাশিকার (লেঃ)—দলছুট্ (solitary) গুন্ডা হাতিকে ক্রমাগত অন্য হাতি দিয়ে তাড়া করে ক্লান্ত করে দিয়ে ধরার বিশেষ পদ্ধতি।

পিলখানা—হাতি রাখার স্থায়ী জায়গা।

পুং—নুনমাটি বা ক্ষারমাটি salt lick.

পুংগড় (আঃ, গোঃ)—হাতির নুনমাটি বা পুং-এ যাবার রাস্তায় তৈরি গড়। 'ধর্মকোট' দ্রঃ।

ফাঁড়া/ফাড়া—হাতি ধরার সময়ে কুনকি হাতির বুকে বাঁধা মোটা পাটের রশির পেটি। এর সঙ্গে 'ফান্দ' বাঁধা থাকে। 'girth belt'।

ফান্দ্/ফান্দ্ (গোঃ, আঃ)—হাতি ধরার ফাঁস। ডোল' দ্রঃ।

ফান্দি (আঃ, গোঃ)—হাতির ওপর থেকে যে লোক 'ফান্দ্' দিয়ে হাতি ধরে। এর স্থান মাহুতের ওপরে। 'দাইদার' দ্রঃ।

ফান্দ্ শিকার (মৈঃ)—হাতি চলার রাস্তায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হাতি, বিশেষত গুন্ডা হাতি ধরার পদ্ধতি।

ফাঁসি শিকার (মৈঃ)—হাতির ওপর থেকে ফাঁস দিয়ে হাতি ধরা। 'মেলা শিকার' দ্রঃ।

'ব' দেওয়া (মৈঃ)—হাতিকে স্নান করিয়ে চুবিয়ে আনা।

বকরাটানা (মৈঃ)—শুঁড় তুলে বা সামনের দিকে মেলে গন্ধ নেওয়া। 'বোথার নেওয়া' দ্রঃ।

বরফান্দি (গোঃ আঃ)—'ফান্দি' দের প্রধান।

বাংরি খেদা (মৈঃ)—ছোট খেদা, 'পাতবেড়' করা হয় না, কমলোক লাগে।

বান্ডা(গোঃ, আঃ)—হাতির পা বাঁধার রশি।

বান্ডাভরা (মৈঃ, গোঃ)—(১) হাতির পা বাঁধা। 'আগারি বান্ডা' (সংক্ষেপে 'আগারি') (গোঃ)—সামনের পা বাঁধার রশি। 'পিছারি বান্ডা' (সংক্ষেপে 'পিছারি') (গোঃ)—পেছনের পা বাঁধার রশি। (২) 'ভরা' বা—'দেওয়া' = সামনের পা বাঁধা (মৈঃ)।

বেড়ি—হাতির দুই পা একত্র বাঁধার মতন মাপসই শিকল। দুষ্ট হাতির জন্য 'কাঁটা বেড়ি', লোহার পাতের তৈরী, ভিতর দিকে কাঁটা। 'মাটিয়া বেড়ি' দ্রঃ।

'বোখার' নেওয়া—(গোঃ)—বক্‌রাটানা দ্রঃ।

ভাট্রি খোলা (গোঃ আঃ)—হাতির 'মস্তী' বা মদমত্ত হওয়া। এ অবস্থায় হাতি অস্বাভাবিক ব্যবহার করে। কোনো কোনো হাতি উদ্দাম হয়ে ওঠে ; কোনো হাতি আবার একদম ঝিমিয়ে পড়ে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হাতিই 'মস্তী' হয় ; কিন্তু কখনো কখনো মাদি হাতিও 'মস্তী' হয়। তবে মাদি হাতির 'মস্তি' কাল অনেক কম। যৌন উত্তেজনার সঙ্গে 'মস্তী' হওয়ার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে কি না এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। এই অবস্থায় হাতির রগের ছিদ্র থেকে দুর্গন্ধময় মদস্রাব হয়।

তল ভাট্রি—এরপর পুং হাতির লিঙ্গ থেকে বীর্যস্রাব হয়। তখন এ অবস্থাকে 'তলভাট্রি খোলা' বলে। এবং 'তেল' ও 'তল' এই দুই 'ভাট্রি' খুললে তবেই হাতি 'পুরাভাট্রি খোলা' হল।

তেলভাট্রি—যখন শুধু হাতির রগ থেকে মদস্রাব হয় তখন তাকে 'তেলভাট্রি খোলা' বলে।

মলম (কাছার, মৈঃ)—পায়ের দাগ, বিশেষত হাতির পায়ের দাগ। 'ঠোর', 'দান্ড' দ্রঃ।

ময়দান শিকার (আঃ)—খোলা জায়গায় বা ময়দানে হাতি ধরা।

মস্তি—'ভাট্রিখোলা' দ্রঃ।

মহলদার (আঃ)—হাতি ধরার 'মহল' বা 'মহাল' যে সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে। সাধারণত আসামে ১৫ই অক্টোবর থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই ইজারা দেওয়া হয়। তাছাড়া এরপর একমাসের জন্য 'গাজালি শিকার'।

মাটিয়া বেড়ি—বেশী ওজনের বেড়ি ; একপায়ে থাকবে। যে হাতি পালায়, বা দুষ্ট, বা বেশী চলে তার জন্য।

মাটিখোলা (আঃ)—পুং দ্রঃ।

মাহুত—হাতির চালক।
মাহুতপীর (আঃ)—হাতির দেবতা ৭৫% হাতি এ'র অধীন ; বাকি কালীমায়ের।
মেলাশিকার—গলায় ফাঁস দিয়ে হাতি ধরা। এই প্রথাতেই এখন পূর্বাঞ্চলে হাতি ধরা হয়। 'খেদা' প্রথা প্রায় উঠেই গেছে বলা চলে।'ফাঁসি শিকার' দ্রঃ।
মেই (মৈঃ)—মাহুতের সহকারী। 'পাতাওয়ালা', 'ঘাসিয়া' 'চারাকাই' দ্রঃ।
মোহরা ধরা (গোঃ) – দুই হাতির লড়াই। 'চৌদন্তী' দ্রঃ।
রাঙ্গি (আঃ)—'গড়'-এর সামনের বেড়ার দেয়ালের (আম্নি) ফুঁদেল।
লঙ্গর (আঃ)—'কানাচ' 'ঝরণ' দ্রঃ।
লাদ (মৈঃ)—'ঘাস' 'চারা' দ্রঃ।
লাদি বা লেদা—হাতির পুরীষ।
লাং (আং)—'রাঙ্গি'র টুকরা বা অংশ।
লোহাট—লাঠির আগে কাঁটা দেওয়া লোহার গোলক। হাতিকে, বিশেষত মেলা শিকারে, দৌড় করানোর ডানপাশে পেছনে মারা হয়। যে কোন শিকারী 'কুনকি'র ডান কোমরের ওপর সাদাটে লোহাট মারার ঘায়ের দাগ থাকবেই। ঘোড়ার যেমন স্পার (spur), হাতির লোহাট।
সর্দারী কুন্কি (গোঃ আঃ)—'কুন্কি'দের সর্দার ; যে হাতি অন্য কুন্কিদের নেতৃত্ব দেয়।
সহজপেটি (গোঃ)—নূতন হাতিকে শিক্ষাদেবার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। হাতিকে তার গদি গাদেলা ইত্যাদি বইতে শেখান। অনেকটা ঘোড়া 'ব্রেক' (break) করার মতো।
সাজে উঠান (মৈঃ)—'সহজ পেটি' দ্রঃ।
সাতশিকারি—(গোঃ) বনদেবী। হাতি ধরা বা মারা পড়লে, বা বড় বাঘ বা চিতাবাঘ মারা পড়লে এর পূজা করা হয়। উপকরণ ঃ—সাদা, লাল, কালো, সাতটা নিশান ; প্রত্যেক হাতি বা বাঘের জন্য এক জোড়া করে পায়রা উড়ানো ; নৈবেদ্য ধূপ দীপ।
সিঁড়ির কুন্কি (মৈঃ)—কোটে ঢুকে জঙ্গলী হাতি বাঁধার সময় অনেক সময় দ্রুত আত্মরক্ষার জন্য পোষা হাতির ওপর উঠে আসতে হয়। এটা যাতে সহজে করা যায় এজন্য কোনো কোনো হাতিতে দড়ির সিঁড়ি ঝোলানো থাকে। এদের 'সিঁড়ির কুনকি' বলে। এই প্রথা আসামে নেই।
হাওদা—হাতির পিঠে বসার জায়গা। হাওদা সাধারণভাবে দুই প্রকারের (১) শিকারের, (২) শোভাযাত্রায় ব্যবহারের। শিকারের হাওদার সামনের দিকটা উঁচু থাকে, কাঠ বা পালো ধাতুনির্মিত নলের খাঁচায় বেত বা জালের ছাউনি দিয়ে তৈরী। নজরটা যতটা হাল্কা বানানো যায় সে দিকে। সামনে শিকারী দাঁড়িয়ে থাকেন, পেছনে তাঁর সহকারীর বসার জায়গা আছে। ইচ্ছে

করলে শিকারী বসতেও পারেন। শিকারী দুই পাশে শোয়ান অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ব্যবস্থা সাধারণত এক একপাশে দুইটা করে মোট চারটা। শোভাযাত্রায় ব্যবহারের হাওদায় (State Houdah) চেয়ারের মতো করে বসা যায়; দুই সারিতে চারজন, বা কখনো পাঁচ বা ছয়ও। এগুলো খুবই ভারী হয়। সারাদিন বইবার জন্য এগুলো তৈরী নয়। এই হাওদার দেশী নাম 'দরবারী হাওদা' বা 'হেম্‌বরি'।

হাত জাঠা (গোঃ)—ছোট 'জাঠা' (দ্রঃ)।

হাতি জোকার (আঃ)—জঙ্গলী হাতি দেখে মানুষের কাঁপা।

হাতি মহাল (আঃ)—হাতি ধরার জন্য ভাগ করে দেওয়া জঙ্গল এলাকা।

হাতিসার (নেঃ)—হাতি রাখার জায়গা। 'ধুরা', 'পিলখানা' দ্রঃ।

হাল (আঃ)—নূতন ধরা হাতিকে শিক্ষা দেবার চিরাচরিত প্রথায় তৈরী, ছোট নিচু করে ঘেরা জায়গা।

হাতি পিঠা (নেঃ)—'পিঠা শিকার' দ্রঃ।

হেম্‌বরি (গোঃ)— হাওদা' দ্রঃ।

(৪) হাতি : হাতির শ্রেণীবিভাগ, প্রকার, লক্ষণ ইত্যাদি

পূর্ব, উত্তর ও মধ্য ভারত

শব্দ — **ব্যাখ্যা ও টীকা**

অউড়া গুণ্ডা (মৈঃ)—দলছুট (solitary) বড় গুণ্ডা। 'গুণ্ডা' দ্রঃ।

আকাশ পাতাল—যে দাঁতাল হাতির দুই দাঁত খুবই অসমানভাবে উঁচুনিচু। কুলক্ষণ বিশেষত যদি বাঁ দাঁতটি উঁচু হয়। এ হাতি দুষ্ট হবার সম্ভাবনা। 'তালবেতাল' দ্রঃ।

আন্ধার মুখিয়া (হিঃ, গোঃ)—গোমড়ামুখো বদমেজাজী হাতি।

আরা/আরি পেটি (আঃ)—কোনো কোনো হাতির গলা থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত একটা চামড়ার ভাঁজ ঝোলে। এই হাতিকে আরা/আরি পেটি বলে। 'পাংখা পেটি' দ্রঃ। কুলক্ষণ।

একদন্তা—যে দাঁতাল হাতির শুধু একদিকের দাঁতটিই আছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'গণেশ' দ্রঃ।

একহারা—এক রকমের 'বাঁধ' বা 'বান্ধ' (দ্রঃ)। লম্বা ছিপছিপে চেহারার হাতি কিন্তু 'মিরগা বাঁধ' (দ্রঃ) নয়। দোহারা' দ্রঃ।

ওয়াজল (গাঃ)—দাঁতাল।

কণ্ঠা—হাতির গলার গরুর গলকম্বলের মতো চামড়ার ঝোলা ভাঁজ। সুলক্ষণ।

কালাজিরী—জিভের আগে কালো দাগ। কুলক্ষণ।

কালাতালু—তালুতে কালো দাগ বা ছিট্ থাকা। কুলক্ষণ। 'গোলাপতালু' দ্রঃ।

কুঁজী (উঃ বঃ)—গোলপিট শিরদাঁড়া বের করা হাতি। দাম কম। 'ধনুভাঁজ', সম্বলপিঠ' দ্রঃ।

কুন্‌কি—(১) হাতি ধরায় শিক্ষিত গৃহপালিত হাতি, পুং বা স্ত্রী। স্যাণ্ডার্সনও (পৃঃ ১২৬) এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(২) পরিণত বয়স্কা স্ত্রী হাতি (মৈঃ ব্রিঃ)। 'ধুই' দ্রঃ।

কুমেরিয়া/কুমড়া/কুমীরা বাঁধ—সব চাইতে মূল্যবান সুদৃশ্য দুর্লভ গঠন। রাজকীয় 'বাঁধ'। ছোট পা, বিশেষত পেছনের পা ; বিশাল দেহ ; বিরাট মাথা ; পিঠ সামনের কাঁধ থেকে ঢালু হয়ে কোমরের দিকে নেমে এসেছে। টাকায় এ হাতির দাম হয় না। কুমড়া বাঁধের হাতি খুব কমই বদমায়েশ বা পাজি হয়। পা ছোট হওয়ায় গ্রাম্য ভাষায় একে 'ঘুঘুপাইয়া'-ও বলে।

খারা (আঃ)—লেজকাটা হাতি। দাম কম। 'বাণ্ডা' 'বাড়িয়া' 'বাড়িয়ানি' দ্রঃ।

গনেশ—দেবতা গনেশের শাস্ত্রোক্ত রূপ বর্ণনায় দেখা যায় যে এঁর ডানদিকের দাঁতটিই আছে। সেইজন্য আসল 'গনেশ' হাতির লক্ষণ তাই। সাধারণভাবে যে কোনো এক দাঁত বিশিষ্ট হাতিকেই 'গনেশ' বলা হয়, এবং 'ডাইনা গনেশ' ও 'বাঁয়াগনেশ' বলে এদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 'বাঁয়া গনেশ'-কে 'একদন্তা' বলাই বিধেয়।

অনেক সময় হাতির একটা দাঁত ভেঙে বা অসুখ হয়ে পড়ে যায়। এগুলি তখন একটা দাঁত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত গনেশ নয়। প্রকৃত গনেশের দাঁত গোড়া থেকেই হয় না। ধর্মগত কারণে প্রকৃত গনেশ হাতির দাম সব চাইতে বেশী।

গুণ্ডা—পূর্ণবয়স্ক পুং হাতি। প্রয়োগভেদে অর্থ ভিন্ন। যে কোনো দল ছাড়া একলা পুং হাতিকে বা উগ্র প্রকৃতির দলস্থ পুং হাতিকে বোঝাতে পারে। আসামে প্রধানত 'মাক্‌না'-কে (দ্রঃ) বোঝায়।

গেরা খাল—(হিঃ, গোঃ, আঃ)—গণ্ডারের মতো মোটা, ভাঁজ খাওয়া চামড়া, সুলক্ষণ। হাতি কেনার সময় হাতির চামড়া ভাল করে দেখতে হয়। পাতলা টান্‌টান্ চামড়ায় দড়ির ঘষায় চট্ করে ঘা হয়ে যায়। সুতরাং এ ধরনের হাতি থেকে বেশী কাজ পাবার সম্ভাবনা নেই। হাতিকে যেভাবেই কাজে লাগানো হোক তার গায়ে দড়ি বাঁধতেই হবে।

গেরা বান্ধ (আঃ গোঃ)—'কুমড়া' বাঁধের মতো ছোট পা কিন্তু দেহটা সামনে পেছনে লম্বাটে। 'কুমড়া বাঁধ-এর হাতি গোলগাল হয়। 'শোলা বাঁধ' (দ্রঃ) হাতির পা ছোট হলে তাকে 'গেরা বান্ধ' বলা যায়। সাধারণত 'মাক্‌না' হাতিকেই এই বাঁধের ভেতর ফেলা হয়।

গোলাপতালু—গোলাপী, স্বাভাবিক রঙের তালু, কোনো দাগ নেই। সুলক্ষণ।

চাকনা (গোঃ)—'সাকনা' দ্রঃ।

চাঁড়াল কুন্‌কি (মৈঃ, ত্রিঃ)—জঙ্গলী হাতির দলের নেতৃত্ব করে কোন বয়স্কা হাতি ; দাঁতালের বা গুন্ডার দায়িত্ব শুধু বিপদের সময় দলকে রক্ষা করা। অনেক সময়ই গুন্ডা দল থেকে খানিকটা দূরে থাকে, যেমন দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সময়। এই বয়স্কা, অভিজ্ঞা, দলনেত্রীকে 'চাঁড়ালকুন্‌কি' বলে। দল চলবার সময় 'চাঁড়ালকুন্‌কি' সামনে থাকে, গুন্ডা সবার পেছনে। 'রাণী ঢুই' দ্রঃ।

চেলা (মৈঃ)—'মালজুরিয়া' (দ্রঃ) জুটির ছোট হাতিটিকে অনেক সময় 'চেলা' বলে।

ছিট্‌ - হাতির কপালে, কানে, শুঁড়ে, ও শরীরের কোনো কোনো জায়গায় সাদা বা গোলাপী ছিট্‌ছিট্‌ দাগ। অনেকে এই দাগের আধিক্য বয়সের লক্ষণ বলে মনে করেন। যা বোধ হয় ঠিক নয়। 'সিল' দ্রঃ।

জিল্‌মা (গাঃ)—হাতির দল। 'সাহান' দ্রঃ।

ঝাড়ুদুম্‌—যে 'দুম্‌' বা লেজ মাটি ছোঁয় বা 'ঝাড়ু' দেয়। অত্যন্ত কুলক্ষণ। দাম এতই কম যে অনেক সময় 'ঝাড়দুম' হাতি ধরা পড়লে লেজ কেটে 'থারা' বানিয়ে দেওয়া হয়।

দাঁতাল/দান্তাল—বড় দাঁত বিশিষ্ট হাতি। অবশ্যই পুং। দাঁতের সংখ্যা ও চেহারা অনুসারে দাঁতাল হাতিকে এই কয়ভাগে ভাগ করা হয় : (১) গনেশ (২) একদন্তা (৩) চাকনা সাকনা (৪) তাল বেতাল (৫) আকাশপাতাল (৬) পালং দাঁতা (৭) সুরং/ভলুকা দাঁতা (৮) নলদাঁতা/বাতাসিয়া (৯) মাটিখোঁড়া/পাতাল পুরিয়া। এদের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা এই নাম-গুলির নিচে আলাদা ভাবে করা হয়েছে।

দোশালা—হাতির এক রকমের 'বাঁধ' বা 'বান্ধ' (দ্রঃ)। 'কুমড়া' ও 'মিরগা' বাঁধের মাঝামাঝি মিশ্র ধরনের চেহারা। 'দো-আঁশলা'ও বলা চলে। স্যান্ডার্সন এই অর্থেই কথাটি ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৮৩)।

দোহারা—(১) দোশালা দ্রঃ

(২) লম্বা, স্বাস্থ্যবান হাতি, 'কুমড়া' বাঁধের মতো বেঁটে ও মোটা নয়। সাধারণ অর্থে দোহারা চেহারার বা 'বাঁধের' হাতি।

ধনুভাঁজ (গোঃ)—'কুঁজী' দ্রঃ।

ধুই—পরিণত বয়স্কা স্ত্রী হাতি, যার বাচ্চা হয়েছে। 'কুন্‌কি' (২) দ্রঃ।

নলদাঁতা (বিঃ, গোঃ, আঃ)—সরু, লম্বা, হাল্কা দাঁতের পুং হাতি। দাম কম। 'বাতাসিয়া' দ্রঃ।

নর (মৈঃ)--পুং হাতি।

নাক্‌সামা (গোঃ, আঃ)—'মাকনা' বা স্ত্রী হাতির ছোট দাঁত (tush)।

নাগকেনী—যে হাতির লেজ সিধে ঝোলে না, বেঁকা। কুলক্ষণ।

পঙ্খীদুম্—ছোট লেজ, পেছনের পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত। সর্বাধিক সমাদৃত।

পাংখাপেটি (গোঃ, বিঃ)—'আরাপেটি' দ্রঃ।

পায়রা বিলাই চোখ—হালকা রঙের চোখ, 'wall eyed'। বঙ্গভূমিতে কুলক্ষণ বলে ধরা হয়, কিন্তু গোয়ালপাড়ায়, আসামে, এবং সোনপুর মেলায় কুলক্ষণ বলে ধরা হয় না।

পালংদাঁতা—যে দাঁত ওপরের দিকে ওঠানো; যার উপর 'পালং' বা 'চৌকি' (জলচৌকি) রাখা যায়। সুলক্ষণ ও বিশেষ সমাদৃত। এ হাতি মূল্যবান।

পাতালপুরিয়া (আঃ) সোজা মাটির দিকে নামানো লম্বা দাঁত। মাটি খোঁড়া দ্রঃ।

পিছারাগুণ্ডা (মৈঃ)—যে 'গুণ্ডা' (দ্রঃ) দলের পিছনে পিছনে চলে, কিন্তু দলের গুণ্ডার ভয়ে দলে ভিড়তে পারে না। মাঝে মাঝে দল থেকে মাদি হাতি ফুসলিয়ে নিয়ে সাময়িক সঙ্গিনী যোগাড় করে। 'লোকরা গুণ্ডা' দ্রঃ।

পিট্‌মান (গোঃ)—হাতির মাথার মাঝখানের উঁচু জায়গা, 'bump'। উঁচু হওয়া দর্শনধারী ও সুলক্ষণ। 'পিতম্', 'পিতোয়ান' দ্রঃ।

পিটুয়া পিঠুয়া (মৈঃ)—হাতির পিটের ঘা; দুরারোগ্য কিন্তু প্রায়ই হয়। হাতি কেনার সময় বিশেষ করে দেখে নিতে হয় যে, পিঠে পুরানো ঘা-র বা কাটার দাগ আছে কী না। থাকলে সেখানে আবার ঘা ফুটে বেরোবার সম্ভাবনা। 'মরক' দ্রঃ।

পিতাম্ (আঃ)—'পিট্‌মান', 'পিতোয়ান' দ্রঃ।

পিতোয়ান (মৈঃ, হিঃ)—'পিটমান', 'পিতাম' দ্রঃ।

বর্‌মিরপা (আঃ)—হাতির 'বাঁধ' বা 'বান্ধ'।

(১) মিলরয় (Milroy) 'বর্‌মির্‌গা'-কে 'দোশালা' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

(২) রাজকুমার প্রকৃতীশ চন্দ্র বড়ুয়ার (লালজী) মতে খুব বড় আকৃতির (আসামী 'বর্' = বড়) 'মিরগা' বাঁধের হাতি সম্বন্ধেই এই শব্দ প্রযোজ্য।

বনঘরাসিয়া (আঃ)—যে পোষাহাতি আবার জঙ্গলে পালিয়ে ফিরে গেছে।

বাড়িয়া/বড়িয়া (পুং) বাড়িয়ানি/বড়িয়ানি, (স্ত্রী)—(গোঃ)—লেজ কাটা পুং বা স্ত্রী হাতি। 'বাণ্ডা', 'খারা' দ্রঃ।

বাতাসিয়া (হিঃ, উঃ বঙ্গ)—'নলদাঁতা' দ্রঃ।

বাঁধ, বান্ধ্, বান্দ্—হাতির শরীরের গঠন অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ। এই কয় ধরনের বাঁধ সাধারণত মানা হয়ঃ (১) কুমেরিয়া/কুমড়া/কুমীরা বাঁধ; (২) মির্না বাঁধ; (৩) বরমির্গা; (৪) একহারা; (৫) দোহারা; (৬) দোশালা; (৭) শোলা বাঁধ; (৮) গেরা বাঁধ।

এগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও লক্ষণ পৃথক ভাবে নামগুলির পাশে দেওয়া হয়েছে।

বান্ডা (গোঃ)—'খারা' দ্রঃ। দাম কম।

বালখন্ডী (হিঃ)—লেজ কাটা নয়, কিন্তু লেজের আগায় লোম নেই। দৃষ্টি শোভন নয় বলে দাম কম।

বিলাই চোখ—'পায়রা চোখ' দঃ।

ভালুকা দাঁতিয়া (আঃ)—'সুরৎ দাঁত' দ্রঃ।

ভুসুং—শুঁড়ের গোড়া, (base of trunk)। ভুসুং যতো চওড়া হবে, ততই হাতির শোভা।

মখা (আঃ)—যে (মাক্না) (দ্রঃ) হাতির মোটেই দাঁত নেই।

মরক (গোঃ)—'পিটুয়া' দ্রঃ।

মাক্না—দাঁতা ছাড়া পুরুষ হাতি। সাধারণত ছোট ছোট সিধে দাঁত বা 'tush' হয়। 'নাকসামা' দ্রঃ।

মাটি খোঁড়া (গোঃ)—মাটির দিকে প্রলম্বিত সিধে লম্বা দাঁত। 'পাতাল পুরিয়া' দ্রঃ।

মাখি (গাঃ)—দলছুট্ (Solitory) গুন্ডা।

মালজুরিয়া—দুই বা ততোধিক দলছাড়া গুন্ডার একত্র সমাবেশ।

মির্গা বাঁধ—এটাই সাধারণ হাতির বাঁধ। লম্বা পা, হাল্কা শরীর, ছোট মাথা। হরিণের (মৃগ বা মিরগা') মতো গড়ন।

মেনা (মৈঃ)—অপরিণত বয়স্ক পুং হাতি।

মৌন/মিয়ানি (মৈঃ)—অপরিণত বয়স্কা স্ত্রী হাতি। 'সারিণ' দ্রঃ।

মোহড়া (গোঃ)—মাথা।

লোকরা গুন্ডা (গোঃ)—'পিছারা গুন্ডা' দ্রঃ।

শেরদুম্—যে (হাতির) লেজ পেছনের পায়ের শেষ সন্ধি পর্যন্ত ঝোলে। সুলক্ষণ।

শুঁড়চুটি (আঃ)—ছোট শুঁড়। কুলক্ষণ।

শোলা বাঁধ (গোঃ)—দেহের গড়ন সামনে পিছনে লম্বা —শোলমাছের মতন।

ষোলনখিয়া—ষোল নখ বিশিষ্ট হাতি। অত্যন্ত কুলক্ষণ ও দাম সেই মতো কম। সাধারণত হাতির সামনের দুই পায়ে পাঁচটি করে দশ, ও পেছনের দুই পায়ে

চারটি করে আট, মোট আঠারোটি নখ হয়। এর পর সতেরো থেকে বাইশ নখ পর্যন্ত কখন্যে কখনো হয়। ষোল ও সতেরো নখই কুলক্ষণ।
এ সম্বন্ধে বিহারী সওদাগরদের একশ্লোক রাজকুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ;

ষোলনখী, ঝাড়ু দুম্
যে চড়হে, ক'গরী নকুল সহদেব,
ঘর জ্বলে, ঘরণী মরে, স্বামী চলে বিদেশ।

সম্বলপিঠ—সোজাপিঠ, হাতি কেনার সময় হাতির পিঠ খুব ভাল করে দেখতে হয়। হাতির শিরদাঁড়া উঁচু হয়ে থাকলে ('কুঁজী', 'ধনুভাঁজ' দ্রঃ) গদি করলে তার চাপে ও ঘষায় ঘা হবার সম্ভাবনা ('পিটুয়া', 'মরক' দ্রঃ)। এ ঘা দুরারোগ্য। এই কারণে সোজা পিঠের চাহিদা খুব, এবং দামও বেশী।

সাক্না (আঃ)—খুব মোটা, ছোট, ওপরদিকে তোলা সুদৃশ্য দাঁত। এধরনের হাতি খুবই মূল্যবান। গারো পাহাড়ে এই ধরনের হাতি বেশী পাওয়া যায়। 'চাক্না' দ্রঃ।

সাক্নি (আঃ), চাক্নি (গোঃ)—সাধারণত, স্ত্রী হাতির ছোট দাঁত (tush—'নাকসামা') সোজা ও মাটিমুখী থাকে। কখনো কখনো এ দাঁত মোটা হয়, ও পুং হাতির মতো ওপরমুখী বেরিয়ে থাকে। এ হাতি খুবই দুর্লভ। স্ট্রেসী (Stracey) এমন একটি হাতির বিবরণ দিচ্ছেন।

সিল (হিঃ)—'ছিট্' দ্রঃ।

সুরৎ দাঁত—লম্বা, সোজা, মোটা, সামনের দিকে সামান্য তোলা দাঁত। সহজ-লভ্য। 'ভালুকা দাঁতিয়া' দ্রঃ।

সারিণ—অপরিণত বয়স্কা স্ত্রী হাতি যার এখনো বাচ্চা হয়নি। 'মেনি'/'মিয়ানি' দ্রঃ।

সাহান (গোঃ আঃ)—হাতির দল। 'জিল্মা' দ্রঃ।

(৫) হাতি ঃ হাতির বোল

ব্যাখ্যা ঃ হাতিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ বা বোল দিয়ে আদেশ করা হয়। সামান্য হেরফেরে শব্দগুলি এই উপমহাদেশে প্রায় সর্বত্র চালু। দক্ষিণ ভারতে কী বোল চলে তা এখনো জানা যায় নি।

বোল	ব্যাখ্যা	টীকা
আগে (মৈঃ)	আগিয়ে চল্	
আগৎ (গোঃ, আঃ, বিঃ, উঃ প্রঃ)	আগিয়ে চল্	

বোল	ব্যাখ্যা	টীকা
আড়ি (মৈঃ)	সামনে লাফিয়ে ওঠ্	আসামে বা অন্যত্র নাই।
খোল্ আম্ (গোঃ)	ঘাস ঝেড়ে ফেল্	হাতি পিঠে করে তার খাদ্য ঘাস নিয়ে ফিরলে পর দরকার।
খোল্ কান (গোঃ)	কান মেল্	
খোল্ পা (গোঃ)	পা লম্বা কর্	পা ঠুকে বলতে হবে। হাতিকে শুইয়ে স্নান করাবার সময় ভাল করে ঝামা ঘষার জন্য প্রয়োজন।
খোল্ বুক (গোঃ, আঃ)	গা ঢিলে কর,	গদি বাঁধার সময় প্রয়োজন।
খোল্ বৈঠ্ (গোঃ)	শুধু পেছনের দিকে বোস্	
চুপ্ (গোঃ)	চুপ করে স্থির হয়ে থাক,	শিকারে গুলি করার সময় বিশেষ প্রয়োজন।
ছাম্	স্থির হয়ে দাঁড়া	
ছাম্ বৈঠ্	সিধে হয়ে বোস্	
ছামঠ্	কামড়ে ধর্ খা	
ছিঃ/ছুট্ (কুচবিচার).	ছেড়ে দে	ময়মনসিংহে নাই।
ছৈ/চৈ	ঘোর্	
ছোপ্ (গোঃ)	জল খা	সদ্যধরা বনের হাতি বালতি জাতীয় কোনো কৃত্রিম আধার থেকে জল খেতে ভয় পায় বা জানে না। সওদাগর যখন হাতি কিনে নিয়ে যায় তখন তাকে রাস্তায় জল খাওয়ানোর জন্য এই বোলটি শেখানো বিশেষ দরকার।
ছোপ্ দেলে (গোঃ)	ওপরে জল ছিটাও	
ঝুক্	সামনের দিকে নিচু হ’	
ঝুক্ ডবল্ (গোঃ)	সামনের দিকে পুরো নিচু হ’	
ঝুক্ সেলাম (গোঃ)	সামনে পামুড়ে সেলাম দে	

বোল	ব্যাখ্যা	টীকা
ঝ্যপ্ (মৈঃ)	শুঁড় ঘোরা	
টান্ (উঃ প্রঃ)	পা সিধে কর্ (শোয়া অবস্থায়)	'খোল-পা' দ্রঃ।
ঠোকর্ (উঃ প্রঃ)	হোঁচট খাস না	'মাইল ঠোকর্' দ্রঃ।
ডেগ্	ডিঙিয়ে যা	
ডেগ্ লম্বি/লম্বা	লম্বা ডিঙো	মৈমনসিংহে নাই।
তুল্ (চট্টগ্রাম)	শুঁড় দিয়ে তোল্	'দেলে' দ্রঃ।
তেরে	কাত হ', শুয়ে পড়্	
তেরে বৈঠ্	কাত হয়ে বস্	
তৈ (মঃ ভাঃ)	ঘোর্	'ছৈ' দ্রঃ।
তৈ ধ্যৎ (মঃ ভাঃ)	পিছিয়ে গিয়ে ঘোর	
তোল্	পা দিয়ে মানুষকে তোল্	
দলাই (উঃ প্রঃ)	জল খা	'ছোপ্' দ্রঃ।
দাব্	পা দিয়ে দাবিয়ে দে	
দুম্	লেজ সিধে করে রাখ্	
দেলে	শুঁড় দিয়ে তোল্	
দেলে উঠাও (গোঃ)	উপরে উঠাও	
দেলে মার (গোঃ)	উপরে মার্	গাছের ডাল ভাঙ্গার সময় প্রয়োজন।
দেলে ধর্	উপরে ধর্	
দেলে মহরা (গোঃ)	মাথা তোল্	মহরা = মাথা
দেলে সেলাম (গোঃ)	শুঁড় তুলে সেলাম কর্	
ধর্ (মঃ ভাঃ)	ধর/তোল্	'দেলে' দ্রঃ।
ধর্ (গোঃ)	ধর্	এর সঙ্গে যুক্ত করে 'ধর্পা' 'ধরহাত /শুঁড়' 'ধর্ ফান্দ' 'ধর্দুম্' ইত্যাদি হয়।
ধর উপর (উঃ প্রঃ)	উপরে ধর	'দেলে ধর' দ্রঃ।
ধর দাব্ (গোঃ, আঃ)	ধরে, মাড়িয়ে, টুক্রো টুক্রো করে ফেল্	
ধ্যৎ	থাম্	
ধ্যৎ পিছে (উঃ প্রঃ)	পিছনে হট্ (দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়)	
পিচ্ছে/পিছে (আঃ)	পিছনে হট্	'ধ্যৎ পিছে', দ্রঃ।

বোল	ব্যাখ্যা	টীকা
পিছ্ বৈঠ্ (মৈঃ)	শুধু পেছনের দিক নিচু করে আধবসা হ'	
ফাঁড়ো (উঃ প্রঃ)	ভাঙ্গো	
ফুল্ বৈঠ্	(১) শুধু সামনের দিকে অর্ধেক বোস্ (মৈঃ)—'ঝুক্ ডবল্' দ্রঃ (২) পেছনের দিকে অর্ধেক বোস্ (উঃ প্রঃ)— 'পিছ বৈঠ্' দ্রঃ	
বিরি	ফেলে দে ধরিস্ না	শুধু মৈমনসিংহ অঞ্চলে 'বড়ি'।
বিলে (উঃ প্রঃ)	সামনের পা উঠা	
বৈঠ্	বোস্	
বোল্	ডাক্	
ভান্দে (আঃ)	তুলে দে।	'দেলে', 'তোল' দ্রঃ।
ভার (উঃ প্রঃ)	শুঁড় তোল্	
ভিড় আগে ভিড় (মৈঃ)	অন্য হাতি বা উঁচু জায়গার সঙ্গে গা মিলা	
ভিড়চাপ্ (গোঃ, আঃ)	পাশ দিয়ে অন্য হাতিকে চাপ্	হাতি ধরার সময় বিশেষ দরকার।
মাইল্	ওঠ্, সতর্ক হয়ে চল্	
মাইল, মাইল্, মাইল্ (উঃ প্রঃ)	দৌড়ো	
মাইল ঝরপ্ (গোঃ)	দুপাশ দেখে যা	সরু গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঘাস নিয়ে যাওয়ার সময় দরকার
মাইল ঠোকর্ (গোঃ)	ঠোকর খাওয়া থেকে সাবধান	'ঠোকর' দ্রঃ
মাইল সর্তা (গোঃ)	পা ঘষে হাঁট্	পিছল রাস্তায় দরকার
মাইল হুসিয়ার (গোঃ)	সাবধান	
মার্	ভাঙ্গ্, আঘাত কর্	
লগড় লগড় (মৈঃ)	গা রগড়া	স্নানের সময় অন্য হাতি বা পাথরের সঙ্গে গা ঘষ।
লাগায় (উঃ প্রঃ)	অন্য হাতির সঙ্গে লড়াই কর্	
সামাল কর্ (উঃ প্রঃ)	সাবধান	'মাইল', 'মাইল হুসিয়ার' দ্রঃ

(৬) শিকার

উত্তর, মধ্য ও বিশেষত পূর্ব ভারত

উল্টা হাঁকা (হিঃ)—একবার হাঁকায় জানোয়ার না বেরুলে একই জঙ্গলে উল্টো দিকে 'হাঁকা' করা।

একুরা (গোঃ)—দলছুট (Solitary) একলা জানোয়ার—হাতি, মহিষ, মিথুন ইত্যাদি। হাতি সম্বন্ধে বলা হয়—'একুরা গুণ্ডা', অর্থাৎ 'মালজুরিয়া' গুণ্ডা (এক বা একাধিক গুণ্ডার একত্র সমাবেশ) নয়।

একোয়া (দঃ বিহার) - 'একুরা', 'ফেটো' দ্রঃ।

ওয়াগম্ (গাঃ)—হাতির দাঁত।

কারা (ছোঃ নাগপুর)—বাঘের মরি করার জন্য বাঁধা (bait) বাচ্চা মহিষ।

খবরিয়া (গোঃ) – যে শিকারের খবর আনে। 'খুঁজি' দ্রঃ।

খুঁজি (মৈঃ) – 'খবরিয়া' দ্রঃ।

খুঁটি—জঙ্গলে নেপালীদের গরু মোষ রাখার জায়গা বা বাথান। এদের কাছ থেকে জানোয়ারের টাটকা খবর পাওয়া যায়।

খুঁটি করা (মৈঃ) আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে জানোয়ারের, বিশেষত মহিষের ফিরে রুখে দাঁড়ানো।

গন হরিণ (মুঃ)—পুং হরিণ।

গারা (হিঃ)—(১) 'কারা' দ্রঃ। (২) বাঘের 'মরি' বা 'kill'। 'গারা হওয়া'—বাঘের জানোয়ার/বাঁধা 'কারা' বা 'গারা' মারা।

গাড়ি (মৈঃ)—জঙ্গলে জানোয়ারের কাদা মাখার জায়গা, 'wallow'। 'লেটা', 'লোটন'-দ্রঃ।

গুট্কিয়া (গোঃ)—বড়, দলছুট পুং শুয়োর। 'দাঁৎলা' দ্রঃ।

ঘুপি (মৈঃ)—জঙ্গলে লতাপাতায় ঢাকা শিকারীর লুকিয়ে বসার জায়গা। 'hide', 'blind'। 'পাতোয়া', 'পাতুয়া' দ্রঃ।

ঘুপি শিকার (মৈঃ)—ঘুপি থেকে শিকার করা ; 'হাঁকা' করে বা 'মাচান' থেকে নয়।

চাং (পুঃ বঙ্গ)—মাচান। 'টং', 'বোরং' দ্রঃ।

চালি শিকার (আঃ)—হাতি দিয়ে ঘাস জঙ্গলে শিকার করার সময় ঘাস নড়া দেখে গুলি করে শিকার। 'হালি শিকার' দ্রঃ।

ঢেলা (মৈঃ)—বড় দলছুট পুং মহিষের সঙ্গী ছোট পুং মহিষ। অনেক সময় 'মালজুরিয়া' জোড়াগুণ্ডার ছোটটিকেও বোঝায়।

ছেপা (গোঃ) জঙ্গল তড়ানোর সময় শিকারের প্রতীক্ষায় শিকারীর দাঁড়াবার জায়গা, বা শিকারের পালানোর পথ রুখবার জায়গা (stop)।

ছোপা নেওয়া (মৈঃ)—আহত বা ক্রুদ্ধ বাঘ ঘন ঝোপের টুক্‌রা বা 'ছোপা'-য় আশ্রয় নিয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরে দাঁড়ায়। একে বলে বাঘের ছোপা নেওয়া। এটা বিশেষ করে হাতি দিয়ে শিকারের শব্দ। 'ছোপা নেওয়া' বাঘ অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ সে দেখে-দেখে, বেছে-বেছে হাতির লাইনের এক একটি হাতিকে চকিতে আক্রমণ করে, এবং তারপর হাতির লাইনকে সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে আবার 'ছোপা'য় ফিরে গিয়ে তার শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে। ছোপা-ই তখন বাঘের দুর্গ।

ছোট শিকার (মৈঃ)—ছোট জিনিস শিকার, 'small game'.

জঙ্গল ভাঙ্গা—জঙ্গলের জানোয়ার শিকারের উদ্দেশ্যে তাড়ানো, বিশেষত হাতি দিয়ে।

জঙ্গল তাড়ানো—শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের জানোয়ার তাড়ানো,—'beating'।

ঝরুয়া শিকার (নেঃ)—হাতির লাইন দিয়ে জঙ্গল 'হাঁকা' (beat) করে শিকার।

ঝোড়া (পঃ মালদা)—'হাঁকা' করা, 'beating'

টং (পূঃ বঙ্গ)—'চাং', 'মাচান', 'বোরং', দ্রঃ। বিশেষত উচুমাচা বোঝায়।

ঠাঁটা (মৈঃ) আহত, আক্রমণোদ্যত ভাল্লুকের চিৎকার।

ঠাঠা (মৈঃ)—কাঠের ঘোরানো যন্ত্র ; বদ 'কট্‌কট্‌' আওয়াজ করে। 'হাঁকা'য় ব্যবহার হয়।

ঠোর (মৈঃ, ত্রিঃ)—জন্তু জানোয়ারের সর্বদা চলাচলের রাস্তা, বিশেষত হাতির। 'দাঁড়' 'দুয়াল', 'মলম', 'থোর' দ্রঃ।

ঠৌর (গোঃ)—ঠোর দ্রঃ

ডাঁশ (পূঃ ভাঃ)—Horsefly

ডালাশিকার—একজন লোক মাথায় প্রকাণ্ড এক ডালা উপুড় করে তার ওপর আলো রেখে চলে, ঠিক তার পেছনে শিকারী থাকেন। ডালার নিচেই অন্ধকার থাকায় লোকটিকে শিকার দেখতে পায় না। সঙ্গে অনেক সময় বাঁশি বা টিংটিং করে ঘণ্টা বাজানো হয়। আলো আর এই একটানা

আওয়াজে শিকার—সাধারণত ছোট হরিণ বা খরগোশ—সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তখন শিকারী লাঠি বা তীর ধনুক দিয়ে তাকে মারেন।

ডেরা (গোঃ)—'শুয়োরের ডেরা'—শুয়োরের বাসা, বিশ্রামের জায়গা, ঘর। 'বিছানা', 'বৈঠক' দ্রঃ।

থোর (মৈঃ)—জঙ্গলে মহিষের সর্বদা যাতায়াতের রাস্তা।

দাঁড (গোঃ)—হাতি, মহিষ, গণ্ডার, মিথুন প্রভৃতি ভারী জানোয়ারের পায়ের দাগ বা সর্বদা যাতায়াতের রাস্তা। 'থোর', 'মলম', 'দুয়াল' দ্রঃ।

দাঁৎলা (মৈঃ)—'গুটকিয়া' দ্রঃ। বড়-পুং দলছুট (Solitary) শুয়োর।

দুয়াল (কাছার)—বনাজন্তু, বিশেষত হাতির সর্বদা চলাচলের রাস্তা। 'ঠোর' 'দাঁড' দ্রঃ।

দৌড় (গোঃ)—হাঁকায় জানোয়ার পালানর রাস্তা। নাকা দ্রঃ।

নাকা (মৈঃ)—হাঁকায় জানোয়ারের পালানর রাস্তা। দৌড় দ্রঃ।

পাতোয়া/পাতুয়া (মঃ ভাঃ)—'ঘুপি', 'বাগরি' দ্রঃ।

পাঞ্জ (হিঃ)—পায়ের দাগ।

পারা (মঃ ভাঃ, নেঃ)—'কারা', 'গারা (১)', 'হেলা' দ্রঃ।

পালোয়ান/মাটিয়া পালোয়ান (মৈঃ)—বন্দুকধারী গ্রাম্য পেশাদার শিকারী।

ফুস্‌কি (মৈঃ)—সামান্য, তুচ্ছ, ছোট শিকার।

ফেটো, ফেটুয়া (মৈঃ)—দলছুট একলা জানোয়ার। 'একুরা' 'একোয়া' দ্রঃ।

বড় শিকার—বড় জন্তু শিকার, 'big game'।

বাগরি (মৈঃ)—'পাতুয়া', 'ঘুপি' দ্রঃ।

বাঘাহুলি (মৈঃ)—বাঘ দেখে হুড়াহুড়ি পড়ে যাওয়া, 'chaos'।

বাথান—গরু বা মোষ রাখার জায়গা।

বিছানা (গোঃ)—হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারের দিনে বিশ্রাম করার জায়গা। 'form' of a deer or hare।

বৈঠক (মৈঃ, হিঃ)—বিছানা দ্রঃ।

বিকা (গাঃ)—পুং জানোয়ার।

বিমা (গাঃ)—স্ত্রী জানোয়ার।

বোচা (মাঃ)—মগর কুমীর।

বোড়া (মঃ ভাঃ)—মহিষের বাচ্চা, বাঘের মরির জন্য বাঁধা হয় 'Bait' 'কারা' 'গাবা', 'পারা' দ্রঃ।

বোরং (গাঃ)—গাছের উপর ঘরের মতো তৈরী বিরাট মাচা। গারোরা শস্য পাকার সময় হলে কয়েকমাস গ্রাম থেকে বেশ দূরে তাদের ক্ষেতে ('আদাং')

এই 'বোরং'-এই কাটায়। উদ্দেশ্য, হাতি, শুয়োর, হরিণ থেকে শস্য রক্ষা করা।

ভাঁজা (গোঃ)—জানোয়ারের পায়ের ছাপ। ভারী জানোয়ার, যথা হাতি, গৌর, মিথুন, গণ্ডার বা মহিষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সেখানে 'দণ্ড' দ্রঃ।

মংরেং (গাঃ)—গারো কুঠার।

মলম (মৈঃ, কাছার)—জন্তু জানোয়ারের পায়ের দাগ।

মরি (বাং)—বাঘে মারা জানোয়ার, 'kill'।

মাচাং মাচান। 'ঢাং ঢং', 'বোরং' দ্রঃ।

মটিয়া পালোয়ান (মৈঃ)—'পালোয়ান' দ্রঃ।

মোগাম (মঃ ভাঃ)—'হাঁকা' দ্রঃ।

মোহড়া—(মাঃ)—শিকারীর জানোয়ারেব প্রতীক্ষায দাঁড়াবাব জায়গা।

মৌর (গোঃ)—'মরি' দ্রঃ।

রোখ্—(১) 'হাঁকা'-য় যে যে জায়গায় লোক বসিয়ে জানোয়ারেব পালানোব পথ রোখা হয়।

(২) 'হাঁকা'য় শিকারের অপেক্ষায় শিকারীব দাঁড়াবার জায়গা (মৈঃ' গোঃ)। 'ছেপা' দ্রঃ।

লামথান (নেঃ)—'হাতির লাইন থামো'

লাম পুগিয়ো (নেঃ)—হাতির ঘের (ring) পুরো হয়েছে। নেপালে বহু-শিকারী হাতি দিয়ে প্রথমে বাঘকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়। তারপর এক বা একাধিক শিকারী সেই হাতির ঘের বা 'লাম' এর মধ্যে ঢুকে বাঘ মারেন। বাঘের এতে পালাবার কোনো পথ থাকে না।

লেটা (মৈঃ, গোঃ)—জানোয়ারের কাদা মাখার জায়গা, 'wallow'। 'গাড়ি', 'লোটন' দ্রঃ।

লোটন (হিঃ, মঃ ভাঃ)—'লেটা', 'গাড়ি' দ্রঃ।

শিং ঝাড়া (গোঃ, মৈঃ)—হরিণের বাৎসরিক পুরানো শিং ফেলে দেওয়া।

সুল্পি (মৈঃ)—এক রকমের বল্লম।

হলঙ্গা (মৈঃ)—বাঁশের সরু বল্লম। বাঁশের আগা কেটে সরু কবে নেওয়া—ধাতুর ফলা নয়।

হাওদা শিকার—হাতির ওপর হাওদা দিয়ে ঘাসের জঙ্গলে শিকার। একমাত্র ধনী

ব্যক্তিরাই এই হাওদা ব্যবহার করতেন। সাধারণ লোকেরা হাতি দিয়ে শিকার করার সময় শুধুই গদি ব্যবহার করতেন। হাওদা শিকারে তাই একটা রাজকীয় ভাব ছিল। এখন হাওদা শিকার প্রায় উঠেই গেছে বলা যায়। যদিও কেউ কখনো হাতি দিয়ে শিকার করেন, সে গদি থেকেই। হাওদা ভারী হয়। তা বইবার জন্য বড়, শিক্ষিত হাতি দরকার। সে হাতিও এখন বেশী লোকের নেই। তা ছাড়া গাছের জঙ্গলে হাওদা নিয়ে ঢোকাই যায় না। গদি নিয়ে যাওয়া যায়। আজকাল শুধুই ঘাসের জঙ্গল প্রায় নেই। হাওদা শিকার উঠে যাবার এও একটা কারণ।

হাঁকা/হাঁকোয়া (হিঃ)—শিকারের উদ্দেশ্যে মানুষ বা হাতি দিয়ে জঙ্গলের জানোয়ার তাড়ানো।

হালি শিকার (গোঃ, আঃ)—'চালি শিকার' দ্রঃ। ঘাসের মধ্যে জানোয়ার চললে যে ঘাস নড়ে সাময়িক একটা দাগ মতো হয় তার নাম হালি। অভিজ্ঞ শিকারী এই হালি দেখে কি জানোয়ার তা বলতে পারেন।

হেলা—বাঘের জন্য বাঁধা (bait) বাচ্চা মহিষ। 'গারা' 'কারা', 'পারা' দ্রঃ।

কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় শব্দ

বাঙলা	তামিল	মালায়লাম	কান্নাড়া	তেলুগু
পুং (জানোয়ার)		অণ্মৃগম্	গাণ্ডু	মাগা
স্ত্রী (জানোয়ার)	পেন	পেন্নু	হেন্নু	আডা
গুলি (bullet)			গুণ্ডু	গুণ্ডু
গুলি (cartridge)		তোট্টা	টোটা	তোটা
দাঁতাল	কোম্বান আনেই	কোম্বান আনা	দান্তাদা	
গজদন্ত	কোম্বু	পাম্বু	হা-উ	পামু
ময়ূর	মায়িল	মায়িল	লাভিলু	নামালি
জঙ্গলী মুরগী	কাট্টুকোরি	কাট্টুকোরি	কাড়ুকোরি	আডিভি কোরি
পায়রা	পুরা	প্রা-উ/য়ু	পারিওয়াড়া	পাউরামু

বাঙলা	তামিল	মালায়লাম	কান্নাড়া	তেলেগু
শকুন	কারুগু	কারুরু	রানা হাড্ডু	ডেগা
নরম চামড়ায় ঢাকা নূতন শিং (velvet horn)	তোলুকোম্বুমান			
স্ত্রীহরিণ	পোতে/পেনমান	পেনমান		এগিবেউডুতা
পুং/শিঙাল হরিণ	কোম্বু	কোম্বুমান	কোম্বু	কোম্ভু
ছোট হরিণ	মান কুট্রিমান	কুট্রিমান	জিংকে. চিক্কা/ আঙ্গা	ছিন্না/ চিরুতা
পোষা হাতি	ভীট ইয়ানে	ওয়ারার্তু আনা/নাট্টানা		
জঙ্গলী হাতি	কাট ইয়ানে	কাট্টানা		
মস্তী/গুণ্ডাহাতি	তিরেট/মেরেই ইয়ানে	মাদয়ানা		মদিশ্চনা এনুগু
গোসাপ	উড়ুম্বু	উড়ুম্বা		
একোয়া পুং জানোয়ার	উণ্ডিমাড়ু	উইণ্ডু কালা		
দলের বড় পুং	মাম্মাইমাড়ু			
দল/যূথ	মাণ্ডাই	কুট্টম্		
বাঁদর	কুরাঙ্গু	কুরাঙ্গু	কোতি	কোতি
কাঠবিড়ালী	আনিপিল্লে	আন্না	আল্লিলু	উড্ডুতা
উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী (Flying Squirrel)	পারাক্কুম অনিল		পারাক্কুম আন্না	এগিবে উড়ুতা
কুমীর	মুতানাই	মুতলা		
ময়ালসাপ (python)	পুসে পাম্বু/ হেবাবাউ	পেরুম পাম্পু		কোরাণ্ডা সিলুভা পেরিয়া মালই পাম্বো
জানোয়ারের পুরীষ	চানি	আন্নাপিণ্ডি (হাতির) আগনে ওয়ালম্ (গরু ইত্যাদি)		পেডা
মাচান	পুরাম্নি (?)	তম্বু		মাণ্ডা

গ্রন্থপঞ্জী

আচার্য চৌধুরী, সূর্যকান্ত, 'শিকার কাহিনী' ১৩১৩।

আচার্য চৌধুরী, জিতেন্দ্র কিশোর, 'শিকার স্মৃতি', ১৩৩১।

আচার্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র নারায়ণ, 'শিকার ও শিকারী', ১৩৩২।

সিংহ, ভূপেন্দ্রচন্দ্র, 'বনজঙ্গল ও শিকারের কথা', ১৯৬০ সংস্করণ।

Aflalo, F. G., ed., *The Sports man's Book of India*, London, 1904.

Baillie, W. W., *Days and Nights of Shikar*, London and N. Y , 1921 (Glossary)

Best, J, W., *Indian Shikar Notes*. Calcutta, Delhi, Bombay, 1931.

Big Bare, *Guide to Shikar in the Nilgiris*, new ed., Madras, 1924, (Glossary)

Blanford, W. T., *The Fauna of British India : Mammalia*, London, 1888-89.

Burke, W. S., *The Indian Field Shikar Book*, 6th ed. Calcutta and Simla, 1928.

Champion, F. W., *The Jungle in Sunlight and Shadow*, undated, London (Glossary).

Champion, F. W., *With a Camera in Tiger Land*, 1927.

Dunbar Branden, A. A., *Wild Animals in Central India*, London, 1923 (Glossary).

Ellerman, J. R., and Morrison-Scott, T. C. S., *Checklist of Palaearctic & Indian mammals* (1758 to 1946), London, 1951.

Gee, E. P., *A Glossary of Nature Canservation and Wild Life Management Terminology for use in India*, Leaflet

No. 4, issued by Indian Board of Wild Life, New Delhi, 1960.

Gee, E. P., *Wild Life of India*, London 1951 (Glossary).

Glasfurd., A. I. R., *Rifle and Ramance in the Indian Jungle*, London and N. Y , 1906, (Glossary).

Glasfurd, A. I. R., *Musings of an Old Shikari*, London, 1928.

Hewell,John. *Jungle Trails in Northern India*, London, 1938, (Glossary).

Kinloch, A. A. A., *Large Game Shooting in Thibet, the Himalayas, Northern and Central India*, 3rd ed., Calcutta, 1892.

Milroy, A. J. W., *A Short Treatise on the Management of Elephants*. Shillong, 1922.

Prater, S. H., *The Book of Indian Elephants*, 3rd ed., Bombay, 1971.

Russell, C. E. M., *Bullet and Shot in the Indian Forest, Plain, and Hill.*, 2nd ed., London, 1900.

Sanderson, G. P., *Thirteen years Among the Wild Beast of India*, 7th ed., Edinburgh, 1912.

Silver Hackle (A. G. Shuttleworth), *Indian jungle Lore and the Rifle*, Calcutta, 1929.

Sinha, Kirtananda, *Purnea—A Shikar Land*, Calcutta, 1916.

Smythies, E. A , *Big Game Shooting in Nepal*, Calcutta, 1942, (Glossary).

Stewart, A. E., *Tiger and other Game*, Bombay, Calcutta, Madras, 1927, (Glossary).

Sterndale, R. A., *Seonee*, Calcutta, Bombay, London, 1887, (Glossary).

Stockley, C H., *Big Game Shooting in the Indian Empire*, Calcutta etc , 1928.

Stockley, C. H., *Shikar*, London, 1928.

Stracey, P. D., *Elephant Gold*, London, 1892 (Glossary).

Tulloch, M., *The All-in-one Shikar Book*, Bombay, undated, (Glossary).

Woodyatt, N., *My Sporting Memories*, London, 1923.

চিকলা
পরিকল্পিত পার্কের সীমানা
ব্লকের সীমানা
নদীনালা
মোটর রাস্তা
ফরেস্ট রেস্ট হাউস
ফরেস্ট গার্ড চৌকী
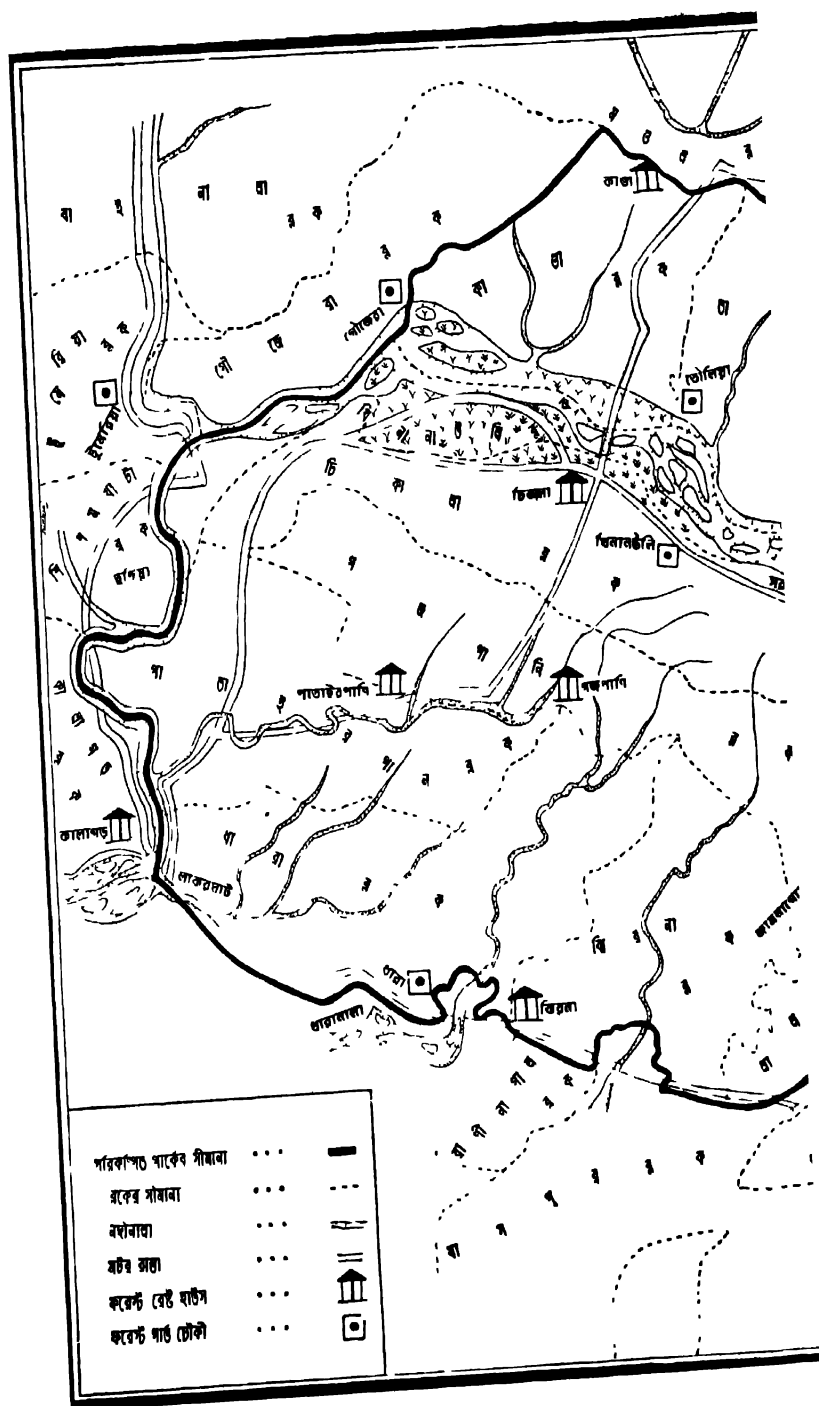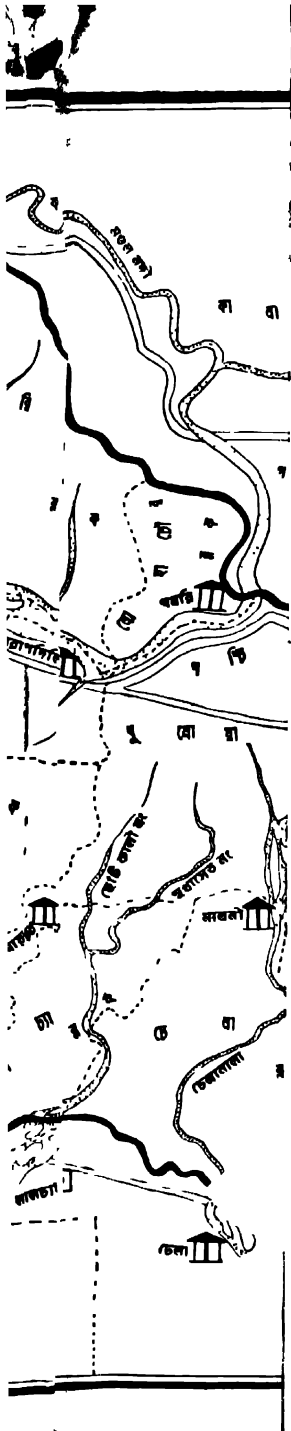
আজীবন অকৃতদার ছিলেন। করবেট প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বিশ্বযুদ্ধেই স্বেচ্ছায় যোগদান করেন এবং প্রথমটিতে মেজর ও দ্বিতীয়টিতে লেফটেনান্ট কর্নেল হন। ভারতের বন্যপ্রাণী ও অরণ্য সংরক্ষণে তাঁব আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল আজীবন। ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম বই 'ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' বেরোয় ও সঙ্গে সঙ্গে করবেট বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন। প্রকাশকসংস্থার তাগিদে তিনি যথাক্রমে 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' (১৯৪৮) ; 'মাই ইন্ডিয়া' (১৯৫২) ; 'জাঙ্গল্ লোর' (১৯৫৩) ; 'দি টেম্পল টাইগার অ্যান্ড মোর ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' (১:) লেখেন। নবখাদক শ্বাপদ তিনি শিকাব কবেছিলেন ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ অবধি। অনুরূপ দশটি শ্বাপদ শিকাবেব কথা তিনি লিখে গেছেন। সংবক্ষণ আন্দোলনে আজীবন আগ্রহী ছিলেন।